বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

রাধারাণী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক:
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, অপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্মথমোহন বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

শ্রাবণ, ১৩৪৭

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্কিম-জীবনী'তে লিখিয়াছেন—

> গৃহ-বিগ্রহ রাধাবল্লভজীউর রথযাত্রা প্রতিবৎসর মহাসমারোহে [কাঁঠালপাড়ায়] সম্পন্ন হইত। পূজনীয় যাদবচন্দ্র তখন জীবিত। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ সালে রথযাত্রার সময় ছুটী লইয়া গৃহে বসিয়া ছিলেন। রথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হারাইয়া যায়। তাহার আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধানার্থ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার দুই মাস পরে "রাধারাণী" লিখিত হয়। আমার মনে হয়, এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "রাধারাণী" রচনা করিয়াছিলেন।—তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩০৩

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুন হইতে ছুটি লইয়া কাঁঠালপাড়ায় বাস করিয়াছিলেন। ঐ সালের শেষ দিকে অর্থাৎ কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'রাধারাণী' বাহির হয়। ইহা ঐ বৎসরে পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'উপকথা' নামক পুস্তকে 'রাধারাণী' পুনর্মুদ্রিত হয় এবং পরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাসে'ও ইহা স্থান লাভ করে। ইহাতে 'রাধারাণী' অংশ তৃতীয় সংস্করণ বলিয়া উল্লিখিত আছে। ঐই অংশ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও বাহির হয় (১৮৮৬); পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৮। ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে ইহা বর্ত্তমান আকারে পরিবর্দ্ধিত হয়। বর্ত্তমান সংস্করণ চতুর্থ সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৬৫।

প্রথম সংস্করণ 'রাধারাণী' আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই এবং উহা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত গল্পের হুবহু পুনর্মুদ্রণ কি না, তাহাও আমাদের জানা নাই। এই কারণে 'রাধারাণী'র পাঠভেদ দেওয়া সম্ভব হইল না।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে ইহা আর. সি. মৌলিক কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাচরণ রায় ইহার একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। শেষোক্ত অনুবাদের সঙ্গে 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'রও অনুবাদ আছে, পুস্তকের নাম—*The Two Rings and Radharani*। অন্য কোনও ভাষায় ইহার কোনও অনুবাদ হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।
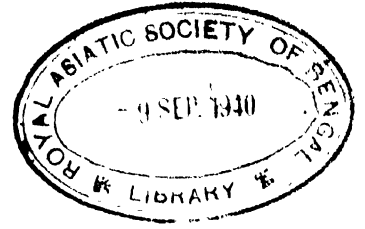
রাধারাণী

[১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত চতুর্থ সংস্করণ হইতে]

চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন

এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া, ইহার কলেবর বাড়াইতে হইয়াছে। কাজেই মূল্যও বাড়াইতে হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল—বড়মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই; তাহার মাতার সঙ্গে এক জন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়; সর্ব্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি; ডিক্রীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল, তাহাও গেল; রাধারাণীর মাতা, অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, প্রিবিকৌন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটীরে আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্ব্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িতা হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্না, এ জন্য কাজে কাজেই তাহার উপবাস; রাধারাণীর জুটিল না বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল, কিন্তু পথ্য কোথা? কি দিবে?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দ্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মুসলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষুঃ বারি বর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল—কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল। আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ডবিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমত সময় অন্ধকারে, অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই—এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, "কে গা তুমি কাঁদ ?"

পুরুষ মানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে—কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা—রাধারাণীর ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল, "আমি দুঃখিলোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল মা আছে।"

সে পুরুষ বলিল, "তুমি কোথা গিয়াছিলে ?"

রাধা। আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। অন্ধকারে, বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল, "তোমার বাড়ী কোথায় ?"

রাধারাণী বলিল, "শ্রীরামপুর।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, কোন্ পাড়ায় তোমার বাড়ী—তাহা আমাকে বলিয়া দিও—আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী বড় বালিকা। এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড় বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোমার বয়স কত ?"

রাধা। দশ এগার বছর—

"তোমার নাম কি ?"

রাধা। রাধারাণী।

"হাঁ রাধারাণি! তুমি ছেলেমানুষ, একেলা রথ দেখিতে গিয়াছিলে কেন?"

তখন সে কথায় কথায়, মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল যে, মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে গিয়াছিল—রথ দেখিতে যায় নাই—সে মালাও বিক্রয় হয় নাই—এক্ষণেও বালিকার হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তখন সে বলিল, "আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম। আমাদের বাড়ীতে ঠাকুর আছেন, তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি।"

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল যে, আমাকে যে এত যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি প্রকারে? তা নহিলে, আমার মা খেতে পাবে না। তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী, মালা সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, "ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।" সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল, "এ কি পয়সা? এ যে বড় বড় ঠেক্‌চে।"

"ডবল পয়সা—দেখিতেছ না দুইটা বই দিই নাই।"

রাধা। তা এ যে অন্ধকারেও চক্‌চক্ কর্‌চে। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই ত?

"না। নূতন কলের পয়সা, তাই চক্‌চক্ কর্‌চে।"

রাধা। তা, আচ্ছা, ঘরে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে যদি দেখি যে, পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।

কিছু পরে তাহারা রাধারাণীর মার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া, রাধারাণী বলিল, "তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি, টাকা কি পয়সা।"

সঙ্গী বলিল, "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি আগে ভিজা কাপড় ছাড়—তার পর প্রদীপ জ্বালিও।"

রাধারাণী বলিল, "আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল, তাহা কাচিতে দিয়াছি। তা, আমি ভিজা কাপড়ে সর্ব্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিঙড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালি।"

"আচ্ছা।"

ঘরে তৈল ছিল না, সুতরাং চালের খড় পাড়িয়া চকমকি ঠুকিয়া, আগুন জ্বালিতে হইল। আগুন জ্বালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল। আলো জ্বালিয়া রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া তল্লাস করিয়া দেখিল যে, যে টাকা দিয়াছে, সে নাই—চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষণ্নবদনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিল—সকাতরে বলিল—"মা! এখন কি হবে?"

মা বলিল, "কি হবে বাছা! সে কি আর না জেনে টাকা দিয়েছে? সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারী হইয়াছি, দান গ্রহণ করিয়া খরচ করি।"

তাহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটীরের আগড় ঠেলিয়া বড় সোর গোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিল—মনে করিয়াছিল যে, সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল! তিনি কেন? পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্‌সে!

রাধারাণীর মার কুটীর বাজারের অনতিদূরে। তাহাদের কুটীরের নিকটেই পদ্মলোচন শাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন খোদ,—পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্‌সে—একযোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, এখন দ্বার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল। বলিল, "রাধারাণীর এই কাপড়।"

রাধারাণী বলিল, "ও মা! আমার কিসের কাপড়!"

পদ্মলোচন—সে বাস্তবিক পোড়ারমুখো কি না, তাহা আমরা সবিশেষ জানি না—রাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল; বলিল, "কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীকে দিয়া এস।"

রাধারাণী তখন বলিল, "ওমা সেই গো! সেই। তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাঁ গা পদ্মলোচন?"—

রাধারাণীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইঁহাদের কাছে সুপরিচিত—অনেক বারই ইঁহাদিগের নিকট যখন সুদিন ছিল, তখন চারি টাকার কাপড়ে শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বারো আনা, আর দুই আনা মুনফা লইতেন।

"হাঁ পদ্মলোচন—বলি সে বাবুটিকে চেন?"

পদ্মলোচন বলিল, "তোমরা চেন না ?"

রাধা। না।

পদ্ম। আমি বলি তোমাদের কুটুম্ব। আমি চিনি না।

যাহা হৌক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনফা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া, প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।

এ দিকে রাধারাণী, প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গাইয়া মার পথ্যের উদ্যোগের জন্য বাজারে গেল। বাজার করিয়া, তৈল আনিয়া প্রদীপ জ্বালিল। মার জন্য যৎকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিষ্কার করিয়া, মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল—"এ কি মা!"

মা দেখিয়া বলিলেন—"একখানা নোট!"

রাধারাণী বলিল, "তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।"

মা বলিলেন, "হাঁ! তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, তোমার নাম লেখা আছে।"

রাধারাণী বড়ঘরের মেয়ে, একটু অক্ষরপরিচয় ছিল। সে পড়িয়া দেখিল, তাই বটে। লেখা আছে।

রাধারাণী বলিল, "হাঁ মা, এমন লোক কে মা!"

মা বলিলেন, "তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এই জন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুক্মিণীকুমার রায়।"

পরদিন মাতায় কন্যায়, রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল না—তুলিয়া রাখিল—তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাধারাণীর মাতা পথ্য করিলেন বটে, কিন্তু সে রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া, তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অতিশয় ধনী ছিলেন, এখন অতি দুঃখিনী হইয়াছিলেন, এই শারীরিক এবং মানসিক দ্বিবিধ কষ্ট, তাঁহার সহ্য হইল না। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, তাঁহার শেষ কাল উপস্থিত হইল।

এমত সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল যে, প্রিবি কৌন্সিলের আপীল তাঁহার পক্ষে নিষ্পত্তি পাইয়াছে ; তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, ওয়াশিলাতের টাকা ফেরত পাইবেন এবং তিন আদালতের খরচা পাইবেন। কামাখ্যানাথ বাবু তাঁহার পক্ষে হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সংবাদ লইয়া রাধারাণীর মাতার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সুসংবাদ শুনিয়া, রুগ্নার অবিরল নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল।

তিনি নয়নাশ্রু সংবরণ করিয়া কামাখ্যা বাবুকে বলিলেন, "যে প্রদীপ নিবিয়াছে, তাহাতে তেল দিলে কি হইবে ? আপনার এ সুসংবাদেও আমার আর প্রাণরক্ষা হইবে না। আমার আয়ুঃশেষ হইয়াছে। তবে আমার এই সুখ যে, রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না। তাই বা কে জানে ? সে বালিকা, তাহার এ সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে ? কেবল আপনিই ভরসা। আপনি আমার এই অন্তিম কালে আমারে একটি ভিক্ষা দিউন—নহিলে আর কাহার কাছে চাহিব।"

কামাখ্যা বাবু অতি ভদ্র লোক এবং তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধু ছিলেন। রাধারাণীর মাতা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে, তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, যত দিন না আপীল নিষ্পত্তি পায়, অন্ততঃ তত দিন তোমরা আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার মত তোমাকে রাখিব। রাধারাণীর মাতা তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। পরিশেষে কামাখ্যা বাবু কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। "আমার এখনও কিছু হাতে আছে—আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইব।" এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া রাধারাণীর মাতা সে সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। রুক্মিণীকুমারের দান গ্রহণ তাঁহাদিগের প্রথম ও শেষ দান গ্রহণ।

কামাখ্যা বাবু এতদিন বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। দশা দেখিয়া কামাখ্যাবাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন। আবার রাধারাণীর মাতা, যুক্তকরে তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছেন, দেখিয়া আরও কাতর হইলেন ; বলিলেন, "আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব ? আপনার যাহা প্রয়োজনীয়, আমি তাহাই করিব।"

রাধারাণীর মাতা বলিলেন, "আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। এক্ষণে আদালত হইতে আমার শ্বশুরের যথার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে ; অতএব রাধারাণী একা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কন্যার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিবেন, এই আমার ভিক্ষা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।"

কামাখ্যা বাবু বলিলেন, "আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি রাধারাণীকে আপন কন্যার অধিক যত্ন করিব। আমি কায়মনোবাক্যে এ কথা কহিলাম; আপনি বিশ্বাস করুন।"

যিনি মুমূর্ষু, তিনি কামাখ্যা বাবুর চক্ষের জল দেখিয়া, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার সেই শীর্ণ শুষ্ক অধরে একটু আহ্লাদের হাসি দেখা দিল। হাসি দেখিয়া কামাখ্যা বাবু বুঝিলেন, ইনি আর বাঁচিবেন না।

কামাখ্যা বাবু তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, এক্ষণে আমার গৃহে চলুন। পরে ভদ্রাসন দখল হইলে আসিবেন। রাধারাণীর মাতার যে অহঙ্কার, সে দারিদ্র্যজনিত—এজন্য দারিদ্র্যাবস্থায় তাঁহার গৃহে যাইতে চাহেন নাই। এক্ষণে আর দারিদ্র্য নাই, সুতরাং আর সে অহঙ্কারও নাই। এক্ষণে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। কামাখ্যা বাবু, রাধারাণী ও তাহার মাতাকে সযত্নে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যা বাবু রাধারাণীকে তাহার সম্পত্তিতে দখল দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিজ বাটীতে একা থাকিতে দিলেন না, আপন গৃহেই রাখিলেন।

কালেক্টর সাহেব, রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবার জন্য যত্ন পাইলেন, কিন্তু কামাখ্যা বাবু বিবেচনা করিলেন, আমি রাধারাণীর জন্য যতদূর করিব, সরকারি কর্ম্মচারিগণ ততদূর করিবে না। কামাখ্যা বাবুর কৌশলে কালেক্টর সাহেব নিরস্ত হইলেন। কামাখ্যা বাবু স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

বাকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যা বাবু নব্যতন্ত্রের লোক—বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমত কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী, স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া শিখুক।

এই ভাবিয়া কামাখ্যা বাবু রাধারাণীর বিবাহের কোন উদ্যোগ না করিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিত করাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসর গেল—রাধারাণী পরম সুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী। কিন্তু সে অন্তঃপুরমধ্যে বাস করে, তাহার সে রূপরাশি কেহ দেখিতে পায় না। এক্ষণে রাধারাণীর সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল। কামাখ্যা বাবুর ইচ্ছা, রাধারাণীর মনের কথা বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধ করেন। তত্ত্ব জানিবার জন্য আপনার কন্যা বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন।

বসন্তের সঙ্গে রাধারাণীর সখীত্ব। উভয়ে সমবয়স্কা। এবং উভয়ে অত্যন্ত প্রণয়। কামাখ্যা বাবু বসন্তকে আপনার মনোগত কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

বসন্ত সলজ্জভাবে, অথচ অল্প হাসিতে হাসিতে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে?"

কামাখ্যা বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না। তা ত জানি না। কেন?"

বসন্ত বলিল, "রাধারাণী রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

কামাখ্যা। সে কি? রাধারাণীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পরিচয় কি প্রকারে হইল?

বসন্ত অবনতমুখে অল্প হাসিল। সে রথের রাত্রির বিবরণ সবিস্তারে রাধারাণীর কাছে শুনিয়াছিল, পিতার সাক্ষাতে সকল বিবৃত করিল। শুনিয়া কামাখ্যা বাবু রুক্মিণীকুমারের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "রাধারাণীকে বুঝাইয়া বলিও, রাধারাণী একটি মহাভ্রমে পড়িয়াছে। বিবাহ কৃতজ্ঞতা অনুসারে কর্ত্তব্য নহে। রুক্মিণীকুমারের নিকট রাধারাণীর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত; যদি সময় ঘটে, তবে অবশ্য প্রত্যুপকার করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহে রুক্মিণীকুমারের কোন দাবি দাওয়া নাই। তাতে আবার সে কি জাতি, কত বয়স, তাহা কেহ জানে না। তাহার পরিবার সন্তানাদি থাকিবারই সম্ভাবনা; রুক্মিণীকুমারের বিবাহ করিবারই বা সম্ভাবনা কি?"

বসন্ত বলিল, "সম্ভাবনা কিছুই নাই, তাহাও রাধারাণী বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। কিন্তু সেই রাত্রি অবধি, রুক্মিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। যেমন দেবতাকে লোকে পূজা করে, রাধারাণী সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া, প্রত্যহ মনে মনে পূজা করে। এই পাঁচ বৎসর রাধারাণী আমাদিগের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাঁচ বৎসরে, এমন দিন প্রায় যায় নাই, যে দিন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই। আর কেহ রাধারাণীকে বিবাহ করিলে, তাহার স্বামী সুখী হইবে না।"

কামাখ্যা বাবু মনে মনে বলিলেন, "বাতিক। ইহার একটু চিকিৎসা আবশ্যক। কিন্তু প্রথম চিকিৎসা বোধ হয়, রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করা।"

কামাখ্যা বাবু রুক্মিণীকুমারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং কলিকাতায় তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গকেও সেই সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। দেশে দেশে আপনার মোয়াক্কেলগণকে পত্র লিখিলেন। প্রতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। সে বিজ্ঞাপন এইরূপ—

"বাবু রুক্মিণীকুমার রায়, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন—বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাতে রুক্মিণী বাবুর সন্তোষের ব্যতীত অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইবে না।

শ্রী ইত্যাদি—"

কিন্তু কিছুতেই রুক্মিণীকুমারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, তথাপি কৈ, রুক্মিণীকুমার ত আসিল না।

ইহার পর রাধারাণীর আর একটি ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইল—কামাখ্যা বাবুর লোকান্তরগতি হইল। রাধারাণী ইহাতে অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন, দ্বিতীয় বার পিতৃহীনা হইলেন মনে করিলেন। কামাখ্যা বাবুর শ্রাদ্ধাদির পর রাধারাণী আপন বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান স্বয়ং করিতে লাগিলেন। কামাখ্যা বাবুর বিচক্ষণতা হেতু রাধারাণীর সম্পত্তি বিস্তর বাড়িয়াছিল।

বিষয় হস্তে লইয়াই রাধারাণী প্রথমেই দুই লক্ষ মুদ্রা গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন যে, এই অর্থে তাঁহার নিজ গ্রামে একটি অনাথনিবাস স্থাপিত হউক। তাহার নাম হউক—"রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ।"

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ প্রস্তাবিত নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কে কথা কহিবে? অনাথনিবাস সংস্থাপিত হইল। রাধারাণীর মাতা দরিদ্রাবস্থায় নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কেন না, যে গ্রামে যে ধনী ছিল, সে সহসা দরিদ্র হইলে, সে গ্রামে তাহার বাস করা কষ্টকর হয়। তাঁহাদিগের নিজ গ্রাম শ্রীরামপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূর—আমরা সে গ্রামকে রাজপুর বলিব। এক্ষণে রাধারাণী রাজপুরেই বাস করিতেন। অনাথনিবাসও রাধারাণীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিত হইল। নানা দেশ হইতে দীন দুঃখী অনাথ আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুই এক বৎসর পরে, একজন ভদ্রলোক সেই অনাথনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। অবস্থা দেখিয়া, অতি ধীর, গম্ভীর এবং অর্থশালী লোক বোধ হয়। তিনি সেই "রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদের" দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী?"

তাহারা বলিল, "এ কাহারও বাড়ী নহে, এখানে দুঃখী অনাথ লোক থাকে। ইহাকে 'রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ' বলে।"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি ইহার ভিতরে গিয়া দেখিতে পারি?"

রক্ষকগণ বলিল, "দীন দুঃখী লোকেও ইহার ভিতর অনায়াসে যাইতেছে—আপনাকে নিষেধ কি?"

দর্শক ভিতরে গিয়া সব দেখিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলিলেন, "বন্দবস্ত দেখিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে। কে এই অন্নসত্র দিয়াছে? রুক্মিণীকুমার কি তাঁহার নাম?"

রক্ষকেরা বলিল, "এক জন স্ত্রীলোক এই অন্নসত্র দিয়াছেন।"

দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ইহাকে রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ বলে কেন?"

রক্ষকেরা বলিল, "তাহা আমরা কেহ জানি না।"

"রুক্মিণীকুমার কার নাম?"

"কাহারও নয়।"

"যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার নিবাস কোথায়?"

রক্ষকেরা সম্মুখে অতি বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তোমরা যাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিলে, তিনি পুরুষ মানুষের সাক্ষাতে বাহির হইয়া থাকেন? রাগ করিও না, এখন অনেক বড় মানুষের মেয়ে মেম লোকের মত বাহিরে বাহির হইয়া থাকে, এই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

রক্ষকেরা উত্তর করিল—"ইনি সেরূপ চরিত্রের নন। পুরুষের সমক্ষে বাহির হন না।"

প্রশ্নকর্ত্তা ধীরে ধীরে, রাধারাণীর অট্টালিকার অভিমুখে গিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সচরাচর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত ; বিশেষ পারিপাট্য, অথবা পারিপাট্যের বিশেষ অভাবও কিছু ছিল না, কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলিতে একটি হীরকাঙ্গুরীয় ছিল ; তাহা দেখিয়া, রাধারাণীর কর্ম্মকারকগণ অবাক্ হইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল, এত বড় হীরা তাহারা কখন অঙ্গুরীয়ে দেখে নাই। তাঁহার সঙ্গে কেহ লোক ছিল না, এজন্য তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, কে ইনি ? মনে করিল, বাবু স্বয়ং পরিচয় দিবেন। কিন্তু বাবু কোন পরিচয় দিলেন না। তিনি রাধারাণীর দেওয়ানজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। বলিলেন, "এই পত্র আপনার মুনিবের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, আমাকে উত্তর আনিয়া দিন।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "আমার মুনিব স্ত্রীলোক, আবার অল্পবয়স্কা। এজন্য তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন অপরিচিত লোকে পত্র আনিলে আমরা তাহা না পড়িয়া তাঁহার কাছে পাঠাইব না।"

আগন্তুক বলিল, "আপনি পড়ুন।"

দেওয়ানজী পত্র পড়িলেন—

"প্রিয় ভগিনি !

এ ব্যক্তি পুরুষ হইলেও ইহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিও—ভয় করিও না। যেমত যেমত ঘটে, আমাকে লিখিও।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী।"

কামাখ্যা বাবুর কন্যার স্বাক্ষর দেখিয়া, কেহ আর কিছু বলিল না। পত্র অন্তঃপুরে গেল।

অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকা, পত্রবাহক বাবুকে লইতে আসিল। আর কেহ সঙ্গে যাইতে পাইল না—হুকুম নাই।

পরিচারিকা, বাবুকে লইয়া এক সুসজ্জিত গৃহে বসাইলেন। রাধারাণীর অন্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষ মানুষ প্রবেশ করিল। দেখিয়া এক জন পরিচারিকা রাধারাণীকে ডাকিতে গেল, আর এক জন অন্তরালে থাকিয়া আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল যে, তাঁহার বর্ণ টুকু গৌর, স্ফুটিত মল্লিকারাশির মত গৌর ; তাঁহার শরীর দীর্ঘ, ঈষৎ স্থূল ; কপাল

দীর্ঘ, অতি সূক্ষ্ম পরিষ্কার ঘনকৃষ্ণ সুরঞ্জিত কেশজালে মণ্ডিত; চক্ষু বৃহৎ, কটাক্ষ স্থির, ভ্রূযুগ সূক্ষ্ম, ঘন, দূরায়ত এবং নিবিড় কৃষ্ণ; নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত; ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, ক্ষুদ্র এবং কোমল; গ্রীবা দীর্ঘ, অথচ মাংসল; অন্যান্য অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কেবল অঙ্গুলিগুলি দেখা যাইতেছে, সেগুলি শুভ্র, সুগঠিত, এবং একটি বৃহদাকার হীরকে রঞ্জিত।

রাধারাণী সেই স্থানে আসিয়া পরিচারিকাকে বিদায় করিয়া দিলেন। রাধারাণী আসিবামাত্র দর্শকের বোধ হইল যে, সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব সূর্য্যোদয় হইল—রূপের আলোকে তাঁহার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আগন্তুকের উচিত, প্রথম কথা কহা—কেন না, তিনি পুরুষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ—কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাধারাণী একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি এরূপ গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছেন কেন? আমি স্ত্রীলোক, কেবল বসন্তের অনুরোধেই আমি ইহা স্বীকার করিয়াছি।"

আগন্তুক বলিল, "আমি আপনার সহিত এরূপ সাক্ষাতের অভিলাষী হইয়াছি, ঠিক তা নহে।"

রাধারাণী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তা নয়, বটে। তবে বসন্ত কি জন্য এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই। বোধ হয়, আপনি জানেন।"

আগন্তুক একখানি অতি পুরাতন সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহা রাধারাণীকে দেখাইলেন। রাধারাণী পড়িলেন; কামাখ্যা বাবুর স্বাক্ষরিত রুক্মিণীকুমার সম্বন্ধে সেই বিজ্ঞাপন। রাধারাণী দাঁড়াইয়াছিলেন—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নারিকেলপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। আগন্তুকের দেবতুল্য গঠন দেখিয়া, মনে ভাবিলেন, ইনিই আমার সেই রুক্মিণীকুমার। আর থাকিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আপনার নাম কি রুক্মিণীকুমার বাবু?"

আগন্তুক বলিলেন, "না।" "না" শব্দ শুনিয়াই রাধারাণী ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—তাঁহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া গেল। আগন্তুক বলিলেন, "না। আমি যদি রুক্মিণীকুমার হইতাম, তাহা হইলে, কামাখ্যা বাবু এ বিজ্ঞাপন দিতেন না। কেন না, তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তখনি আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।"

রাধারাণী বলিল, "যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন কেন?"

উত্তরকারী বলিলেন, "একটি কৌতুকের জন্য। আজি আট দশ বৎসর হইল, আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম—কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে আপনার নামটা গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতাম। কাল্পনিক নাম রুক্মিণীকুমার। আপনি অত বিমনা হইতেছেন কেন?"

রাধারাণী একটু স্থির হইলেন—আগন্তুক বলিতে লাগিলেন—"যথার্থ রুক্মিণীকুমার নাম ধরে, এমন কাহাকেও চিনি না। যদি কেহ আমারই তল্লাস করিয়া থাকে—তাহা সম্ভব নহে—তথাপি কি জানি—সাত পাঁচ ভাবিয়া বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিলাম—কিন্তু কামাখ্যা বাবুর কাছে আসিতে সাহস হইল না।"

"পরে?"

"পরে কামাখ্যা বাবুর শ্রাদ্ধে তাঁহার পুত্রগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আমি কার্য্যগতিকে আসিতে পারি নাই। সম্প্রতি সেই ত্রুটির ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য তাঁহার পুত্রদিগের নিকট আসিলাম। কৌতুকবশতঃ বিজ্ঞাপন সঙ্গে আনিয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে উহার কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যা বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হইয়াছিল? কামাখ্যা বাবুর পুত্র বলিলেন যে, রাধারাণীর অনুরোধে। আমিও এক রাধারাণীকে চিনিতাম—এক বালিকা—আমি এক দিন দেখিয়া তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। সে মাতার পথ্যের জন্য, আপনি অনাহারে থাকিয়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া—সেই অন্ধকার বৃষ্টিতে—" বক্তা আর কথা কহিতে পারিলেন না—তাঁহার চক্ষু জলে পুরিয়া গেল। রাধারাণীরও চক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল। চক্ষু মুছিয়া রাধারাণী বলিল, "ইতর লোকের কথায় এখন প্রয়োজন কি? আপনার কথা বলুন।"

আগন্তুক উত্তর করিলেন, "রাধারাণী ইতর লোক নহে। যদি সংসারে কেহ দেবকন্যা থাকে, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহাকে পবিত্র, সরলচিত্ত, এ সংসারে আমি দেখিয়া থাকি, তবে সেই রাধারাণী—যদি কাহারও কথায় অমৃত থাকে, তবে সেই রাধারাণী—যথার্থ অমৃত! বর্ণে বর্ণে অপ্সরার বীণা বাজে, যেন কথা কহিতে বাধ বাধ করে অথচ সকল কথা পরিষ্কার, সুমধুর,—অতি সরল! আমি এমন কণ্ঠ কখন শুনি নাই—এমন কথা কখনও শুনি নাই!"

রুক্মিণীকুমার—এক্ষণে ইঁহাকে রুক্মিণীকুমারই বলা যাউক—ঐ সঙ্গে মনে মনে বলিলেন, "আবার আজ বুঝি তেমনি কথা শুনিতেছি!"

রুক্মিণীকুমার মনে মনে ভাবিতেছিলেন, আজি এত দিন হইল, সেই বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, ঠিক্ আজিও সে কণ্ঠ আমার মনের ভিতর জাগিতেছে। যেন কাল

শুনিয়াছি। অথচ আজি এই সুন্দরীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার সেই রাধারাণীকেই বা মনে পড়ে কেন? এই কি সেই? আমি মূর্খ! কোথায় সেই দীনদুঃখিনী, কুটীরবাসিনী ভিখারিণী—আর কোথায় এই উচ্চপ্রাসাদবিহারিণী ইন্দ্রাণী! আমি সে রাধারাণীকে অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, সুতরাং জানি না যে, সে সুন্দরী, কি কুৎসিতা, কিন্তু এই শচীনিন্দিতা রূপসীর শতাংশের একাংশ রূপও যদি তাহার থাকে, তাহা হইলে সেও লোকমনোমোহিনী বটে!

এ দিকে রাধারাণী, অতৃপ্তশ্রবণে রুক্মিণীকুমারের মধুর বচনগুলি শুনিতেছিলেন—মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তুমি যাহা পাপিষ্ঠা রাধারাণীকে বলিতেছ, কেবল তোমাকেই সেই কথাগুলি বলা যায়! তুমি আজ আট বৎসরের পর রাধারাণীকে ছলিবার জন্য কোন্ নন্দনকানন ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিলে? এত দিনে কি আমার হৃদয়ের পূজায় প্রীত হইয়াছ? তুমি কি অন্তর্যামী? নহিলে আমি লুকাইয়া লুকাইয়া, হৃদয়ের ভিতরে লুকাইয়া তোমাকে যে পূজা করি, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?

এই প্রথম, দুই জনে স্পষ্ট দিবসালোকে, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দুই জনে, দুই জনের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর এমন আছে কি? এই সসাগরা, নদনদীচিত্রিতা, জীবসঙ্কুলা পৃথিবীতলে এমন তেজোময়, এমন মধুর, এমন সুখময়, এমন চঞ্চল অথচ স্থির, এমন সহাস্য অথচ গম্ভীর, এমন প্রফুল্ল অথচ ব্রীড়াময়, এমন আর আছে কি? চিরপরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অভিনব মধুরিমাময়, আত্মীয় অথচ অত্যন্ত পর, চিরস্মৃত অথচ অদৃষ্টপূর্ব্ব—কখন দেখি নাই, আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি?

রাধারাণী বলিল,—বড় কষ্টে বলিতে হইল, কেন না, চক্ষের জল থামে না, আবার সেই চক্ষের জলের উপর কোথা হইতে পোড়া হাসি আসিয়া পড়ে—রাধারাণী বলিল, "তা, আপনি এতক্ষণ কেবল সেই ভিখারিণীর কথাই বলিলেন, আমাকে যে কেন দর্শন দিয়াছেন, তা ত এখনও বলেন নাই।"

হাঁ গা, এমন করিয়া কি কথা কহা যায় গা? যাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, প্রাণেশ্বর! দুঃখিনীর সর্ব্বস্ব! চিরবাঞ্ছিত! বলিয়া যাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে; আবার যাকে সেই সঙ্গে "হাঁ গা, সেই রাধারাণী পোড়ারমুখী তোমার কে হয় গা" বলিয়া তামাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে—তার সঙ্গে আপনি, মশাই, দর্শন দিয়াছেন, এই সকল কথা নিয়ে কি কথা কহা যায় গা? তোমরা পাঁচ জন রসিকা, প্রেমিকা,

বাক্‌চতুরা, বয়োধিকা ইত্যাদি ইত্যবদি আছ, তোমরা পাঁচ জনে বল দেখি, ছেলেমানুষ রাধারাণী কেমন করে এমন করে কথা কয় গা ?

রাধারাণী মনে মনে একটু পরিতাপ করিল ; কেন না, কথাটা একটু ভর্ৎসনার মত হইল। রুক্মিণীকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"তাই বলিতেছিলাম। আমি সেই রাধারাণীকে চিনিতাম—রাধারাণীকে মনে পড়িল, একটু—এতটুকু—অন্ধকার রাত্রে জোনাকির ন্যায়—একটু আশা হইল যে, যদি এই রাধারাণী আমার সেই রাধারাণী হয় !"

"তোমার রাধারাণী।" রাধারাণী ছল ধরিয়া চুপি চুপি এই কথাটি বলিয়া, মুখ নত করিয়া ঈষৎ ঈষৎ হাসিল। হাঁ গা, না হেসে কি থাকা যায় গা ? তোমরা আমার রাধারাণীর নিন্দা করিও না।

রুক্মিণীকুমারও মনে মনে ছল ধরিল—এ তুমি বলে কেন ? কে এ ? প্রকাশ্যে বলিল, "আমারই রাধারাণী। আমি একরাত্রি মাত্র তাহাকে দেখিয়া—দেখিয়াছিই বা কেমন করিয়া বলি—এই আট বৎসরেও তাহাকে ভুলি নাই। আমারই রাধারাণী।"

রাধারাণী বলিল, "হোক আপনারই রাধারাণী।"

রুক্মিণী বলিতে লাগিলেন, "সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কামাখ্যা বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কে ? কামাখ্যা বাবুর পুত্র সবিস্তারে পরিচয় দিতে বোধ হয় অনিচ্ছুক ছিলেন ; কেবল বলিলেন, 'আমাদিগের কোন আত্মীয়ার কন্যা।' যেখানে তাঁহাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম, সেখানে আর অধিক পীড়াপীড়ি করিলাম না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কেন রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিয়াছিলেন, শুনিতে পাই কি ? যদি প্রয়োজন হয় ত বোধ করি, আমি কিছু সন্ধান দিতে পারি। আমি এই কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, 'কেন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারকে খুঁজিয়াছিলেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না ; আমার পিতৃঠাকুর জানিতেন ; বোধ করি, আমার ভগিনীও জানিতে পারেন। যেখানে আপনি সন্ধান দিতে পারেন বলিতেছেন, সেখানে আমার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে হইতেছে।' এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র দিলেন, সে পত্র আপনাকে দিয়াছি। তিনি আমাকে সেই পত্র দিয়া বলিলেন, আমার ভগিনী সবিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না, কেবল এই পত্র দিলেন, আর বলিলেন যে, এই পত্র লইয়া তাঁহাকে স্বয়ং রাজপুরে যাইতে বলুন। রাজপুরে যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন। আমি সেই পত্র লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। কোন অপরাধ করিয়াছি কি ?"

রাধারাণী বলিল, “জানি না। বোধ হয় যে, আপনি মহাভ্রমে পতিত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন। আপনার রাধারাণী কে, তাহা আমি চিনি কি না, বলিতে পারিতেছি না। সে রাধারাণীর কথা কি, শুনিলে বলিতে পারি, আমা হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না।”

রুক্মিণী সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন, কেবল নিজদত্ত অর্থ বস্ত্রের কথা কিছু বলিলেন না। রাধারাণী বলিলেন—“স্পষ্ট কথা মার্জ্জনা করিবেন। আপনাকে রাধারাণীর কোন কথা বলিতে সাহস হয় না; কেন না, আপনাকে দয়ালু লোক বোধ হইতেছে না। যদি আপনি সেরূপ দয়ার্দ্রচিত্ত হইতেন, তাহা হইলে আপনি যে ভিখারী বালিকার কথা বলিলেন, তাহাকে অমন দুর্দ্দশাপন্না দেখিয়া অবশ্য তার কিছু আনুকূল্য করিতেন। কই, আনুকূল্য করার কথা ত কিছু আপনি বলিলেন না?”

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, “আনুকূল্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। আমি সে দিন নৌকাপথে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম—পাছে কেহ জানিতে পারে, এই জন্য ছদ্মবেশে রুক্মিণীকুমার রায় পরিচয়ে লুকাইয়া আসিয়াছিলাম—অপরাহ্ণে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। সঙ্গে যাহা অল্প ছিল, তাহা রাধারাণীকেই দিয়াছিলাম; কিন্তু সে অতি সামান্য। পরদিন প্রাতে আসিয়া উহাদিগের বিশেষ সংবাদ লইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই রাত্রে আমার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তখনই আমাকে কাশী যাইতে হইল। পিতা অনেক দিন রুগ্ন হইয়া রহিলেন, কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিতে আমার বৎসরাধিক বিলম্ব হইল। বৎসর পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কুটীরের সন্ধান করিলাম—কিন্তু তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না।”

রা। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বোধ হয়, সে রথের দিন নিরাশ্রয়ে, বৃষ্টি বাদলে, আপনাকে সেই কুটীরেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন?

রু। অধিকক্ষণ নহে। আমি যাহা রাধারাণীর হাতে দিয়াছিলাম, তাহা দেখিবার জন্য রাধারাণী আলো জ্বালিতে গেল—আমি সেই অবসরে তাহার বস্ত্র কিনিতে চলিয়া আসিলাম।

রাধা। আর কি দিয়া আসিলেন?

রু। আর কি দিব? একখানি ক্ষুদ্র নোট ছিল, তাহা কুটীরে রাখিয়া আসিলাম।

রা। নোটখানি ওরূপে দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই—তাহারা মনে করিতে পারে, আপনি নোটখানি হারাইয়া গিয়াছেন।

রু। না, আমি পেন্‌সিলে লিখিয়া দিয়াছিলাম, "রাধারাণীর জন্য।" তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম, "রুক্মিণীকুমার রায়।" যদি সেই রুক্মিণীকুমারকে সেই রাধারাণী অন্বেষণ করিয়া থাকে, এই ভরসায় বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

রাধা। তাই বলিতেছিলাম, আপনাকে দয়ার্দ্রচিত্ত বলিয়া বোধ হয় না। যে রাধারাণী আপনার শ্রীচরণ দর্শন জন্য—এইটুকু বলিতেই—আ ছি ছি রাধারাণী! ফুলের কুড়ির ভিতর যেমন বৃষ্টির জল ভরা থাকে, ফুলটি নীচু করিলেই ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া যায়, রাধারাণী মুখ নত করিয়া এইটুকু বলিতেই, তাঁহার চোখের জল ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া পড়িতে লাগিল। অমনই যে দিকে রুক্মিণীকুমার ছিলেন, সেই দিকের মাথার কাপড়টা বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া সে ঘর হইতে রাধারাণী বাহির হইয়া গেল। রুক্মিণীকুমার বোধ হয়, চক্ষের জলটুকু দেখিতে পান নাই, কি পাইয়াই থাকিবেন, বলা যায় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাহিরে আসিয়া, মুখে চক্ষে জল দিয়া অশ্রুচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া, রাধারাণী ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, "ইনিই ত রুক্মিণীকুমার। আমিও সেই রাধারাণী। দুই জনে দুই জনের জন্য মন তুলিয়া রাখিয়াছি। এখন উপায়? আমি যে রাধারাণী, তা উঁহাকে বিশ্বাস করাইতে পারি—তার পর? উনি কি জাতি, তা কে জানে। জাতিটা এখনই জানিতে পারা যায়। কিন্তু উনি যদি আমার জাতি না হন! তবে ধর্ম্মবন্ধন ঘটিবে না, চিরন্তনের যে বন্ধন, তাহা ঘটিবে না, প্রাণের বন্ধন ঘটিবে না। তবে আর উঁহার সঙ্গে কথায় কাজ কি? না হয় এ জন্মটা রুক্মিণীকুমার নাম জপ করিয়া কাটাইব। এত দিন সেই জপ করিয়া কাটাইয়াছি, জোয়ারের প্রথম বেগটা কাটিয়া গিয়াছে—বাকি কাল কাটিবে না কি?"

এই ভাবিতে ভাবিতে রাধারাণীর আবার নাকের পাটা কাঁপিয়া উঠিল, ঠোঁট দুখানা ফুলিয়া উঠিল—আবার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আবার সে জল দিয়া মুখ চোখ ধুইয়া টোয়ালিয়া দিয়া মুছিয়া ঠিক হইয়া আসিল। রাধারাণী আবার ভাবিতে লাগিল,—

"আচ্ছা! যদি আমার জাতিই হন, তা হলেই বা ভরসা কি? উনি ত দেখিতেছি বয়ঃপ্রাপ্ত—কুমার, এমন সম্ভাবনা কি? তা হলেনই বা বিবাহিত? না! না! তা হইবে না। নাম জপ করিয়া মরি, সে অনেক ভাল—সতীন সহিতে পারিব না।"

"তবে এখন কর্ত্তব্য কি? জাতির কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই কি হইবে? তবে রাধারাণীর পরিচয়টা দিই। আর উনি কে, তাহা জানিয়া লই; কেন না, রুক্মিণীকুমার ত ওঁর নাম নয়—তা ত শুনিলাম। যে নাম জপ করিয়া মরিতে হইবে, তা শুনিয়া লই। তার পর বিদায় দিয়া কাঁদিতে বসি। আ পোড়ারমুখী বসন্ত! না বুঝিয়া, না জানিয়া এ সামগ্রী কেন পাঠাইলি? জানিস্ না কি, এ জীবনসমুদ্র অমন করিয়া মন্থন করিতে গেলে, কাহারও কপালে অমৃত, কাহারও কপালে গরল উঠে!

"আচ্ছা! পরিচয়টা ত দিই।" এই ভাবিয়া রাধারাণী, যাহা প্রাণের অধিক যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া আনিল। সে সেই নোটখানি। বলিয়াছি, রাধারাণী তাহা তুলিয়া রাখিয়াছিল। রাধারাণী তাহা আঁচলে বাঁধিল। বাঁধিতে বাঁধিতে ভাবিতে লাগিল—

"আচ্ছা, যদি মনের বাসনা পূরিবার মতনই হয়? তবে শেষ কথাটা কে বলিবে?" এই ভাবিয়া রাধারাণী আপনা আপনি হাসিয়া কুটপাট হইল। "আ, ছি—ছি—ছি! তা ত আমি পারিব না। বসন্তকে যদি আনাইতাম! ভাল, উঁহাকে এখন দুদিন বসাইয়া রাখিয়া বসন্তকে আনাইতে পারিব না? উনি না হয় সে দুই দিন আমার লাইব্রেরি হইতে বহি লইয়া পড়ুন না। পড়া শুনা করেন না কি? ওঁরই জন্য ত লাইব্রেরি করিয়া রাখিয়াছি। তা যদি দুই দিন থাকিতে রাজি না হন? উঁহার যদি কাজ থাকে? তবে কি হবে? ওঁতে আমাতেই সে কথাটা কি হবে? ক্ষতি কি, ইংরেজের মেয়ের কি হয়? আমাদের দেশে তাতে নিন্দা আছে, তা আমি দেশের লোকের নিন্দার ভয়ে কোন্ কাজটাই করি? এই যে উনিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি বিয়ে কর্‌লেম না, এতে কে না কি বলে? আমি ত বুড়া বয়স পর্য্যন্ত কুমারী;—তা এ কাজটাও না হয় ইংরেজের মেয়ের মত হইল।"

তার পর রাধারাণী বিষণ্ণ মনে ভাবিল, "তা যেন হলো; তাতেও বড় গোল! মম-বাতিতে গড়া মেয়েদের মাঝখানে প্রথাটা এই যে, পুরুষ মানুষেই কথাটা পাড়িবে। ইনি যদি কথাটা না পাড়েন? না পাড়েন, তবে—তবে হে ভগবান্! বলিয়া দাও, কি করিব! লজ্জাও তুমি গড়িয়াছ—যে আগুনে আমি পুড়িতেছি, তাহাও তুমি গড়িয়াছ! এ আগুনে সে লজ্জা কি পুড়িবে না? তুমি এই সহায়হীনা, অনাথাকে দয়া করিয়া, পবিত্রতার আবরণে

আমাকে আবৃত করিয়া লজ্জার আবরণ কাড়িয়া লও। তোমার কৃপায় যেন আমি এক দণ্ডের জন্য মুখরা হই।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভগবান্ বুঝি, সে কথাও শুনিলেন। বিশুদ্ধচিত্তে যাহা বলিবে, তাহাই বুঝি তিনি শুনেন। রাধারাণী মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে, গজেন্দ্রগমনে রুক্মিণীকুমারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রুক্মিণীকুমার তখন বলিলেন, "আপনি আমাকে বিদায় দিয়াও যান নাই, আমি যে কথা জানিবার জন্য আসিয়াছি, তাহাও জানিতে পারি নাই। তাই এখনও যাই নাই।"

রাধা। আপনি রাধারাণীর জন্য আসিয়াছেন, তাহা আমারও মনে আছে। এ বাড়ীতে একজন রাধারাণী আছে, সত্য বটে। সে আপনার নিকট পরিচিত হইবে কি না, সেই কথাটা ঠিক করিতে গিয়াছিলাম।

রু। তার পর?

রাধারাণী তখন অল্প একটু হাসিয়া, একবার আপনার পার দিকে চাহিয়া, আপনার হাতের অলঙ্কার খুঁটিয়া, সেই ঘরে বসান একটা প্রস্তরনির্ম্মিত Niobe প্রতিকৃতি পানে চাহিয়া রুক্মিণীকুমারের পানে না চাহিয়া, বলিল—"আপনি বলিয়াছেন, রুক্মিণীকুমার আপনার যথার্থ নাম নহে। রাধারাণীর যে আরাধ্য দেবতা, তাহার নাম পর্য্যন্ত এখনও সে শুনিতে পায় নাই।"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আরাধ্য দেবতা! কে বলিল?"

রাধারাণী কথাটা অনবধানে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, এখন সামলাইতে গিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "নাম ঐরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।"

কি বোকা মেয়ে।

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আমার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।"

রাধারাণী গুপ্তভাবে দুই হাত যুক্ত করিয়া মনে মনে ডাকিল, "জয় জগদীশ্বর! তোমার কৃপা অনন্ত!" প্রকাশ্যে বলিল, "রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের নাম শুনিয়াছি।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "অমন সকলেই রাজা কবলায়। আমাকে যে কুমার বলে, সে যথেষ্ট সম্মান করে।"

রা। এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল। জানিলাম যে, আপনি আমার স্বজাতি। এখন স্পর্দ্ধা হইতেছে, আজি আপনাকে আমার আতিথ্য স্বীকার করাই।

দেবেন্দ্র। সে কথা পরে হবে। রাধারাণী কৈ?

রা। ভোজনের পর সে কথা বলিব।

দে। মনে দুঃখ থাকিলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না।

রা। রাধারাণীর জন্য এত দুঃখ? কেন?

দে। তা জানি না, বড় দুঃখ—আট বৎসরের দুঃখ, তাই জানি!

রা। হঠাৎ রাধারাণীর পরিচয় দিতে আমার কিছু সঙ্কোচ হইতেছে। আপনি রাধারাণীকে পাইলে কি করিবেন?

দে। কি আর করিব? একবার দেখিব।

রা। একবার দেখিবার জন্য এই আট বৎসর এত কাতর?

দে। রকম রকমের মানুষ থাকে।

রা। আচ্ছা, আমি ভোজনের পরে আপনাকে আপনার রাধারাণী দেখাইব। ঐ বড় আয়না দেখিতেছেন; উহার ভিতর দেখাইব। চাক্ষুষ দেখিতে পাইবেন না।

দে। চাক্ষুষ সাক্ষাতেই বা কি আপত্তি? আমি যে আট বৎসর কাতর!

ভিতরে ভিতরে দুই জনে দুই জনকে বুঝিতেছেন কি না জানি না, কিন্তু কথা বার্ত্তা এইরূপ হইতে লাগিল। রাধারাণী বলিতে লাগিল, "সে কথাটায় তত বিশ্বাস হয় না। আপনি আট বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তখন তাহার বয়স কত?"

দে। এগার হইবে।

রা। এগার বৎসরের বালিকার উপর এত অনুরাগ?

দে। হয় না কি?

রা। কখনও শুনি নাই।

দে। তবে মনে করুন কৌতূহল!

রা। সে আবাব কি?

দে। শুধুই দেখিবার ইচ্ছা।

রা। তা, দেখাইব, ঐ বড় আয়নার ভিতর। আপনি বাহিরে থাকিবেন।

দে। কেন, সম্মুখ সাক্ষাতে আপত্তি কি?

রা। সে কুলের কুলবতী।

দে। আপনিও ত তাই।

রা। আমার কিছু বিষয় আছে। নিজে তাহার তত্বাবধান করি। সুতরাং সকলের সমুখেই আমাকে বাহির হইতে হয়। আমি কাহারও অধীন নই। সে তাহার স্বামীর অধীন, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত—

দে। স্বামী!

রা। হাঁ! আশ্চর্য্য হইলেন যে?

দে। বিবাহিতা!

রা। হিন্দুর মেয়ে—উনিশ বৎসর বয়স—বিবাহিতা নহে?

দেবেন্দ্রনারায়ণ অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া রহিলেন। রাধারাণী বলিলেন, "কেন, আপনি কি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন?"

দে। মানুষ কি না ইচ্ছা করে?

রা। এরূপ ইচ্ছা রাণীজি জানিতে পারিয়াছেন কি?

দে। রাণীজি কেহ ইহার ভিতর নাই। রাধারাণী-সাক্ষাতের অনেক পূর্ব্বেই আমার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে।

রাধারাণী আবার যুক্তকরে ডাকিল, "জয় জগদীশ্বর! আর ক্ষণকাল যেন আমার এমনই সাহস থাকে।" প্রকাশ্যে বলিল, "তা শুনিলেন ত, রাধারাণী পরস্ত্রী। এখনও কি তাহার দর্শন অভিলাষ করেন?"

দে। করি বৈ কি।

রা। সে কথাটা কি আপনার যোগ্য?

দে। রাধারাণী আমার সন্ধান করিয়াছিল কেন, তাহা এখনও আমার জানা হয় নাই।

রা। আপনি রাধারাণীকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ করিবে বলিয়া। আপনি শোধ লইবেন কি?

দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "যা দিয়াছি, তাহা পাইলে লইতে পারি।"

রা। কি কি দিয়াছেন?

দে। একখানা নোট।

রা। এই নিন।

বলিয়া রাধারাণী আঁচল হইতে সেই নোটখানি খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের হাতে দিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন, তাঁহার হাতে লেখা রাধারাণীর নাম সে নোটে আছে। দেখিয়া বলিলেন, "এ নোট কি রাধারাণীর স্বামী কখনও দেখিয়াছেন?"

রা। রাধারাণী কুমারী। স্বামীর কথাটা আপনাকে মিথ্যা বলিয়াছিলাম।

দে। তা, সব ত শোধ হইল না।

রা। আর কি বাকি?

দে। দুইটা টাকা, আর কাপড়।

রা। সব ঋণ যদি এখন পরিশোধ হয়, তবে আপনি আহার না করিয়া চলিয়া যাইবেন। পাওনা বুঝিয়া পাইলে কোন্ মহাজন বসে? ঋণের সে অংশ ভোজনের পর রাধারাণী পরিশোধ করিবে।

দে। আমার যে এখনও অনেক পাওনা বাকি।

রা। আবার কি?

দে। রাধারাণীকে মনঃপ্রাণ দিয়াছি—তা ত পাই নাই।

রা। অনেক দিন পাইয়াছেন। রাধারাণীর মনঃপ্রাণ আপনি অনেক দিন লইয়াছেন —তা সে দেনাটা শোধ-বোধ গিয়াছে।

দে। সুদ কিছু পাই না?

রা। পাইবেন বৈ কি।

দে। কি পাইব?

রা। শুভ লগ্নে সুতহিবুক যোগে এই অধম নারীদেহ আপনাকে দিয়া, রাধারাণী ঋণ হইতে মুক্ত হইবে।

এই বলিয়া রাধারাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাধারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, দেওয়ানজি আসিয়া রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে বহির্ব্বাটীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। যথাবিহিত সময়ে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ভোজন করিলেন। রাধারাণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে

রাধারাণী বলিলেন, "আপনার নগদ দুইটা টাকা ও কাপড় এখনও ধারি। কাপড় পরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি; টাকা খরচ করিয়াছি। তাহা আর ফেরত দিবার যো নাই। তাহার বদলে যাহা আপনার জন্য রাখিয়াছি, তাহা গ্রহণ করুন।"

এই বলিয়া রাধারাণী বহুমূল্য হীরকহার বাহির করিয়া দেবেন্দ্রের গলায় পরাইয়া দিতে গেলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ নিষেধ করিয়া বলিলেন, "যদি ঐরূপে দেনা পরিশোধ করিবে, তবে তোমার গলায় যে ছড়া আছে, তাহাই লইব।"

রাধারাণী হাসিতে হাসিতে আপনার গলার হার খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের গলায় পরাইল। তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সব শোধ হইল—কিন্তু আমি একটু ঋণী রহিলাম।"

রাধা। কিসে?

দে। সেই দুই পয়সার ফুলের মালার মূল্য ত ফেরত পাইলাম। তবে এখন মালা ফেরত দিতে আমি বাধ্য।

রাধারাণী হাসিল।

দেবেন্দ্রনারায়ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক মুক্তাহার পরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা রাধারাণীর কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই ফেরত দিলাম।"

এমন সময়ে পোঁ করিয়া শাঁক বাজিল।

রাধারাণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শাঁক বাজাইল কে?"

তাঁহার একজন দাসী, চিত্রা, উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আমি।"

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাজাইলি?"

চিত্রা বলিল, "কিছু পাইব বলিয়া।"

বলা বাহুল্য যে, চিত্রা পুরস্কৃত হইল। কিন্তু তাহার কথাটা মিথ্যা। রাধারাণী তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া দ্বারের নিকট বসাইয়া আসিয়াছিল।

তার পর দুই জনে বিরলে বসিয়া মনের কথা হইল। রাধারাণী দেবেন্দ্রনারায়ণের বিস্ময় দূর করিবার জন্য, সেই রথের দিনের সাক্ষাতের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার পিতামহের বিষয়সম্পত্তির কথা, পিতামহের উইল লইয়া মোকদ্দমার কথা, তজ্জন্য রাধারাণীর মার দৈন্যের কথা, মার মৃত্যুর কথা, কামাখ্যা বাবুর আশ্রয়ের কথা, প্রিবি কৌন্সিলের ডিক্রীর কথা, কামাখ্যা বাবুর মৃত্যুর কথা, সব বলিল। বসন্তের কথা বলিল, আপনার বিজ্ঞাপনের কথা বলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, হাসিতে হাসিতে, বৃষ্টি বিদ্যুতে, চাতকী

চিরসঞ্চিত প্রণয়সম্ভাষণপিপাসা পরিতৃপ্ত করিল। নিদাঘসন্তপ্ত পর্ব্বত যেমন বর্ষার বারিধারা পাইয়া শীতল হয়, দেবেন্দ্রনারায়ণও তেমনি শীতল হইলেন।

তিনি রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ত কেহ নাই। কিন্তু এ বাড়ী বড় জনাকীর্ণ দেখিতেছি।"

রাধারাণী বলিল, "দুঃখের দিনে আমার কেহ ছিল না। এখন আমার অনেক আত্মীয় কুটুম্ব জুটিয়াছে। আমি এ অল্প বয়সে একা থাকিতে পারি না, এজন্য যত্ন করিয়া তাহাদিগকে স্থান দিয়া রাখিয়াছি।"

দে। তাঁহাদের মধ্যে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট কেহ আছে যে, তোমাকে এই দীন দরিদ্রকে দান করিতে পারে?

রা। তাও আছে।

দে। তবে তিনি কেন সেই শুভলগ্নযুক্ত সুতহিবুক যোগটা খুঁজুন না?

রা। বোধ করি, এতক্ষণ সে কাজটা হইয়া গেল। তোমার সঙ্গে রাধারাণীর এরূপ সাক্ষাৎ অন্য কোন কারণে হইতে পারে না, এ পুরীতে সকলেই জানে। সংবাদ লইব কি?

দে। বিলম্বে কাজ কি?

রাধারাণী ডাকিল, "চিত্রে!" চিত্রা আসিল। রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "দিন টিন কিছু হইল কি?"

চিত্রা বলিল, "হাঁ, দেওয়ানজি মহাশয় পুরোহিত মহাশয়কে ডাকাইয়াছিলেন। পুরোহিত পর দিন বিবাহের উত্তম দিন বলিয়া গিয়াছেন। দেওয়ানজি মহাশয় সমস্ত উদ্যোগ করিতেছেন।"

তখন বসন্ত আসিল, কামাখ্যা বাবুর পুত্রেরা এবং পরিবারবর্গ সকলেই আসিল, আর যত বসন্তের কোকিল, সময়ের বন্ধু, যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিল। দেবেন্দ্রনারায়ণের বন্ধু ও অনুচর-বর্গ সকলেই আসিল।

বসন্ত আসিলে রাধারাণী বলিল, "তোমার কি আক্কেল ভাই বসন্ত?" বসন্ত বলিল, "কি আক্কেল ভাই রাধারাণী?"

রা। যাকে তাকে তুমি পত্র দিয়া পাঠাইয়া দাও কেন?

বসন্ত। কেন, লোকটা কি করেছে বল দেখি?

রাধারাণী তখন সকল বলিল। বসন্ত বলিল, "রাগের কথা ত বটে। সুদ শুদ্ধ দেনা পাওনা বুঝিয়া নেয়, এমন মহাজনকে যে বাড়ী চিনাইয়া দেয়, তার উপর রাগের কথাটা বটে।"

রাধারাণী বলিল, "তাই আজ আমি তোর গলায় দড়ি দিব!"

এই বলিয়া রাধারাণী যে হীরকহার রুক্মিণীকুমারকে পরাইতে গিয়াছিলেন, তাহা আনিয়া বসন্তের গলায় পরাইয়া দিলেন।

তার পর শুভ লগ্নে শুভ বিবাহ হইয়া গেল।

বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

রজনী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১২৮৪ সালে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক:

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, অপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্মথমোহন বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

শ্রাবণ, ১৩৪৭

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমস্ত উপন্যাসে যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, 'ইন্দিরা' এবং 'রজনী'তে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়; সর্ব্বত্র উপন্যাসকার গল্প বলিয়াছেন, 'ইন্দিরা'য় ইন্দিরাই বক্তা; 'রজনী'তে বিভিন্ন চরিত্র নিজেরাই আপন আপন বক্তব্য বলিয়া গল্পের ধারা বজায় রাখিয়াছেন। উইল্কি কলিন্সের *Woman in White*-এ অবলম্বিত পদ্ধতি যে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা "বিজ্ঞাপনে" স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার নায়িকাও লর্ড লিটনের *Last Days of Pompeii*-এর অন্ধ ফুলওয়ালী নিদিয়ার স্মরণে চিত্রিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন, উপন্যাসে বর্ণিত "অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার"-গুলির দায়িত্ব তিনি এই পদ্ধতির সাহায্যে কাটাইতে চাহিয়াছেন। লেখকের দায়িত্ব কাটিলেও শিল্পসৃষ্টি-হিসাবে উপন্যাসের ক্ষতি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ('বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', পৃ. ১৫৫-১৬২) এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত ('বঙ্কিমচন্দ্র', পৃ. ২৬০-২৬৫) ইহা লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

কিন্তু সকল অসঙ্গতি ও অভাব সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে 'রজনী'র বিশিষ্ট স্থান থাকিবে; ইহাই বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। 'ইন্দিরা'ও তাই, কিন্তু প্রথম সংস্করণ 'ইন্দিরা' 'রজনী'র পূর্ব্বগামী হইলেও ৪৫ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র গল্প মাত্র ছিল; ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫ম সংস্করণে তাহা রীতিমত উপন্যাস-গৌরব পাইয়াছে। নায়ক-নায়িকার মানসিক দ্বন্দ্ব এবং চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতকে 'রজনী'তে ঘটনা-বৈচিত্র্যের উপরেও প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সে যুগের বর্ণনাবহুল রোমান্টিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইহা অভিনব, সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, হীরালাল-চরিত্র সে যুগের এক জন খবরের কাগজের সম্পাদককে আদর্শ করিয়া রচিত। 'রজনী' সম্বন্ধে ইহার অধিক কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'রজনী'র তিনটি সংস্করণ হয়; প্রথম—১২৮৪, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ১২৮৭।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে (ডিসেম্বর) কলিকাতা হইতে পি. মজুমদার ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে এন. হেমচন্দ্র ইহার গুজরাটী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রজনী

[১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে]

বিজ্ঞাপন

রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে যে, ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্ব্ববৎ আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে।

প্রথম লর্ড লিটনপ্রণীত "Last Days of Pompeii" নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি "কাণা ফুলওয়ালী" আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্ম্মাণ করা গিয়াছে।

উপাখ্যানের অংশবিশেষ, নায়ক বা নায়িকাবিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা, প্রচলিত রচনাপ্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইল্‌কি কলিন্সকৃত "Woman in White" নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
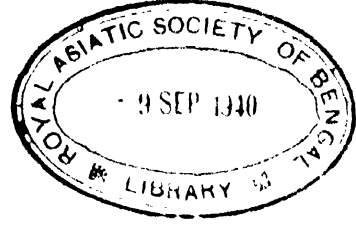
প্রথম খণ্ড

রজনীর কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তোমাদের সুখদুঃখে আমার সুখদুঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা আর আমি ভিন্নপ্রকৃতি। আমার সুখে তোমরা সুখী হইতে পারিবে না—আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না—আমি একটি ক্ষুদ্র যূথিকার গন্ধে সুখী হইব; আর ষোলকলা শশী আমার লোচনাগ্রে সহস্র নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যস্থ হইয়া বিকসিত হইলেও আমি সুখী হইব না—আমার উপাখ্যান কি তোমরা মন দিয়া শুনিবে? আমি জন্মান্ধ।

কি প্রকারে বুঝিবে? তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়—আমার জীবন অন্ধকার—দুঃখ এই, আমি ইহা অন্ধকার বলিয়া জানি না। আমার এ রুদ্ধ নয়নে, তাই আলো! না জানি তোমাদের আলো কেমন!

তাই বলিয়া কি আমার সুখ নাই? তাহা নহে। সুখ দুঃখ তোমার আমার প্রায় সমান। তুমি রূপ দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শুনিয়াই সুখী। দেখ, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যূথিকা-সকলের বৃন্তগুলি কত সূক্ষ্ম, আর আমার এই করস্থ সূচিকাগ্রভাগ আরও কত সূক্ষ্ম! আমি এই সূচিকাগ্রে সেই ক্ষুদ্র পুষ্পবৃন্তসকল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথি—আশৈশব মালাই গাঁথিয়াছি—কেহ কখন আমার গাঁথা মালা পরিয়া বলে নাই যে, কাণায় মালা গাঁথিয়াছে।

আমি মালাই গাঁথিতাম। বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পুষ্পোদ্যান জমা ছিল—তাহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। ফাল্গুন মাস হইতে যত দিন ফুল ফুটিত, তত দিন পর্য্যন্ত পিতা প্রত্যহ তথা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া দিতেন, আমি মালা গাঁথিয়া দিতাম। পিতা তাহা লইয়া মহানগরীর পথে পথে বিক্রয় করিতেন। মাতা গৃহকর্ম্ম করিতেন। অবকাশমতে পিতামাতা উভয়েই আমার মালা গাঁথার সহায়তা করিতেন।

ফুলের স্পর্শ বড় সুন্দর—পরিতে বুঝি বড় সুন্দর হইবে—ঘ্রাণে পরম সুন্দর বটে। কিন্তু ফুল গাঁথিয়া দিন চলে না। অন্নের বৃক্ষের ফুল নাই। সুতরাং পিতা নিতান্ত দরিদ্র

ছিলেন। মৃজাপুরে একখানি সামান্য খাপরেলের ঘরে বাস করিতেন। তাহারই এক প্রান্তে, ফুল বিছাইয়া, ফুল স্তূপাকৃত করিয়া, ফুল ছড়াইয়া, আমি ফুল গাঁথিতাম। পিতা বাহির হইয়া গেলে গান গাইতাম—

আমার এত সাধের প্রভাতে সই, ফুটলো নাকো কলি—

ও হরি—এখনও আমার বলা হয় নাই, আমি পুরুষ, কি মেয়ে! তবে, এতক্ষণে যিনি না বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে না বলাই ভাল। আমি এখন বলিব না।

পুরুষই হই, মেয়েই হই, অন্ধের বিবাহের বড় গোল। কাণা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না। সেটা দুর্ভাগ্য, কি সৌভাগ্য, যে চোখের মাথা না খাইয়াছে, সেই বুঝিবে। অনেক অপাঙ্গরঙ্গরঙ্গিণী, আমার চিরকৌমার্য্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে, "আহা, আমিও যদি কাণা হইতাম!"

বিবাহ না হউক—তাতে আমার দুঃখ ছিল না। আমি স্বয়ম্বরা হইয়াছিলাম। একদিন পিতার কাছে কলিকাতার বর্ণনা শুনিতেছিলাম। শুনিলাম, মনুমেণ্ট বড় ভারি ব্যাপার। অতি উঁচু, অটল, অচল, ঝড়ে ভাঙ্গে না, গলায় চেন—একা একাই বাবু। মনে মনে মনুমেণ্টকে বিবাহ করিলাম। আমার স্বামীর চেয়ে বড় কে? আমি মনুমেণ্টমহিষী।

কেবল একটা বিবাহ নহে। যখন মনুমেণ্টকে বিবাহ করি, তখন আমার বয়স পনের বৎসর। সতের বৎসর বয়সে, বলিতে লজ্জা করে, সধবাবস্থাতেই—আর একটা বিবাহ ঘটিয়া গেল। আমাদের বাড়ীর কাছে, কালীচরণ বসু নামে একজন কায়স্থ ছিল। চীনাবাজারে তাহার একখানি খেলানার দোকান ছিল। সে কায়স্থ—আমরাও কায়স্থ—এজন্য একটু আত্মীয়তা হইয়াছিল। কালীবসুর একটি চারি বৎসরের শিশুপুত্র ছিল। তাহার নাম বামাচরণ। বামাচরণ সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে আসিত। একদিন একটা বর বাজনা বাজাইয়া মন্দগামী ঝড়ের মত আমাদিগের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যায়। দেখিয়া বামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "ও কেও?"

আমি বলিলাম, "ও বর।" বামাচরণ তখন কান্না আরম্ভ করিল—"আমি বল হব।"

তাহাকে কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া বলিলাম, "কাঁদিস না—তুই আমার বর।" এই বলিয়া একটা সন্দেশ তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন, তুই আমার বর হবি?" শিশু সন্দেশ হাতে পাইয়া, রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, "হব।"

সন্দেশ সমাপ্ত হইলে, বালক ক্ষণেককাল পরে বলিল, "হাঁ গা, বলে কি কলে গা?" বোধ হয়, তাহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বরে বুঝি কেবল সন্দেশই খায়। যদি তা হয়,

তবে সে আর একটা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম, "বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।" বামাচরণ স্বামীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়া লইয়া, ফুলগুলি আমার হাতে গুছাইয়া তুলিয়া দিতে লাগিল। সেই অবধি আমি তাহাকে বর বলি—সে আমাকে ফুল গুছাইয়া দেয়।

আমার এই দুই বিবাহ—এখন এ কালের জটিলা কুটিলাদিগকে আমার জিজ্ঞাস্য—আমি সতী বলাইতে পারি কি ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড়বাড়ীতে ফুল যোগান বড় দায়। সে কালের মালিনী মাসী রাজবাটীতে ফুল যোগাইয়া মশানে গিয়াছিল। ফুলের মধু খেলে বিদ্যাসুন্দর, কিল খেলে হীরা মালিনী—কেন না, সে বড়বাড়ীতে ফুল যোগাইত। সুন্দরের সেই রামরাজ্য হইল—কিন্তু মালিনীর কিল আর ফিরিল না।

বাবা ত "বেলফুল" হাঁকিয়া, রসিক মহলে ফুল বেচিতেন, মা দুই একটা অরসিক মহলে ফুল নিত্য যোগাইতেন। তাহার মধ্যে রামসদয় মিত্রের বাড়ীই প্রধান। রামসদয় মিত্রের সাড়ে চারিটা ঘোড়া ছিল—('নাতিদের একটা পণি, আর আদত চারিটা) সাড়ে চারিটা ঘোড়া—আর দেড়খানা গৃহিণী। একজন আদত—একজন চিররুগ্না এবং প্রাচীনা। তাঁহার নাম ভুবনেশ্বরী—কিন্তু তাঁর গলার সাঁই সাঁই শব্দ শুনিয়া রামমণি ভিন্ন অন্য নাম আমার মনে আসিত না।

আর যিনি পুরা একখানি গৃহিণী, তাঁহার নাম লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা লোকে বলিত, কিন্তু তাঁহার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন ললিতলবঙ্গলতা, এবং রামসদয় বাবু আদর করিয়া বলিতেন—ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে। রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর। ললিতলবঙ্গ-লতা নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোলআনা গৃহিণী। তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চূণ, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাসিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।

নয়ন নাই—ললিত-লবঙ্গ-লতাকে কখন দেখিতে পাইলাম না—কিন্তু শুনিয়াছি, তিনি রূপসী। রূপ যাউক, গুণ শুনিয়াছি। লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী। গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে

মুক্তহস্তা, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়ী। লবঙ্গলতার অশেষ গুণের মধ্যে, একটি এই যে, তিনি বাস্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসেন কি না সন্দেহ। ভালবাসিতেন বলিয়া, তাঁহাকে নবীন সাজাইতেন—সে সজ্জার রস কাহাকে বলি? আপন হস্তে নিত্য শুভ্র কেশে কলপ মাখাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন। যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোন দিন মলমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিলপেড়ে, ফিতেপেড়ে, কল্কাপেড়ে পরাইয়া দিতেন—মলমলের ধুতিখানি তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতেন। রামসদয় প্রাচীন বয়সে, আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত—লবঙ্গলতা, তাহার নিদ্রিতাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিতেন। রামসদয়ের চস্‌মাগুলি, লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত, সোণাটুকু লইয়া, যাহার কন্যার বিবাহের সম্ভাবনা, তাহাকে দিত। রামসদয়ের নাক ডাকিলে, লবঙ্গ ছয়গাছা মল বাহির করিয়া, পরিয়া ঘরময় ঝম্‌ঝম্ করিয়া, রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত।

লবঙ্গলতা আমাদের ফুল কিনিত—চারি আনার ফুল লইয়া দুই টাকা মূল্য দিত। তাহার কারণ, আমি কাণা। মালা পাইলে, লবঙ্গ গালি দিত, বলিত, এমন কদর্য্য মালা আমাকে দিস কেন? কিন্তু মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিত। ফিরাইয়া দিতে গেলে বলিত—ও আমার টাকা নয়—দুইবার বলিতে গেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিত। তাহার দানের কথা মুখে আনিলে মারিতে আসিত। বাস্তবিক, রামসদয় বাবুর ঘর না থাকিলে, আমাদিগের দিনপাত হইত না; তবে যাহা রয় সয়, তাই ভাল বলিয়া, মাতা, লবঙ্গের কাছে অধিক লইতেন না। দিনপাত হইলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম। লবঙ্গলতা আমাদিগের নিকট রাশি রাশি ফুল কিনিয়া রামসদয়কে সাজাইত। সাজাইয়া বলিত—দেখ, রতিপতি। রামসদয় বলিত—দেখ, সাক্ষাৎ—অঞ্জনানন্দন। সেই প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল—দর্পণের মত দুই জনে দুই জনের মন দেখিতে পাইত। তাহাদের প্রেমের পদ্ধতিটা এইরূপ—

রামসদয় বলিত, "ললিতলবঙ্গলতাপরিশী—?"

লবঙ্গ। আজ্ঞে ঠাকুরদাদামহাশয়, দাসী হাজির।

রাম। আমি যদি মরি?

লব। "আমি তোমার বিষয় খাইব।" লবঙ্গ মনে মনে বলিত, "আমি বিষ খাইব।" রামসদয় তাহা মনে মনে জানিত।

লবঙ্গ এত টাকা দিত, তবে বড়বাড়ীতে ফুল যোগান দুঃখ কেন? শুন।

একদিন মার জ্বর। অন্তঃপুরে বাবা যাইতে পারিবেন না—তবে আমি বৈ আর কে লবঙ্গলতাকে ফুল দিতে যাইবে? আমি লবঙ্গের জন্য ফুল লইয়া চলিলাম। অন্ধ হই, যাই হই—কলিকাতার রাস্তা সকল আমার নখদর্পণ ছিল। বেত্রহস্তে সর্ব্বত্র যাইতে পারিতাম, কখন গাড়ি ঘোড়ার সম্মুখে পড়ি নাই। অনেকবার পদচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি বটে—তাহার কারণ, কেহ্ কেহ অন্ধযুবতী দেখিয়া সাড়া দেয় না, বরং বলে, "আ মলো! দেখ্‌তে পাস্‌নে? কাণা না কি?" আমি ভাবিতাম, "উভয়তঃ।"

ফুল লইয়া গিয়া লবঙ্গের কাছে গেলাম। দেখিয়া লবঙ্গ বলিলেন, "কি লো কাণী—আবার ফুল লইয়া মর্‌তে এয়েছিস্ কেন?" কাণী বলিলে আমার হাড় জ্বলিয়া যাইত—আমি কি কদর্য্য উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে সেখানে হঠাৎ কাহার পদধ্বনি শুনিলাম—কে আসিল। যে আসিল—সে বলিল, "এ কে ছোট মা?"

ছোট মা! তবে রামসদয়ের পুত্র। রামসদয়ের কোন্ পুত্র! বড় পুত্রের কণ্ঠ একদিন শুনিয়াছিলাম—সে এমন অমৃতময় নহে—এমন করিয়া কর্ণবিবর ভরিয়া, সুখ ঢালিয়া দেয় নাই। বুঝিলাম, এ ছোট বাবু।

ছোট মা বলিলেন, এবার বড় মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "ও কাণা ফুলওয়ালী।"

"ফুলওয়ালী! আমি বলি বা কোন ভদ্রলোকের মেয়ে।"

লবঙ্গ বলিলেন, "কেন গা, ফুলওয়ালী হইলে কি ভদ্রলোকের মেয়ে হয় না?"

ছোট বাবু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "হবে না কেন? এটি ত ভদ্রলোকের মেয়ের মতই বোধ হইতেছে। তা ওটি কাণা হইল কিসে?"

লবঙ্গ। ও জন্মান্ধ।

ছোট বাবু। দেখি?

ছোট বাবুর বড় বিদ্যার গৌরব ছিল। তিনি অন্যান্য বিদ্যাও যেরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থের প্রত্যাশী না হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রেও সেইরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। লোকে রাষ্ট্র করিত যে, শচীন্দ্র বাবু (ছোট বাবু) কেবল দরিদ্রগণের বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবার জন্য চিকিৎসা শিখিতেছিলেন। "দেখি" বলিয়া আমাকে বলিলেন, "একবার দাঁড়াও ত গা।"

আমি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলাম।

ছোট বাবু বলিলেন, "আমার দিকে চাও।"

চাব কি ছাই!”

“আমার দিকে চোখ ফিরাও!”

কাণা চোকে শব্দভেদী বাণ মারিলাম। ছোট বাবুর মনের মত হইল না। তিনি আমার দাড়ি ধরিয়া, মুখ ফিরাইলেন।

ডাক্তারির কপালে আগুন জ্বেলে দিই। সেই চিবুকস্পর্শে আমি মরিলাম!

সেই স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি—সব ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম। বোধ হইল, আমার আশে পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল, আমার পরণে ফুল; আমার বুকের ভিতর ফুলের রাশি। আ মরি মরি! কোন্ বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল! বলিয়াছি ত কাণার সুখ দুঃখ তোমরা বুঝিবে না। আ মরি মরি—সে নবনীত—সুকুমার—পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ! বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে, সে বুঝিবে কি প্রকারে? আমার সুখ দুঃখ আমাতেই থাকুক। যখন সেই স্পর্শ মনে পড়িত, তখন কত বীণাধ্বনি কর্ণে শুনিতাম, তাহা. তুমি, বিলোলকটাক্ষকুশলিনি! কি বুঝিবে?

ছোট বাবু বলিলেন, “না, এ কাণা সারিবার নয়।”

আমার ত সেই জন্য ঘুম হইতেছিল না।

লবঙ্গ বলিল, “তা না সারুক, টাকা খরচ করিলে কাণার কি বিয়ে হয় না?”

ছোট বাবু। কেন, এর কি বিবাহ হয় নাই?

লবঙ্গ। না। টাকা খরচ করিলে হয়?

ছোট বাবু। আপনি কি ইহার বিবাহ জন্য টাকা দিবেন?

লবঙ্গ রাগিল। বলিল, “এমন ছেলেও দেখি নাই! আমার কি টাকা রাখিবার জায়গা নাই? বিয়ে কি হয়, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। মেয়ে মানুষ, সকল কথা ত জানি না। বিবাহ কি হয়?”

ছোট বাবু ছোট মাকে চিনিতেন। হাসিয়া বলিলেন, “তা মা, তুমি টাকা রেখ, আমি সম্বন্ধ করিব।”

মনে মনে ললিতলবঙ্গলতার মুণ্ডপাত করিতে করিতে আমি সে স্থান হইতে পলাইলাম।

তাই বলিতেছিলাম, বড়মানুষের বাড়ী ফুল যোগান বড় দায়।

বহুমূর্ত্তিময়ি বসুন্ধরে! তুমি দেখিতে কেমন? তুমি যে অসংখ্য, অচিন্তনীয় শক্তি ধর, অনন্ত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট জড় পদার্থসকল হৃদয়ে ধারণ কর, সে সব দেখিতে কেমন?

যাকে যাকে লোকে সুন্দর বলে, সে সব দেখিতে কেমন? তোমার হৃদয়ে যে অসংখ্য, বহুপ্রকৃতিবিশিষ্ট জন্তুগণ বিচরণ করে, তারা সব দেখিতে কেমন? বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত, পুরুষ জাতি দেখিতে কেমন? দেখাও মা, তাহার মধ্যে, যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন? দেখা মা, দেখিতে কেমন দেখায়? দেখা কি? দেখা কেমন? দেখিলে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্ত্তজন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না? দেখা মা! বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে থাকুক মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া, মনের সাধে রূপ দেখে, নারীজন্ম সার্থক করি। সবাই দেখে—আমি দেখিব না কেন? বুঝি কীট পতঙ্গ অবধি দেখে—আমি কি অপরাধে দেখিতে পাই না? শুধু দেখা—কারও ক্ষতি নাই, কারও কষ্ট নাই, কারও পাপ নাই, সবাই অবহেলে দেখে—কি দোষে আমি কখনও দেখিব না?

না! না! অদৃষ্টে নাই। হৃদয়মধ্যে খুঁজিলাম। শুধু শব্দ স্পর্শ গন্ধ। আর কিছু পাইলাম না।

আমার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে লাগিল, কে দেখাবি দেখা গো—আমায় রূপ দেখা! বুঝিল না! কেহই অন্ধের দুঃখ বুঝিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই অবধি আমি প্রায় প্রত্যহ রামসদয় মিত্রের বাড়ী ফুল বেচিতে যাইতাম। কিন্তু কেন, তাহা জানি না। যাহার নয়ন নাই, তাহার এ যত্ন কেন? সে দেখিতে পাইবে না—কেবল কথার শব্দ শুনিবার ভরসা মাত্র। কেন শচীন্দ্র বাবু আমার কাছে আসিয়া কথা কহিবেন? তিনি থাকেন সদরে—আমি যাই অন্তঃপুরে। যদি তাঁহার স্ত্রী থাকিত, তবেও বা কখন আসিতেন। কিন্তু বৎসরেক পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল—আর বিবাহ করেন নাই। অতএব সে ভরসাও নাই। কদাচিৎ কোন প্রয়োজনে মাতাদিগের নিকটে আসিতেন। আমি যে সময়ে ফুল লইয়া যাইব, তিনিও ঠিক সেই সময়ে আসিবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? অতএব যে এক শব্দ শুনিবার মাত্র আশা, তাহাও বড় সফল হইত না। তথাপি অন্ধ প্রত্যহ ফুল লইয়া যাইত। কোন্ দুরাশায়, তাহা জানি না। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় প্রত্যহ ভাবিতাম, আমি কেন আসি? প্রত্যহ মনে করিতাম, আর আসিব না। প্রত্যহই সে কল্পনা বৃথা হইত। প্রত্যহই আবার যাইতাম। যেন কে চুল

ধরিয়া লইয়া যাইত। আবার নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম, আবার প্রতিজ্ঞা করিতাম, যাইব না—আবার যাইতাম। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

মনে মনে আলোচনা করিতাম, কেন যাই? শুনিয়াছি, স্ত্রীজাতি পুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসে। আমি কাণা, কাহার রূপ দেখিয়াছি? তবে কেন যাই? কথা শুনিব বলিয়া? কখন কেহ শুনিয়াছে যে, কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়া উন্মাদিনী হইয়াছে? আমিই কি তাই হইয়াছি? তাও কি সম্ভব? যদি তাই হয়, তবে বাদ্য শুনিবার জন্য, বাদকের বাড়ী যাই না কেন? সেতার, সারেঙ্গ, এসরাজ, বেহালার অপেক্ষা কি শচীন্দ্র সুকণ্ঠ? সে কথা মিথ্যা।

তবে কি সেই স্পর্শ? আমি যে কুসুমরাশি রাত্রি দিবা লইয়া আছি, কখন পাতিয়া শুইতেছি, কখন বুকে চাপাইতেছি—ইহার অপেক্ষা তাহার স্পর্শ কোমল? তা ত নয়। তবে কি? এ কাণাকে কে বুঝাইবে, তবে কি?

তোমরা বুঝ না, বুঝাইবে কি? তোমাদের চক্ষু আছে, রূপ চেন, রূপই বুঝ। আমি জানি, রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র—শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে—নহিলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান্ দেখে না কেন? একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন? সেইরূপ শব্দও তোমার মনে। রূপ দর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র, স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপসুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্ব্বময় না হইবে?

শুষ্ক ভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে? শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জ্বলিবে? রূপে হোক, শব্দে হোক, স্পর্শে হোক, শূন্য রমণীহৃদয়ে সুপুরুষসংস্পর্শ হইলে কেন প্রেম না জন্মিবে? দেখ, অন্ধকারেও ফুল ফুটে, মেঘে ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে, জনশূন্য অরণ্যেও কোকিল ডাকে, যে সাগরগর্ভে মনুষ্য কখন যাইবে না, সেখানেও রত্ন প্রভাসিত হয়, অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জন্মে, আমার নয়ন নিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রস্ফুটিত হইবে না?

হইবে না কেন, কিন্তু সে কেবল আমার যন্ত্রণার জন্য। বোবার কবিত্ব, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য। বধিরের সঙ্গীতানুরাগ যদি হয়, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য; আপনার গীত আপনি শুনিতে পায় না। আমার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার তেমনই যন্ত্রণার জন্য। পরের রূপ দেখিব কি—আমি আপনার কখন আপনি দেখিলাম না। রূপ! রূপ! আমার কি রূপ!

এই ভূমণ্ডলে রজনীনামে ক্ষুদ্র বিন্দু কেমন দেখায়? আমাকে দেখিলে, কখনও কি কাহার আবার ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই? এমন নীচাশয়, ক্ষুদ্র কেহ কি জগতে নাই যে, আমাকে সুন্দর দেখে? নয়ন না থাকিলে নারী সুন্দরী হয় না—আমার নয়ন নাই—কিন্তু তবে কারিগরে পাথর খোদিয়া চক্ষুঃশূন্য মূর্ত্তি গড়ে কেন? আমি কি কেবল সেইরূপ পাষাণী মাত্র? তবে বিধাতা এ পাষাণমধ্যে এ সুখদুঃখসমাকুল প্রণয়লালসাপরবশ হৃদয় কেন পুরিল? পাষাণের দুঃখ পাইয়াছি, পাষাণের সুখ পাইলাম না কেন? এ সংসারে এ তারতম্য কেন? অনন্ত দুষ্কৃতকারীও চক্ষে দেখে, আমি জন্মপূর্ব্বেই কোন্ দোষ করিয়াছিলাম যে, আমি চক্ষে দেখিতে পাইব না? এ সংসারে বিধাতা নাই, বিধান নাই, পাপপুণ্যের দণ্ড পুরস্কার নাই—আমি মরিব।

আমার এই জীবনে বহু বৎসর গিয়াছে—বহু বৎসর আসিতেও পারে! বৎসরে বৎসরে বহু দিবস—দিবসে দিবসে বহু দণ্ড—দণ্ডে দণ্ডে বহু মুহূর্ত্ত—তাহার মধ্যে এক মুহূর্ত্ত জন্য, এক পলক জন্য, আমার কি চক্ষু ফুটিবে না? এক মুহূর্ত্ত জন্য, চক্ষু মেলিতে পারিলে দেখিয়া লই, এই শব্দস্পর্শময় বিশ্বসংসার কি—আমি কি—শচীন্দ্র কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমি প্রত্যহই ফুল লইয়া যাইতাম, ছোট বাবুর কথার শব্দশ্রবণ প্রায় ঘটিত না—কিন্তু কদাচিৎ দুই একদিন ঘটিত। সে আহ্লাদের কথা বলিতে পারি না। আমার বোধ হইত, বর্ষার জলভরা মেঘ যখন ডাকিয়া বর্ষে, তখন মেঘের বুঝি সেইরূপ আহ্লাদ হয়; আমারও সেইরূপ ডাকিতে ইচ্ছা করিত। আমি প্রত্যহ মনে করিতাম, আমি ছোটবাবুকে কতকগুলি বাছা ফুলের তোড়া বাঁধিয়া দিয়া আসিব—কিন্তু তাহা একদিনও পারিলাম না। একে লজ্জা করিত—আবার মনে ভাবিতাম, ফুল দিলে তিনি দাম দিতে চাহিবেন—কি বলিয়া না লইব? মনের দুঃখে ঘরে আসিয়া ফুল লইয়া ছোটবাবুকেই গড়িতাম। কি গড়িতাম, তাহা জানি না—কখন দেখি নাই।

এদিকে আমার যাতায়াতে একটি অচিন্তনীয় ফল ফলিতেছিল—আমি তাহার কিছুই জানিতাম না। পিতা মাতার কথোপকথনে তাহা প্রথম জানিতে পারিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর, আমি মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কি একটা শব্দে নিদ্রা

ভাঙ্গিল। জাগ্রত হইলে কর্ণে পিতা মাতার কথোপকথনের শব্দ প্রবেশ করিল। বোধ হয়, প্রদীপ নিবিয়া গিয়া থাকিবে; কেন না, পিতা মাতা আমার নিদ্রাভঙ্গ জানিতে পারিলেন, এমত বোধ হইল না। আমিও আমার নাম শুনিয়া কোন সাড়াশব্দ করিলাম না। শুনিলাম, মা বলিতেছেন, "তবে এক প্রকার স্থিরই হইয়াছে?"

পিতা উত্তর করিলেন, "স্থির বৈ কি? অমন বড় মানুষ লোক, কথা দিলে কি আর নড়চড় আছে? আর আমার মেয়ের দোষের মধ্যে অন্ধ, নহিলে অমন মেয়ে লোকে তপস্যা করিয়া পায় না।"

মা। তা, পরে এত কর্‌বে কেন?

পিতা। তুমি বুঝিতে পার না যে, ওরা আমাদের মত টাকার কাঙ্গাল নয়—হাজার দুহাজার টাকা ওরা টাকার মধ্যে ধরে না। যে দিন রজনীর সাক্ষাতে রামসদয় বাবুর স্ত্রী বিবাহের কথা প্রথম পাড়িলেন, সেই দিন হইতে রজনী তাঁহার কাছে প্রত্যহ যাতায়াত আরম্ভ করিল। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "টাকায় কি কাণার বিয়ে হয়?" ইহাতে অবশ্য মেয়ের মনে আশা ভরসা হইতে পারে যে, বুঝি ইনি দয়াবতী হইয়া টাকা খরচ করিয়া আমার বিবাহ দিবেন। সেই দিন হইতে রজনী নিত্য যায় আসে। সেই দিন হইতে নিত্য যাতায়াত দেখিয়া লবঙ্গ বুঝিলেন যে, মেয়েটি বিবাহের জন্য বড় কাতর হয়েছে—না হবে কেন, বয়স ত হয়েছে। তাতে আবার ছোট বাবু টাকা দিয়া হরনাথ বসুকে রাজি করিয়াছেন। গোপালও রাজি হইয়াছে।

হরনাথ বসু, রামসদয় বাবুর বাড়ীর সরকার। গোপাল তাহার পুত্র। গোপালের কথা কিছু কিছু জানিতাম। গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর—একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্ম্মার্থে তাহার গৃহিণী আছে—সন্তানার্থ অন্ধ পত্নীতে তাহার আপত্তি নাই। বিশেষ লবঙ্গ তাহাকে টাকা দিবে। পিতা মাতার কথায় বুঝিলাম, গোপালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—টাকার লোভে সে কুড়ি বৎসরের মেয়েও বিবাহ করিতে প্রস্তুত। টাকায় জাতি কিনিবে। পিতামাতা মনে করিলেন, এ জন্মের মত অন্ধ কন্যা উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। তাঁহারা আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তার পরদিন স্থির করিলাম, আর আমি লবঙ্গের কাছে যাইব না—মনে মনে তাহাকে শতবার পোড়ারমুখী বলিয়া গালি দিলাম। লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। রাগে লবঙ্গকে মারিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। দুঃখে কান্না আসিতে লাগিল।

আমি লবঙ্গের কি করিয়াছি যে, সে আমার উপর এত অত্যাচার করিতে উদ্যত? ভাবিলাম, যদি সে বড় মানুষ বলিয়া অত্যাচার করিয়াই সুখী হয়, তবে জন্মান্ধ দুঃখিনী ভিন্ন, আর কি অত্যাচার করিবার পাত্র পাইল না? মনে করিলাম—না, আর একদিন যাইব, তাহাকে এমনই করিয়া তিরস্কার করিয়া আসিব—তার পর আর যাইব না—আর ফুল বেচিব না—আর তাহার টাকা লইব না—মা যদি তাহাকে ফুল দিয়া মূল্য লইয়া আসেন, তবে তাহার টাকার অন্ন ভোজন করিব না—না খাইয়া মরিতে হয়—সেও ভাল। ভাবিলাম, বলিব, বড় মানুষ হইলেই কি পরপীড়ন করিতে হয়? বলিব, আমি অন্ধ—অন্ধ বলিয়া কি দয়া হয় না? বলিব, পৃথিবীতে যাহার কোন সুখ নাই, তাহাকে বিনাপরাধে কষ্ট দিয়া তোমার কি সুখ? যত ভাবি, এই এই বলিব, তত আপনার চক্ষের জলে আপনি ভাসি। মনে ভয় হইতে লাগিল, পাছে বলিবার সময় কথাগুলি ভুলিয়া যাই।

যথাসময়ে আবার রামসদয় বাবুর বাড়ী চলিলাম। ফুল লইয়া যাইব না মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু শুধু হাতে যাইতে লজ্জা করিতে লাগিল—কি বলিয়া গিয়া বসিব। পূর্ব্বমত কিছু ফুল লইলাম। কিন্তু আজি মাকে লুকাইয়া গেলাম।

ফুল দিলাম—তিরস্কার করিব বলিয়া লবঙ্গের কাছে বসিলাম। কি বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব? হরি! হরি! কি বলিয়া আরম্ভ করিব? গোড়ার কথা কোন্‌টা? যখন চারি দিকে আগুন জ্বলিতেছে—আগে কোন্ দিক্ নিবাইব? কিছুই বলা হইল না। কথা পাড়িতেই পারিলাম না। কান্না আসিতে লাগিল।

ভাগ্যক্রমে লবঙ্গ আপনিই প্রসঙ্গ তুলিল, "কাণি—তোর বিয়ে হবে।"

আমি জ্বলিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "ছাই হবে।"

লবঙ্গ বলিল, "কেন, ছোট বাবু বিবাহ দেওয়াইবেন—হবে না কেন?"

আরও জ্বলিলাম। বলিলাম, "কেন, আমি তোমাদের কাছে কি দোষ করেছি?"

লবঙ্গও রাগিল। বলিল, "আঃ মলো! তোর কি বিয়ের মন নাই না কি?"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "না।"

লবঙ্গ আরও রাগিল, বলিল, "পাপিষ্ঠা কোথাকার! বিয়ে করবিনে কেন?"

আমি বলিলাম, "খুসি।"

লবঙ্গের মনে বোধ হয়, সন্দেহ হইল—আমি ভ্রষ্টা—নহিলে বিবাহে অসম্মত কেন? সে বড় রাগ করিয়া বলিল, "আঃ মলো! বের বলিতেছি—নহিলে খেঙ্‌রা মারিয়া বিদায় করিব।"

আমি উঠিলাম—আমার দুই অন্ধ চক্ষে জল পড়িতেছিল—তাহা লবঙ্গকে দেখাইলাম না—ফিরিলাম। গৃহে যাইতেছিলাম, সিঁড়িতে আসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম,—কই, তিরস্কারের কথা কিছুই ত বলা হয় নাই—অকস্মাৎ কাহার পদশব্দ শুনিলাম। অন্ধের শ্রবণশক্তি অনৈসর্গিক প্রখরতা প্রাপ্ত হয়—আমি দুই একবার সেই পদশব্দ শুনিয়াই চিনিয়াছিলাম, কাহার পদবিক্ষেপের এ শব্দ। আমি সিঁড়িতে বসিলাম। ছোট বাবু আমার নিকটে আসিলে, আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ হয়, আমার চক্ষের জল দেখিতে পাইয়াছিলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, রজনি!"

সকল ভুলিয়া গেলাম। রাগ ভুলিলাম। অপমান ভুলিলাম, দুঃখ ভুলিলাম।—কাণে বাজিতে লাগিল—"কে রজনি!" আমি উত্তর করিলাম না—মনে করিলাম, আর দুই একবার জিজ্ঞাসা করুন—আমি শুনিয়া কাণ জুড়াই।

ছোট বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনি! কাঁদিতেছ কেন?"

আমার অন্তর আনন্দে ভরিতে লাগিল—চক্ষের জল আরও উছলিতে লাগিল। আমি কথা কহিলাম না—আরও জিজ্ঞাসা করুন। মনে করিলাম, আমি কি ভাগ্যবতী! বিধাতা আমায় কাণা করিয়াছেন, কালা করেন নাই।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কাঁদিতেছ? কেহ কিছু বলিয়াছে?"

আমি সেবার উত্তর করিলাম—তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনের সুখ, যদি জন্মে একবার ঘটিতেছে—তবে ত্যাগ করি কেন? আমি বলিলাম, "ছোট মা তিরস্কার করিয়াছেন।"

ছোটবাবু হাসিলেন,—বলিলেন, "ছোট মার কথা ধরিও না—তাঁর মুখ ঐ রকম—কিন্তু মনে রাগ করেন না। তুমি আমার সঙ্গে এস—এখনই তিনি আবার ভাল কথা বলিবেন।"

তাঁহার সঙ্গে কেন না যাইব? তিনি ডাকিলে কি আর রাগ থাকে? আমি উঠিলাম—তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তিনি সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন—আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি দেখিতে পাও না—সিঁড়িতে উঠ কিরূপে? না পার, আমি হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছি।"

আমার গা কাঁপিয়া উঠিল—সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল—তিনি আমার হাত ধরিবেন! ধরুন্ না—লোকে নিন্দা করে করুক—আমার নারীজন্ম সার্থক হউক। আমি পরের সাহায্য ব্যতীত কলিকাতার গলি গলি বেড়াইতে পারি, কিন্তু ছোট বাবুকে নিষেধ করিলাম না। ছোট বাবু—বলিব কি? কি বলিয়া বলিব—উপযুক্ত কথা পাই না—ছোট বাবু হাত ধরিলেন।

যেন একটি প্রভাতপ্রফুল্ল পদ্ম দলগুলির দ্বারা আমার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল—যেন গোলাবের মালা গাঁথিয়া কে আমার হাতে বেড়িয়া দিল! আমার আর কিছু মনে নাই। বুঝি সেই সময়ে ইচ্ছা হইয়াছিল—এখন মরি না কেন? বুঝি তখন গলিয়া জল হইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল—বুঝি ইচ্ছা করিয়াছিল, শচীন্দ্র আর আমি, দুইটি ফুল হইয়া এইরূপ সংস্পৃষ্ট হইয়া, কোন বন্য বৃক্ষে গিয়া এক বোঁটায় ঝুলিয়া থাকি। আর কি মনে হইয়াছিল—তাহা মনে নাই। যখন সিঁড়ির উপরে উঠিয়া, ছোটবাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন—তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম—এ সংসার আবার মনে পড়িল—সেই সঙ্গে মনে পড়িল—"কি করিলে প্রাণেশ্বর! না বুঝিয়া কি করিলে! তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ। এখন তুমি আমায় গ্রহণ কর না কর—তুমি আমার স্বামী—আমি তোমার পত্নী—ইহজন্মে অন্ধ ফুলওয়ালীর আর কেহ স্বামী হইবে না।"

সেই সময় কি পোড়া লোকের চোখ পড়িল? বুঝি তাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছোটবাবু ছোট মার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনীকে কি বলিয়াছ গা? সে কাঁদিতেছে।" ছোট মা আমার চক্ষে জল দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন,—আমাকে ভাল কথা বলিয়া কাছে বসাইলেন—বয়োজ্যেষ্ঠ সপত্নীপুত্রের কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিলেন না। ছোটবাবু ছোট মাকে প্রসন্ন দেখিয়া নিজ প্রয়োজনে বড় মার কাছে চলিয়া গেলেন। আমিও বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

এ দিকে গোপাল বাবুর সঙ্গে আমার বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। দিন স্থির হইল। আমি কি করিব? ফুল গাঁথা বন্ধ করিয়া, দিবারাত্র কিসে এ বিবাহ বন্ধ করিব—সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। এ বিবাহে মাতার আনন্দ, পিতার উৎসাহ, লবঙ্গলতার যত্ন, ছোটবাবু ঘটক—এই কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক—ছোটবাবু ঘটক! আমি একা অন্ধ কি প্রকারে ইহার প্রতিবন্ধকতা করিব? কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। মালা গাঁথা বন্ধ হইল। মাতাপিতা মনে করিলেন, বিবাহের আনন্দে আমি বিহ্বল হইয়া মালা গাঁথা ত্যাগ করিয়াছি।

ঈশ্বর আমাকে এক সহায় আনিয়া দিলেন। বলিয়াছি, গোপাল বসুর বিবাহ ছিল—তাঁহার পত্নীর নাম চাঁপা—বাপ রেখেছিল চম্পকলতা। চাঁপাই কেবল এ বিবাহে

অসম্মত। চাঁপা একটু শক্ত মেয়ে। যাহাতে ঘরে সপত্নী না হয়—তাহার চেষ্টার কিছু ত্রুটি করিল না।

হীরালাল নামে চাঁপার এক ভাই ছিল—চাঁপার অপেক্ষা দেড় বৎসরের ছোট। হীরালাল মদ খায়—তাহাও অল্প মাত্রায় নহে। শুনিয়াছি, গাঁজাও টানে। তাহার পিতা তাহাকে লেখা পড়া শিখান নাই—কোন প্রকারে সে হস্তাক্ষরটি প্রস্তুত করিয়াছিল মাত্র, তথাপি রামসদয়বাবু তাহাকে কোথা কেরানিগিরি করিয়া দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে চাকরিটি গেল। হরনাথ বসু, তাহার দমে ভুলিয়া, লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন। দোকানে লাভ দূরে থাক, দেনা পড়িল—দোকান উঠিয়া গেল। তার পর কোন গ্রামে, বার টাকা বেতনে হীরালাল মাস্টার হইয়া গেল। সে গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল। তার পর সে একখানা খবরের কাগজ করিল। দিনকতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জঁাকিল—কিন্তু অশ্লীলতা দোষে পুলিষে টানাটানি আরম্ভ করিল—ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল। কিছুদিন পরে হীরালাল আবার হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়া ছোটবাবুর মোসায়েবি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ছোট বাবুর কাছে মদের চাল নাই দেখিয়া আপনা আপনি সরিল। অনন্যোপায় হইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। নাটক একখানিও বিক্রয় হইল না। তবে ছাপাখানার দেনা শোধিতে হয় না বলিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল। এক্ষণে এ ভবসংসারে আর কূল কিনারা না দেখিয়া—হীরালাল চাঁপাদিদির আঁচল ধরিয়া বসিয়া রহিল।

চাঁপা হীরালালকে স্বকার্য্যোদ্ধার জন্য নিয়োজিত করিল। হীরালাল ভগিনীর কাছে সবিশেষ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকার কথা সত্য ত? যেই কাণীকে বিবাহ করিবে, সেই টাকা পাইবে?"

চাঁপা সে বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন করিল। হীরালালের টাকার বড় দরকার। সে তখনই আমার পিতৃভবনে আসিয়া দর্শন দিল। পিতা তখন বাড়ী ছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। আমি নিকটস্থ অন্য ঘরে ছিলাম—অপরিচিত পুরুষে পিতার সঙ্গে কথা কহিতেছে, কণ্ঠস্বরে জানিতে পারিয়া, কাণ পাতিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম। হীরালালের কি কর্কশ কদর্য্য স্বর!

হীরালাল বলিতেছে, "সতীনের উপর কেন মেয়ে দিবে?"

পিতা দুঃখিতভাবে বলিলেন, "কি করি! না দিলে ত বিয়ে হয় না—এত কাল ত হলো না!"

হীরালাল। কেন, তোমার মেয়ের বিবাহের ভাবনা কি?

পিতা হাসিলেন, বলিলেন, "আমি গরিব—ফুল বেচিয়া খাই—আমার মেয়ে কে বিবাহ করিবে? তাতে আবার কাণা মেয়ে, আবার বয়সও ঢের হয়েছে।"

হীরা। কেন, পাত্রের অভাব কি? আমায় বলিলে আমি বিয়ে করি। এখন বয়ঃস্থা মেয়ে ত লোকে চায়। আমি যখন স্তুশ্চুভিশ্চশাৎ পত্রিকার এডিটার ছিলাম, তখন আমি মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দিবার জন্য কত আর্টিকেল লিখেছি—পড়িয়া আকাশের মেঘ ডেকে উঠেছিল। বাল্যবিবাহ! ছি! ছি! মেয়ে ত বড় করিয়াই বিবাহ দিবে। এসো! আমাকে দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট্ করিতে দাও—আমিই এ মেয়ে বিয়ে করিব।

আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি নাই—পশ্চাৎ শুনিয়াছি। পিতা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এত বড় পণ্ডিত জামাই হাতছাড়া হয় ভাবিয়া শেষ একটু দুঃখিত হইলেন; শেষ বলিলেন, "এখন কথা ধার্য্য হইয়া গিয়াছে—এখন আর নড়চড় হয় না। বিশেষ এ বিবাহের কর্ত্তা শচীন্দ্র বাবু। তাঁহারাই বিবাহ দিতেছেন। তাঁহারা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তাঁহারাই গোপাল বাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন।"

হীরা। তাঁদের মতলব তুমি কি বুঝিবে? বড়মানুষের চরিত্রের অন্ত পাওয়া ভার। তাদের বড় বিশ্বাস করিও না।

এই বলিয়া হীরালাল চুপি চুপি কি বলিল, তাহা শুনিতে পাইলাম না। পিতা বলিলেন, "সে কি? না—আমার কাণা মেয়ে।"

হীরালাল তৎকালে ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘরের এদিক্ সেদিক্ দেখিতে লাগিল। চারি দিক্ দেখিয়া বলিল, "তোমার ঘরে মদ নাই, বটে হে?" পিতা বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "মদ! কি জন্য রাখিব!"

হীরালাল মদ নাই জানিয়া, বিজ্ঞের ন্যায় বলিল, "সাবধান করিয়া দিবার জন্য বল্‌ছিলাম। এখন ভদ্রলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে চলিলে, ওগুলা যেন না থাকে।"

কথাটা পিতার বড় ভাল লাগিল না। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। হীরালাল না বিবাহে, না মদে, কোন দিকেই দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট্ করিতে না পারিয়া, ক্ষুণ্নমনে বিদায় হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহের দিন অতি নিকট হইল—আর একদিনমাত্র বিলম্ব আছে। উপায় নাই! নিষ্কৃতি নাই! চারি দিক্ হইতে উচ্ছ্বাসিত বারিরাশি গর্জ্জিয়া আসিতেছে—নিশ্চিত ডুবিব।

তখন লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, মাতার পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। যোড়হাত করিয়া বলিলাম,—"আমার বিবাহ দিও না—আমি আইবুড় থাকিব।"

মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" কেন? তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না। কেবল যোড়হাত করিতে লাগিলাম, কেবল কাঁদিতে লাগিলাম। মাতা বিরক্ত হইলেন,—রাগিয়া উঠিলেন; গালি দিলেন। শেষ পিতাকে বলিয়া দিলেন। পিতাও গালি দিয়া মারিতে আসিলেন। আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

উপায় নাই! নিষ্কৃতি নাই! ডুবিলাম।

সেই দিন বৈকালে গৃহে কেবল আমি একা ছিলাম—পিতা বিবাহের খরচসংগ্রহে গিয়াছিলেন—মাতা দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে গিয়াছিলেন। এ সব যে সময়ে হয়, সে সময়ে আমি দ্বার দিয়া থাকিতাম, না হয় বামাচরণ আমার কাছে বসিয়া থাকিত। বামাচরণ এ দিন বসিয়াছিল। একজন কে দ্বার ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চেনা পায়ের শব্দ নহে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে গা?"

উত্তর "তোমার যম।"

কথা কোপযুক্ত বটে, কিন্তু স্বর স্ত্রীলোকের। ভয় পাইলাম না। হাসিয়া বলিলাম,—"আমার যম কি আছে? তবে এতদিন কোথা ছিলে?"

স্ত্রীলোকটির রাগশান্তি হইল না। "এখন জান্‌বি! বড় বিয়ের সাধ! পোড়ারমুখী; আবাগী!" ইত্যাদি গালির ছড়া আরম্ভ হইল। গালি সমাপ্তে সেই মধুরভাষিণী বলিলেন, "হা দেখ, কাণি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, তবে যে দিন তুই ঘর করিতে যাইবি, সেই দিন তোকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।"

বুঝিলাম, চাঁপা খোদ। আদর করিয়া বসিতে বলিলাম। বলিলাম, "শুন—তোমার সঙ্গে কথা আছে।" এত গালির উত্তরে সাদর সম্ভাষণ দেখিয়া, চাঁপা একটু শীতল হইয়া বসিল।

আমি বলিলাম, "শুন, এ বিবাহে তুমি যেমন বিরক্ত, আমিও তেমনি। আমার এ বিবাহ যাহাতে না হয়, আমি তাহাই করিতে রাজি আছি। কিসে বিবাহ বন্ধ হয়, তাহার উপায় বলিতে পার?"

চাঁপা বিস্মিত হইল। বলিল, "তা তোমার বাপ মাকে বল না কেন?"

আমি বলিলাম, "হাজার বার বলিয়াছি। কিছু হয় নাই।"

চাঁপা। বাবুদের বাড়ী গিয়া তাঁদের হাতে পায়ে ধর না কেন?

আমি। তাতেও কিছু হয় নাই।

চাঁপা একটু ভাবিয়া বলিল, "তবে এক কাজ করিবি?"

আমি। কি?

চাঁপা। দুদিন লুকাইয়া থাকিবি?

আমি। কোথায় লুকাইব? আমার স্থান কোথায় আছে?

চাঁপা আবার একটু ভাবিল। বলিল, "আমার বাপের বাড়ী গিয়া থাকিবি?"

ভাবিলাম, মন্দ কি? আর ত উদ্ধারের কোন উপায় দেখি না। বলিলাম, "আমি কাণা, নূতন স্থানে আমাকে কে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইবে? তাহারাই বা স্থান দিবে কেন?"

চাঁপা আমার সর্ব্বনাশিনী কুপ্রবৃত্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়াছিল; সে বলিল, "তোর তা ভাবিতে হইবে না। সে সব বন্দোবস্ত আমি করিব। আমি সঙ্গে লোক দিব, আমি তাদের বলিয়া পাঠাইব। তুই যাস্ ত বল্?"

মজ্জনোন্মুখের সমীপবর্ত্তী কাষ্ঠফলকবৎ এই প্রবৃত্তি আমার চক্ষে একমাত্র রক্ষার উপায় বলিয়া বোধ হইল। আমি সম্মত হইলাম।

চাঁপা বলিল, "আচ্ছা, তবে ঠিক থাকিস্। রাত্রে সবাই ঘুমাইলে আমি আসিয়া দ্বারে টোকা মারিব; বাহির হইয়া আসিস্।"

আমি সম্মত হইলাম।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে দ্বারে ঠক্‌ঠক করিয়া অল্প শব্দ হইল। আমি জাগ্রত ছিলাম। দ্বিতীয় বস্ত্র মাত্র লইয়া, আমি দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক বাহির হইলাম। বুঝিলাম, চাঁপা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে চলিলাম। একবার ভাবিলাম না—একবার বুঝিলাম না যে, কি দুষ্কর্ম্ম করিতেছি। পিতা মাতার জন্য মন কাতর হইল বটে, কিন্তু তখন মনে মনে

বিশ্বাস ছিল যে, অল্প দিনের জন্য যাইতেছি। বিবাহের কথা নিবৃত্তি পাইলেই আবার আসিব।

আমি চাঁপার গৃহে—আমার শ্বশুরবাড়ী ?—উপস্থিত হইলে চাঁপা আমায় সত্বই লোক সঙ্গে দিয়া বিদায় করিল। পাছে তাহার স্বামী জানিতে পারে, এই ভয়ে বড় তাড়াতাড়ি করিল—যে লোক সঙ্গে দিল, তাহার সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে আমার বিশেষ আপত্তি—কিন্তু চাঁপা এমনই তাড়াতাড়ি করিল যে, আমার আপত্তি ভাসিয়া গেল। মনে কর, কাহাকে আমার সঙ্গে দিল ? হীরালালকে।

হীরালালের মন্দ চরিত্রের কথা তখন আমি কিছুই জানিতাম না। সেজন্য আপত্তি করি নাই। সে যুবা পুরুষ—আমি যুবতী—তাহার সঙ্গে কি প্রকারে একা যাইব ? এই আপত্তি। কিন্তু তখন আমার কথা কে শুনে ? আমি অন্ধ, পথ অপরিচিত, রাত্রে আসিয়াছি—সুতরাং পথে যে সকল শব্দঘটিত চিহ্ন চিনিয়া রাখিয়া আসিয়া থাকি, সে সকল কিছু শুনিতে পাই নাই—অতএব বিনা সহায়ে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না—বাড়ী ফিরিয়া গেলেও সেই পাপ বিবাহ! অগত্যা হীরালালের সঙ্গে যাইতে হইল। তখন মনে হইল—আর কেহ অন্ধের সহায় থাক না থাক—মাথার উপর দেবতা আছেন; তাঁহারা কখনও লবঙ্গলতার ন্যায় পীড়িতকে পীড়ন করিবেন না; তাঁহাদের দয়া আছে, শক্তি আছে, অবশ্য দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন—নহিলে দয়া কার জন্য ?

তখন জানিতাম না যে, ঐশিক নিয়ম বিচিত্র—মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত—আমরা যাহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা দয়া নহে—আমরা যাহাকে পীড়ন বলি—ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে। তখন জানিতাম না যে, এই সংসারের অনন্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য, সে চক্র নিয়মিত পথে অনতিক্ষুণ্ণ রেখায় অহরহ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে—অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, আর্ত্ত হউক, সেই পিষিয়া মরিবে। আমি অন্ধ নিঃসহায় বলিয়া, অনন্ত সংসারচক্র পথ ছাড়িয়া চলিবে কেন ?

হীরালালের সঙ্গে প্রশস্ত রাজপথে বাহির হইলাম—তাহার পদশব্দ অনুসরণ করিয়া চলিলাম—কোথাকার ঘড়িতে একটা বাজিল। পথে কেহ নাই—কোথাও শব্দ নাই—দুই একখানা গাড়ির শব্দ—দুই একজন সুরাপহৃতবুদ্ধি কামিনীর অসম্বদ্ধ গীতিশব্দ। আমি হীরালালকে সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হীরালাল বাবু, আপনার গায়ে জোর কেমন ?"

হীরালাল একটু বিস্মিত হইল—বলিল, "কেন ?"

আমি বলিলাম, "জিজ্ঞাসা করি ?"

হীরালাল বলিল, "তা মন্দ নয়।"

আমি। তোমার হাতে কিসের লাঠি ?

হীরা। তালের।

আমি। ভাঙ্গিতে পার ?

হীরা। সাধ্য কি ?

আমি। আমার হাতে দাও দেখি।

হীরালাল আমার হাতে লাঠি দিল। আমি তাহা ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড করিলাম। হীরালাল আমার বল দেখিয়া বিস্মিত হইল। আমি আধখানা তাহাকে দিয়া, আধখানা আপনি রাখিলাম। তাহার লাঠি ভাঙ্গিয়া দিলাম দেখিয়া হীরালাল রাগ করিল। আমি বলিলাম—"আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম—রাগ করিও না। তুমি আমার বল দেখিলে—আমার হাতে এই আধখানা লাঠি দেখিলে—তোমার ইচ্ছা থাকিলেও তুমি আমার উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না।"

হীরালাল চুপ করিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হীরালাল, জগন্নাথের ঘাটে গিয়া নৌকা করিল। রাত্রিকালে দক্ষিণা বাতাসে পাল দিল। সে বলিল, তাহাদের পিত্রালয় হুগলী। আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

পথে হীরালাল বলিল, "গোপালের সঙ্গে তোমার বিবাহ ত হইবে না—আমায় বিবাহ কর।" আমি বলিলাম, "না।" হীরালাল বিচার আরম্ভ করিল। তাহার যত্ন যে, বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করে যে, তাহার ন্যায় সৎপাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ; আমার ন্যায় কুপাত্রীও পৃথিবীতে দুর্লভ। আমি উভয়ই স্বীকার করিলাম—তথাপি বলিলাম যে, "না, তোমাকে বিবাহ করিব না।"

তখন হীরালাল বড় ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, "কাণাকে কে বিবাহ করিতে চাহে।" এই বলিয়া নীরব হইল। উভয়ে নীরবে রহিলাম—এইরূপে রাত্রি কাটিতে লাগিল।

তাহার পরে, শেষ রাত্রে, হীরালাল অকস্মাৎ মাঝিদিগকে বলিল, "এইখানে ভিড়ো।" মাঝিরা নৌকা লাগাইল—নৌকাতলে ভূমি স্পর্শের শব্দ শুনিলাম। হীরালাল

আমাকে বলিল, "নাম—আসিয়াছি।"—সে আমার হাত ধরিয়া নামাইল। আমি কূলে দাঁড়াইলাম।

তাহার পরে শব্দ শুনিলাম, যেন হীরালাল আবার নৌকায় উঠিল। মাঝিদিগকে বলিল, "দে, নৌকা খুলিয়া দে।" আমি বলিলাম, "সে কি? আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা খুলিয়া দাও কেন?"

হীরালাল বলিল, "আপনার পথ আপনি দেখ।" মাঝিরা নৌকা খুলিতে লাগিল—দাঁড়ের শব্দ শুনিলাম। আমি তখন কাতর হইয়া বলিলাম, "তোমার পায়ে পড়ি! আমি অন্ধ—যদি একান্তই আমাকে ফেলিয়া যাইবে, তবে কাহারও বাড়ী পর্য্যন্ত আমাকে রাখিয়া দিয়া যাও। আমি ত এখানে কখনও আসি নাই—এখানকার পথ চিনিব কি প্রকারে?"

হীরালাল বলিল, "আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ?"

আমার কান্না আসিল। ক্ষণেক রোদন করিলাম; রাগে হীরালালকে বলিলাম, "তুমি যাও। তোমার কাছে কোন উপকারও পাইতে নাই—রাত্রি প্রভাত হইলে তোমার অপেক্ষা দয়ালু শত শত লোকের সাক্ষাৎ পাইব। তাহারা অন্ধের প্রতি তোমার অপেক্ষা দয়া করিবে।"

হী। দেখা পেলে ত? এ যে চড়া! চারি দিকে জল। আমাকে বিবাহ করিবে?

হীরালালের নৌকা তখন কিছু বাহিরে গিয়াছিল। শ্রবণশক্তি আমার জীবনাবলম্বন—শ্রবণই আমার চক্ষের কাজ করে। কেহ কথা কহিলে—কত দূরে, কোন্ দিকে কথা কহিতেছে, তাহা অনুভব করিতে পারি। হীরালাল কোন্ দিকে, কত দূরে থাকিয়া কথা কহিল, তাহা মনে মনে অনুভব করিয়া, জলে নামিয়া সেই দিকে ছুটিলাম—ইচ্ছা, নৌকা ধরিব। গলাজল অবধি নামিলাম। নৌকা পাইলাম না। নৌকা আরও বেশী জলে। নৌকা ধরিতে গেলে ডুবিয়া মরিব।

তালের লাঠি তখনও হাতে ছিল। আবার ঠিক করিয়া শব্দানুভব করিয়া বুঝিলাম, হীরালাল এই দিকে, এত দূর হইতে কথা কহিতেছে। পিছু হটিয়া, কোমর জলে উঠিয়া, শব্দের স্থানানুভব করিয়া, সবলে সেই তালের লাঠি নিক্ষেপ করিলাম।

চীৎকার করিয়া হীরালাল নৌকার উপর পড়িয়া গেল। "খুন হইয়াছে, খুন হইয়াছে!" বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। বাস্তবিক—সেই পাপিষ্ঠ খুন হয় নাই। তখনই তাহার মধুর কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম—নৌকা বাহিয়া চলিল—সে উচ্চৈঃস্বরে আমাকে গালি দিতে দিতে চলিল—অতি কদর্য্য অশ্রাব্য ভাষায় পবিত্রা গঙ্গা কলুষিত করিতে করিতে

চলিল। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম যে, সে শাসাইতে লাগিল যে, আবার খবরের কাগজ করিয়া আমার নামে আর্টিকেল লিখিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেই জনহীনা রাত্রিতে, আমি অন্ধযুবতী, একা সেই দ্বীপে দাঁড়াইয়া গঙ্গার কল কল জলকল্লোল শুনিতে লাগিলাম।

হায়, মানুষের জীবন! কি অসার তুই! কেন আসিস্—কেন থাকিস্—কেন যাস্? এ দুঃখময় জীবন কেন? ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। শচীন্দ্র বাবু, একদিন তাঁহার মাতাকে বুঝাইতেছিলেন, সকলই নিয়মাধীন। মানুষের এই জীবন কি কেবল সেই নিয়মের ফল? যে নিয়মে ফুল ফুটে, মেঘ ছুটে, চাঁদ উঠে,—যে নিয়মে জলবুদ্‌বুদ্ ভাসে, হাসে, মিলায়, যে নিয়মে ধূলা উড়ে, তৃণ পুড়ে, পাতা খসে, সেই নিয়মেই কি এই সুখদুঃখময় মনুষ্যজীবন আবদ্ধ, সম্পূর্ণ, বিলীন হয়? যে নিয়মের অধীন হইয়া ঐ নদীগর্ভস্থ কুম্ভীর শিকারের সন্ধান করিতেছে—যে নিয়মের অধীন হইয়া এই চরে ক্ষুদ্র কীটসকল অন্য কীটের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, সেই নিয়মের অধীন হইয়া আমি শচীন্দ্রের জন্য প্রাণ ত্যাগ করিতে বসিয়াছি? ধিক্ প্রাণত্যাগে! ধিক্ প্রণয়ে! ধিক্ মনুষ্যজীবনে! কেন এই গঙ্গাজলে ইহা পরিত্যাগ করি না?

জীবন অসার—সুখ নাই বলিয়া অসার, তাহা নহে। শিমুলগাছে শিমুলফুলই ফুটিবে; তাহা বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। দুঃখময় জীবনে দুঃখ আছে বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। কিন্তু অসার বলি এই জন্য যে, দুঃখই দুঃখের পরিণাম—তাহার পর আর কিছু নাই। আমার মর্ম্মের দুঃখ, আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না—আর কেহ বুঝিল না—দুঃখ প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা শুনাইতে পারিলাম না—সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না। একটি শিমুলবৃক্ষ হইতে সহস্র শিমুলবৃক্ষ হইতে পারিবে, কিন্তু তোমার দুঃখে আর কয়জনের দুঃখ হইবে। পরের অন্তঃকরণমধ্যে পরে প্রবেশ করিতে পারে, এমন কয়জন পর পৃথিবীতে জন্মিয়াছে? পৃথিবীতে কে এমন জন্মিয়াছে যে, অন্ধ পুষ্পনারীর দুঃখ বুঝিবে? কে এমন জন্মিয়াছে যে, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে, প্রতি কথায়, প্রতি শব্দে, প্রতি বর্ণে, কত সুখদুঃখের

তরঙ্গ উঠে, তাহা বুঝিতে পারে? সুখ দুঃখ? হাঁ, সুখও আছে। যখন চৈত্র মাসে, ফুলের বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছি ছুটিয়া আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিত, তখন সে শব্দের সঙ্গে আমার কত সুখ উছলিত, কে বুঝিত? যখন গীতিব্যবসায়িনীর অট্টালিকা হইতে বাদ্যনিক্কণ, সান্ধ্য সমীরণে কর্ণে আসিত, তখন আমার সুখ কে বুঝিয়াছে? যখন বামাচরণের আধ আধ কথা ফুটিয়াছিল—জল বলিতে "ত" বলিত, কাপড় বলিতে "খাব" বলিত, রজনী বলিতে "জুজ্ঞি" বলিত, তখন আমার মনে কত সুখ উছলিত, তাহা কে বুঝিয়াছিল? আমার দুঃখই বা কে বুঝিবে? অন্ধের রূপোন্মাদ কে বুঝিবে? না দেখায় যে দুঃখ, তাহা কে বুঝিবে? বুঝিলেও বুঝিতে পারে, কিন্তু দুঃখ যে কখন প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এ দুঃখ কে বুঝিবে? পৃথিবীতে যে দুঃখের ভাষা নাই, এ দুঃখ কে বুঝিবে? ছোট মুখে বড় কথা তোমরা ভালবাস না, ছোট ভাষায় বড় দুঃখ কি প্রকাশ করা যায়? এমনই দুঃখ যে, আমার যে কি দুঃখ, তাহাতে হৃদয় ধ্বংস হইলেও, সকলটা আপনি মনে ভাবিয়া আনিতে পারি না।

মনুষ্যভাষাতে তেমন কথা নাই—মনুষ্যের তেমন চিন্তাশক্তি নাই। দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু দুঃখটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমার কি দুঃখ? কি তাহা জানি না, কিন্তু হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে যে, তোমার দেহ শীর্ণ হইতেছে, বল অপহৃত হইতেছে, কিন্তু তোমার শারীরিক রোগ কি, তাহা জানিতে পারিতেছ না। তেমনি অনেক সময়ে দেখিবে যে, দুঃখে তোমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে, প্রাণ বাহির করিয়া দিয়া, শূন্যমার্গে পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছে—কিন্তু কি দুঃখ, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছ না। আপনি বুঝিতে পারিতেছ না—পরে বুঝিবে কি? ইহা কি সামান্য দুঃখ? সাধ করিয়া বলি, জীবন অসার!

যে জীবন এমন দুঃখময়, তাহার রক্ষার জন্য এত ভয় পাইতেছিলাম কেন? আমি কেন ইহা ত্যাগ করি না? এই ত কলনাদিনী গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে দাঁড়াইয়া আছি—আর দুই পা অগ্রসর হইলেই মরিতে পারি। না মরি কেন? এ জীবন রাখিয়া কি হইবে? মরিব।

আমি কেন জন্মিলাম? কেন অন্ধ হইলাম? জন্মিলাম ত শচীন্দ্রের যোগ্য হইয়া জন্মিলাম না কেন? শচীন্দ্রের যোগ্য না হইলাম, তবে শচীন্দ্রকে ভালবাসিলাম কেন? ভালবাসিলাম, তবে তাঁহার কাছে রহিতে পারিলাম না কেন? কিসের জন্য শচীন্দ্রকে ভাবিয়া, গৃহত্যাগ করিতে হইল? নিঃসহায় অন্ধ, গঙ্গার চরে মরিতে আসিলাম কেন?

কেন বানের মুখে কুটার মত, সংসারস্রোতে, অজ্ঞাত পথে ভাসিয়া চলিলাম? এ সংসারে অনেক দুঃখী আছে, আমি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী কেন? এ সকল কাহার খেলা? দেবতার? জীবের এত কষ্টে দেবতার কি সুখ? কষ্ট দিবার জন্য সৃষ্টি করিয়া কি সুখ? মূর্ত্তিমতী নির্দ্দয়তাকে কেন দেবতা বলিব? কেন নিষ্ঠুরতার পূজা করিব? মানুষের এত ভয়ানক দুঃখ কখন দেবকৃত নহে—তাহা হইলে দেবতা রাক্ষসের অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট। তবে কি আমার কর্ম্মফল? কোন্ পাপে আমি জন্মান্ধ?

দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম—মরিব। গঙ্গার তরঙ্গরব কাণে বাজিতে লাগিল—বুঝি মরা হইল না—আমি মিষ্ট শব্দ বড় ভালবাসি। না, মরিব। চিবুক ডুবিল! অধর ডুবিল! আর একটু মাত্র। নাসিকা ডুবিল! চক্ষু ডুবিল! আমি ডুবিলাম।

ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।

আমি সেই প্রভাতবায়ুতাড়িত গঙ্গাজলপ্রবাহমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

অমরনাথের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার এই অসার জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সংসারসাগরে, কোন্ চরে লাগিয়া আমার এই নৌকা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এই বিশ্বচিত্রে আমি আঁকিয়া রাখিব; দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।

আমার নিবাস—অথবা পিত্রালয় শান্তিপুর—আমার বর্ত্তমান বাসস্থানের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আমি সৎকায়স্থকুলোদ্ভূত, কিন্তু আমার পিতৃকুলে একটি গুরুতর কলঙ্ক ঘটিয়াছিল। আমার খুল্লতাতপত্নী কুলত্যাগিনী হইয়াছিলেন। আমার পিতার ভূসম্পত্তি যাহা ছিল—তদ্দ্বারা অন্য উপায় অবলম্বন না করিয়াও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। লোকে তাঁহাকে ধনী বলিয়া গণনা করিত। তিনি আমার শিক্ষার্থ অনেক ধনব্যয় করিয়াছিলেন। আমিও কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম—কিন্তু সে কথায় কাজ নাই। সর্পের মণি থাকে; আমারও বিদ্যা ছিল।

আমার বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে আমার অনেক সম্বন্ধ আসিল—কিন্তু কোন সম্বন্ধই পিতার মনোমত হইল না। তাঁহার ইচ্ছা, কন্যা পরম সুন্দরী হইবে, কন্যার পিতা পরম ধনী হইবে, এবং কৌলীন্যের নিয়ম সকল বজায় থাকিবে। কিন্তু এরূপ কোন সম্বন্ধ উপস্থিত হইল না। আসল কথা, আমাদিগের কুলকলঙ্ক শুনিয়া কোন বড় লোক আমাকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। এইরূপ সম্বন্ধ করিতে করিতে আমার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

পরিশেষে পিতার স্বর্গারোহণের পর আমার এক পিসী এক সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। গঙ্গাপার, কালিকাপুর নামে এক গ্রাম ছিল। এই ইতিহাসে ভবানীনগর নামে অন্য গ্রামের নাম উত্থাপিত হইবে; এই কালিকাপুর সেই ভবানীনগরের নিকটস্থ গ্রাম।

আমার পিসীর শ্বশুরালয় সেই কালিকাপুরে। সেইখানে লবঙ্গ নামে কোন ভদ্রলোকের কন্যার সঙ্গে পিসী আমার সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন।

সম্বন্ধের পূর্ব্বে আমি লবঙ্গকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। আমার পিসীর বাড়ীতে আমি মধ্যে মধ্যে যাইতাম। লবঙ্গকে পিসীর বাড়ীতেও দেখিতাম—তাহার পিত্রালয়েও দেখিতাম। মধ্যে মধ্যে লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে "ক"য়ে করাত, "খ"য়ে খরা শিখাইতাম। যখন তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইল, তখন হইতে সে আমার কাছে আর আসিত না। কিন্তু সেই সময়েই আমিও তাহারে দেখিবার জন্য অধিকতর উৎসুক হইয়া উঠিলাম। তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল—লবঙ্গ কলিকা ফোটে ফোটে হইয়াছিল। চক্ষের চাহনী চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল—উচ্চ হাস্য মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দ্রুত গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই—এ সৌন্দর্য্য যুবতীর অদৃষ্টে কখন ঘটে না। বস্তুতঃ অতীতশৈশব অথচ অপ্রাপ্তযৌবনার সৌন্দর্য্য, এবং অস্ফুটবাক্ শিশুর সৌন্দর্য্য, ইহাই মনোহর—যৌবনের সৌন্দর্য্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসনভূষণের ঘটা, হাসি চাহনীর ঘটা,—বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি—যুবতীর রূপের বিকাশ একপ্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে সে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহাও বিকৃত। যে সৌন্দর্য্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শ মাত্র নাই, সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য।

এই সময়ে আমাদের কুলকলঙ্ক কন্যাকর্ত্তার কর্ণে প্রবেশ করিল। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমার হৃদয়পতত্রী সবে এই লবঙ্গলতায় বসিতেছিল—এমত সময় ভবানীনগরের রামসদয় মিত্র আসিয়া লবঙ্গলতা ছিঁড়িয়া লইয়া গেল। তাহার সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হইল। লবঙ্গলাভে নিরাশ হইয়া আমি বড় ক্ষুণ্ণ হইলাম।

ইহার কয়বৎসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। পশ্চাৎ বলিব কি না, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই অবধি আমি গৃহত্যাগ করিলাম। সেই পর্য্যন্ত নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াই বেড়াই। কোথাও স্থায়ী হইতে পারি নাই।

কোথাও স্থায়ী হই নাই, কিন্তু মনে করিলেই স্থায়ী হইতে পারিতাম। মনে করিলে কুলীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অধিক বিবাহ করিতে পারিতাম। আমার সব ছিল—ধন, সম্পদ্, বয়স, বিদ্যা, বাহুবল—কিছুরই অভাব ছিল না; অদৃষ্টদোষে, একদিনের দুর্ব্বুদ্ধিদোষে, সকল ত্যাগ করিয়া, আমি এই সুখময় গৃহ—এই উদ্যানতুল্য পুষ্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া,

বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মত দেশে দেশে বেড়াইলাম। আমি মনে করিলে আমার সেই জন্মভূমিতে রম্য গৃহ রম্য সজ্জায় সাজাইয়া, রঙ্গের পবনে সুখের নিশান উড়াইয়া দিয়া, হাসির বাণে দুঃখরাক্ষসকে বধ করিতে পারিতাম। কিন্তু—

এখন তাই ভাবি, কেন করিলাম না। সুখ দুঃখের বিধান পরের হাতে, কিন্তু মন ত আমার। তরঙ্গে নৌকা ডুবিল বলিয়া, কেন ডুবিয়া রহিলাম—সাঁতার দিয়া ত কূল পাওয়া যায়। আর দুঃখ—দুঃখ কি? মনের অবস্থা, সে ত নিজের আয়ত্ত। সুখ দুঃখ পরের হাত, না আমার নিজের হাত? পর কেবল বহির্জগতের কর্ত্তা—অন্তর্জগতে আমি একা কর্ত্তা। আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারি না কেন? জড়জগৎ জগৎ, অন্তর্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? তোমার বাহ্য জগতে কয়টি সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি বা নাই? আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্য জগৎ দেখাইবে, সাধ্য কি? যে কুসুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে উঠে, যে সাগর এ অন্ধকারে আপনি মাতে, তোমার বাহ্য জগতে তেমন কোথায়?

তবে কেন, সেই নিশীথকালে, সুষুপ্তা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যপ্রভা—দূর হৌক! একদিন নিশীথকালে—এই অসীম পৃথিবী সহসা আমার চক্ষে শুষ্ক বদরীর মত ক্ষুদ্র হইয়া গেল—আমি লুকাইবার স্থান পাইলাম না। দেশে দেশে ফিরিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কালের শীতল প্রলেপে সেই হৃদয়ক্ষত ক্রমে পুরিয়া উঠিতে লাগিল।

কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোন সচ্চরিত্র, অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। ইনি বহুকাল হইতে কাশীবাস করিয়া আছেন।

একদা তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনকালে পুলিষের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হইল। অনেকে পুলিষের অত্যাচারঘটিত অনেকগুলিন গল্প বলিলেন—দুই একটা বা সত্য, দুই একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত। গোবিন্দকান্ত বাবু একটি গল্প বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই।

"হরেকৃষ্ণ দাস নামে আমাদিগের গ্রামে একঘর দরিদ্র কায়স্থ ছিল। তাহার একটি কন্যা ভিন্ন অন্য সন্তান ছিল না। তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সে নিজেও রুগ্ন।

এজন্য সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল। তাহার কন্যাটির কতকগুলিন স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোভবশতঃ তাহা সে শ্যালীপতিকে দেয় নাই। কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখিল, তখন সেই অলঙ্কারগুলি সে আমাকে ডাকিয়া আমার কাছে রাখিল—বলিল যে, 'আমার কন্যার জ্ঞান হইলে তাহাকে দিবেন—এখন দিলে রাজচন্দ্র ইহা আত্মসাৎ করিবে।' আমি স্বীকৃত হইলাম। পরে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া, নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব দারোগা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণের ঘটী বাটী পাতর টুকনি লাওয়ারেশ মাল বলিয়া হস্তগত করিলেন। কেহ কেহ বলিল যে, হরেকৃষ্ণ লাওয়ারেশ নহে—কলিকাতায় তাহার কন্যা আছে। দারোগা মহাশয় তাহাকে কটু বলিয়া, আজ্ঞা করিলেন, 'ওয়ারেশ থাকে, হজুরে হাজির হইবে।' তখন আমার দুই একজন শত্রু সুযোগ মনে করিয়া বলিয়া দিল যে, গোবিন্দ দত্তের কাছে ইহার স্বর্ণালঙ্কার আছে। আমাকে তলব হইল। আমি তখন দেবাদিদেবের কাছে আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলাম। কিছু গালি খাইলাম। আসামীর শ্রেণীতে চালান হইবার গতিক দেখিলাম। বলিব কি? ঘুষাঘুষির উদ্যোগ দেখিয়া অলঙ্কারগুলি সকল দারোগা মহাশয়ের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিলাম, তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

"বলা বাহুল্য যে, দারোগা মহাশয় অলঙ্কারগুলি আপন কন্যার ব্যবহারার্থ নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন। সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে, 'হরেকৃষ্ণ দাসের এক লোটা আর এক দেরকো ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তিই নাই; এবং সে লাওয়ারেশা ফৌত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই।'"

হরেকৃষ্ণ দাসের নাম শুনিয়াছিলাম। আমি গোবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "ঐ হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাইয়ের নাম মনোহর দাস না?"

গোবিন্দকান্ত বাবু বলিলেন, "হাঁ। আপনি কি প্রকারে জানিলেন?"

আমি বিশেষ কিছু বলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতির নাম কি?"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "রাজচন্দ্র দাস।"

আমি। তাহার বাড়ী কোথায়?

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "কলিকাতায়। কিন্তু কোন্ স্থানে, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কন্যাটির নাম কি জানেন?"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ তাহার নাম রজনী রাখিয়াছিলেন।"
ইহার অল্প দিন পরেই আমি কাশী পরিত্যাগ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমে আমাকে বুঝিতে হইতেছে, আমি কি খুঁজি। চিত্ত আমার দুঃখময়, এ সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। আজি আমার মৃত্যু হইলে, আমি কাল চাহি না। যদি দুঃখ নিবারণ করিতে না পরিলাম, তবে পুরুষত্ব কি? কিন্তু ব্যাধির শান্তি করিতে গেলে আগে ব্যাধির নির্ণয় চাহি। দুঃখ নিবারণের আগে আমার দুঃখ কি, তাহা নিরূপণের আবশ্যক।

দুঃখ কি? অভাব। সকল দুঃখই অভাব। রোগ দুঃখ; কারণ, রোগ স্বাস্থ্যের অভাব। অভাবমাত্রই দুঃখ নহে, তাহা জানি। রোগের অভাব দুঃখ নহে। অভাববিশেষই দুঃখ।

আমার কিসের অভাব? আমি চাই কি? মনুষ্যই চায় কি? ধন? আমার যথেষ্ট আছে।

যশঃ? পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যাহার যশ নাই। যে পাকা জুয়াচোর, তাহারও বুদ্ধি সম্বন্ধে যশ আছে। আমি একজন কশাইয়েরও যশ শুনিয়াছি—মাংস সম্বন্ধে সে কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিত না। সে কখন মেষমাংস বলিয়া কাহাকেও কুক্কুরমাংস দেয় নাই। যশ সকলেরই আছে। আবার কাহারও যশ সম্পূর্ণ নহে। বেকনের ঘুষখোর অপবাদ—সক্রেতিস্ অপযশহেতু বধদণ্ডার্হ হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণবধে মিথ্যাবাদী—অর্জ্জুন বভ্রুবাহন কর্তৃক পরাভূত। কাইসরকে যে বিথীনিয়ার রাণী বলিত, সে কথা অদ্যাপি প্রচলিত;—সেক্ষপীয়রকে বল্‌টের ভাঁড় বলিয়াছেন। যশ চাহি না।

যশ সাধারণ লোকের মুখে। সাধারণ লোক কোন বিষয়েরই বিচারক নহে—কেন না, সাধারণ লোক মূর্খ এবং স্থূলবুদ্ধি। মূর্খ স্থূলবুদ্ধির কাছে যশস্বী হইয়া আমার কি সুখ হইবে? আমি যশ চাহি না।

মান? সংসারে এমন লোক কে আছে যে, সে মানিলে সুখী হই? যে দুই চারি জন আছে, তাহাদিগের কাছে আমার মান আছে। অন্যের কাছে মান—অপমান মাত্র। রাজদরবারে মান—সে কেবল দাসত্বের প্রাধান্য চিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি। আমি মান চাহি না। মান চাহি কেবল আপনার কাছে।

রূপ? কতটুকু চাই? কিছু চাই। লোকে দেখিয়া, না নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে। আমাকে দেখিয়া কেহ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে না। রূপ যাহা আছে, তাহাই আমার যথেষ্ট।

স্বাস্থ্য? আমার স্বাস্থ্য অদ্যাপি অনন্ত।

বল? লইয়া কি করিব? প্রহারের জন্য বল আবশ্যক। আমি কাহাকেও প্রহার করিতে চাহি না।

বুদ্ধি? এ সংসারে কেহ কখন বুদ্ধির অভাব আছে মনে করে নাই—আমিও করি না। সকলেই আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানে, আমিও জানি।

বিদ্যা? ইহার অভাব স্বীকার করি, কিন্তু কেহ কখন বিদ্যার অভাবে আপনাকে অসুখী মনে করে নাই। আমিও করি না।

ধর্ম্ম? লোকে বলে, ধর্ম্মের অভাব পরকালের দুঃখের কারণ, ইহকালের নহে। লোকের চরিত্রে দেখিতে পাই, অধর্ম্মের অভাবই দুঃখ। জানি আমি সে মিথ্যা। কিন্তু জানিয়াও ধর্ম্মকামনা করি না। আমার সে দুঃখ নহে।

প্রণয়? স্নেহ? ভালবাসা? আমি জানি, ইহার অভাবই সুখ—ভালবাসাই দুঃখ। সাক্ষী লবঙ্গলতা।

তবে আমার দুঃখ কিসের? আমার অভাব কিসের? আমার কিসের কামনা যে, তাহা লাভে সফল হইয়া দুঃখ নিবারণ করিব? আমার কাম্য বস্তু কি?

বুঝিয়াছি। আমার কাম্য বস্তুর অভাবই আমার দুঃখ। আমি বুঝিয়াছি যে, সকলই অসার। তাই আমার কেবল দুঃখ সার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিছু কাম্য কি খুঁজিয়া পাই না? এই অনন্ত সংসার, অসংখ্য রত্নরাজিময়, ইহাতে আমার প্রার্থনীয় কি কিছু নাই? যে সংসারে এক একটি দুরবেক্ষণীয় ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ অনন্ত কৌশলের স্থান, অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, যে জগতে পথিস্থ বালুকার এক এক কণা, অনন্তরত্ন-প্রভব নগাধিরাজের ভগ্নাংশ, সে জগতে কি আমার কাম্য বস্তু কিছু নাই। দেখ, আমি কোন্ ছার! টিণ্ডল, হক্‌সলী, ডার্বিন, এবং লায়ল এক আসনে বসিয়া যাবজ্জীবনে ঐ ক্ষুদ্র নীহারবিন্দুর, ঐ বালুকাকণার বা ঐ শিয়ালকাঁটাফুলটির গুণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না—তবু আমার কাম্য বস্তু নাই? আমি কি?

দেখ, এই পৃথিবীতে কত কোটি মনুষ্য আছে, তাহা কেহ গণিয়া সংখ্যা করে নাই। বহু কোটি মনুষ্য সন্দেহ নাই। উহার এক একটি মনুষ্য অসংখ্য গুণের আধার। সকলেই ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ধর্ম্মাদির আধার—সকলেই পূজ্য, সকলেই অনুসরণীয়। আমার কাম্য কি কেহ নাই? আমি কি?

আমার এক বাঞ্ছনীয় পদার্থ ছিল—আজিও আছে। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। পূর্ণ হইবার নহে বলিয়া তাহা হৃদয় হইতে অনেক দিন হইল উন্মূলিত করিয়াছি। আর পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহি না। অন্য কোন বাঞ্ছনীয় কি সংসারে নাই?

তাই খুঁজি। কি করিব?

কয় বৎসর হইতে আমি আপনা আপনি এই প্রশ্ন করিতেছিলাম, উত্তর দিতে পারিতেছিলাম না। যে দুই একজন বন্ধু বান্ধব আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, তোমার আপনার কাজ না থাকে, পরের কাজ কর। লোকের যথাসাধ্য উপকার কর।

সে ত প্রাচীন কথা। লোকের উপকার কিসে হয়? রামের মার ছেলের জ্বর হইয়াছে, নাড়ী টিপিয়া একটু কুইনাইন দাও। রঘো পাগলের গাত্রবস্ত্র নাই, কম্বল কিনিয়া দাও। সস্তার মা বিধবা, মাসিক দাও। সুন্দর নাপিতের ছেলে ইস্কুলে পড়িতে পায় না—তাহার বেতনের আনুকূল্য কর। এই কি পরের উপকার?

মানিলাম, এই পরের উপকার। কিন্তু এ সকলে কতক্ষণ যায়? কতটুকু সময় কাটে? কতটুকু পরিশ্রম হয়? মানসিক শক্তিসকল কতখানি উত্তেজিত হয়? আমি এমত বলি না যে, এই সকল কার্য্য আমার যথাসাধ্য আমি করিয়া থাকি; কিন্তু যতটুকু করি, তাহাতে আমার বোধ হয় না যে, ইহাতে আমার অভাব পূরণ হইবে। আমার যোগ্য কাজ আমি খুঁজি, যাহাতে আমার মন মজিবে, তাই খুঁজি।

আর একপ্রকারে লোকের উপকারের ঢং উঠিয়াছে। তাহার এক কথায় নাম দিতে হইলে বলিতে হয় "বকাবকি লেখালেখি।" সোসাইটি, ক্লব, এসোসিয়েসন, সভা, সমাজ, বক্তৃতা, রিজলিউশ্যন, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন,—আমি তাহাতে নহি। আমি একদা কোন বন্ধুকে একটি মহাসভার ঐরূপ একখানি আবেদন পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কি পড়িতেছ? তিনি বলিলেন, "এমন কিছু না, কেবল কাণা ফকির ভিক মাঙ্গে।" এ সকল আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাই—কেবল "কাণা ফকির ভিক মাঙ্গে রে বাবা।"

এই রোগের আর এক প্রকার বিকার আছে। বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দেও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গোরুর

মত গোহালে বাঁধা থাকে—দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, চরিয়া খাক্। আমার গোরু নাই, পরের গোহালের সঙ্গেও আমার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। জাতি উঠাইতে আমি বড় রাজি নহি, আমি তত দূর আজিও সুশিক্ষিত হই নাই। আমি এখনও আমার ঝাড়ুদারের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইতে অনিচ্ছুক, তাহার কন্যা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, এবং যে গালি শিরোমণি মহাশয় দিলে নিঃশব্দে সহিব, ঝাড়ুদারের কাছে তাহা সহিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আমার জাতি থাকুক। বিধবা বিবাহ করে করুক, ছেলে পুলেরা আইবুড়ো থাকে থাকুক, কুলীন ব্রাহ্মণ একপত্নীর যন্ত্রণায় খুসী হয় হউক, আমার আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার পোষকতায় লোকের কি হিত হইবে, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত।

সুতরাং এ বঙ্গসমাজে আমার কোন কার্য্য নাই। এখানে আমি কেহ নহি—আমি কোথাও নহি। আমি, আমি, এই পর্য্যন্ত; আর কিছু নহি। আমার সেই দুঃখ। আর কিছু দুঃখ নাই—লবঙ্গলতার হস্তলিপি ভুলিয়া যাইতেছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমার এইরূপ মনের অবস্থা, আমি এমত সময়ে—কাশীধামে গোবিন্দ দত্তের কাছে রজনীর নাম শুনিলাম। মনে হইল, ঈশ্বর আমাকে, বুঝি একটি গুরুতর কার্য্যের ভার দিলেন। এ সংসারে আমি একটি কার্য্য পাইলাম। রজনীর যথার্থ উপকার চেষ্টা করিলে করা যায়। আমার ত কোন কাজ নাই—এই কাজ কেন করি না। ইহা কি আমার যোগ্য কাজ নহে?

এখানে শচীন্দ্রের বংশাবলীর পরিচয় কিছু দিতে হইল। শচীন্দ্রনাথের পিতার নাম রামসদয় মিত্র; পিতামহের নাম বাঞ্ছারাম মিত্র; প্রপিতামহের নাম কেবলরাম মিত্র। তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস কলিকাতায় নহে—তাঁহার পিতা প্রথমে কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস ভবানীনগর গ্রামে। তাঁহার প্রপিতামহ দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তি ছিলেন। পিতামহ বুদ্ধিবলে ধনসঞ্চয় করিয়া তাঁহাদিগের ভোগ্য ভূসম্পত্তি সকল ক্রয় করিয়াছিলেন।

বাঞ্ছারামের এক পরম বন্ধু ছিলেন, নাম মনোহর দাস। বাঞ্ছারাম মনোহর দাসের সাহায্যেই এই বিভবের অধিপতি হইয়াছিলেন। মনোহর, প্রাণপাত করিয়া তাঁহার কার্য্য

করিতেন, নিজে কখন ধনসঞ্চয় করিতেন না। বাঞ্ছারাম তাঁহার এই সকল গুণে অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। মনোহরকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন; এবং মনোহর বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে মান্য করিতেন। তাঁহার পিতার সঙ্গে পিতামহের তাদৃশ সম্প্রীতি ছিল না। বোধ হয়, উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু দোষ ছিল।

একদা রামসদয়ের সঙ্গে মনোহর দাসের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। মনোহর দাস বাঞ্ছারামকে বলিলেন যে, রামসদয় তাঁহাকে কোন বিষয়ে সহনাতীত অপমান করিয়াছেন। অপমানের কথা বাঞ্ছারামকে বলিয়া, মনোহর তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ভবানীনগর হইতে উঠিয়া গেলেন। বাঞ্ছারাম মনোহরকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; মনোহর কিছুই শুনিলেন না। উঠিয়া কোন্ দেশে গিয়া বাস করিলেন, তাহাও কাহাকে জানাইলেন না।

বাঞ্ছারাম রামসদয়ের প্রতি যত স্নেহ করুন বা না করুন, মনোহরকে ততোধিক স্নেহ করিতেন। সুতরাং রামসদয়ের উপর তাঁহার ক্রোধ অপরিসীম হইল। বাঞ্ছারাম অত্যন্ত কটূক্তি করিয়া গালি দিলেন, রামসদয়ও সকল কথা নিঃশব্দে সহ্য করিলেন না।

পিতা পুত্রের বিবাদের ফল এই দাঁড়াইল যে, বাঞ্ছারাম পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পুত্রও গৃহত্যাগ করিয়া, শপথ করিলেন, আর কখনও পিতৃভবনে মুখ দেখাইবেন না। বাঞ্ছারাম রাগ করিয়া এক উইল করিলেন। উইলে লিখিত হইল যে, বাঞ্ছারাম মিত্রের সম্পত্তিতে তস্য পুত্র রামসদয় মিত্র কখন অধিকারী হইবেন না। বাঞ্ছারাম মিত্রের অবর্ত্তমানে মনোহর দাস, মনোহর দাসের অভাবে মনোহরের উত্তরাধিকারিগণ অধিকারী হইবেন; তদভাবে রামসদয়ের পুত্রপৌত্রাদি যথাক্রমে, কিন্তু রামসদয় নহে।

রামসদয় গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমা স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। ঐ স্ত্রীর কিছু পিতৃদত্ত অর্থ ছিল। তদবলম্বনে, এবং একজন সজ্জন বণিক্ সাহেবের আনুকূল্যে তিনি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন; সংসার প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না।

যদি কষ্ট পাইতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, বাঞ্ছারাম সদয় হইতেন। পুত্রের সুখের অবস্থা শুনিয়া, বৃদ্ধের যে স্নেহাবশেষ ছিল, তাহাও নিবিয়া গেল। পুত্র অভিমান-প্রযুক্ত, পিতা না ডাকিলে, আর যাইব না, ইহা স্থির করিয়া, আর পিতার কোন সম্বাদ লইলেন না। অভক্তি এবং তাচ্ছল্যবশতঃ পুত্র এরূপ করিতেছে বিবেচনা করিয়া, বাঞ্ছারাম তাঁহাকেও আর ডাকিলেন না।

সুতরাং কাহারও রাগ পড়িল না ; উইলও অপরিবর্ত্তিত রহিল। এমত কালে হঠাৎ বাঞ্ছারামের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল।

রামসদয় শোকাকুল হইলেন ; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করিয়া যথাকর্ত্তব্য করেন নাই, এই দুঃখে অনেক দিন ধরিয়া রোদন করিলেন। তিনি আর ভবানীনগর গেলেন না, কলিকাতাতেই পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। কেন না, এক্ষণে ঐ বাটী মনোহর দাসের হইল।

এদিকে মনোহর দাসের কোন সম্বাদ নাই। পশ্চাৎ জানিতে পারা গেল যে, বাঞ্ছারামের জীবিতাবস্থাতেও মনোহরের কেহ কোন সম্বাদ পায় নাই। মনোহর দাস ভবানীনগর হইতে যে গিয়াছিল, সেই গিয়াছিল ; কোথায় গেল, বাঞ্ছারাম তাহার অনেক সন্ধান করিলেন ; কিছুতেই কোন সম্বাদ পাইলেন না। তখন তিনি উইলের এক ক্রোড়পত্র সৃজন করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুরাম সরকার নামক একজন কলিকাতানিবাসী আত্মীয় কুটুম্বকে উইলের এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে কথা রহিল যে, তিনি সযত্নে মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিবেন। পশ্চাৎ ফলানুসারে সম্পত্তি যাহার প্রাপ্য, তাহাকে দিবেন।

বিষ্ণুরাম বাবু অতি বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ, এবং কর্ম্মঠ ব্যক্তি। তিনি বাঞ্ছারামের মৃত্যুর পরেই মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া যাহা বাঞ্ছারাম কর্ত্তৃক অনুসন্ধান হয় নাই, তাহার নিগূঢ় কথা পরিজ্ঞাত হইলেন। স্থূল বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে এই জানা গেল যে, মনোহর ভবানীনগর হইতে পলাইয়া কিছু কাল সপরিবারে ঢাকা অঞ্চলে গিয়া বাস করেন। পরে সেখানে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কিছু কষ্ট হওয়াতে, কলিকাতায় নৌকাযোগে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে বাত্যায় পতিত হইয়া সপরিবারে জলমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার আর উত্তরাধিকারী ছিল, এমন সন্ধান পাইলেন না।

বিষ্ণুরাম বাবু এ সকল কথার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রামসদয়কে দেখাইলেন। তখন বাঞ্ছারামের ভূসম্পত্তি শচীন্দ্রদিগের দুই ভ্রাতার হইল ; এবং বিষ্ণুরাম বাবুও তাহা তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এক্ষণে এই রজনী যদি জীবিত থাকে, তবে যে সম্পত্তি রামসদয় মিত্র ভোগ করিতেছে, তাহা রজনীর। রজনী হয়ত নিতান্ত দরিদ্রাবস্থাপন্না। সন্ধান করিয়া দেখা যাউক। আমার আর কোন কাজ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালায় আসার পর একদা কোন গ্রাম্য কুটুম্বের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে গ্রাম পর্য্যটনে গিয়াছিলাম। এক স্থানে অতি মনোহর নিভৃত জঙ্গল; দয়েল সপ্ত স্বর মিলাইয়া আশ্চর্য্য ঐকতানবাদ্য বাজাইতেছে; চারি দিকে বৃক্ষরাজি; ঘনবিন্যস্ত, কোমল শ্যাম পল্লবদলে আচ্ছন্ন; পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি মিশামিশি, শ্যাম রূপের রাশি রাশি; কোথাও কলিকা, কোথাও স্ফুটিত পুষ্প, কোথাও অপক্ক, কোথাও সুপক্ক ফল। সেই বনমধ্যে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একজন বিকটমূর্ত্তি পুরুষ এক যুবতীকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতেছে।

দেখিবামাত্র বুঝিলাম, পুরুষ অতি নীচজাতীয় পাষণ্ড—বোধ হয়, ডোম কি সিউলি—কোমরে দা। গঠন অত্যন্ত বলবানের মত।

ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাদ্ভাগে গেলাম। গিয়া তাহার কক্ষাল হইতে দাখানি টানিয়া লইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলাম। দুষ্ট তখন যুবতীকে ছাড়িয়া দিল—আমার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। আমাকে গালি দিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া আমার শঙ্কা হইল।

বুঝিলাম, এ স্থলে বিলম্ব অকর্ত্তব্য। একেবারে তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিলাম। ছাড়াইয়া সেও আমাকে ধরিল। আমিও তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিলাম। তাহার বল অধিক। কিন্তু আমি ভীত হই নাই—বা অস্থির হই নাই। অবকাশ পাইয়া আমি যুবতীকে বলিলাম যে, "তুমি এই সময় পলাও—আমি ইহার উপযুক্ত দণ্ড দিতেছি।"

যুবতী বলিল,—"কোথায় পলাইব? আমি যে অন্ধ! এখানকার পথ চিনি না।"

অন্ধ! আমার বল বাড়িল। আমি রজনী নামে একটি অন্ধ কন্যাকে খুঁজিতেছিলাম।

দেখিলাম, সেই বলবান্ পুরুষ আমাকে প্রহার করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু আমাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার অভিপ্রায় বুঝিলাম, যে দিকে আমি দা ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সেই দিকে সে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি তখন দুষ্টকে ছাড়িয়া দিয়া, অগ্রে গিয়া দা কুড়াইয়া লইলাম। সে এক বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া, তাহা ফিরাইয়া আমার হস্তে প্রহার করিল, আমার হস্ত হইতে দা পড়িয়া গেল। সে দা তুলিয়া লইয়া, আমাকে তিন চারি স্থানে আঘাত করিয়া পলাইয়া গেল।

আমি গুরুতর পীড়াপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহু কষ্টে আমি কুটুম্বের গৃহাভিমুখে চলিলাম। অন্ধ যুবতী আমার পদশব্দানুসরণ করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল।

কিছু দূর গিয়া আর আমি চলিতে পারিলাম না। পথিক লোকে আমাকে ধরিয়া আমার কুটুম্বের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

সেই স্থানে আমি কিছু কাল শয্যাগত রহিলাম—অন্য আশ্রয়াভাবেও বটে, এবং আমার দশা কি হয়, তাহা না জানিয়া কোথাও যাইতে পারে না, সে জন্যও বটে, অন্ধ যুবতীও সেইখানে রহিল।

বহু দিনে, বহু কষ্টে, আমি আরোগ্যলাভ করিলাম।

মেয়েটি অন্ধ দেখিয়া অবধিই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। যে দিন প্রথম আমার বাক্‌শক্তি হইল, সে আমার রুগ্নশয্যাপার্শ্বে আসিল; সেই দিনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি গা?"

"রজনী।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি রাজচন্দ্র দাসের কন্যা?"

রজনীও বিস্মিতা হইল। বলিল, "আপনি বাবাকে কি চেনেন?"

আমি স্পষ্টতঃ কোন উত্তর দিলাম না।

আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে, রজনীকে কলিকাতায় লইয়া গেলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় গমনকালে আমি একা রজনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম না। কুটুম্বগৃহ হইতে তিনকড়ি নামে একজন প্রাচীনা পরিচারিকা সমভিব্যাহারে লইয়া গেলাম। এ সতর্কতা রজনীর মন প্রসন্ন করিবার জন্য। গমনকালে রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনী—তোমাদের বাড়ী কলিকাতায়—কিন্তু তুমি এখানে আসিলে কি প্রকারে?"

রজনী বলিল, "আমাকে কি সকল কথা বলিতে হইবে?"

আমি বলিলাম, "তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, তবে বলিও না।"

বস্তুতঃ এই অন্ধ স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, বিবেচনা, এবং সরলতায় আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলাম। তাহাকে কোন প্রকার ক্লেশ দিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। রজনী বলিল, "যদি অনুমতি করিলেন, তবে কতক কথা গোপন রাখিব। গোপালবাবু বলিয়া আমার একজন প্রতিবাসী আছেন। তাঁহার স্ত্রী চাঁপা। চাঁপার সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় হইয়াছিল। তাহার বাপের বাড়ী হুগলী। সে আমাকে বলিল, 'আমার বাপের বাড়ী

যাইবে?' আমি রাজি হইলাম। সে আমাকে একদিন সঙ্গে করিয়া গোপালবাবুর বাড়ীতে লইয়া আসিল। কিন্তু তাহার বাপের বাড়ী আমাকে পাঠাইবার সময় আপনি আমার সঙ্গে আসিল না। তাহার ভাই হীরালালকে আমার সঙ্গে দিল। হীরালালও নৌকা করিয়া আমায় হুগলী লইয়া চলিল।"

আমি এইখানে বুঝিতে পারিলাম যে, রজনী হীরালাল সম্বন্ধে কথা গোপন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি তাহার সঙ্গে গেলে?"

রজনী বলিল, "ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যাইতে হইল। কেন যাইতে হইল, তাহা বলিতে পারিব না। পথিমধ্যে হীরালাল আমার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। আমি তাহার বাধ্য নহি দেখিয়া, সে আমাকে বিনাশ করিবার জন্য, গঙ্গার এক চরে নামাইয়া দিয়া নৌকা লইয়া চলিয়া গেল।"

রজনী চুপ করিল—আমি হীরালালকে ছদ্মবেশী রাক্ষস মনে করিয়া, মনে মনে তাহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিলাম।—তার পর রজনী বলিতে লাগিল, "সে চলিয়া গেলে, আমি ডুবিয়া মরিব বলিয়া জলে ডুবিলাম।"

আমি বলিলাম, "কেন? তুমি কি হীরালালকে এত ভালবাসিতে?"

রজনী ভ্রূকুটী করিল। বলিল, "তিলার্দ্ধ না। আমি পৃথিবীতে কাহারও উপর এত বিরক্ত নহি।"

'তবে ডুবিয়া মরিতে গেলে কেন?"

"আমার যে দুঃখ, তাহা আপনাকে বলিতে পারি না।"

"আচ্ছা। বলিয়া যাও।"

"আমি জলে ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। একখানা গহনার নৌকা যাইতেছিল। সেই নৌকার লোক আমাকে ভাসিতে দেখিয়া উঠাইল। যে গ্রামে আপনার সহিত সাক্ষাৎ, সেইখানে একজন আরোহী নামিল। সে নামিবার সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কোথায় নামিবে?' আমি বলিলাম, 'আমাকে যেখানে নামাইয়া দিবে, আমি সেইখানে নামিব।' তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার বাড়ী কোথায়?' আমি বলিলাম, 'কলিকাতায়।' সে বলিল, 'আমি কালি আবার কলিকাতায় যাইব। তুমি আজ আমার সঙ্গে আইস। আজি আমার বাড়ী থাকিবে। কালি তোমাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিব।' আমি আনন্দিত হইয়া তাহার সঙ্গে উঠিলাম। সে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। তার পর আপনি সব জানেন।"

আমি বলিলাম, "আমি যাহার হাত হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়াছিলাম, সে কি সেই ?"

"সে সেই।"

আমি রজনীকে কলিকাতায় আনিয়া, তাহার কথিত স্থানে অন্বেষণ করিয়া, রাজচন্দ্র দাসের বাড়ী পাইলাম। সেইখানে রজনীকে লইয়া গেলাম।

রাজচন্দ্র কন্যা পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহার স্ত্রী অনেক রোদন করিল। উহারা আমার কাছে রজনীর বৃত্তান্ত সবিশেষ শুনিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

পরে রাজচন্দ্রকে আমি নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কন্যা গৃহ-ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল কেন জান ?"

রাজচন্দ্র বলিল, "না। আমি তাহা সর্ব্বদাই ভাবি, কিন্তু কিছুই ঠিকানা করিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম, "রজনী জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল কি দুঃখে জান ?"

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল। বলিল, "রজনীর এমন কি দুঃখ, কিছুই ত ভাবিয়া পাই না। সে অন্ধ, এটি বড় দুঃখ বটে, কিন্তু তার জন্য এত দিনের পর ডুবিয়া মরিতে যাইবে কেন ? তবে, এত বড় মেয়ে, আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু তাহার জন্যও নয়। তাহার ত সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ দিতেছিলাম। বিবাহের আগের রাত্রেই পলাইয়াছিল।"

আমি নূতন কথা পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে পলাইয়াছিল ?"

রাজ। হাঁ।

আমি। তোমাদিগকে না বলিয়া ?

রাজ। কাহাকেও না বলিয়া।

আমি। কাহার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছিলে ?

রাজ। গোপালবাবুর সঙ্গে।

আমি। কে গোপালবাবু ? চাঁপার স্বামী ?

রাজ। আপনি সবই ত জানেন্। সেই বটে।

আমি একটু আলো দেখিলাম। তবে চাঁপা সপত্নীযন্ত্রণাভয়ে রজনীকে প্রবঞ্চনা করিয়া ভ্রাতৃসঙ্গে হুগলী পাঠাইয়াছিল। বোধ হয়, তাহারই পরামর্শে হীরালাল উহার বিনাশে উদ্যোগ পাইয়াছিল।

সে কথা কিছু না বলিয়া রাজচন্দ্রকে বলিলাম, "আমি সবই জানি। আমি আরও যাহা জানি, তোমায় বলিতেছি। তুমি কিছু লুকাইও না।"

রাজ। কি—আজ্ঞা করুন।

আমি। রজনী তোমার কন্যা নহে।

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল। বলিল, "সে কি! আমার মেয়ে নয় ত কাহার?"

"হরেকৃষ্ণ দাসের।"

রাজচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। শেষে বলিল, "আপনি কে, তাহা জানি না। কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি, এ কথা রজনীকে বলিবেন না।"

আমি। এখন বলিব না। কিন্তু বলিতে হইবে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার সত্য উত্তর দাও। যখন হরেকৃষ্ণ মরিয়া যায়, তখন রজনীর কিছু অলঙ্কার ছিল?

রাজচন্দ্র ভীত হইল। বলিল, "আমি ত তাহার অলঙ্কারের কথা কিছু জানি না। অলঙ্কার কিছুই পাই নাই।"

আমি। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তুমি তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির সন্ধানে সে দেশে আর গিয়াছিলে?

রাজ। হাঁ, গিয়াছিলাম। গিয়া শুনিলাম, হরেকৃষ্ণের যাহা কিছু ছিল, তাহা পুলিষে লইয়া গিয়াছে।

আমি। তাহাতে তুমি কি করিলে?

রাজ। আমি আর কি করিব? আমি পুলিষকে বড় ভয় করি, রজনীর বালাচুরি মোকদ্দমায় বড় ভুগিয়াছিলাম। আমি পুলিষের নাম শুনিয়া আর কিছু বলিলাম না।

আমি। রজনীর বালাচুরি মোকদ্দমা কিরূপ?

রাজ। রজনীর অন্নপ্রাশনের সময় তাহার বালা চুরি গিয়াছিল। চোর ধরা পড়িয়াছিল। বর্দ্ধমানে তাহার মোকদ্দমা হইয়াছিল। এই কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে আমাকে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইয়াছিল। বড় ভুগিয়াছিলাম।

আমি পথ দেখিতে পাইলাম।

তৃতীয় খণ্ড

শচীন্দ্র বক্তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে—রজনীর জীবনচরিত্রের এ অংশ আমাকে লিখিতে হইবে। লিখিব।

আমি রজনীর বিবাহের সকল উদ্যোগ করিয়াছিলাম—বিবাহের দিন প্রাতে শুনিলাম যে, রজনী পলাইয়াছে, তাহাকে আর পাওয়া যায় না। তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না। কেহ বলিল, সে ভ্রষ্টা। আমি বিশ্বাস করিলাম না। আমি তাহাকে অনেক বার দেখিয়াছিলাম—শপথ করিতে পারি, সে কখন ভ্রষ্টা হইতে পারে না। তবে ইহা হইতে পারে যে, সে কুমারী, কৌমার্য্যাবস্থাতেই কাহারও প্রণয়াসক্ত হইয়া বিবাহাশঙ্কায় গৃহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও দুইটি আপত্তি; প্রথম, যে অন্ধ, সে কি প্রকারে সাহস করিয়া আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইবে? দ্বিতীয়তঃ, যে অন্ধ, সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে? মনে করিলাম, কদাচ না। কেহ হাসিও না, আমার মত গণ্ডমূর্খ অনেক আছে। আমরা খান দুই তিন বহি পড়িয়া, মনে করি, জগতের চেতনাচেতনের গূঢ়াদপি গূঢ় তত্ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি, যাহা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না, তাহা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর মানি না, কেন না, আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তিতে সে বৃহত্তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না। অন্ধের রূপোন্মাদ কি প্রকারে বুঝিব?

সন্ধান করিতে করিতে জানিলাম যে, যে রাত্রি হইতে রজনী অদৃশ্য হইয়াছে, সেই রাত্রি হইতে হীরালালও অদৃশ্য হইয়াছে। সকলে বলিতে লাগিল,' হীরালালের সঙ্গে সে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, হীরালাল রজনীকে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে। রজনী পরমা সুন্দরী; কাণা হউক, এমন লোক নাই, যে তাহার রূপে মুগ্ধ হইবে না। হীরালাল তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে বঞ্চনা করিয়া লইয়া গিয়াছে। অন্ধকে বঞ্চনা করা বড় সুসাধ্য।

কিছু দিন পরে হীরালাল দেখা দিল। আমি তাহাকে বলিলাম, “তুমি রজনীর সম্বাদ জান?” সে বলিল—“না।”

কি করিব। নালিশ, ফরিয়াদ হইতে পারে না। আমার জ্যেষ্ঠকে বলিলাম। জ্যেষ্ঠ বলিলেন, “রাস্কালকে মার।” কিন্তু মারিয়া কি হইবে? আমি সম্বাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলাম। যে রজনীর সন্ধান দিবে, তাহাকে অর্থ পুরস্কার দিব, ঘোষণা করিলাম। কিছু ফল ফলিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রজনী জন্মান্ধ, কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। চক্ষে দেখিতে কোন দোষ নাই। চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমরকৃষ্ণতারাবিশিষ্ট। অতি সুন্দর চক্ষুঃ—কিন্তু কটাক্ষ নাই। চাক্ষুষ স্নায়ুর দোষে অন্ধ। স্নায়ুর নিশ্চেষ্টতাবশতঃ রেটিনাস্থিত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে গৃহীত হয় না। রজনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী; বর্ণ উদ্ভেদ-প্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর, গঠন বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত; মুখকান্তি গম্ভীর; গতি, অঙ্গভঙ্গী সকল মৃদু, স্থির এবং অন্ধতাবশতঃ সর্ব্বদা সঙ্কোচজ্ঞাপক; হাস্য দুঃখময়। সচরাচর এই স্থিরপ্রকৃতি সুন্দর শরীরে সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাস্কর্য্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্ম্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত।

রজনীকে প্রথম দেখিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই সৌন্দর্য্য অনিন্দনীয় হইলেও মুগ্ধকর নহে। রজনী রূপবতী, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া কেহ কখন পাগল হইবে না। তাহার চক্ষের সে মোহিনী গতি নাই। সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিবে; বোধ হয়, সে মূর্ত্তি সহজে ভুলিবেও না; কেন না, সে স্থির, গম্ভীর কান্তির একটু অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। কিন্তু সেই আকর্ষণ অন্যবিধ; ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাকে “পঞ্চবাণ” বলে, রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। নাই কি?

সে যাহাই হউক—আমি মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিতাম—রজনীর দশা কি হইবে? সে ইতর লোকের কন্যা, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় যে, সে ইতরপ্রকৃতিবিশিষ্ট নহে। ইতর লোক ভিন্ন, তাহার অন্যত্র বিবাহের সম্ভাবনা নাই। ইতর লোকের সঙ্গেও এত কালে বিবাহ ঘটে নাই। দরিদ্রের ভার্য্যা গৃহকর্ম্মের জন্য, যে ভার্য্যার অন্ধতানিবন্ধন গৃহকর্ম্মের সাহায্য হইবে না—তাহাকে কোন্ দরিদ্র বিবাহ করিবে? কিন্তু ইতর লোক ভিন্ন এই

ইতরবৃত্তিপরায়ণ কায়স্থের কন্যা কে বিবাহ করিবে? তাহাতে আবার এ অন্ধ। এরূপ স্বামীর সহবাসে রজনীর দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। দুশ্ছেদ্য কণ্টক-কাননমধ্যে যত্নপালনীয় উদ্যানপুষ্পের জন্মের ন্যায়, এই রজনীর পুষ্পবিক্রেতার গৃহে জন্ম ঘটিয়াছে। কণ্টকাবৃত হইয়াই ইহাকে মরিতে হইবে। তবে আমি গোপালের সঙ্গে ইহার বিবাহ দিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? ঠিক জানি না। তবে ছোট মার দৌরাত্ম্য বড়; তাঁহারই উত্তেজনাতে ইহার বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আর বলিতে কি, যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি, তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।

এ কথা শুনিয়া অনেক সুন্দরী মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তোমার মনে মনে রজনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে কি? না, সে ইচ্ছা নাই। রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ; রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং রজনী অশিক্ষিতা। রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না; ইচ্ছাও নাই। আমার বিবাহে অনিচ্ছাও নাই। তবে মনোমত কন্যা পাই না। আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে রজনীর মত সুন্দরী হইবে, অথচ বিদ্যুৎকটাক্ষ-বর্ষিণী হইবে; বংশমর্য্যাদায় শাহ আলমের বা মহ্লাররাও হুল্কারের প্রপরাপ সং পৌত্রী হইবে, বিদ্যায় লীলাবতী বা শাপভ্রষ্টা সরস্বতী হইবে; এবং পতিভক্তিতে সাবিত্রী হইবে; চরিত্রে লক্ষ্মী, রন্ধনে দ্রৌপদী, আদরে সত্যভামা এবং গৃহকর্ম্মে গদার মা। আমি পান খাইবার সময়ে পানের লবঙ্গ খুলিয়া দিবে, তামাকু খাইবার সময়ে হুঁকায় কলিকা আছে কি না, বলিয়া দিবে, আহারের সময়ে মাছের কাঁটা বাছিয়া দিবে, এবং স্নানের পর গা মুছিয়াছি কি না, তদারক করিবে। আমি চা খাইবার সময়ে, দোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চার অনুসন্ধান না করি, এবং কালীর অনুসন্ধানে চার পাত্রমধ্যে কলম না দিই, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে; পিক্‌দানিতে টাকা রাখিয়া বাক্সের ভিতর ছেপ না ফেলি, তাহার খবরদারি করিবে। বন্ধুকে পত্র লিখিয়া আপনার নামে শিরোনামা দিলে, সংশোধন করাইয়া লইবে, পয়সা দিতে টাকা দিতেছি কি না, খবর লইবে, নোটের পিঠে দোকানের চিঠি কাটিতেছি কি না দেখিবে, এবং তামাসা করিবার সময়ে বিয়ানের নামের পরিবর্ত্তে ভক্তিমতী প্রতিবাসিনীর নাম করিলে, ভুল সংশোধন করিয়া লইবে। ঔষধ খাইতে ফুলোল তৈল না খাই, চাকরাণীর নাম করিয়া ডাকিতে, গৌসের সাহেবের মেমের নাম না ধরি, এ সকল বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে। এমত কন্যা পাই, তবে বিবাহ করি। আপনারা যে ইনি উঁকে টিপিয়া হাসিতেছেন, আপনাদের মধ্যে যদি কেহ অবিবাহিতা এবং এই সকল গুণে গুণবতী থাকেন, তবে বলুন, আমি পুরোহিত ডাকি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শেষে রাজচন্দ্র দাসের কাছে শুনিতে পাইলাম যে, রজনীকে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজচন্দ্র দাস এ বিষয়ে আমাদিগের সঙ্গে বড় চমৎকার ব্যবহার করিতে লাগিল। রজনীকে কোথায় পাওয়া গেল, কি প্রকারে পাওয়া গেল, তাহা কিছুই বলিল না। আমরা অনেক জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছুতেই কোন কথা বাহির করিতে পারিলাম না। সে কেনই বা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাও জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম, তাহাও বলিল না। তাহার স্ত্রীও ঐরূপ—ছোট মা, সুচীর ন্যায় লোকের মনের ভিতর প্রবেশ করেন, কিন্তু তাহার কাছে হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিলেন না। রজনী স্বয়ং আর আমাদের বাড়ীতে আসিত না। কেন আসিত না, তাহাও কিছু জানিতে পারিলাম না। শেষে রাজচন্দ্র ও তাহার স্ত্রীও আমাদিগের বাড়ী আসা পরিত্যাগ করিল। ছোট মা কিছু দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, উহারা সপরিবারে অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে, সাবেক বাড়ীতে আর নাই। কোথায় গিয়াছে, তাহার কোন ঠিকানা করিতে পারিলাম না।

ইহার এক মাস পরে, একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি আসিয়াই, আপনি আত্মপরিচয় দিলেন। "আমার নিবাস কলিকাতায় নহে। আমার নাম অমরনাথ ঘোষ, আমার নিবাস শান্তিপুর।"

তখন আমি তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে নিযুক্ত হইলাম। কি জন্য তিনি আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। তিনিও প্রথমে কিছু বলিলেন না। সুতরাং সামাজিক ও রাজকীয় বিষয়ঘটিত নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম, তিনি কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত বিচক্ষণ। তাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত, শিক্ষা সম্পূর্ণ, এবং চিন্তা বহুদূরগামিনী। কথাবার্ত্তায় একটু অবসর পাইয়া, তিনি আমার টেবিলের উপরে স্থিত "সেক্ষপিয়র গেলেরির" পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। ততক্ষণ আমি অমরনাথকে দেখিয়া লইতে লাগিলাম। অমরনাথ দেখিতে সুপুরুষ; গৌরবর্ণ, কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, স্থূলও নহে, শীর্ণও নহে; বড় বড় চক্ষু, কেশগুলি সূক্ষ্ম, কুঞ্চিত, যত্নরঞ্জিত। বেশভূষার পারিপাট্যের বাড়াবাড়ি নাই, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে। তাঁহার কথা কহিবার ভঙ্গী অতি মনোহর; কণ্ঠ অতি সুমধুর। দেখিয়া বুঝিলাম, লোক অতি সুচতুর।

সেক্ষপিয়র গেলেরির পাতা উল্টান শেষ হইলে অমরনাথ নিজ প্রয়োজনের কথা কিছু না বলিয়া, ঐ পুস্তকস্থিত চিত্র সকলের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহা বাক্য এবং কার্য্যদ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিত্রফলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধৃষ্টতার কাজ। সে চিত্র কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; এবং এ সকল চিত্রও সম্পূর্ণ নহে। ডেস্‌ডিমনার চিত্র দেখাইয়া কহিলেন, আপনি এই চিত্রে ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত সে সাহস কৈ? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কই? জুলিয়েটের মূর্ত্তি দেখাইয়া কহিলেন, এ নবযুবতীর মূর্ত্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের নবযৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কই?

অমরনাথ এইরূপে কত বলিতে লাগিলেন। সেক্ষপিয়রের নায়িকাগণ হইতে শকুন্তলা, সীতা, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। অমরনাথ একে একে তাঁহাদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ করিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের কথায় ক্রমে প্রাচীন ইতিহাসের কথা আসিয়া পড়িল, তৎপ্রসঙ্গে তাসিতস, প্লুটার্ক, থুকিদিদিস প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমালোচনার অবতারণা হইল। প্রাচীন ইতিবৃত্ত-লেখকদিগের মত লইয়া অমরনাথ কোম্‌তের ত্রৈকালিক উন্নতিসম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন। কোম্‌ৎ হইতে তাঁহার সমালোচক মিল ও হকস্‌লীর কথা আসিল। হকস্‌লী হইতে ওয়েন ও ডারুইন, ডারুইন হইতে বুকনেয়র সোপেনহয়র প্রভৃতির সমালোচনা আসিল। অমরনাথ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যস্রোতঃ আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আমি মুগ্ধ হইয়া আসল কথা ভুলিয়া গেলাম।

বেলা গেল দেখিয়া, অমরনাথ বলিলেন, "মহাশয়কে আর বিরক্ত করিব না। যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই। রাজচন্দ্র দাস যে আপনাদিগকে ফুল বেচিত, তাহার একটি কন্যা আছে?"

আমি বলিলাম, "আছে বোধ হয়।"

অমরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বোধ হয় নয়, সে আছে। আমি তাহাকে বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি।"

আমি অবাক্ হইলাম। অমরনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি রাজচন্দ্রের নিকটে এই কথা বলিতেই গিয়াছিলাম। তাহাকে বলা হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগের সঙ্গে একটা কথা আছে। যে কথা বলিব, তাহা মহাশয়ের পিতার কাছে বলাই আমার উচিত; কেন না, তিনি কর্ত্তা। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে আপনাদিগের রাগ করিবার কথা। আপনি সর্ব্বাপেক্ষা স্থিরস্বভাব এবং ধর্ম্মজ্ঞ, এজন্য আপনাকেই বলিতেছি।"

আমি বলিলাম, "কি কথা মহাশয় ?"

অমর। রজনীর কিছু বিষয় আছে।

আমি। সে কি ? সে যে রাজচন্দ্রের কন্যা।

অমর। রাজচন্দ্রের পালিত কন্যা মাত্র।

আমি। তবে সে কাহার কন্যা ? কোথায় বিষয় পাইল ? এ কথা আমরা এত দিন কিছু শুনিলাম না কেন ?

অমর। আপনারা যে সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, ইহাই রজনীর। রজনী মনোহর দাসের ভ্রাতুষ্কন্যা।

একবার, প্রথমে চমকিয়া উঠিলাম। তার পর বুঝিলাম যে, কোন জালসাজ জুয়াচোরের হাতে পড়িয়াছি। প্রকাশ্যে উচ্চৈঃহাস্য করিয়া বলিলাম, "মহাশয়কে নিষ্কর্ম্মা লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার অনেক কর্ম্ম আছে। এক্ষণে আপনার সঙ্গে রহস্যের আমার অবসর নাই। আপনি গৃহে গমন করুন।"

অমরনাথ বলিল, "তবে উকীলের মুখে সম্বাদ শুনিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এদিকে বিষ্ণুরাম বাবু সম্বাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, মনোহর দাসের উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইয়াছে—বিষয় ছাড়িয়া দিতে হইবে। অমরনাথ তবে জুয়াচোর জালসাজ নহে ?

কে উত্তরাধিকারী, তাহা বিষ্ণুরাম বাবু প্রথমে কিছু বলেন নাই। কিন্তু অমরনাথের কথা স্মরণ হইল। বুঝি রজনীই উত্তরাধিকারিণী। যে ব্যক্তি দাবিদার, সে যে মনোহর দাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা আছে কি না, ইহা জানিবার জন্য বিষ্ণুরাম বাবুর কাছে গেলাম। আমি বলিলাম, "মহাশয় পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, মনোহর দাস সপরিবারে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহার প্রমাণও আছে। তবে তাহার আবার ওয়ারিস আসিল কোথা হইতে ?"

বিষ্ণুরাম বাবু বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ দাস নামে তাহার এক ভাই ছিল, জানেন বোধ হয়।"

আমি। তা ত জানি। কিন্তু সেও ত মরিয়াছে।

বিষ্ণু। বটে, কিন্তু মনোহরের পর মরিয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ের অধিকারী হইয়া মরিয়াছে।

আমি। তা হৌক, কিন্তু হরেকৃষ্ণেরও ত এক্ষণে কেহ নাই?

বিষ্ণু। পূর্ব্বে তাহাই মনে করিয়া আপনাদিগকে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে জানিতেছি যে, তাহার এক কন্যা আছে।

আমি। তবে এত দিন সে কন্যার কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই কেন?

বিষ্ণু। হরেকৃষ্ণের স্ত্রী তাহার পূর্ব্বে মরে; স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শিশু কন্যাকে পালন করিতে অক্ষম হইয়া হরেকৃষ্ণ কন্যাটিকে তাহার শ্যালীকে দান করে। তাহার শ্যালী ঐ কন্যাটিকে আত্মকন্যাবৎ প্রতিপালন করে, এবং আপনার বলিয়া পরিচয় দেয়। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি লাওয়ারেশ বলিয়া মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাইয়া, আমি হরেকৃষ্ণকে লাওয়ারেশ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে হরেকৃষ্ণের একজন প্রতিবাসী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার কন্যার কথা প্রকাশ করিয়াছে। আমি তাহার প্রদত্ত সন্ধানের অনুসরণ করিয়া জানিয়াছি যে, তাহার কন্যা আছে বটে।

আমি বলিলাম, "যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা বলিয়া ধূর্ত্ত লোক উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু সে যে যথার্থ হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, তাহার কিছু প্রমাণ আছে কি?"

"আছে।" বলিয়া বিষ্ণুরাম বাবু আমাকে একটা কাগজ দেখিতে দিলেন, বলিলেন, "এ বিষয়ে যে যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উহাতে ইয়াদ দাস্ত করিয়া রাখিয়াছি।"

আমি ঐ কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে পাইলাম যে, হরেকৃষ্ণ দাসের শ্যালীপতি রাজচন্দ্র দাস; এবং হরেকৃষ্ণের কন্যার নাম **রজনী**।

প্রমাণ যাহা দেখিলাম, তাহা ভয়ানক বটে। আমরা এত দিন অন্ধ রজনীর ধনে ধনী হইয়া তাহাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছিলাম।

বিষ্ণুরাম একটি জোবানবন্দীর জাবেতা নকল আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এক্ষণে দেখুন, এই জোবানবন্দী কাহার?"

আমি পড়িয়া দেখিলাম যে, জোবানবন্দীর বক্তা হরেকৃষ্ণ দাস। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তিনি এক বালাচুরীর মোকদ্দমায় এই জোবানবন্দী দিতেছেন। জোবানবন্দীতে পিতার নাম ও বাসস্থান লেখা থাকে; তাহাও পড়িয়া দেখিলাম। তাহা মনোহর দাসের পিতার নাম ও বাসস্থানের সঙ্গে মিলিল। বিষ্ণুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোহর দাসের ভাই হরেকৃষ্ণের এই জোবানবন্দী বলিয়া আপনার বোধ হইতেছে কি না?"

আমি। বোধ হইতেছে।

বিষ্ণু। যদি সংশয় থাকে, তবে এখনই তাহা ভঞ্জন হইবে। পড়িয়া যাউন।

পড়িতে লাগিলাম যে, সে বলিতেছে, "আমার ছয় মাসের একটি কন্যা আছে। এক সপ্তাহ হইল, তাহার অন্নপ্রাশন দিয়াছি। অন্নপ্রাশনের দিন বৈকালে তাহার বালা চুরি গিয়াছে।"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখিলে, বিষ্ণুরাম বলিলেন, "দেখুন, কত দিনের জোবানবন্দী?"

জোবানবন্দীর তারিখ দেখিলাম, জোবানবন্দী উনিশ বৎসরের।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "ঐ কন্যার বয়স এক্ষণে হিসাবে কত হয়?"

আমি। উনিশ বৎসর কয় মাস—প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু। রজনীর বয়স কত অনুমান করেন?

আমি। প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু। পড়িয়া যাউন; হরেকৃষ্ণ কিছু পরে বালিকার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আমি পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, এক স্থানে হরেকৃষ্ণ পুনঃপ্রাপ্ত বালা দেখিয়া বলিতেছেন, "এই বালা আমার কন্যা রজনীর বালা বটে।"

আর বড় সংশয়ের কথা রহিল না—তথাপি পড়িতে লাগিলাম। প্রতিবাদীর মোক্তার হরেকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি দরিদ্র লোক। তোমার কন্যাকে সোণার বালা দিলে কি প্রকারে?" হরেকৃষ্ণ উত্তর দিতেছে, "আমি গরীব, কিন্তু আমার ভাই মনোহর দাস দশটাকা উপার্জ্জন করেন। তিনি আমার মেয়েকে সোণার গহনাগুলি দিয়াছেন।"

তবে যে এই হরেকৃষ্ণ দাস আমাদিগের মনোহর দাসের ভাই, তদ্বিষয়ে আর সংশয়ের স্থান রহিল না।

পরে মোক্তার আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমার ভাই তোমার পরিবার বা তোমার আর কাহাকে কখন অলঙ্কার দিয়াছে?"

উত্তর। না।

পুনশ্চ প্রশ্ন। সংসার খরচ দেয়?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তবে তোমার কন্যাকে অন্নপ্রাশনে সোণার গহনা দিবার কারণ কি?

উত্তর। আমার এই মেয়েটি জন্মান্ধ। সে জন্য আমার স্ত্রী সর্ব্বদা কাঁদিয়া থাকে। আমার ভাই ও ভাইজ তাহাতে দুঃখিত হইয়া, আমাদিগের মনোদুঃখ যদি কিছু নিবারণ হয়, এই ভাবিয়া অন্নপ্রাশনের সময় মেয়েটিকে এই গহনাগুলি দিয়াছিলেন।

জন্মান্ধ! তবে যে সে এই রজনী, তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি?

আমি হতাশ হইয়া জোবানবন্দী রাখিয়া দিলাম। বলিলাম, "আমার আর বড় সন্দেহ নাই।"

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "অত অল্প প্রমাণে আপনাকে সন্তুষ্ট হইতে বলি না। আর একটা জোবানবন্দীর নকল দেখুন।"

দ্বিতীয় জোবানবন্দীও দেখিলাম যে, উহাও ঐ কথিত বালাচুরীর মোকদ্দমায় গৃহীত হইয়াছিল। এই জোবানবন্দীতে বক্তা রাজচন্দ্র দাস। তিনি একমাত্র কুটুম্ব বলিয়া ঐ অন্নপ্রাশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন। এবং চুরীর বিষয় সকল সপ্রমাণ করিতেছেন।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "উপস্থিত রাজচন্দ্র দাস সেই রাজচন্দ্র দাস। সংশয় থাকে, ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

আমি বলিলাম, "নিষ্প্রয়োজন।"

বিষ্ণুরাম আরও কতকগুলি দলিল দেখাইলেন, সে সকলের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিতে গেলে, সকলের ভাল লাগিবে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই রজনী দাসী যে হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় রহিল না। তখন দেখিলাম, বৃদ্ধ পিতা মাতা লইয়া, অন্নের জন্য কাতর হইয়া বেড়াইব!

বিষ্ণুরামকে বলিলাম, "মোকদ্দমা করা বৃথা। বিষয় রজনী দাসীর, তাঁহার বিষয় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব। তবে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তুল্যাধিকারী। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা রহিল মাত্র।"

আমি একবার আদালতে গিয়া, আসল জোবানবন্দী দেখিয়া আসিলাম। এখন পুরাণ নথি ছিঁড়িয়া ফেলে, তখন রাখিত। আসল দেখিয়া জানিলাম যে, নকলে কোন কৃত্রিমতা নাই।

বিষয় রজনীকে ছাড়িয়া দিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রজনীকে বিষয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু কেহ ত সে বিষয় দখল করিল না।

রাজচন্দ্র দাস একদিন দেখা করিতে আসিল। তাহার মুখে শুনিলাম, সে শিমলায় একটি বাড়ী কিনিয়া সেইখানে রজনীকে লইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, টাকা কোথায় পাইলে? রাজচন্দ্র বলিল, অমরনাথ কর্জ্জ দিয়াছেন, পশ্চাৎ বিষয় হইতে শোধ হইবে। জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তবে তোমরা বিষয়ে দখল লইতেছ না কেন? তাহাতে সে বলিল, সে সকল কথা অমরনাথ বাবু জানেন। অমরনাথ বাবু কি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন? তাহাতে রাজচন্দ্র বলিল, "না।" পরে রাজচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজচন্দ্র, তোমায় এত দিন দেখি নাই কেন?"

রাজচন্দ্র বলিল, "একটু গা ঢাকা হইয়াছিলাম।"

আমি। কার কি চুরি করিয়াছ যে, গা ঢাকা হইয়াছিলে?

রাজ। চুরি করিব কার? তবে অমরনাথ বাবু বলিয়াছিলেন যে, এখন বিষয় লইয়া গোলযোগ হইতেছে, এখন একটু আড়াল হওয়াই ভাল। মানুষের চক্ষুলজ্জা আছে ত?

আমি। অর্থাৎ পাছে আমরা কিছু ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করি। অমরনাথ বাবু বিজ্ঞ লোক দেখিতেছি। তা যাই হৌক, এখন যে বড় দেখা দিলে?

রাজ। আপনার ঠাকুর আমাকে ডাকাইয়াছেন।

আমি। আমার ঠাকুর? তিনি তোমার সন্ধান পাইলেন কি প্রকারে?

রাজ। খুঁজিয়া খুঁজিয়া।

আমি। এত খোঁজাখুঁজি কেন? তোমায় বিষয় ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিবার জন্য নয় ত?

রাজ। না—না—তা কেন—তা কেন? আর একটা কথার জন্য। এখন রজনীর কিছু বিষয় হইয়াছে শুনিয়া অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে। তা কোথায় সম্বন্ধ করি—তাই আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

আমি। কেন, অমরনাথ বাবুর সঙ্গে ত সম্বন্ধ হইতেছিল? তিনি এত করিয়া রজনীর বিষয় উদ্ধার করিলেন, তাঁকে ছাড়িয়া কাহাকে বিবাহ দিবে?

রাজ। যদি তাঁর অপেক্ষাও ভাল পাত্র পাই?

আমি। অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র কোথায় পাইবে?

রাজ। মনে করুন, আপনি যেমন, এমনই পাত্র যদি পাই ?

আমি একটু চমকিলাম। বলিলাম, "তাহা হইলে অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র হইল না। কিন্তু ছেঁদো কথা ছাড়িয়া দেও—তুমি কি আমার সঙ্গে রজনীর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ ?"

রাজচন্দ্র একটু কুণ্ঠিত হইল। বলিল, "হাঁ, তাই বটে। এ সম্বন্ধ করিতেই কর্ত্তা আমাকে ডাকাইয়াছিলেন।"

শুনিয়া, আকাশ হইতে পড়িলাম। সম্মুখে, দারিদ্র্যরাক্ষসকে দেখিয়া, ভীত হইয়া, পিতা যে এই সম্বন্ধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম—রজনীকে আমি বিবাহ করিলে ঘরের বিষয় ঘরে থাকিবে। আমাকে অন্ধ পুষ্পনারীর কাছে বিক্রয় করিয়া, পিতা বিক্রয়-মূল্যস্বরূপ হৃত সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। শুনিয়া হাড় জ্বলিয়া গেল।

রাজচন্দ্রকে বলিলাম, "তুমি এখন যাও। কর্ত্তার সঙ্গে আমার সে কথা হইবে।"

আমার রাগ দেখিয়া, রাজচন্দ্র পিতার কাছে গেল। সে কি বলিল, বলিতে পারি না। পিতা তাহাকে বিদায় দিয়া, আমাকে ডাকাইলেন।

তিনি আমাকে নানা প্রকারে অনুরোধ করিলেন,—রজনীকে বিবাহ করিতেই হইবে। নহিলে সপরিবারে মারা যাইব—খাইব কি ? তাঁহার দুঃখ ও কাতরতা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল না। বড় রাগ হইল। আমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলাম।

পিতার কাছে হইতে গিয়া, আমার মার হাতে পড়িলাম। পিতার কাছে রাগ করিলাম, কিন্তু মার কাছে রাগ করিতে পারিলাম না—তাঁহার চক্ষের জল অসহ্য হইল। সেখান হইতে পলাইলাম। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা স্থির রহিল—যে রজনীকে দয়া করিয়া গোপালের সঙ্গে বিবাহিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলাম—আজি তাহার টাকার লোভে তাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিব ?

বিপদে পড়িয়া মনে করিলাম, ছোট মার সাহায্য লইব। গৃহের মধ্যে ছোট মাই বুদ্ধিমতী। ছোট মার কাছে গেলাম।

"ছোট মা, আমাকে কি রজনীকে বিবাহ করিতে হইবে ? আমি কি অপরাধ করিয়াছি ?"

ছোট মা চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি। তুমিও কি ঐ পরামর্শে ?

ছোট মা। বাছা, রজনী ত সৎকায়স্থের মেয়ে ?

আমি। হইলই বা?

ছোট মা। আমি জানি, সে সচ্চরিত্রা।

আমি। তাহাও স্বীকার করি।

ছোট মা। সে পরম সুন্দরী।

আমি। পদ্মচক্ষু!

ছোট মা। বাবা—যদি পদ্মচক্ষুই খোঁজ, তবে তোমার আর একটা বিবাহ করিতে কতক্ষণ?

আমি। সে কি মা! রজনীর টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করিয়া, তার বিষয় লইয়া, তার পর তাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আর একজনকে বিবাহ করা, কেমন কাজটা হইবে?

ছোট মা। ঠেলিয়া ফেলিবে কেন? তোমার বড় মা কি ঠেলা আছেন?

এ কথার উত্তর ছোট মার কাছে করিতে পারা যায় না। তিনি আমার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের বনিতা, বহুবিবাহের দোষের কথা তাঁহার সাক্ষাতে কি প্রকারে বলিব! সে কথা না বলিয়া, বলিলাম, "আমি এ বিবাহ করিব না—তুমি আমায় রক্ষা কর। তুমি সব পার।"

ছোট মা। আমি না বুঝি, এমন নহে। কিন্তু বিবাহ না করিলে, আমরা সপরিবারে অন্নাভাবে মারা যাইব। আমি সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমাদিগের অন্নকষ্ট আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না। তোমার সহস্র বৎসর পরমায়ু হউক, তুমি ইহাতে অমত করিও না।

আমি। টাকাই কি এত বড়?

ছোট মা। তোমার আমার কাছে নহে। কিন্তু যাহারা তোমার আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের কাছে বটে। সুতরাং তোমার আমার কাছেও বটে! দেখ, তোমার জন্য আমরা তিন জনে প্রাণ দিতেও পারি। তুমি আমাদিগের জন্য একটি অন্ধ কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে না?

বিচারে ছোট মার কাছে হারিলাম। হারিলে রাগ বাড়ে। আমার রাগ বাড়িল। আর মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করা বড় অন্যায়। অতএব আমি দম্ভ করিয়া বলিলাম, "তোমরা যাহাই বল না কেন, আমি এ বিবাহ করিব না।"

ছোট মাও দম্ভ করিয়া বলিলেন, "তুমিও যাই বল না কেন, আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে তোমায় এ বিবাহ দিবই দিব।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তবে বোধ হয়, তুমি গোয়ালার মেয়ে। আমায় এ বিবাহ দিতে পারিবে না।"

ছোট মা বলিলেন, "না বাবা, আমি কায়েতের মেয়ে।"

ছোট মা বড় দুষ্ট। আমাকেই বাবা বলিয়া গালি ফিরাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমাদিগের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিত। কেহ সন্ন্যাসী বলিত, কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধূত। পরিধানে গৈরিক বাস, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকে রুক্ষ কেশ, জটা নহে, রক্তচন্দনের ছোট রকমের ফোঁটা। বড় একটা ধূলা কাদার ঘটা নাই—সন্ন্যাসী জাতির মধ্যে ইনি একটু বাবু। খড়ম চন্দনকাষ্ঠের, তাহাতে হাতীর দাঁতের বৌল। তিনি যাই হউন, বালকেরা তাঁহাকে সন্ন্যাসী মহাশয় বলিত বলিয়া আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিব।

পিতা কোথা হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। অনুভবে বুঝিলাম, পিতার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, সন্ন্যাসী নানাবিধ ঔষধ জানে এবং তান্ত্রিক যাগযজ্ঞে সুদক্ষ। বিমাতা বন্ধ্যা।

পিতার অনুকম্পায় সন্ন্যাসী উপরের একটি বৈঠকখানা আসিয়া দখল করিয়াছিল। ইহা আমার একটু বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া সারঙ্গ রাগিণীতে আর্য্যাচ্ছন্দে স্তোত্র পাঠ করিত। ভণ্ডামী আর আমার সহ্য হইল না। আমি তাহার অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহার নিকট গেলাম। বলিলাম, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, ছাদের উপর মাথা মুণ্ড কি বকিতেছিলে?"

সন্ন্যাসী হিন্দুস্থানী, কিন্তু আমাদিগের সঙ্গে যে ভাষায় কথা কহিত, তাহার চৌদ্দ আনা নির্ভাঁজ সংস্কৃত, এক আনা হিন্দি, এক আনা বাঙ্গালা। আমি বাঙ্গালাই রাখিলাম। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "কেন, কি বকি, আপনি কি জানেন না?"

আমি বলিলাম, "বেদমন্ত্র?"

স। হইলে হইতে পারে।

আমি। পড়িয়া কি হয়?

স। কিছু না।

উত্তরটুকু সন্ন্যাসীর জিত—আমি এটুকু প্রত্যাশা করি নাই। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে পড়েন কেন ?"

স। কেন, শুনিতে কি কষ্টকর ?

আমি। না, শুনিতে মন্দ নয়, বিশেষ আপনি সুকণ্ঠ। তবে যদি কিছু ফল নাই, তবে পড়েন কেন ?

স। যেখানে ইহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট নাই, সেখানে পড়ায় ক্ষতি কি ?

আমি জারি করিতে আসিয়াছিলাম,—কিন্তু দেখিলাম যে, একটু হটিয়াছি—সুতরাং আমাকে চাপিয়া ধরিতে হইল। বলিলাম, "ক্ষতি নাই, কিন্তু নিষ্ফলে কেহ কোন কাজ করে না—যদি বেদগান নিষ্ফল, তবে আপনি বেদগান করেন কেন ?"

স। আপনিও ত পণ্ডিত, আপনিই বলুন দেখি, বৃক্ষের উপর কোকিল গান করে কেন ?

ফাঁপরে পড়িলাম। ইহার দুইটি উত্তর আছে, এক—"ইহাতেই কোকিলের সুখ"—দ্বিতীয়, "স্ত্রীকোকিলকে মোহিত করিবার জন্য।" কোন্‌টি বলি ? প্রথমটি আগে বলিলাম, "গাইয়াই কোকিলের সুখ।"

স। গাইয়াই আমার সুখ।

আমি। তবে টপ্পা, খিয়াল প্রভৃতি থাকিতে বেদগান করেন কেন ?

কোন্ কথাগুলি সুখকর—সামান্যা গণিকাগণের কদর্য্য চরিত্রের গুণগান সুখকর, না দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান সুখকর ?

হারিয়া, দ্বিতীয় উত্তরে গেলাম। বলিলাম, "কোকিল গায়, কোকিলপত্নীকে মোহিত করিবার জন্য। মোহনার্থ যে শারীরিক স্ফূর্ত্তি, তাহাতে জীবের সুখ। কণ্ঠস্বরের স্ফূর্ত্তি সেই শারীরিক স্ফূর্ত্তির অন্তর্গত। আপনি কাহাকে মুগ্ধ করিতে চাহেন ?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "আমার আপনার মনকে। মন আত্মার অনুরাগী নহে। আত্মার হিতকারী নহে। তাহাকে বশীভূত করিবার জন্য গাই।"

আমি। আপনারা দার্শনিক, মন এবং আত্মা পৃথক্ বলিয়া মানেন। কিন্তু মন একটি পৃথক্, আত্মা একটি পৃথক্ পদার্থ, ইহা মানিতে পারি না। মনেরই ক্রিয়া দেখিতে পাই—ইচ্ছা, প্রবৃত্ত্যাদি আমার মনে। সুখ আমার মনে, দুঃখ আমার মনে। তবে আবার মনের অতিরিক্ত আত্মা, কেন মানিব ? যাহার ক্রিয়া দেখি, তাহাকেই মানিব। যাহার কোন চিহ্ন দেখি না, তাহাকে মানিব কেন ?

স। তবে বল না কেন, মন ও শরীর এক। শরীর ও মনের প্রভেদ কেন মানিব? যে কিছু কার্য্য করিতেছ, সকলই শরীরের কার্য্য—কোন্‌টি মনের কার্য্য?

আমি। চিন্তা প্রবৃত্তি ভোগাদি।

স। কিসে জানিলে, সে সকল শারীরিক ক্রিয়া নহে?

আমি। তাহাও সত্য বটে। মন শরীরের ক্রিয়া * মাত্র।

স। ভাল, ভাল। তবে আর একটু এসো। বল না কেন যে, শরীরও পঞ্চভূতের ক্রিয়ামাত্র? শুনিয়াছি, তোমরা পঞ্চ ভূত মান না—তোমরা বহুভূতবাদী, তাই হউক; বল না কেন যে, ক্ষিত্যাদি বা অন্য ভূতগণ, শরীররূপ ধারণ করিয়া সকলই করিতেছে? এই যে তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ—আমি বলি যে, কেবল ক্ষিত্যাদি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শব্দ করিতেছে, শচীন্দ্রনাথ নহে। মন ও শরীরাদির কল্পনার প্রয়োজন কি? ক্ষিত্যাদি ভিন্ন শচীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব মানি না।

হারিয়া, ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলাম। কিন্তু সেই অবধি সন্ন্যাসীর সঙ্গে একটু সম্প্রীতি হইল। সর্ব্বদা তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতাম; এবং শাস্ত্রীয় আলাপ করিতাম। দেখিলাম, সন্ন্যাসীর অনেক প্রকার ভণ্ডামি আছে। সন্ন্যাসী ঔষধ বিলায়, সন্ন্যাসী হাত দেখিয়া গণিয়া ভবিষ্যৎ বলে, সন্ন্যাসী যাগ হোমাদিও মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকে—নল চালে, চোর বলিয়া দেয়, আরও কত ভণ্ডামি করে। একদিন আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, "আপনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত; আপনার এ সকল ভণ্ডামি কেন?"

স। কোন্‌টা ভণ্ডামি?

আমি। এই নলচালা, হাতগণা প্রভৃতি।

স। কতকগুলা অনিশ্চিত বটে, কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্য।

আমি। যাহা অনিশ্চিত জানিতেছেন, তদ্দ্বারা লোককে প্রতারণা কেন করেন?

স। তোমরা মড়া কাট কেন?

আমি। শিক্ষার্থ।

স। যাহারা শিক্ষিত, তাহারা কাটে কেন?

আমি। তত্ত্বানুসন্ধান জন্য।

---

* Function of the brain.

স। আমরাও তত্ত্বানুসন্ধান জন্য এ সকল করিয়া থাকি। শুনিয়াছি, বিলাতী পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়। যদি মাথার গঠনে চরিত্র বলা যায়, তবে হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেন না বলা যাইবে? ইহা মানি যে, হাতের রেখা দেখিয়া, কেহ এ পর্য্যন্ত ঠিক বলিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার প্রকৃত সঙ্কেত অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে হাত দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে। এজন্য হাত পাইলেই দেখি।

আমি। আর নলচালা?

স। তোমরা লৌহের তারে পৃথিবীময় লিপি চালাইতে পার, আমরা কি নলটি চালাইতে পারি না? তোমাদের একটি ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে, যাহা ইংরেজেরা জানে, তাহাই সত্য, যাহা ইংরেজে জানে না, তাহা অসত্য, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে, আমি সব জানি—আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। কিছু ইংরেজে জানে, কিছু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজেরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন না; ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই। সেই সকল আর্য্যবিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে; আমরা কেহ কেহ দুই একটি বিদ্যা জানি। যত্নে গোপন রাখি—কাহাকেও শিখাই না।

আমি হাসিলাম। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস করিতেছ না? কিছু প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও?"

আমি বলিলাম, "দেখিলে বুঝিতে পারি।"

সন্ন্যাসী বলিল, "পশ্চাৎ দেখাইব। এক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ কথা আছে। আমার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া, তোমার পিতা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তোমাকে বিবাহে প্রবৃত্তি দিই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "প্রবৃত্তি দিতে হইবে না, আমি বিবাহে প্রস্তুত—কিন্তু—"

স। কিন্তু কি?

আমি। কন্যা কই? এক কাণা কন্যা আছে, তাহাকে বিবাহ করিব না।

স। এ বাঙ্গালাদেশে কি তোমার যোগ্যা কন্যা নাই?

আমি। হাজার হাজার আছে, কিন্তু বাছিয়া লইব কি প্রকারে ? এই শত সহস্র কন্যার মধ্যে কে আমাকে চিরকাল ভালবাসিবে, তাহা কি প্রকারে বুঝিব ?

স। আমার একটি বিদ্যা আছে। যদি পৃথিবীতে এমত কেহ থাকে যে, তোমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, তবে তাহাকে স্বপ্নে দেখাইতে পারি। কিন্তু যে তোমাকে এখন ভালবাসে না, ভবিষ্যতে বাসিতে পারে, তাহা আমার বিদ্যার অতীত।

আমি। এ বিদ্যা বড় আবশ্যক বিদ্যা নহে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে প্রায় প্রণয়শালী বলিয়া জানে।

স। কে বলিল ? অজ্ঞাত প্রণয়ই পৃথিবীতে অধিক। তোমাকে কেহ ভালবাসে ? তুমি কি তাহাকে জান ?

আমি। আত্মীয় স্বজন ভিন্ন কেহ যে আমাকে বিশেষ ভালবাসে, এমত জানি না।

স। তুমি আমাদের বিদ্যা কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেছিলে, আজ এইটি প্রত্যক্ষ কর।

আমি। ক্ষতি কি ?

স। তবে শয়নকালে আমাকে শয্যাগৃহে ডাকিও।

আমার শয্যাগৃহ বহির্ব্বাটীতে। আমি শয়নকালে সন্ন্যাসীকে ডাকাইলাম। সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। আমি শয়ন করিলে, তিনি বলিলেন, "যতক্ষণ আমি এখানে থাকিব, চক্ষু চাহিও না। আমি গেলে যদি জাগ্রত থাক, চাহিও।" সুতরাং আমি চক্ষু মুদিয়া রহিলাম—সন্ন্যাসী কি কৌশল করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী যাইবার পূর্ব্বেই আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম।

সন্ন্যাসী বলিয়াছিল, পৃথিবীমধ্যে যে নায়িকা আমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, অদ্য তাহাকেই আমি স্বপ্নে দেখিব। স্বপ্ন দেখিলাম বটে। কল কল গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকত-ভূমি ; তাহার প্রান্তভাগে অর্দ্ধজলমগ্না—কে ?

রজনী

—

পরদিন প্রভাতে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলে ?"

আমি। কাণা ফুলওয়ালী।

স। কাণা ?

আমি। জন্মান্ধ।

স। আশ্চর্য্য! কিন্তু যেই হউক, তাহার অধিক পৃথিবীতে আর কেহ তোমাকে ভালবাসে না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম।

চতুর্থ খণ্ড

সকলের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

বড় গোল বাধিল। আমি ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের হাতে পায়ে ধরিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, শচীন্দ্রকে রজনীর বশীভূত করিবার উপায় করিতেছি। সন্ন্যাসী তন্ত্রসিদ্ধ; জগদম্বার কৃপায় যাহা মনে করেন, তাই করিতে পারেন। মিত্র মহাশয় ষষ্টি বৎসর বয়সে যে, এ পামরীর এত বশীভূত, তাহা আমার গুণে, কি সন্ন্যাসী ঠাকুরের গুণে, তাহা বলিয়া উঠা ভার; আমিও কায়মনোবাক্যে পতিপদসেবার ত্রুটি করি না, ব্রহ্মচারীও আমার জন্য যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র প্রয়োগে ত্রুটি করেন না। যাহার জন্য যাহা তিনি করিয়াছেন, তাহা ফলিয়াছে। কামারবউর পিতলের টুক্‌নী সোণা করিয়া দিয়াছিলেন—উনি না পারেন কি? উঁহার মন্ত্রৌষধির গুণে শচীন্দ্র যে রজনীকে ভালবাসিবে—রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু তবু গোল বাধিয়াছে। গোলযোগ অমরনাথ বাধাইয়াছে। এখন শুনিতেছি, অমরনাথের সঙ্গেই রজনীর বিবাহ স্থির হইয়াছে।

রজনীর মাসী মাসুয়া, রাজচন্দ্র এবং তাহার স্ত্রী, আমাদিগের দিকে। তাহার কারণ, কর্ত্তা বলিয়াছেন, বিবাহ যদি হয়, তবে তোমাদিগকে ঘটকবিদায়স্বরূপ কিছু দিব। কথাটা ঘটকবিদায়, কিন্তু আঁচটা দু হাজার দশ হাজার। কিন্তু তাহারা আমাদিগের দিকে হইলেও কিছু হইতেছে না। অমরনাথ ছাড়িতেছে না। সে নিশ্চয় রজনীকে বিবাহ করিবে, জিদ করিতেছে।

ভাল, অমরনাথ কে? মেয়ের বিবাহ দিবার কর্ত্তা হইল, তাহার মাসুয়া মাসী,—বাপ মা বলাই উচিত—রাজচন্দ্র ও তাহার স্ত্রী, তাহারা যদি আমাদিগের দিকে, তবে অমরনাথের জিদে কি আসিয়া যায়? সে তাহাদিগকে বিষয় দেওয়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মেহনতানা দুই চারি হাজার ধরিয়া দিলেই হইবে। আমার ছেলের বৌ করিব বলিয়া আমি যে কন্যার সম্বন্ধ করিতেছি, অমরনাথ কি না তাহাকে বিবাহ করিতে চায়?

অমরনাথের এ বড় স্পর্দ্ধা! আমি একবার অমরনাথকে কিছু শিক্ষা দিয়াছি—আর একবার না হয় কিছু দিব। আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে অমরনাথের নিকট হইতে এই রজনীকে কাড়িয়া লইয়া, আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিব।

আমি অমরনাথের সকল গুণ জানি। অমরনাথ অত্যন্ত ধূর্ত্ত—তাহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বড় সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হয়। আমি সতর্ক হইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিলাম।

প্রথমে রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন গা ?—"

মালী বৌ—রাজচন্দ্রের স্ত্রীকে আমরা আজিও মালী বৌ বলিতাম, রাগ না হইলে বরং বলিতাম না, রাগ হইলেই মালী বৌ বলিতাম—মালী বৌ বলিল, "কি গা ?"

আমি। মেয়ের বিয়ে নাকি অমর বাবুর সঙ্গে দিবে ?

মালী বৌ। সেই কথাই ত এখন হচ্চে।

আমি। কেন হচ্চে ? আমাদের সঙ্গে কি কথা হইয়াছিল ?

মালী বৌ। কি করব মা—আমি মেয়ে মানুষ, অত কি জানি ?

মাগীর মোটা বুদ্ধি দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল—আমি বলিলাম, "সে কি মালী বৌ ? মেয়ে মানুষে জানে না ত কি পুরুষ মানুষে জানে ? পুরুষ মানুষ আবার সংসার ধর্ম্ম কুটুম্ব কুটুম্বিতার কি জানে ? পুরুষ মানুষ মাথায় মোট করিয়া টাকা বহিয়া আনিয়া দিবে এই পর্য্যন্ত—পুরুষ মানুষ আবার কর্ত্তা না কি ?"

বোধ হয়, মাগীর মোটাবুদ্ধিতে আমার কথাগুলা অসঙ্গত বোধ হইল—সে একটু হাসিল। আমি বলিলাম, "তোমার স্বামীর কি মত—অমরনাথের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেন ?"

মালী বৌ বলিল, "তার মত নয়—তবে অমরনাথ বাবু হইতেই রজনী বিষয় পাইয়াছে —তাঁর বাধ্য হইতেই হয়।"

আমি। তবে অমরনাথ বাবুকে বল গিয়া, বিষয় রজনী এখনও পায় নাই। বিষয় আমাদের ; বিষয় আমরা ছাড়িব না। পার, তোমরা বিষয় মোকদ্দমা করিয়া লও গিয়া।

মালী বৌ। সে কথা আগে বলিলেই হইত। এত দিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইত।

আমি। মোকদ্দমা করা মুখের কথা নহে। টাকার শ্রাদ্ধ। রাজচন্দ্র দাস ফুল বেচিয়া কত টাকা করিয়াছে ?

মালী বৌ রাগে গর গর করিতে লাগিল। সত্য বলিতেছি, আমার কিছুই রাগ হয় নাই। মালী বৌ একটু রাগ সামলাইয়া বলিল, "অমর বাবু আমার জামাই হইলেই বিষয়

অমর বাবুর হইবে। তিনি টাকা দিয়া মোকদ্দমা করিতে পারেন, তাঁহার এমন শক্তি আছে।"

এই বলিয়া মালী বৌ উঠিয়া যায়, আমি তাহার আঁচল ধরিয়া বসাইলাম। মালী বৌ হাসিয়া বসিল। আমি বলিলাম, "অমর বাবু মোকদ্দমা করিয়া বিষয় লইলে তোমার কি উপকার?"

মালী বৌ। আমার মেয়ের সুখ হবে।

আমি। আর আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হলে বুঝি বড় দুঃখ হবে?

মালী বৌ। তা কেন? তবে যেখানে থাকে, আমার মেয়ে সুখী হইলেই হইল।

আমি। তোমাদের নিজের কিছু সুখ চাহি না?

মালী বৌ। আমাদের আবার কি সুখ? মেয়ের সুখেই আমাদের সুখ।

আমি। ঘটকালীটা?

মালী বৌ মুখ মুচকিয়া হাসিল। বলিল, "আসল কথা বলিব মা ঠাকুরাণি? এখানে বিয়েয় মেয়ের মত নাই।"

আমি। সে কি? কি বলে?

মালী বৌ। এখানকার কথা হইলেই বলে, কাণার আবার বিয়েয় কাজ কি?

আমি। আর অমরনাথের সঙ্গে বিয়ের কথা হইলে?

মালী বৌ। বলে, ওঁ হতে আমাদের সব। উনি যা বলিবেন, তাই করিতে হইবে।

আমি। তা বিয়ের কন্যার আবার মতামত কি? মা বাপের মতামত হইলেই হইল।

মালী বৌ। রজনী ত ক্ষুদে মেয়ে নয়, আর আমার পেটের সন্তানও নয়। আর বিষয় তার, আমাদের নয়। সে আমাদের হাঁকাইয়া দিলে আমরা কি করিতে পারি? বরং তার মন রাখিয়াই আমাদের এখন চলিতে হইতেছে।

আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"রজনীর সঙ্গে অমরনাথের দেখা শুনা হয় কি?"

মালী বৌ। না। অমর বাবু দেখা করেন না।

আমি। আমার সঙ্গে রজনীর একবার দেখা হয় না কি?

মালী বৌ। আমারও তাই ইচ্ছা। আপনি যদি তাহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া তাহার মত করাইতে পারেন। আপনাকে রজনী বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

আমি। তা চেষ্টা করিয়া দেখিব। কিন্তু রজনীর দেখা পাই কি প্রকারে? কাল তাহাকে এ বাড়ীতে একবার পাঠাইয়া দিতে পার?

মালী বৌ। তার আটক কি? সে ত এই বাড়ীতেই খাইয়া মানুষ। কিন্তু যার বিয়ের সম্বন্ধ হইতেছে, তাহাকে কি শ্বশুরবাড়ীতে অমন অদিনে অক্ষণে বিয়ের আগে আসিতে আছে?

মর মাগী! আবার কাচ! কি করি, আমি অন্য উপায় না দেখিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, রজনী না আসিতে পারে, আমি একবার তোমাদের বাড়ী যাইতে পারি কি?"

মালী বৌ। সে কি! আমাদের কি এমন ভাগ্য হইবে যে, আপনার পায়ের ধূলা আমাদের বাড়ীতে পড়িবে?

আমি। কুটুম্বিতা হইলে আমার কেন, অনেকেরই পড়িবে। তুমি আমাকে আজ নিমন্ত্রণ করিয়া যাও।

মালী বৌ। তা আমাদের বাড়ীতে আপনাকে পাঠাইতে কর্ত্তার মত হইবে কেন?

আমি। পুরুষ মানুষের আবার মতামত কি? মেয়ে মানুষের যে মত, পুরুষ মানুষেরও সেই মত।

মালী বৌ যোড়হাত করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অমরনাথের কথা

রজনীর সম্পত্তির উদ্ধার জন্য আমার এত কষ্ট সফল হইয়াছে, মিত্রেরাও নির্ব্বিবাদে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছে, তথাপি বিষয়ে দখল লওয়া হয় নাই, ইহা শুনিয়া অনেকে চমৎকৃত হইতে পারেন। তাহাতে আমিও কিছু বিস্মিত। বিষয় আমার নহে, আমি দখল লইবার কেহ নহি। বিষয় রজনীর, সে দখল না লইলে কে কি করিতে পারে? কিন্তু রজনী কিছুতেই বিষয়ে দখল লইতে সম্মত নহে। বলে—আজ নহে—আর দুই দিন যাক—পশ্চাৎ দখল লইবেন ইত্যাদি। দখল না লউক—কিন্তু দরিদ্রকন্যার ঐশ্বর্য্যে এত অনাস্থা কেন, আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজচন্দ্র এবং রাজচন্দ্রের স্ত্রীও এ বিষয়ে রজনীকে অনুরোধ করিয়াছে, কিন্তু রজনী বিষয়ে সম্প্রতি দখল লইতে চায় না। ইহার মর্ম্ম কি? কাহার জন্য এত পরিশ্রম করিলাম?

ইহার যা হয়, একটা চূড়ান্ত স্থির করিবার জন্য আমি রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। রজনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা উত্থাপিত হওয়া অবধি আমি আর রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বড় যাইতাম না—কেন না, এখন আমাকে দেখিলে রজনী কিছু লজ্জিতা হইত। কিন্তু আজ না গেলে নয় বলিয়া রজনীর কাছে গেলাম। সে বাড়ীতে আমার অবারিত দ্বার। আমি রজনীর সন্ধানে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ফিরিয়া আসিতেছি, এমত সময়ে দেখিতে পাইলাম, রজনী আর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে উপরে উঠিতেছে। সে স্ত্রীলোককে দেখিয়াই চিনিলাম—অনেক দিন দেখি নাই, কিন্তু দেখিয়াই চিনিলাম যে, ঐ গজেন্দ্রগামিনী ললিতলবঙ্গলতা।

রজনী ইচ্ছাপূর্ব্বক জীর্ণ বস্ত্র পরিয়াছিল, লজ্জায় সে লবঙ্গলতার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেছিল না। লবঙ্গলতা হাসিতে উছলিয়া পড়িতেছিল—রাগ বা বিদ্বেষের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।

সে হাসি অনেক দিন শুনি নাই। সে হাসি তেমনই ছিল—পূর্ণিমার সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গের তুল্য, সপুষ্প বসন্তলতার আন্দোলন তুল্য—তাহা হইতে সুখ, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া, ঝরিয়া পড়িতেছিল।

আমি অবাক্ হইয়া নিস্পন্দশরীরে, সশঙ্কচিত্তে, এই বিচিত্রচরিত্রা রমণীর মানসিক শক্তির আলোচনা করিতেছিলাম। ললিতলবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না। লবঙ্গলতা মহান্ ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পড়িয়াছে—তবু সেই সুখময় হাসি; যে রজনী হইতে এই ঘোর বিপদ্ ঘটিয়াছে, তাহারই গৃহে উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে, তবু সেই সুখময় হাসি। আমি সম্মুখে—তবু সেই সুখময় হাসি। অথচ আমি জানি, লবঙ্গ কোন কথাই ভুলে নাই।

আমি সরিয়া পার্শ্বের ঘরে গেলাম। লবঙ্গলতা প্রথমে সেই ঘরে প্রবেশ করিল—নিঃশঙ্কচিত্তে, আজ্ঞাদায়িনী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় রজনীকে বলিল, "রজনি—তুই এখন আর কোথাও যা। তোর বরের সঙ্গে আমার গোপনে কিছু কথা আছে। ভয় নাই। তোর বর সুন্দর হলেও আমার বৃদ্ধ স্বামীর অপেক্ষা সুন্দর নহে।" রজনী অপ্রতিভ হইয়া, কি ভাবিতে ভাবিতে সরিয়া গেল।

ললিতলবঙ্গলতা ভ্রূকুটি কুটিল করিয়া, সেই মধুর হাসি হাসিয়া, ইন্দ্রাণীর মত আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। একবার বৈ কেহ অমরনাথকে আত্মবিস্মৃত দেখে নাই। আবার আত্মবিস্মৃত হইলাম। সে বারও ললিতলবঙ্গলতা—এবারও ললিতলবঙ্গলতা।

লবঙ্গ হাসিয়া বলিল, "আমার মুখপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ? তোমার অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি কি না? মনে করিলে তাহা পারি।"

আমি বলিলাম, "তুমি সব পার, কিন্তু ঐটি পার না। পারিলে কখন রজনীকে বিষয় দিয়া, এখন স্বহস্তে রাঁধিয়া সতীনকে খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে না।"

লবঙ্গ উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "ওটা বুঝি বড় গায়ে লাগিবে মনে করেছ? সতীনকে রাঁধিয়া দিতে হয়, বড় দুঃখের কথা বটে; কিন্তু একটা পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিলে, এখনই আবার পাঁচটা রাঁধুনী রাখিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "বিষয় রজনীর; আমাকে ধরাইয়া দিলে কি হইবে? যাহার বিষয়, সে ভোগ করিতে থাকিবে।"

লবঙ্গ। তুমি কস্মিন্ কালে স্ত্রীলোক চিনিলে না। যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে রক্ষার জন্য রজনী এখনই বিষয় ছাড়িয়া দিবে।

আমি। অর্থাৎ আমার রক্ষার জন্য বিষয়টা তোমায় ঘুষ দিবে।

লবঙ্গ। তাই।

আমি। তবে এতদিন সে ঘুষ চাও নাই, আমাদিগের বিবাহ হয় নাই বলিয়া। বিবাহ হইলেই সে ঘুষ চাহিবে।

লবঙ্গ। তোমার মত ছোটলোকে বুঝিবে কি প্রকারে? চোরেরা বুঝিতে পারে না যে, পরের দ্রব্য অস্পৃশ্য। রজনীর সম্পত্তি রাখিতে পারিলেও আমি রাখিব কেন?

আমি বলিলাম, "তুমি যদি এমন না হবে, তবে আমার সে মরণকুবুদ্ধি ঘটিবে কেন? যদি আমার এত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছ, এত অনুগ্রহ করিয়াছ, তবে আর একটি ভিক্ষা আছে। যাহা জান, তাহা যদি অন্যের কাছে না বলিয়াছ, তবে রজনীর কাছেও বলিও না।"

দর্পিতা লবঙ্গলতা ভ্রূভঙ্গী করিল—কি সুন্দর ভ্রূভঙ্গী! বলিল, "আমি কি ঠক! যে তোমার স্ত্রী হইবে, তাহার কাছে তোমার নামে ঠকাম করিবার জন্য কি আমি তাহার বাড়ীতে আসিয়াছি?"

এই বলিয়া লবঙ্গলতা হাসিল। তাহার হাসির মর্ম্ম আমি কিছু কখন বুঝিতে পারি না। লবঙ্গ বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু হাসিতে সব রাগ ভাসিয়া গেল। যেন জলের উপর হইতে মেঘের ছায়া সরিয়া গেল, তাহার উপর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। আমি লবঙ্গলতার মর্ম্ম কখন বুঝিতে পারিলাম না।

হাসিয়া লবঙ্গ বলিল, "তবে আমি রজনীর কাছে যাই।"

"যাও।"

ললিতলবঙ্গলতা, ললিত লবঙ্গলতার মত দুলিতে দুলিতে চলিল। ক্ষণেক পরে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। গিয়া দেখিলাম, লবঙ্গলতা দাঁড়াইয়া আছে। রজনী তাহার পায়ে হাত দিয়া কাঁদিতেছে। আমি গেলে লবঙ্গলতা বলিল, "শুন, তোমার ভবিষ্যৎ ভার্য্যা কি বলিতেছে। তোমার সম্মুখে নহিলে এমন কথা আমি কাণে শুনিব না।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি?"

লবঙ্গলতা রজনীকে বলিল, "বল। তোমার বর আসিয়াছেন—"

রজনী সকাতরে অশ্রুপূর্ণলোচনে ললিতলবঙ্গলতার চরণস্পর্শ করিয়া বলিল, "আমার এই ভিক্ষা, আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, এই বাবুর যত্নে আমার যে সম্পত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, আমি লেখাপড়া করিয়া আপনাকে দান করিব, আপনি গ্রহণ করিবেন না কি?"

আহ্লাদে আমার সর্ব্বান্তঃকরণ প্লাবিত হইল—আমি রজনীর জন্য যে যত্ন করিয়াছিলাম—যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলাম—তাহা সার্থক বোধ হইল। আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, এখন আরও পরিষ্কার বুঝিলাম যে, রমণীকুলে, অন্ধ রজনী অদ্বিতীয় রত্ন! লবঙ্গলতার প্রোজ্জ্বল জ্যোতিও তাহার কাছে ম্লান হইল। আমি ইতিপূর্ব্বেই রজনীর অন্ধ নয়নে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—আজি তাহার কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত হইলাম। এই অমূল্য রত্নে আমার অন্ধকারপুরী প্রভাসিত করিয়া, এ জীবন সুখে কাটাইব। বিধাতা আমার কি সে দিন করিবেন না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

আমি মনে করিয়াছিলাম, রজনীর এই বিস্ময়কর কথা শুনিয়া, অমরনাথ আগুনে সেঁকা কলাপাতের মত শুকাইয়া উঠিবে। কই, তাহা ত কিছু দেখিলাম না। তাহার মুখ না শুকাইয়া বরং প্রফুল্ল হইল। বিস্মিত হতবুদ্ধি, যা হইবার, তাহা আমিই হইলাম।

আমি প্রথমে তামাসা মনে করিলাম, কিন্তু রজনীর কাতরতা, অশ্রুপাত এবং দার্ঢ্য দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিল যে, রজনী আন্তরিক বলিতেছে। আমি বলিলাম, "রজনী! কায়েতের কুলে তুমিই ধন্য! তোমার মত কেহ নাই। কিন্তু আমি তোমার দান গ্রহণ করিব না।"

রজনী বলিল, "না গ্রহণ করেন, আমি ইহা বিলাইয়া দিব।"

আমি। অমরনাথ বাবুকে?

রজনী। আপনি উঁহাকে সবিশেষ চিনেন না; আমি দিলেও উনি লইবেন না। লইবার অন্য লোক আছে।

আমি। অমরনাথ বাবু কি বল?

অমর। আমার সঙ্গে কোন কথা হইতেছে না, আমি কি বলিব?

আমি বড় ফাঁপরে পড়িলাম; রজনী যে বিষয় ছাড়িয়া দিতেছে, তাহাতে বিস্মিত; আবার অমরনাথ যে বিষয় উদ্ধারের জন্য এত করিয়াছিল, যাহার লোভে রজনীকে বিবাহ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে, সে বিষয় হাতছাড়া হইতেছে, দেখিয়াও সে প্রফুল্ল। কাণ্ডখানা কি?

আমি অমরনাথকে বলিলাম যে, যদি স্থানান্তরে যাও, তবে আমি রজনীর সঙ্গে সকল কথা মুখ ফুটিয়া কই। অমরনাথ অমনি সরিয়া গেল। আমি তখন রজনীকে বলিলাম, "সত্য সত্যই কি তুমি বিষয় বিলাইয়া দিবে?"

"সত্য সত্যই। আমি গঙ্গাজল নিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি।"

আমি। আমি তোমার দান লই, তুমি যদি আমার কিছু দান লও।

রজনী। অনেক লইয়াছি।

আমি। আরও কিছু লইতে হইবে।

রজনী। একখানি প্রসাদি কাপড় দিবেন।

আমি। তা না। আমি যা দিই, তাই নিতে হইবে।

রজনী। কি দিবেন?

আমি। শচীন্দ্র বলিয়া আমার একটি পুত্র আছে। আমি তোমাকে শচীন্দ্র দান করিব। স্বামিস্বরূপ তুমি তাহাকে গ্রহণ করিবে। তুমি যদি তাহাকে গ্রহণ কর, তবেই আমি তোমার বিষয় গ্রহণ করিব।

রজনী দাঁড়াইয়াছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া, অন্ধ নয়ন মুদিল। তার পর তাহার মুদিত নয়ন হইতে অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল—চক্ষের জল আর ফুরায় না। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। রজনী কথা কহে না—কেবল কাঁদে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রজনি! অত কাঁদ কেন?"

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সে দিন গঙ্গার জলে আমি ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলাম—ডুবিয়াছিলাম, লোকে ধরিয়া তুলিল। সে শচীন্দ্রের জন্য। তুমি যদি বলিতে, তুমি অন্ধ, তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব—আমি তাহা চাহিতাম না—আমি শচীন্দ্র চাহিতাম। শচীন্দ্রের অপেক্ষা এ জগতে আর কিছুই নাই—আমার প্রাণ তাঁহার কাছে, দেবতার কাছে ফুলের কলিমাত্র—শ্রীচরণে স্থান পাইলেই সার্থক। অন্ধের দুঃখের কথা শুনিবে কি?"

আমি রজনীর কাতরতা দেখিয়া কাতর হইয়া বলিলাম, "শুনিব।"

তখন রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে, হৃদয় খুলিয়া, আমার কাছে সকল কথা বলিল। শচীন্দ্রের কণ্ঠ, শচীন্দ্রের স্পর্শ, অন্ধের রূপোন্মাদ! তাহার পলায়ন, নিমজ্জন, উদ্ধার, সকল বলিল। বলিয়া বলিল, "ঠাকুরাণি, তোমাদের চক্ষু আছে—চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি?"

মনে মনে বলিলাম, "কাণি! তুই ভালবাসার কি জানিস্! তুমি লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।" প্রকাশ্যে বলিলাম, "না, রজনি, আমার বুড়া স্বামী—আমি অত শত জানি না। তুমি শচীন্দ্রকে তবে বিবাহ করিবে, ইহা স্থির?"

রজনী বলিল, "না।"

আমি। সে কি? তবে এত কথা কি বলিতেছিলে—এত কাঁদিলে কেন?

রজনী। আমার সে সুখ কপালে নাই বলিয়াই এত কাঁদিলাম।

আমি। সে কি? আমি বিবাহ দিব।

রজনী। দিতে পারিবেন না। অমরনাথ হইতে আমার সর্ব্বস্ব। অমরনাথ আমার বিষয় উদ্ধারের জন্য যাহা করিয়াছেন, পরের জন্য পরে কি তত করে? তাও ধরি না, তিনি আপনার প্রাণ দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

রজনী সে বৃত্তান্ত বলিল। পরে কহিল, "যাঁহার কাছে আমি এত ঋণী, তিনি আমার যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তিনি যখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দাসী করিতে চাহিয়াছেন, তখন আমি তাঁহারই দাসী হইব, আর কাহারও নহে।"

হরি! হরি! কেন বাছাকে সন্ন্যাসী দিয়া ঔষধ করিলাম। বিবাহ ব্যতীতও বিষয় থাকে—রজনী ত এখনই বিষয় দিতে চাহিতেছে। কিন্তু ছি! রজনীর দান লইব? ভিক্ষা মাগিয়া খাইব—সেও ভাল। আমি বলিয়াছি—আমি যদি এই বিবাহ না দিই ত আমি কায়েতের মেয়ে নই। আমি এ বিবাহ দিবই দিব। আমি রজনীকে বলিলাম, "তবে আমি তোমার দান লইব না। তুমি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দান করিও।" আমি উঠিলাম।

রজনী বলিল, "আর একবার বসুন। আমি অমরনাথ বাবুর দ্বারা একবার অনুরোধ করাইব। তাঁহাকে ডাকিতেছি।"

অমরনাথের সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ আমারও ইচ্ছা। আমি আবার বসিলাম। রজনী অমরনাথকে ডাকিল।

অমরনাথ আসিলে, আমি রজনীকে বলিলাম, "অমরনাথ বাবু এ বিষয়ে যদি অনুরোধ করিতে চাহেন, তবে সকল কথা কি তোমার সাক্ষাতে খুলিয়া বলিতে পারিবেন? আপনার প্রশংসা আপনি দাঁড়াইয়া শুনিও না।"

রজনী সরিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

আমি অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি রজনীকে বিবাহ করিবে?"

অ। করিব—স্থির।

আমি। এখনও স্থির? রজনীর বিষয় ত রজনী আমাকে দিতেছে।

অ। আমি রজনীকে বিবাহ করিব—বিষয় বিবাহ করিব না।

আমি। বিষয়ের জন্যই ত রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে?

অ। স্ত্রীলোকের মন এমনই কদর্য্য।

আমি। আমাদের উপর এত অভক্তি কত দিন?

অ। অভক্তি নাই—তাহা হইলে বিবাহ করিতে চাহিতাম না।

আমি। কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া অন্ধ কন্যাতে এত অনুরাগ কেন? তাই বিষয়ের কথা বলিতেছিলাম।

অম। তুমি বৃদ্ধতে এত অনুরক্ত কেন? বিষয়ের জন্য কি?

আমি। কাহারও সাক্ষাতে তাহার স্বামীকে বুড়া বলিতে নাই। আমার সঙ্গে রাগারাগি কেন? তুমি কি মুখরা স্ত্রীলোকের মুখকে ভয় কর না?

(কিন্তু রাগারাগি আমার আন্তরিক বাসনা।)

অমরনাথ বলিল, "ভয় করি বই কি? রাগের কথা কিছু বলি নাই। তুমি যেমন মিত্রজাকে ভালবাস, আমিও রজনীকে তেমনি ভালবাসি।"

আমি। কটাক্ষের গুণে নাকি ?

অম। না। কটাক্ষ নাই বলিয়া। তুমিও কাণা হইলে আরও সুন্দর হইতে।

আমি। সে কথা মিত্রজাকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে নহে। সম্প্রতি তুমিও যেমন রজনীকে ভালবাস, আমিও রজনীকে তেমনি ভালবাসি।

অম। তুমিও রজনীকে বিবাহ করিতে চাও নাকি ?

আমি। প্রায়। আমি নিজে তাহাকে বিবাহ না করি, তাহার ভাল বিবাহ দিতে চাই। তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে দিব না।

অম। আমি সুপাত্র। রজনীর এরূপ আর জুটিতেছে না।

আমি। তুমি কুপাত্র। আমি সুপাত্র জোটাইয়া দিব।

অম। আমি কুপাত্র কিসে ?

আমি। কামিজটা খুলিয়া পিঠ বাহির কর দেখি ?

অমরনাথের মুখ শুকাইয়া কালো হইয়া গেল। অতি দুঃখিতভাবে বলিল, "ছি। লবঙ্গ !"

আমার দুঃখ হইল, কিন্তু দুঃখ দেখিয়া ভুলিলাম না। বলিলাম, "একটি গল্প বলিব শুনিবে ?"

আমি কথা চাপা দিতেছি মনে করিয়া অমরনাথ বলিল, "শুনিব।"

আমি তখন বলিতে লাগিলাম, "প্রথম যৌবনকালে লোকে আমাকে রূপবতী বলিত—"

অ। এটা যদি-গল্প, তবে সত্য কোন্ কথা ?

আমি। পরে শোন। সেই রূপ দেখিয়া এক চোর মুগ্ধ হইয়া, আমার পিত্রালয়ে, যে ঘরে আমি এক পরিচারিকা সঙ্গে শয়ন করিয়াছিলাম, সেই ঘরে সিঁধ দিল।

এই কথা বলিতে আরম্ভ করায়, অমরনাথ গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। বলিল, "ক্ষমা কর।"

আমি বলিতে লাগিলাম, "সেই চোর সিঁধপথে আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—আমি চোরকে চিনিলাম। ভীতা হইয়া পরিচারিকাকে উঠাইলাম। সে চোরকে চিনিত না। আমি তখন অভীতা, চোরকে আদর করিয়া আশ্বস্ত করিয়া পালঙ্কে বসাইলাম।"

অমর। ক্ষমা কর, সে ত সকলই জানি।

আমি। তবু একবার স্মরণ করিয়া দেওয়া ভাল। ক্ষণেক পরে, চোরের অলক্ষ্যে আমার সঙ্কেতানুসারে পরিচারিকা বাহিরে গিয়া দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া লইয়া সিঁধমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও সময় বুঝিয়া, বাহিরে প্রয়োজন ছলনা করিয়া নির্গত হইয়া, বাহির হইতে একমাত্র দ্বারের শৃঙ্খল বদ্ধ করিলাম। মন্দ করিয়াছিলাম?

অমরনাথ বলিল, "এ সকল কথা কেন?"

আমি। পরে চোর নির্গত হইল কি প্রকারে বল দেখি? ডাকিয়া পাড়ার লোক জমা করিলাম। বড় বড় বলবান্ আসিয়া চোরকে ধরিল। চোর লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া রহিল। আমি দয়া করিয়া তাহার মুখের কাপড় খুলাইলাম না, কিন্তু স্বহস্তে লোহার শলা তপ্ত করিয়া তাহার পিঠে লিখিয়াছিলাম,

"চোর!"

অমরবাবু, অতি গ্রীষ্মেও কি আপনি গায়ের জামা খুলিয়া শয়ন করেন না?

অ। না।

আমি। লবঙ্গলতার হস্তাক্ষর মুছিবার নহে। আমি রজনীকে ডাকিয়া এই গল্প শুনাইয়া যাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনাইব না। তুমি রজনীর যোগ্য নহ, রজনীকে বিবাহ করিতে চেষ্টা পাইও না। যদি ক্ষান্ত না হও, তবে সুতরাং শুনাইতে বাধ্য হইব।

অমরনাথ কিছুক্ষণ ভাবিল। পরে দুঃখিতভাবে বলিল, "শুনাইতে হয় শুনাইও। তুমি শুনাও বা না শুনাও, আমি স্বয়ং আজি তাহাকে সকল শুনাইব। আমার দোষ গুণ সকল শুনিয়া রজনী আমাকে গ্রহণ করিতে হয়, গ্রহণ করিবে; না করিতে হয়, না করিবে। আমি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিব না।"

আমি হারিয়া, মনে মনে অমরনাথকে শত শত ধন্যবাদ করিতে করিতে, হর্ষবিষাদে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শচীন্দ্রনাথের কথা

ঐশ্বর্য্য হারাইয়া, কিছু দিন পরে আমি পীড়িত হইলাম। ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পতনের আশঙ্কায় মনে কোন বিকার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, কি কিজন্য এই পীড়ার উৎপত্তি, তাহা আমি বলিবার কোন চেষ্টা পাইব না। কেবল পীড়ার লক্ষণ বলিব।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রৌদ্রের তাপ অপনীত হইলে পর, প্রাসাদের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলাম। সমস্ত দিবস অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। জগতের দুরূহ গূঢ় তত্ত্বসকলের আলোচনা করিতেছিলাম। কিছুরই মর্ম্ম বুঝিতে পারি না, কিন্তু কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায় না। যত পড়ি, তত পড়িতে সাধ করে। শেষ শ্রান্তি বোধ হইল। পুস্তক বন্ধ করিয়া হস্তে লইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটু নিদ্রা আসিল—অথচ নিদ্রা নহে। সে মোহ, নিদ্রার ন্যায় সুখকর বা তৃপ্তিজনক নহে। ক্লান্ত হস্ত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল। চক্ষু চাহিয়া আছি—বাহ্য বস্তু সকলই দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু কি দেখিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। অকস্মাৎ সেইখানে প্রভাতবীচিবিক্ষেপচপলা কলকলনাদিনী নদী বিস্তৃতা দেখিলাম—যেন তথা উষার উজ্জ্বল বর্ণে পূর্ব্বদিক্ প্রভাসিত হইতেছে—দেখি, সেই গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতমূলে রজনী! রজনী জলে নামিতেছে। ধীরে, ধীরে, ধীরে! অন্ধ! অথচ কুঞ্চিত ভ্রূ; বিকলা, অথচ স্থিরা; সেই প্রভাতশান্তিশীতলা ভাগীরথীর ন্যায় গম্ভীরা, ধীরা, সেই ভাগীরথীর ন্যায় অন্তরে দুর্জ্জয় বেগশালিনী! ধীরে, ধীরে, ধীরে,—জলে নামিতেছে। দেখিলাম, কি সুন্দর! রজনী কি সুন্দরী! বৃক্ষ হইতে নবমুঞ্জরীর সুগন্ধের ন্যায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের ন্যায়, রজনী জলে, ধীরে—ধীরে—ধীরে নামিতেছে! ধীরে রজনি! ধীরে! আমি দেখি তোমায়। তখন অনাদর করিয়া দেখি নাই, এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। ধীরে রজনি, ধীরে!

আমার মূর্চ্ছা হইল। মূর্চ্ছার লক্ষণ সকল আমি অবগত নহি। যাহা পশ্চাৎ শুনিয়াছি, তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। আমি যখন পুনর্ব্বার চেতনাপ্রাপ্ত হইলাম, তখন রাত্রিকাল—আমার নিকট অনেক লোক। কিন্তু আমি সে সকল কিছুই দেখিলাম না। আমি দেখিলাম—কেবল সেই মৃদুনাদিনী গঙ্গা, আর সেই মৃদুগামিনী রজনী, ধীরে ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। চক্ষু মুদিলাম, তবু দেখিলাম সেই গঙ্গা, আর সেই রজনী। আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! দিগন্তরে চাহিলাম—আবার সেই রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। ঊর্দ্ধে চাহিলাম—ঊর্দ্ধেও আকাশবিহারিণী গঙ্গা ধীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে; আর আকাশবিহারিণী রজনী ধীরে, ধীরে, ধীরে নামিতেছে। অন্য দিকে মন ফিরাইলাম; তথাপি সেই গঙ্গা আর সেই রজনী। আমি নিরস্ত হইলাম। চিকিৎসকেরা আমার চিকিৎসা করিতে লাগিল।

অনেক দিন ধরিয়া আমার এই চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু আমার নয়নাগ্র হইতে রজনীরূপ তিলেক জন্য অন্তর্হিত হইল না। আমি জানি না, আমার কি রোগ বলিয়া

চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করিতেছিল। আমার নয়নাগ্রে যে রূপ অহরহঃ নাচিতেছিল, তাহার কথা কাহাকেও বলি নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শচীন্দ্রের কথা

ওহে ধীরে, রজনি ধীরে! ধীরে, ধীরে, আমার এই হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ কর! এত দ্রুতগামিনী কেন? তুমি অন্ধ, পথ চেন না, ধীরে, রজনি ধীরে! ক্ষুদ্রা এই পুরী, আঁধার, আঁধার, আঁধার! চিরান্ধকার! দীপশলাকার ন্যায় ইহাতে প্রবেশ করিয়া আলো কর;—দীপশলাকার ন্যায় আপনি পুড়িবে, কিন্তু এ আঁধার পুরী আলো করিবে।

ওহে ধীরে, রজনি ধীরে। এ পুরী আলো কর, কিন্তু দাহ কর কেন? কে জানে যে, শীতল প্রস্তরেও দাহ করিবে—তোমায় ত পাষাণগঠিতা, পাষাণময়ী জানিতাম, কে জানে যে, পাষাণেও দাহ করিবে? অথবা কে জানে, পাষাণেও লৌহের সংঘর্ষণেই অগ্নু্যৎপাত হয়। তোমার প্রস্তরধবল, প্রস্তরস্নিগ্ধদর্শন, প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্ত্তি যত দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। অনুদিন, পলকে পলকে, দেখিয়াও মনে হয়, দেখিলাম কই? আবার দেখি। আবার দেখি, কিন্তু দেখিয়া ত সাধ মিটিল না।

পীড়িতাবস্থায় আমি প্রায় কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম না। কেহ কথা কহিতে আসিলে ভাল লাগিত না। রজনীর কথা মুখে আনিতাম না—কিন্তু প্রলাপকালে কি বলিতাম না বলিতাম, তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। প্রলাপ সচরাচরই ঘটিত।

শয্যা প্রায় ত্যাগ করিতাম না। শুইয়া শুইয়া কত কি দেখিতাম, তাহা বলিতে পারি না। কখন দেখিতাম, সমরক্ষেত্রে যবনদিপাত হইতেছে—রক্তে নদী বহিতেছে; কখন দেখিতাম, সুবর্ণপ্রান্তরে হীরকবৃক্ষে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র ফুটিয়া আছে। কখন দেখিতাম, আকাশমার্গে, অষ্টশশিসমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ চতুশ্চন্দ্রবাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেগে পতিত হইল—গ্রহ উপগ্রহ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আঘাতোৎপন্ন বহ্নিতে সে সকল জ্বলিয়া উঠিয়া, দহ্যমানাবস্থাতে মহাবেগে বিশ্বমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কখন দেখিতাম, এই জগৎ, জ্যোতির্ম্ময় কান্তরূপধর দেবযোনির মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ; তাহারা অবিরত অম্বরপথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে; তাহাদিগের অঙ্গের সৌরভে আমার নাসারন্ধ্র

পরিপূর্ণ হইতেছে। কিন্তু যাহাই দেখি না—সকলের মধ্যস্থলে—রজনীর সেই প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। হায় রজনি! পাথরে এত আগুন!

ধীরে, রজনি, ধীরে! ধীরে, ধীরে, রজনি, ঐ অন্ধ নয়ন উন্মীলিত কর। দেখ, আমায় দেখ, আমি তোমায় দেখি! ঐ দেখিতেছি—তোমার নয়নপদ্ম ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে—ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, নয়নরাজীব ফুটিতেছে! এ সংসারে কাহার না নয়ন আছে? গো, মেষ, কুক্কুর, মার্জ্জার, ইহাদিগেরও নয়ন আছে—তোমার নাই? নাই, নাই, তবে আমারও নাই! আমিও আর চক্ষু চাহিব না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

আমি জানিতাম, শচীন্দ্র একটা কাণ্ড করিবে—ছেলে বয়সে অত ভাবিতে আছে? দিদি ত একবার ফিরে চেয়েও দেখেন না—আমি বলিলে বিমাতা বলিয়া আমার কথা গ্রাহ্য করে না। ও সব ছেলেকে আঁটিয়া উঠা ভার। এখন দায় দেখিতেছি আমার। ডাক্তার বৈদ্য কিছু করিতে পারিল না—পারিবেও না। তারা রোগই নির্ণয় করিতে জানে না। রোগ হলো মনে—হাত দেখিলে, চোখ দেখিলে, জিব দেখিলে তারা কি বুঝিবে? যদি তারা আমার মত আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া আড়ি পেতে ছেলের কাণ্ড দেখ্‌ত, তবে একদিন রোগের ঠিকানা করিলে করিতে পারিত।

কথাটা কি? "ধীরে, রজনি!" ছেলে ত একেলা থাকিলেই এই কথাই বলে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের ঔষধে কি এই ফল ফলিল? আমার মাথা খাইতে কেন আমি এমন কাজ করিলাম? ভাল, রজনীকে একবার রোগীর কাছে বসাইয়া রাখিলে হয় না? কই, আমি রজনীর বাড়ী গিয়াছিলাম, সে ত সেই অবধি আমার বাড়ী একবারও আসে নাই! ডাকিয়া পাঠাইলে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া আমি রজনীর গৃহে লোক পাঠাইলাম—বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার আসিতে বলিও।

মনে করিলাম, আগে একবার শচীন্দ্রের কাছে রজনীর কথা পাড়িয়া দেখি। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের পীড়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি না?

অতএব প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য শচীন্দ্রের কাছে গিয়া বসিলাম। এ কথা ও কথার পর রজনীর প্রসঙ্গ ছলে পাড়িলাম। আর কেহ সেখানে ছিল না। রজনীর নাম শুনিবামাত্র বাছা অমনি, চমকিত হংসীর ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া আমার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল। আমি যত রজনীর কথা বলিতে লাগিলাম, শচীন্দ্র কিছুই উত্তর করিল না, কিন্তু ব্যাকুলিত চক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। ছেলে বড় অস্থির হইয়া উঠিল—এটা পাড়ে, সেটা ভাঙ্গে, এইরূপ আরম্ভ করিল। আমি পরিশেষে রজনীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম; সে অত্যন্ত ধনলুব্ধা, আমাদিগের পূর্ব্বকৃত উপকার কিছুমাত্র স্মরণ করিল না। এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া শচীন্দ্র অপ্রসন্ন ভাবাপন্ন হইলেন, এমন আমার বোধ হইল, কিন্তু কথায় কিছু প্রকাশ পাইল না।

নিশ্চয় বুঝিলাম, এটি সন্ন্যাসীর কীর্ত্তি। তিনি এক্ষণে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, অল্পদিনে আসিবার কথা ছিল। তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাও মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, তিনিই বা কি করিবেন? আমি নির্ব্বোধ দুরাকাঙ্ক্ষাপরবশ স্ত্রীলোক—ধনের লোভে অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া আপনিই এই বিপত্তি উপস্থিত করিয়াছি! তখন মনে জানিতাম যে, রজনীকে নিশ্চয়ই পুত্রবধূ করিব। তখন কে জানে যে, কাণা ফুলওয়ালীও দুর্লভ হইবে? কে জানে যে, সন্ন্যাসীর মন্ত্রৌষধে হিতে বিপরীত হইবে? স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র, তাহা জানিতাম না; আপনার বুদ্ধির অহঙ্কারে আপনি মজিলাম। আমার এমন বুদ্ধি হইবার আগে, আমি মরিলাম না কেন? এখন ইচ্ছা হইতেছে মরি, কিন্তু শচীন্দ্রবাবুর আরোগ্য না দেখিয়া মরিতে পারিতেছি না।

কিছু দিন পরে কোথা হইতে সেই পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তিনি শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন। কে তাঁহাকে শচীন্দ্রের পীড়ার সংবাদ দিল, তাহা কিছু বলিলেন না।

শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিলেন। পরে শচীন্দ্রের কাছে বসিয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রণাম করিবার জন্য আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। প্রণাম করিয়া, মঙ্গল জিজ্ঞাসার পর বলিলাম, "মহাশয় সর্ব্বজ্ঞ; না জানেন, এমন তত্ত্বই নাই। শচীন্দ্রের কি রোগ, আপনি অবশ্য জানেন।"

তিনি বলিলেন, "উহা বায়ুরোগ। অতি দুশ্চিকিৎস্য।"

আমি বলিলাম, "তবে শচীন্দ্র সর্ব্বদা রজনীর নাম করে কেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বালিকা, বুঝিবে কি?" (কি সর্ব্বনাশ, আমি বালিকা। আমি শচীর মা!) "এই রোগের এক গতি এই যে, হৃদয়স্থ লুক্কায়িত এবং অপরিচিত ভাব

বা প্রবৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠে। শচীন্দ্র কদাচিৎ আমাদিগের দৈববিদ্যা সকলের পরীক্ষার্থী হইলে, আমি কোন তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিলাম, তাহাতে যে তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসে, তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন। শচীন্দ্র রাত্রিযোগে রজনীকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে আমাদিগকে ভালবাসে বুঝিতে পারি, আমরা তাহার প্রতি অনুরক্ত হই। অতএব সেই রাত্রে শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল। কিন্তু রজনী অন্ধ, এবং ইতর লোকের কন্যা, ইত্যাদি কারণে সে অনুরাগ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। অনুরাগের লক্ষণ স্বহৃদয়ে কিছু দেখিতে পাইলেও শচীন্দ্র তৎপ্রতি বিশ্বাস করেন নাই। ক্রমে ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখের আশঙ্কা তোমাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা শচীন্দ্রই তাহাতে গুরুতর ব্যথা পাইলেন। অন্যমনে, দারিদ্র্যদুঃখ ভুলিবার জন্য শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন। অনন্যমনা হইয়া বিদ্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই বিদ্যালোচনার আধিক্য হেতু, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহাতেই এই মানসিক রোগের সৃষ্টি। সেই মানসিক রোগকে অবলম্বন করিয়া রজনীর প্রতি সেই বিলুপ্তপ্রায় অনুরাগ পুনঃপ্রস্ফুটিত হইল। এখন আর শচীন্দ্রের সে মানসিক শক্তি ছিল না যে, তদ্দ্বারা তিনি সেই অবিহিত অনুরাগকে প্রশমিত করেন। বিশেষ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল মানসিক পীড়ার কারণ যে যে গুপ্ত মানসিক ভাব বিকশিত হয়, তাহা অপ্রকৃত হইয়া উঠে। তখন তাহা বিকারের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। শচীন্দ্রের সেইরূপ এ বিকার।"

আমি তখন কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "ইহার প্রতীকারের কি উপায় হইবে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছুই জানি না। ডাক্তারদিগের দ্বারা এ রোগ উপশম হইতে পারে কি না, তাহা বিশেষ বলিতে পারি না। কিন্তু ডাক্তারেরা কখন এ সকল রোগের প্রতীকার করিয়াছেন, এমন আমি শুনি নাই।"

আমি বলিলাম যে, "অনেক ডাক্তার দেখান হইয়াছে, কোন উপকার হয় নাই।"

স। সচরাচর বৈদ্যচিকিৎসকের দ্বারাও কোনও উপকার হইবে না।

আমি। তবে কি কোন উপায় নাই?

স। যদি বল, তবে আমি ঔষধ দিই।

আমি। আপনার ঔষধের অপেক্ষা কাহার ঔষধ? আপনিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। আপনিই ঔষধ দিন।

স। তুমি বাড়ীর গৃহিণী। তুমি বলিলেই ঔষধ দিতে পারি। শচীন্দ্রও তোমার বাধ্য। তুমি বলিলেই সে আমার ঔষধ সেবন করিবে। কিন্তু কেবল ঔষধে আরোগ্য হইবে না। মানসিক পীড়ার মানসিক চিকিৎসা চাই। রজনীকে চাই।

আমি। রজনী আসিবে। ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।

স। কিন্তু রজনীর আগমনে ভাল হইবে, কি মন্দ হইবে, তাহাও বিবেচ্য। এমত হইতে পারে যে, রজনীর প্রতি এই অপ্রকৃত অনুরাগ, রুগ্নাবস্থায় দেখা সাক্ষাৎ হইলে বদ্ধমূল হইয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে। যদি রজনীর সঙ্গে বিবাহ না হয়, তবে রজনীর না আসাই ভাল।

আমি। রজনীর আসা ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহা বিচার করিবার আর সময় নাই। ঐ দেখুন, রজনী আসিতেছে।

সেই সময়ে একজন পরিচারিকা সঙ্গে রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরনাথও শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া স্বয়ং শচীন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। এবং রজনীকে সঙ্গে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। আপনি বহির্ব্বাটীতে থাকিয়া, পরিচারিকার সঙ্গে তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

পঞ্চম খণ্ড

অমরনাথের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই অন্ধ পুষ্পনারী কি মোহিনী জানে, তাহা বলিতে পারি না। চক্ষে কটাক্ষ নাই, অথচ আমার মত সন্ন্যাসীকেও মোহিত করিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, লবঙ্গলতার পর আর কখন কাহাকে ভাল বাসিব না। মনুষ্যের সকলই অনর্থক দম্ভ! অন্য দূরে থাক, সহজেই এই অন্ধ পুষ্পনারী কর্তৃক মোহিত হইলাম।

মনে করিয়াছিলাম—এ জীবন অমাবস্যার রাত্রির স্বরূপ—অন্ধকারেই কাটিবে—সহসা চন্দ্রোদয় হইল! মনে করিয়াছিলাম—এ জীবনসিন্ধু সাঁতারিয়াই আমাকে পার হইতে হইবে—সহসা সম্মুখে সুবর্ণসেতু দেখিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এ মরুভূমি চিরকাল এমনই দগ্ধক্ষেত্র থাকিবে, রজনী সহসা সেখানে নন্দনকানন আনিয়া বসাইল! আমার এ সুখের আর সীমা নাই। চিরকাল যে অন্ধকার গুহামধ্যে বাস করিয়াছে, সহসা সে যদি এই সূর্য্যকিরণসমুজ্জল তরুপল্লবকুসুমসুশোভিত মনুষ্যলোকে স্থাপিত হয়, তাহার যে আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! যে চিরকাল পরাধীন পরপীড়িত দাসানুদাস ছিল, সে যদি হঠাৎ সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম হয়, তাহার যে আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! রজনীর মত যে জন্মান্ধ, হঠাৎ তাহার চক্ষু ফুটিলে যে আনন্দ, রজনীকে ভাল বাসিয়া আমার সেই আনন্দ!

কিন্তু এ আনন্দে পরিণামে কি হইবে, তাহা বলিতে পারি না। আমি চোর! আমার পিঠে, আগুনের অক্ষরে লেখা আছে যে, আমি চোর! যে দিন রজনী সেই অক্ষরে হাত দিয়া, জিজ্ঞাসা করিবে, এ কিসের দাগ—আমি তাহাকে কি বলিব! বলিব কি যে, ও কিছু নহে? সে অন্ধ, কিছু জানিতে পারিবে না। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি সংসারে সুখী হইতে চাহিতেছি—তাহাকে আবার প্রতারণা করিব! যে পারে, সে করুক, আমি যখন পারিয়াছি, তখন ইহার অপেক্ষাও গুরুতর দুষ্কার্য্য করিয়াছি—করিয়া ফলভোগ করিয়াছি—আর কেন? আমি লবঙ্গলতার কাছে বলিয়াছিলাম, সকল কথা রজনীকে বলিব, কিন্তু বলিতে মুখ ফুটে নাই। এখন বলিব।

যে দিন রজনী শচীন্দ্রকে দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই দিন অপরাহ্নে আমি রজনীকে এই কথা বলিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম যে, রজনী একা বসিয়া কাঁদিতেছে। আমি তখন তাহাকে কিছু না বলিয়া, রজনীর মাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রজনী কাঁদিতেছে কেন? তাহার মাসী বলিল যে, কি জানি? মিত্রদিগের বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি রজনী কাঁদিতেছে। আমি স্বয়ং শচীন্দ্রের নিকট যাই নাই—আমার প্রতি শচীন্দ্র বিরক্ত, যদি আমাকে দেখিয়া তাহার পীড়াবৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় যাই নাই—সুতরাং সেখানে কি হইয়াছিল, তাহা জানিতাম না। রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন কাঁদিতেছ?" রজনী চক্ষু মুছিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আমি বড় কাতর হইলাম। বলিলাম, "দেখ রজনি, তোমার যাহা কিছু দুঃখ, তাহা জানিতে পারিলে আমি প্রাণপাত করিয়া তাহা নিবারণ করিব—তুমি কি দুঃখে কাঁদিতেছ, আমায় বলিবে না?"

রজনী আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বহু কষ্টে আবার রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, "আপনি এত অনুগ্রহ করেন, কিন্তু আমি তাহার যোগ্য নহি।"

আমি। সে কি রজনি? আমি মনে জানি, আমিই তোমার যোগ্য নহি। আমি তোমাকে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

রজনী। আমি আপনার অনুগৃহীত দাসী, আমাকে অমন কথা কেন বলেন?

আমি। শুন রজনি। আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া, ইহজন্ম সুখে কাটাইব, এই আমার একান্ত ভরসা। এ আশা আমার ভগ্ন হইলে, বুঝি আমি মরিব। কিন্তু সে আশাতেও যে বিঘ্ন, তাহা তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। শুনিয়া উত্তর দিও, না শুনিয়া উত্তর দিও না। প্রথমযৌবনে একদিন আমি রূপান্ধ হইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলাম—জ্ঞান হারাইয়া চোরের কাজ করিয়াছিলাম। অঙ্গে আজিও তাহার চিহ্ন আছে। সেই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।

তখন ধীরে ধীরে, নিতান্ত ধৈর্য্যমাত্র সহায় করিয়া, সেই অকথনীয়া কথা রজনীকে বলিলাম। রজনী অন্ধ, তাই বলিতে পারিলাম। চক্ষে চক্ষে সন্দর্শন হইলে বলিতে পারিতাম না।

রজনী নীরব হইয়া রহিল। আমি তখন বলিলাম, "রজনি! রূপোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া প্রথমযৌবনে একদিন এই অজ্ঞানের কার্য্য করিয়াছিলাম। আর কখন কোন অপরাধ করি নাই। চিরজীবন সেই একদিনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। আমাকে কি তুমি গ্রহণ করিবে?"

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনি যদি চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকেন—আপনি যদি সহস্র ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনি আমার কাছে দেবতা। আপনি আমাকে চরণে স্থান দিলেই আমি আপনার দাসী হইব। কিন্তু আমি আপনার যোগ্য নহি। সেই কথাটি আপনার শুনিতে বাকি আছে।"

আমি। সে কি রজনি ?

রজনী। আমার এই পাপ মন পরের কাছে বিক্রীত।

আমি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি রজনি ?"

রজনী বলিল, "আমি স্ত্রীলোক—আপনার কাছে ইহার অধিক আর কি প্রকারে বলিব ? কিন্তু লবঙ্গ ঠাকুরাণী সকল জানেন। যদি আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে সকল শুনিতে পাইবেন। বলিবেন, আমি সকল কথা বলিতে বলিয়াছি।"

আমি তখনই মিত্রদিগের গৃহে গেলাম। যে প্রকারে লবঙ্গের সাক্ষাৎ পাইলাম, তাহা লিখিয়া ক্ষুদ্র বিষয়ে কালক্ষেপ করিব না। দেখিলাম, লবঙ্গলতা ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া শচীন্দ্রের জন্য কাঁদিতেছে। যাইবামাত্র লবঙ্গলতা আমার পা জড়াইয়া আরও কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "ক্ষমা কর ! অমরনাথ, ক্ষমা কর ! তোমার উপর আমি এত অত্যাচার করিয়াছিলাম বলিয়া বিধাতা আমাকে দণ্ডিত করিতেছেন। আমার গর্ভজ পুত্রের অধিক প্রিয় পুত্র শচীন্দ্র বুঝি আমারই দোষে প্রাণ হারায় ! আমি বিষ খাইয়া মরিব ! আজি তোমার সম্মুখে বিষ খাইয়া মরিব।"

আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। রজনী কাঁদিতেছে, লবঙ্গ কাঁদিতেছে। ইহারা স্ত্রীলোক, চক্ষের জল ফেলে ; আমার চক্ষের জল পড়িতেছিল না—কিন্তু রজনীর কথায় আমার হৃদয়ের ভিতর হইতে রোদনধ্বনি উঠিতেছিল। লবঙ্গ কাঁদিতেছে, রজনী কাঁদিতেছে, আমি কাঁদিতেছি—আর শচীন্দ্রের এই দশা ! কে বলে সংসার সুখের ? সংসার অন্ধকার !

আপনার দুঃখ রাখিয়া আগে লবঙ্গের দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। লবঙ্গ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত সমুদয় বলিল। সন্ন্যাসীর বিদ্যাপরীক্ষা হইতে রুগ্নশয্যায় রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত লবঙ্গ সকল বলিল।

তার পর রজনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, "রজনী সকল কথা বলিতে বলিয়াছে—বল।" লবঙ্গ তখন, রজনীর কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, অকপটে সকল বলিল।

রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর ; মাঝখানে আমি কে ?

এবার বস্ত্রে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ ভবের হাট হইতে আমার দোকানপাঠ উঠাইতে হইল। আমার অদৃষ্টে সুখ বিধাতা লিখেন নাই—পরের সুখ কাড়িয়া লইব কেন? শচীন্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙ্গিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব—যিনি সুখদুঃখের অতীত, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।

প্রভো, তোমায় অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি? দর্শনে বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটিতোন্মুখ হৃদ্‌পদ্মই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি অন্ধ পুষ্পনারীকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার ছায়া সেখানে স্থাপন করি।

তুমি নাই? না থাক, তোমার নামে আমি সকল উৎসর্গ করিব। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তস্মৈ নমঃ বলিয়া এ কলঙ্কলাঞ্ছিত দেহ উৎসর্গ করিব। তুমি যাহা দিয়াছ, তুমি কি তাহা লইবে না? তুমি লইবে, নহিলে এ কলঙ্কের ভার আর কে পবিত্র করিবে?

প্রভো! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ দেহ কলঙ্কিত করাইল কে, তুমি, না আমি? আমি যে অসৎ অসার, দোষ আমার, না তোমার? আমার এ মনিহারির দোকান সাজাইল কে, তুমি, না আমি? যাহা তুমি সাজাইয়াছ, তাহা তোমাকেই দিব। আমি এ ব্যবসা আর রাখিব না।

সুখ! তোমাকে সর্ব্বত্র খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই—তবে আশায় কাজ কি? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে?

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জ্জন দিব।

আমি পরদিন শচীন্দ্রকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্র অধিকতর স্থির—অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল। তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, আমার উপর যে বিরক্তি, শচীন্দ্রের মন হইতে তাহা যায় নাই।

পরদিন পুনরপি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। প্রত্যহই তাঁহাকে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। শচীন্দ্রের দুর্ব্বলতা ও ক্লিষ্টভাব কমিল না, কিন্তু ক্রমে স্থৈর্য্য জন্মিতে লাগিল। প্রলাপ দূর হইল। ক্রমে শচীন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন।

রজনীর কথা একদিনও শচীন্দ্রের মুখে শুনি নাই। কিন্তু ইহা দেখিয়াছি যে, যে দিন হইতে রজনী আসিয়াছিল, সেই দিন হইতে তাঁহার পীড়া উপশমিত হইয়া আসিতেছিল।

একদিন, যখন আর কেহ শচীন্দ্রের কাছে ছিল না, তখন আমি ধীরে ধীরে বিনা আড়ম্বরে রজনীর কথা পাড়িলাম। ক্রমে তাহার অন্ধতার কথা পাড়িলাম, অন্ধের দুঃখের কথা বলিতে লাগিলাম, এই জগৎসংসারশোভা দর্শনে সে যে বঞ্চিত,—প্রিয়জনদর্শনসুখে সে যে আজন্মমৃত্যুপর্য্যন্ত বঞ্চিত, এই সকল কথা তাঁহার সাক্ষাতে বলিতে লাগিলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্র মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল।

অনুরাগ বটে।

তখন বলিলাম, "আপনি রজনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি সেই জন্যই একটি কথার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে চাই। রজনী একে বিধাতাকর্তৃক পীড়িতা, আবার আমাকর্তৃক আরও গুরুতর পীড়িতা হইয়াছে।"

শচীন্দ্র আমার প্রতি বিকট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি যদি সমুদয় মনোযোগপূর্ব্বক শুনেন, তবেই আমি বলিতে প্রবৃত্ত হই।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "বলুন।"

আমি বলিলাম, "আমি অত্যন্ত লোভী এবং স্বার্থপর। আমি তাহার চরিত্রে মোহিত হইয়া, তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। সে আমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিল, সেই জন্য আমার অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়াছে।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "মহাশয়, এ সকল কথা আমাকে বলিতেছেন কেন?"

আমি বলিলাম, "আমি ভাবিয়া দেখিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াই; অন্ধ রজনী কি প্রকারে আমার সঙ্গে দেশে দেশে বেড়াইবে? আমি এখন ভাবিতেছি, অন্য কোন ভদ্রলোক তাহাকে বিবাহ করে, তবে সুখের হয়। আমি তাহাকে অন্য পাত্রস্থ করিতে চাই। যদি কেহ আপনার সন্ধানে থাকে, সেই জন্য আপনাকে এত কথা বলিতেছি।"

শচীন্দ্র একটু বেগের সহিত বলিলেন, "রজনীর পাত্রের অভাব নাই।"

আমি বুঝিলাম, রজনীর বরপাত্র কে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন আবার মিত্রদিগের আলয়ে গিয়া দেখা দিলাম। লবঙ্গলতাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইব। এক্ষণে সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিব না—তিনি আমার শিষ্যা, আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিব।

লবঙ্গলতা আমার সহিত পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কালি যাহা শচীন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি?"

ল। শুনিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয়। আমাকে ক্ষমা করিও; আমি তোমার গুণ জানিতাম না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। তখন অবসর পাইয়া লবঙ্গলতা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছ কেন? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?"

অ। যাইব।

ল। কেন?

অ। যাইব না কেন? আমাকে যাইতে বারণ করিবার ত কেহ নাই।

ল। যদি আমি বারণ করি?

অ। আমি তোমার কে যে বারণ করিবে?

ল। তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

লবঙ্গলতা আর কিছু বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, "যদি লোকান্তর থাকে, তবে?"

লবঙ্গলতা বলিল, "আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।"

আমি বড় বিচলিত হইলাম, বলিলাম, "আমি সে কথায় বিশ্বাস করি। কিন্তু একটি কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে আমার গায়ে চিরদিনের জন্য এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন? এ যে মুছিলে যায় না—কখন মুছিলে যাইবে না।"

লবঙ্গ অধোবদনে রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল, "তুমি কুকাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকাবুদ্ধিতেই কুকাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড, বিধাতা তাহার বিচার

করিবেন,—আমি বিচারের কে ? এখন সে অনুতাপ আমার—কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে ?"

আমি। তুমি না বলিতেই আমি ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই বা কি ? উচিত দণ্ড করিয়াছিলে—তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না—আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু যদি তুমি কখন ইহার পরে শোন যে, অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অণুমাত্র—স্নেহ করিবে ?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

আমি। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই ?

ল। না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।

আবার "ইহলোকে।" যাক—আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কি না, বলিতে পারি না ; কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না। কিন্তু দেখিলাম, লবঙ্গ ঈষৎ কাঁদিতেছে।

আমি বলিলাম, "আমার যাহা বলিবার অবশিষ্ট আছে, তাহা বলিয়া যাই। আমার কিছু ভূসম্পত্তি আছে, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। তাহা আমি দান করিয়া যাইতেছি।"

ল। কাহাকে ?

আমি। যে রজনীকে বিবাহ করিবে, তাহাকে।

ল। তোমার সমুদায় স্থাবর সম্পত্তি ?

আমি। হাঁ। তুমি এই দানপত্র এক্ষণে তোমার কাছে অতি গোপনে রাখিবে। যতদিন না রজনীর বিবাহ হয়, ততদিন ইহার কথা প্রকাশ করিও না। বিবাহ হইয়া গেলে, রজনীর স্বামীকে দানপত্র দিও।

এই কথা বলিয়া, ললিতলবঙ্গলতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, দানপত্র আমি তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলাম। আমি সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম—আমি আর বাড়ী গেলাম না। একবারে ষ্টেসনে গিয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে কাশ্মীর যাত্রা করিলাম।

দোকানপাঠ উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইহার দুই বৎসর পরে, একদা ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ভবানীনগর গেলাম। শুনিলাম যে, মিত্রবংশীয় কেহ তথায় আসিয়া বাস করিতেছেন। কৌতূহলপ্রযুক্ত আমি দেখিতে গেলাম। দ্বারদেশে শচীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

শচীন্দ্র আমাকে চিনিতে পারিয়া, নমস্কার আলিঙ্গনপূর্ব্বক আমার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া উত্তমাসনে বসাইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, তিনি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু রজনী ফুলওয়ালী ছিল, পাছে কলিকাতায় ইহাতে লোকে ঘৃণা করে, এই ভাবিয়া, তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানীনগরে বাস করিতেছেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন।

আমার নিজসম্পত্তি প্রতিগ্রহণ করিবার জন্য শচীন্দ্র আমারে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না। শেষে শচীন্দ্র রজনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমারও সে ইচ্ছা ছিল। শচীন্দ্র আমাকে অন্তঃপুরে রজনীর নিকটে লইয়া গেলেন।

রজনীর নিকট গেলে, সে আমাকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিল। আমি দেখিলাম যে, ধূলিগ্রহণকালে, পাদস্পর্শ জন্য, অন্ধগণের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সে ইতস্ততঃ হস্তসঞ্চালন করিল না, এককালেই আমার পাদস্পর্শ করিল। কিছু বিস্মিত হইলাম।

সে আমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মুখ অবনত করিয়া রহিল। আমার বিস্ময় বাড়িল। অন্ধদিগের লজ্জা চক্ষুর্গত নহে। চক্ষে চক্ষে মিলনজনিত যে লজ্জা, তাহা তাহাদিগের ঘটিতে পারে না বলিয়া, তাহারা দৃষ্টি লুকাইবার জন্য মুখ নত করে না। একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, রজনী মুখ তুলিয়া আবার নত করিল, দেখিলাম—নিশ্চিত দেখিলাম—সে চক্ষে কটাক্ষ!

জন্মান্ধ রজনী কি এখন তবে দেখিতে পায়? আমি শচীন্দ্রকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে শচীন্দ্র আমাকে বসিবার আসন দিবার জন্য রজনীকে আজ্ঞা করিলেন। রজনী একখানা কার্পেট লইয়া পাতিতেছিল—যেখানে পাতিতেছিল, সেখানে অল্প একবিন্দু জল পড়িয়াছিল; রজনী আসন রাখিয়া, অগ্রে অঞ্চলের দ্বারা জল

মুছিয়া লইয়া আসন পাতিল। আমি বিলক্ষণ দেখিয়াছিলাম যে, রজনী সেই জল স্পর্শ না করিয়াই আসন পাতা বন্ধ করিয়া জল মুছিয়া লইয়াছিল। অতএব স্পর্শের দ্বারা কখনই সে জানিতে পারে নাই যে, সেখানে জল আছে। অবশ্য সে জল দেখিতে পাইয়াছিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনি, এখন তুমি কি দেখিতে পাও?"

রজনী মুখ নত করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ।"

আমি বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিলাম। শচীন্দ্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় না হইতে পারে, এমন কি আছে? আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসাসম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল—সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বহুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসাবিদ্যায় কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু সে সকল এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল দুই একজন সন্ন্যাসী উদাসীন প্রভৃতির কাছে সে সকল লুপ্তবিদ্যার কিয়দংশ অতি গুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী কখন কখন যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভালবাসিতেন। তিনি যখন শুনিলেন, আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, 'শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে? কন্যা যে অন্ধ।' আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, 'আপনি অন্ধত্ব আরোগ্য করুন।' তিনি বলিলেন, 'করিব—এক মাসে।' ঔষধ দিয়া, তিনি এক মাসে রজনীর চক্ষে দৃষ্টির সৃজন করিলেন।"

আমি আরও বিস্মিত হইলাম; বলিলাম, "না দেখিলে, আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে ইহা অসাধ্য।"

এই কথা হইতেছিল, এমত সময়ে এক বৎসরের একটি শিশু, টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু আসিয়া, রজনীর পায়ের কাছে দুই একটা আছাড় খাইয়া, তাহার বস্ত্রের একাংশ ধৃত করিয়া টানাটানি করিয়া উঠিয়া, রজনীর আঁটু ধরিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া, উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার পরে, ক্ষণেক আমার মুখপানে চাহিয়া, হস্তোত্তোলন করিয়া আমাকে বলিল, "দা!" (যা!)

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে এটি?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "আমার ছেলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার নাম কি রাখিয়াছেন?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "অমরপ্রসাদ।"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

সমাপ্তঃ

'রজনী'র প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠভেদ

'রজনী' ১২৮৪ বঙ্গাব্দে (১৮৭৭) প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শন' (১২৮১-৮২) হইতে পুনর্মুদ্রণের সময় ইহাতে এত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল যে, "ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে।" পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১২২। দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১২১) ১২৮৭ বঙ্গাব্দে (১৮৮১) প্রকাশিত হয়। তৃতীয় অর্থাৎ গ্রন্থকারের জীবিতকালের শেষ সংস্করণ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬২।

'রজনী'র প্রথম সংস্করণ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে এক খণ্ড আছে বটে ; কিন্তু তাহার ১-২ ও ৯-১০ পৃষ্ঠা নাই। অন্য কপি সংগ্রহ করা যায় নাই, সুতরাং পরিষদের কপি হইতেই পাঠভেদ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। চারিটি পৃষ্ঠার অভাবহেতু এই পাঠভেদ অসম্পূর্ণ। কাহারও নিকট সম্পূর্ণ প্রথম সংস্করণ থাকিলে পরে পাঠভেদ সম্পূর্ণ হইতে পারে।

পৃষ্ঠা ৬, পংক্তি ৬, "আমি এখন বলিব না।" স্থলে "আমি বলিব না।" ছিল।
৭, "পুরুষই" স্থলে "পুরুষ" ছিল।
১৩, "অতি উঁচু" স্থলে "অত্যুচ্চ" ছিল।
১৮, "সে" স্থলে "সেও" ছিল।
২৪, "কিছুতেই" স্থলে "কিছুতে" ছিল।

পৃ. ৯, পংক্তি ৭, "উভয়তঃ।" স্থলে "দুজনেই।" ছিল।

পৃ. ১২, পংক্তি ২, "এইরূপে" স্থলে "এরূপে" ছিল।
২১, "অন্ধকারেও" স্থলে "অন্ধকারে" ছিল।
২৫, "কবিত্ব" স্থলে "সুখস্বপ্ন" ছিল।

পৃ. ২২, পংক্তি ৪, "এই" স্থলে "এ" ছিল।

পৃ. ২৪, পংক্তি ২১, "ডুবিয়া মরিব।" ইহার পর ১ম সংস্করণে নিম্নোক্ত অংশ অধিক ছিল—

কাতর হইয়া বলিলাম, "বাবু আমার কি উপায় করিবে না? আমাকে কি এইখানে মরিতে হইবে?"

হীরালাল বলিল, "আমাকে আজই বিবাহ কর।" কাতরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি অন্ধ ভার্য্যা লইয়া কি করিবে?"

হীরালাল বলিল, "বাবুদিগের টাকাগুলি গণিয়া লইব। তার পরে, তোমায় পরিত্যাগ করিব। তখন তুমি অন্যকে ভজনা করিতে পারিবে; আমি কিছু বলিব না।"

আর সহ্য হইল না।

পৃ. ২৫, পংক্তি ২৪, "বুঝিবে?" স্থলে "বুঝে?" ছিল।

পৃ. ২৬, পংক্তি ২২, "গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে" স্থলে "গঙ্গাতরঙ্গমধ্যে" ছিল।

পৃ. ২৮, পংক্তি ৪, "লিখিবার" স্থলে "লিখিয়া রাখিবার" ছিল।

পৃ. ২৯, পংক্তি ১৫, "সে সৌন্দর্য্য" স্থলে "যে সৌন্দর্য্য" ছিল।

২৭, "ছিল না; অদৃষ্টদোষে" স্থলে "ছিল না; কিন্তু অদৃষ্টদোষে" ছিল।

পৃ. ৩২, পংক্তি ১১, "মনুষ্যই" স্থলে "মনুষ্য" ছিল।

২১, "মূর্খ স্থূলবুদ্ধির" স্থলে "মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধির" ছিল।

পৃ. ৩৫, পংক্তি ২১, "ভবানীনগর গ্রামে।" স্থলে "ভবানীনগর নামক গ্রামে।" ছিল।

পৃ. ৩৭, পংক্তি ১০, "সম্বাদ" স্থলে "সন্ধান" ছিল।

পৃ. ৩৮, পংক্তি ২০, "সেই" স্থলে "সে" ছিল।

পৃ. ৪২, পংক্তি ১১, "অলঙ্কারের কথা কিছু" স্থলে "অলঙ্কারের কিছু" ছিল।

২০, "বালাচুরি" স্থলে "বালাচুরির" ছিল।

পৃ. ৪৩, পংক্তি ৪, "চরিত্রের" স্থলে "চরিতের" ছিল।

১৮, "জানিলাম যে," স্থলে "জানিলাম," ছিল।

পৃ. ৪৪, পংক্তি ২৩, "বিশিষ্ট" স্থলে "বিশিষ্টা" ছিল।

পৃ. ৪৫, পংক্তি ২৩, "বিয়ানের" স্থলে "বিহাইনের" ছিল।

পৃ. ৪৬, পংক্তি ৭, "সূচীর" স্থলে "সূচিকার" ছিল।

পৃ. ৪৭, পংক্তি ৫, "দেখাইয়া" স্থলে "দেখিয়া" ছিল।

পৃ. ৪৮, পংক্তি ৪, "রাজচন্দ্রের" স্থলে "সে রাজচন্দ্রের" ছিল।

পৃ. ৪৯, পংক্তি ৬, "হরেকৃষ্ণ" স্থলে "হরেকৃষ্ণের" ছিল।

১২, "লোক" স্থলে "লোকে" ছিল।

পৃ. ৫০, পংক্তি ২১, "অলঙ্কার" স্থলে "অলঙ্কারাদি" ছিল।

পৃ. ৫৫, পংক্তি ৬, "আমাদিগের" স্থলে "আমাদের" ছিল।

১৭, "স্তোত্র" স্থলে "বেদমন্ত্র" ছিল।

পৃ. ৫৮, পংক্তি ১৬, "আর্য্যবিদ্যা" স্থলে "আর্যবিদ্যা" ছিল।

পৃ. ৫৯, পংক্তি ১০, "এমত জানি না।" স্থলে "এমত আমি জানি না।" ছিল।

পৃ. ৬১, পংক্তি ৯, "সেবার" স্থলে "সেবায়" ছিল।

পৃ. ৬৪, পংক্তি ৬, "আমি" শব্দটি ছিল না।

২৪, "আমি" স্থলে "তাহা আমি" ছিল।

পৃ. ৬৫, পংক্তি ২৬, "মধুর" স্থলে "মধুময়" ছিল।

পৃ. ৬৭, পংক্তি ২৩, "করিলাম" স্থলে "করিতাম" ছিল।

পৃ. ৬৮, পংক্তি ৫, ১ম সংস্করণে "বাবু" কথাটি নাই।

পৃ. ৬৯, পংক্তি ১৮, "পারিবেন না।" স্থলে "পারিবে না।" ছিল।

পৃ. ৭২, পংক্তি ৯, "লিখিয়াছিলাম," স্থলে "লিখিয়া দিলাম" ছিল।

পৃ. ৭৩, পংক্তি ২৭, "এই" কথাটি ১ম সংস্করণে নাই।

পৃ. ৭৪, পংক্তি ১, "চিকিৎসকেরা চিকিৎসা" স্থলে "চিকিৎসকেরা কি চিকিৎসা" ছিল।

৪, "শচীন্দ্রের" স্থলে "শচীন্দ্রনাথের" ছিল।

১১, "অথবা কে জানে," স্থলে "অথবা কে না জানে," এবং "পাষাণেও" স্থলে "পাষাণ ও" ছিল।

পৃ. ৭৪ পংক্তি ১২, "যত" স্থলে "যতই" ছিল।

১৬, "প্রলাপকালে" স্থলে "প্রলাপকালীন" ছিল।

১৭, "প্রলাপ" স্থলে "প্রলাপোক্তি" ছিল।

পৃ. ৭৬, পংক্তি ৮, "প্রকাশ পাইল না।" ইহার পর ১ম সংস্করণে নিম্নোক্ত অংশ অধিক ছিল—

শচীন্দ্র সে কথা ঢাকিয়া প্রসঙ্গান্তর উত্থাপিত করিলেন।

পৃ. ৭৬ পংক্তি ১৪, "যে," কথাটি ১ম সংস্করণে নাই।

পৃ. ৭৭, পংক্তি ২, "কোন" হইতে "তাহাতে" পর্য্যন্ত অংশ, ১ম সংস্করণে এইরূপ ছিল—

এক বীজমন্ত্রান্বিত যন্ত্র লিখিয়া তাঁহার উপাধানতলে রাখিয়া দিলাম, বলিয়া দিলাম যে,

পৃ. ৭৭, পংক্তি ২২, "এমন" স্থলে "এমত" ছিল।

পৃ. ৭৮, পংক্তি ৫, "এমত" স্থলে "এমন" ছিল।

পৃ. ৮৫, পংক্তি ২, "আমার" স্থলে "আমাকে" ছিল।

১৪, "কাঁদিতেছে।" স্থলে "কাঁপিতেছে।" ছিল।

পৃ. ৮৭, পংক্তি ১৫, "অন্ধত্ব" স্থলে "অন্ধত্বের" ছিল।

বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ
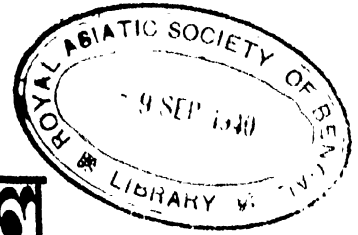
কৃষ্ণকান্তের উইল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, অপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্মথমোহন বসু কর্তৃক
প্রকাশিত

চৈত্র, ১৩৫০

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্তৃক
মুদ্রিত

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্পগুলিকে কোনও কোনও সমালোচক তিনটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করিয়াছেন ; প্রথম স্তরে, 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' ; তৃতীয় স্তরে, 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' ; বাকী সবগুলি গল্প ও উপন্যাস দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত। এই স্তরের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' ও শেষ উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। অবশ্য 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরেও দ্বিতীয় স্তরে তাঁহার "ক্ষুদ্র কথা" 'রাজসিংহ' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের 'রাজসিংহ'কে উপন্যাসের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ৮৩ পৃষ্ঠার এই চটি গল্পের বইটি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ সংস্করণে বর্ত্তমান রূপ (৪৩৪ পৃষ্ঠা) গ্রহণ করে। বস্তুতঃ অধুনাপ্রচলিত 'রাজসিংহ'কে নানা কারণে তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত।

দ্বিতীয় স্তরের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র (১৮৭৮) প্রকৃতিগত সাদৃশ্য খুব ঘনিষ্ঠ। শেষোক্ত উপন্যাসে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী সর্ব্বাপেক্ষা পরিণতি লাভ করিয়াছে। অনেকের মতে নিছক রসরচনা-হিসাবে এইটিই তাঁহার শেষ ও শ্রেষ্ঠ বই। কোনও কোনও সমসাময়িক লেখক এমনও সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করিতেন।

রসবিচার আমাদের ভূমিকার উদ্দেশ্য নহে, আমরা ভূমিকায় পুস্তক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি মাত্রই লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর পুস্তক পুস্তিকা এবং সাময়িক পত্রে ইহা লইয়া এত অধিক আলোচনা হইয়াছে যে, সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে বিরাট একটি গ্রন্থ হইতে পারে। রোহিণীর অপঘাত-মৃত্যু লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বহুবার জবাবদিহি করিতে হইয়াছে। উত্যক্ত হইয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন—

> …অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"রোহিণীকে মারিলেন কেন?" অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, "আমার ঘাট হইয়াছে।" কাব্যগ্রন্থ, মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।
>
> —'বঙ্গদর্শন,' মাঘ ১২৮৩, পৃ. [illegible]

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর (সেপ্টেম্বর ?) মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বারাসত হইতে অস্থায়ী-ভাবে মালদহে রোড-সেসের কাজে যান। অসুস্থতাবশতঃ সেখান হইতে ছুটি লইয়া (১৮৭৫, ২৪ জুন) তিনি কাঁটালপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। এই অবসরকালেই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা আরম্ভ হয়। এই সময়েই উহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ, 'বঙ্গদর্শনে' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১২৮২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ফাল্গুনে নবম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত বাহির হইয়া উহা বন্ধ হইয়াছে দেখিতে পাই। চৈত্র মাসে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কোনও পরিচ্ছেদ বাহির হয় নাই এবং চৈত্র মাসেই বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' "বিদায় গ্রহণ" করিয়াছে। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে 'বঙ্গদর্শন' পুনরায় সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বাহির হয়; 'কৃষ্ণকান্তের উইল'ও দশম পরিচ্ছেদ হইতে ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতে থাকে। ঐ বৎসরের মাঘ মাসে ৪৬ পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্ট, মোট ৪৭ পরিচ্ছেদে উপন্যাস সম্পূর্ণ হয়

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (১২৮৫, ভাদ্র) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৭০। দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭১) ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এবং চতুর্থ বা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে শেষ সংস্করণ (পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯৬) ১৮৯২ সালে বাহির হয়। আখ্যাপত্রহীন তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়াছি। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৭২। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কোনও সংস্করণেই কোনও "ভূমিকা" বা "বিজ্ঞাপন" ছিল না।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী ও গোবিন্দলাল চরিত্র পরবর্ত্তী-কালে পুস্তক-প্রকাশের সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের ক্রমোন্নতি আছে। 'বঙ্গদর্শনে'র রোহিণী দুশ্চরিত্রা, লোভী। প্রথম সংস্করণের রোহিণী প্রায় তাই, দুশ্চরিত্রতা ও লোভ একটু কম দেখানো হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে রোহিণী আশ্চর্য্য রকম বদলাইয়া গিয়াছে; চরিত্রে সংযম ও দৃঢ়তা নাই বটে, কিন্তু দুশ্চরিত্রা নয়, লোভী মোটেই নয়। শেষ পর্য্যন্ত রোহিণী তাহাই আছে। গোবিন্দলালের চরিত্র 'বঙ্গদর্শন' এবং প্রথম তিন সংস্করণের পুস্তকে প্রায় অনুরূপই আছে। চতুর্থ সংস্করণে পরিণাম-বদলে চরিত্রও পূর্ব্বাপর বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেকার গোবিন্দলাল আত্মহত্যা করিয়া মনের জ্বালা জুড়াইতে চাহিয়াছিল— শেষের গোবিন্দলাল প্রায়শ্চিত্ত ও ভগবৎ-সাধনা দ্বারা শান্তি লাভ করিয়াছিল।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুই জনের আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩২০ সালের 'ভারতবর্ষে'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শরচ্চন্দ্র ঘোষালশাস্ত্রী মহাশয় 'বঙ্গদর্শন' ও বর্ত্তমান সংস্করণ পুস্তকের পার্থক্য প্রদর্শন করেন।

১৩৩৬ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'পঞ্চপুষ্পে' দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী মহাশয় বিভিন্ন সংস্করণের পুস্তকের পরিবর্ত্তন প্রদর্শন করেন। আমরা পরিশিষ্টে "পাঠভেদে" প্রথম ও চতুর্থ সংস্করণের পাঠভেদ দেখাইয়াছি; ইহা হইতেই 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রায় সকল প্রকার পরিবর্ত্তনেরই কিছু আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের সহিত তুলনা করিলে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁহার বর্ণনাবাহুল্যের অভাব এবং আড়ম্বরহীনতা। আয়োজন এবং উপকরণ খুব অল্প, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলি ছাড়া গ্রন্থকার বাহিরের কোনও অলঙ্কার অথবা আতিশয্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। দক্ষ মূর্ত্তিকারের মত যে মাটির তাল লইয়া তিনি উপন্যাস রচনা সুরু করিয়াছেন, সমাপ্তিশেষে দেখা যাইতেছে, তাহার এক কণিকাও অবশিষ্ট নাই, অথবা একটি কণিকারও অভাব ঘটে নাই। এমন অপরূপ শিল্পচাতুর্য্য, এমন সংযত ভাবপ্রকাশ, বৈজ্ঞানিক ঘটনা-বিন্যাস এবং সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবোধ বাংলা সাহিত্যের অন্য কোনও উপন্যাসে দৃষ্ট হয় না। মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের লিপিচাতুর্য্য 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' চরমে পৌঁছিয়াছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' অপর লক্ষণীয় বিষয়, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনধারার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এই পরিচয় পুস্তকের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ছড়াইয়া আছে। শুধু জমিদারের কাছারিবাড়ি নয়; গ্রামের পোস্ট-অফিস, মেয়ে-মজলিস, এমন কি চাষী ও ভৃত্যদের পরস্পর কথোপকথনের এমন নিখুঁত ছবি তিনি আঁকিয়াছেন যে, মনে হয়, তিনি আজীবন এইগুলির মধ্যেই বাস করিয়াছেন। আদালত এবং সাক্ষীদের জোবানবন্দীর চিত্রাঙ্কণে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাইয়াছেন। মোটের উপর, এমন অল্প পরিসরের মধ্যে সর্ব্বজনগ্রাহ্য ভাষায় তিনি অপূর্ব্ব কৌশলে একটি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ লইয়া অনেকে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র বসু, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, শশাঙ্কমোহন সেন ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমসাময়িক লেখকদের লেখায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনার ইতিহাস সামান্যই পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণে' "বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটাল-পাড়ায়"-শীর্ষক প্রবন্ধে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়া বাস ত্যাগের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, যাদবচন্দ্রের এই সময়ের কোনও উইলের কথা স্মরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা আরম্ভ করিয়া

থাকিবেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রকাশেরও উল্লেখ আছে। যথা—

> নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইবার প্রায় বছরখানেক পরে আমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি এবং সেখানে এক বৎসর থাকি। আমি যেদিন যাই, সেইদিন সকালে বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি প্রেসে গিয়া ভিজা বাঁধান একখানি কৃষ্ণকান্তের উইল আমাকে দিলেন, বলিলেন "রেলগাড়ীতে এইখানি পড়িও, ছাপাখানা হইতে এইখানা প্রথম বাহির হইল।" আমি অনেক বৎসর ধরিয়া সেখানি বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম।...

ঐ সংখ্যার 'নারায়ণে' "অর্জ্জুনা পুষ্করিণী" নামে বঙ্কিমসহোদর পূর্ণচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ আছে, তাহার প্রথম তিন পংক্তি এইরূপ—

> অনেকে এই পুষ্করিণীকে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের বারুণী পুষ্করিণী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে। 'বারুণী' পুষ্করিণী বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার সৃষ্টি মাত্র।...

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র দুইটি ইংরেজী অনুবাদ হয়। সুপ্রসিদ্ধা Miriam S. Knight-এর অনুবাদ J. F. Blumhardt-কৃত ভূমিকা, প্রসারি ও টীকা সমেত লণ্ডন হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা 'মডার্ন রিভিউ' অফিস হইতে দক্ষিণাচরণ রায়-কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র হিন্দী, তেলেগু ও কানাড়ী অনুবাদ যথাক্রমে ১৮৯৮ সালে পাটনা হইতে এ. উপাধ্যায়, ১৯১০ সালে মছলিপট্টম্ হইতে সি. এস. রাও এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর হইতে বি. বেঙ্কটাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' আইনের ভুল লইয়াও কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল

[১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত চতুর্থ সংস্করণ হইতে]

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিদ্রাগ্রামে একঘর বড় জমীদার ছিলেন। জমীদার বাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী; তাঁহার জমীদারীর মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জ্জিত। উভয় ভ্রাতা একত্রিত হইয়া ধনোপার্জ্জন করেন। উভয় ভ্রাতায় পরম সম্প্রীতি ছিল, একের মনে এমত সন্দেহ কস্মিন্ কালে জন্মে নাই যে, তিনি অপর কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমীদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়ে একান্নভুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল—তাহার নাম গোবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি, রামকান্ত রায়ের মনে মনে সংকল্প হইল যে, উভয়ের উপার্জ্জিত বিষয় একের নামে আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার বিহিত লেখাপড়া করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কেন না, যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত ছিল যে, কৃষ্ণকান্ত কখনও প্রবঞ্চনা অথবা তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করার সম্ভাবনা নাই, তথাপি কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাঁহার পুত্রেরা কি করে, তাহার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু লেখাপড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না—আজি বলিব, কালি বলিব, করিতে লাগিলেন। একদা প্রয়োজনবশতঃ তালুকে গেলে সেইখানে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

যদি কৃষ্ণকান্ত এমত অভিলাষ করিতেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইলে তৎসাধন পক্ষে এখন আর কোন বিঘ্ন ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি গোবিন্দলালকে আপন সংসারে আপন পুত্রদিগের সহিত সমান ভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, এবং উইল করিয়া, আপনাদিগের উপার্জ্জিত সম্পত্তির যে অর্দ্ধাংশ ন্যায়মত রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুই পুত্র, আর এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরলাল, কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল, কন্যার নাম শৈলবতী। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে, তাঁহার

পরলোকান্তে, গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা, আর শৈলবতী এক আনা সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন।

হরলাল বড় দুর্দ্দান্ত। পিতার অবাধ্য এবং দুর্ম্মুখ। বাঙ্গালির উইল প্রায় গোপনে থাকে না। উইলের কথা হরলাল জানিতে পারিল। হরলাল, দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পিতাকে কহিল, "এটা কি হইল? গোবিন্দলাল অর্দ্ধেক ভাগ পাইল, আর আমার তিন আনা?"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "ইহা ন্যায্য হইয়াছে। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়াছি।"

হর। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্যটা কি? আমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি সে লইবার কে? আর মা বহিনকে আমরা প্রতিপালন করিব—তাহাদিগের বা এক এক আনা কেন? বরং তাহাদিগকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী বলিয়া লিখিয়া যান।

কৃষ্ণকান্ত কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বাপু হরলাল! বিষয় আমার, তোমার নহে। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়া যাইব।"

হর। আপনার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে—আপনাকে যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে দিব না।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে চক্ষু আরক্ত করিয়া কহিলেন, "হরলাল, তুমি যদি বালক হইতে, তবে আজি তোমাকে গুরু মহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম।"

হর। আমি বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের গোঁপ পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব।

কৃষ্ণকান্ত রায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বহস্তে উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তৎপরিবর্ত্তে নূতন একখানি উইল লিখাইলেন। তাহাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদলাল পাঁচ আনা, কর্ত্রী এক আনা, শৈলবতী এক আনা, আর হরলাল এক আনা মাত্র পাইলেন।

রাগ করিয়া হরলাল পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গেলেন, তথা হইতে পিতাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই ;—

"কলিকাতায় পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি মানস করিয়াছি যে, একটি বিধবাবিবাহ করিব। আপনি যদ্যপি উইল পরিবর্ত্তন করিয়া

আমাকে ॥০ আনা লিখিয়া দেন, আর সেই উইল শীঘ্র রেজিষ্টরি করেন, তবেই এই অভিলাষ ত্যাগ করিব, নচেৎ শীঘ্র একটি বিধবাবিবাহ করিব।"

হরলাল মনে করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকান্ত ভয়ে ভীত হইয়া, উইল পরিবর্ত্তন করিয়া, হরলালকে অধিক বিষয় লিখিয়া দিবেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে সে ভরসা রহিল না। কৃষ্ণকান্ত লিখিলেন,

"তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিবাহ করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ করিলে আমি উইল বদলাইব বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না।"

ইহার কিছু পরেই হরলাল সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি বিধবাবিবাহ করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্ত রায় আবার উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নূতন উইল করিবেন।

পাড়ায় ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নামে এক জন নিরীহ ভাল মানুষ লোক বাস করিতেন। কৃষ্ণকান্তকে জ্যেঠা মহাশয় বলিতেন। এবং তৎকর্ত্তৃক অনুগৃহীত এবং প্রতিপালিতও হইতেন।

ব্রহ্মানন্দের হস্তাক্ষর উত্তম। এ সকল লেখা পড়া তাঁহার দ্বারাই হইত। কৃষ্ণকান্ত সেই দিন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "আহারাদির পর এখানে আসিও। নূতন উইল লিখিয়া দিতে হইবে।"

বিনোদলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, "আবার উইল বদলান হইবে কি অভিপ্রায়ে?"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "এবার তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে শূন্য পড়িবে।"

বিনোদ। ইহা ভাল হয় না। তিনিই যেন অপরাধী। কিন্তু তাঁহার একটি পুত্র আছে—সে শিশু, নিরপরাধী। তাহার উপায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। তাহাকে এক পাই লিখিয়া দিব।

বিনোদ। এক পাই বখরায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। আমার আয় দুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বখরায় তিন হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে এক জন গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চলিতে পারে। ইহার অধিক দিব না।

বিনোদলাল অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কর্ত্তা কোন মতে মতান্তর করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মানন্দ স্নানাহার করিয়া নিদ্রার উদ্যোগে ছিলেন, এমত সময়ে বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন যে, হরলাল রায়। হরলাল আসিয়া তাঁহার শিওরে বসিলেন।

ব্রহ্মা। সে কি, বড় বাবু যে? কখন বাড়ী এলে?

হর। বাড়ী এখনও যাই নাই।

ব্র। একেবারে এইখানেই? কলিকাতা হইতে কতক্ষণ আসিতেছ?

হর। কলিকাতা হইতে দুই দিবস হইল আসিয়াছি। এই দুই দিন কোন স্থানে লুকাইয়া ছিলাম। আবার নাকি নূতন উইল হইবে?

ব্র। এই রকম ত শুনিতেছি।

হর। আমার ভাগে এবার শূন্য?

ব্র। কর্ত্তা এখন রাগ করে্য তাই বল্‌ছেন, কিন্তু সেটা থাকবে না।

হর। আজি বিকালে লেখাপড়া হবে? তুমি লিখিবে?

ব্র। তা কি কর্‌ব ভাই! কর্ত্তা বলিলে ত "না" বলিতে পারি না।

হর। ভাল, তাতে তোমার দোষ কি? এখন কিছু রোজগার করিবে?

ব্র। কিলটে চড়টা? তা ভাই, মার না কেন?

হর। তা নয়; হাজার টাকা।

ব্র। বিধবা বিয়ে করে্য নাকি?

হর। তাই।

ব্র। বয়স গেছে।

হর। তবে আর একটি কাজ বলি। এখনই আরম্ভ কর। আগামী কিছু গ্রহণ কর।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দের হাতে হরলাল পাঁচ শত টাকার নোট দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ নোট পাইয়া উলটিয়া পালটিয়া দেখিল। বলিল, "ইহা লইয়া আমি কি করিব?"

হর। পুঁজি করিও। দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও।

ব্র। গোওয়ালা-ফোওয়ালার কোন এলেকা রাখি না। কিন্তু আমার করিতে হইবে কি?

হর। দুইটি কলম কাট। দুইটি যেন ঠিক সমান হয়।

ব্র। আচ্ছা ভাই—যা বল, তাই শুনি।

এই বলিয়া ঘোষজ মহাশয় দুইটি নূতন কলম লইয়া ঠিক্ সমান করিয়া কাটিলেন। এবং লিখিয়া দেখিলেন যে, দুইটিরই লেখা এক প্রকার দেখিতে হয়।

তখন হরলাল বলিলেন, "ইহার একটি কলম বাক্সতে তুলিয়া রাখ। যখন উইল লিখিতে যাইবে, এই কলম লইয়া গিয়া ইহাতে উইল লিখিবে। দ্বিতীয় কলমটি লইয়া এখন একখানা লেখা পড়া করিতে হইবে। তোমার কাছে ভাল কালি আছে?"

ব্রহ্মানন্দ মসীপাত্র বাহির করিয়া লিখিয়া দেখাইলেন। হরলাল বলিতে লাগিল, "ভাল, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া যাইও।"

ব্র। তোমাদিগের বাড়ীতে কি দোওয়াত কলম নাই যে, আমি ঘাড়ে করিয়া নিয়া যাব?

হর। আমার কোন উদ্দেশ্য আছে—নচেৎ তোমাকে এত টাকা দিলাম কেন?

ব্র। আমিও তাই ভাবিতেছি বটে—ভাল বলেছ ভাই রে!

হর। তুমি দোওয়াত কলম লইয়া গেলে কেহ ভাবিলেও ভাবিতে পারে, আজি এটা কেন? তুমি সরকারি কালি কলমকে গালি পাড়িও; তাহা হইলেই শোধরাইবে।

ব্র। তা সরকারি কালি কলমকে শুধু কেন? সরকারকে শুদ্ধ গালি পাড়িতে পারিব।

হর। তত আবশ্যক নাই। এক্ষণে আসল কর্ম্ম আরম্ভ কর।

তখন হরলাল দুইখানি জেনেরাল লেটর কাগজ ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "এ যে সরকারি কাগজ দেখিতে পাই।"

"সরকারি নহে—কিন্তু উকীলের বাড়ীর লেখা পড়া এই কাগজে হইয়া থাকে। কর্ত্তাও এই কাগজে উইল লেখাইয়া থাকেন, জানি। এজন্যে এই কাগজ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। যাহা বলি, তাহা এই কালি কলমে লেখ।"

ব্রহ্মানন্দ লিখিতে আরম্ভ করিল। হরলাল একখানি উইল লেখাইয়া দিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই। কৃষ্ণকান্ত রায় উইল করিতেছেন। তাঁহার নামে যত সম্পত্তি আছে, তাহার বিভাগ কৃষ্ণকান্তের পরলোকান্তে এইরূপ হইবে। যথা, বিনোদলাল তিন আনা, গোবিন্দলাল এক পাই, গৃহিণী এক পাই, শৈলবতী এক পাই, হরলালের পুত্র এক পাই, হরলাল জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া অবশিষ্ট বারো আনা।

লেখা হইলে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, “এখন ত উইল লেখা হইল—দস্তখত করে কে?”

“আমি।” বলিয়া হরলাল ঐ উইলে কৃষ্ণকান্ত রায়ের এবং চারি জন সাক্ষীর দস্তখত করিয়া দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, “ভাল, এ ত জাল হইল।”

হর। এই সাঁচ্চা উইল হইল, বৈকালে যাহা লিখিবে, সেই জাল।

ব্র। কিসে?

হর। তুমি যখন উইল লিখিতে যাইবে, তখন এই উইলখানি আপনার পিরানের পকেটে লুকাইয়া লইয়া যাইবে। সেখানে গিয়া এই কালি কলমে তাঁহাদের ইচ্ছামত উইল লিখিবে। কাগজ, কলম, কালি, লেখক একই; সুতরাং দুইখান উইলই দেখিতে এক প্রকার হইবে। পরে উইল পড়িয়া শুনান ও দস্তখত হইয়া গেলে শেষে তুমি স্বাক্ষর করিবার জন্য লইবে। সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দস্তখত করিবে। সেই অবকাশে উইলখানি বদলাইয়া লইবে। এইখানি কর্ত্তাকে দিয়া, কর্ত্তার উইলখানি আমাকে আনিয়া দিবে।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ ভাবিতে লাগিল। বলিল, “বলিলে কি হয়—বুদ্ধির খেলটা খেলোছ ভাল।”

হর। ভাবিতেছ কি?

ব্র। ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু ভয় করে। তোমার টাকা ফিরাইয়া লও। আমি কিন্তু জালের মধ্যে থাকিব না।

“টাকা দাও।” বলিয়া হরলাল হাত পাতিল। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নোট ফিরাইয়া দিল। নোট লইয়া হরলাল উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ব্রহ্মানন্দ তখন আবার তাহাকে ডাকিয়া বলিল, “বলি, ভায়া কি গেলে?”

“না” বলিয়া হরলাল ফিরিল।

ব্র। তুমি এখন পাঁচ শত টাকা দিলে। আর কি দিবে?

হর। তুমি সে উইলখানি আনিয়া দিলে আর পাঁচ শত দিব।

ব্র। অনেকটা—টাকা—লোভ ছাড়া যায় না।

হর। তবে তুমি রাজি হইলে?

ব্র। রাজি না হইয়াই বা কি করি? কিন্তু বদল করি কি প্রকারে? দেখিতে পাইবে যে।

হর। কেন দেখিতে পাইবে? আমি তোমার সম্মুখে উইল বদল করিয়া লইতেছি, তুমি দেখ দেখি, টের পাও কি না।

হরলালের অন্য বিদ্যা থাকুক না থাকুক, হস্তকৌশল বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন উইলখানি পকেটে রাখিলেন, আর একখানি কাগজ হাতে লইয়া তাহাতে লিখিবার উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে হাতের কাগজ পকেটে, পকেটের কাগজ হাতে কি প্রকারে আসিল, ব্রহ্মানন্দ তাহা কিছুই লক্ষিত করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দ হরলালের হস্তকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরলাল বলিলেন, "এই কৌশলটি তোমায় শিখাইয়া দিব।" এই বলিয়া হরলাল সেই অভ্যস্ত কৌশল ব্রহ্মানন্দকে অভ্যাস করাইতে লাগিলেন।

দুই তিন দণ্ডে ব্রহ্মানন্দের সেই কৌশলটি অভ্যস্ত হইল। তখন হরলাল কহিল যে, "আমি এক্ষণে চলিলাম। সন্ধ্যার পর বাকি টাকা লইয়া আসিব।" বলিয়া সে বিদায় হইল।

হরলাল চলিয়া গেলে ব্রহ্মানন্দের বিষম ভয়সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন যে, তিনি যে কার্য্যে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা রাজদ্বারে মহা দণ্ডার্হ অপরাধ—কি জানি, ভবিষ্যতে পাছে তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইতে হয়। আবার বদলের সময়ে যদি কেহ ধরিয়া ফেলে? তবে তিনি এ কার্য্য কেন করেন? না করিলে হস্তগত সহস্র মুদ্রা ত্যাগ করিতে হয়। তাহাও হয় না। প্রাণ থাকিতে নয়।

হায়! ফলাহার! কত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুমি মর্ম্মান্তিক পীড়া দিয়াছ! এ দিকে সংক্রামক জ্বর, প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার উপর ফলাহার উপস্থিত! তখন কাংস্যপাত্র বা কদলীপত্রে সুশোভিত লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ প্রভৃতির অমলধবল শোভা সন্দর্শন করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিবে? ত্যাগ করিবে, না আহার করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর যদি সহস্র বৎসর সেই সজ্জিত পাত্রের নিকট বসিয়া তর্ক বিতর্ক করেন, তথাপি তিনি এ কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না—এবং মীমাংসা করিতে না পারিয়া—অন্যমনে পরদ্রব্যগুলি উদরসাৎ করিবেন।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ মহাশয়ের ঠিক তাই হইল। হরলালের এ টাকা হজম করা ভার—জেলখানার ভয় আছে; কিন্তু ত্যাগ করাও যায় না। লোভ বড়, কিন্তু বদহজমের ভয়ও বড়। ব্রহ্মানন্দ মীমাংসা করিতে পারিল না। মীমাংসা করিতে না পারিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের মত উদরসাৎ করিবার দিকেই মন রাখিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দ উইল লিখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন যে, হরলাল আসিয়া বসিয়া আছেন। হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?"

ব্রহ্মানন্দ একটু কবিতাপ্রিয়। তিনি কষ্টে হাসিয়া বলিলেন,

"মনে করি চাঁদা ধরি হাতে দিই পেড়ে।
বাবলা গাছে হাত লেগে আঙ্গুল গেল ছিঁড়ে।"

হর। পার নাই নাকি?

ব্র। ভাই, কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল।

হ। পার নাই?

ব্র। না ভাই—এই ভাই, তোমার জাল উইল নাও। এই তোমার টাকা নাও।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ কৃত্রিম উইল ও বাক্স হইতে পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। ক্রোধে এবং বিরক্তিতে হরলালের চক্ষু আরক্ত এবং অধর কম্পিত হইল। বলিলেন, "মূর্খ, অকর্ম্মা! স্ত্রীলোকের কাজটাও তোমা হইতে হইল না? আমি চলিলাম। কিন্তু দেখিও, যদি তোমা হইতে এই কথার বাষ্প মাত্র প্রকাশ পায়, তবে তোমার জীবন সংশয়।"

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "সে ভাবনা করিও না; কথা আমার নিকট প্রকাশ পাইবে না।"

সেখান হইতে উঠিয়া হরলাল ব্রহ্মানন্দের পাকশালায় গেলেন। হরলাল ঘরের ছেলে, সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। পাকশালায় ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতৃকন্যা রোহিণী রাঁধিতেছিল।

এই রোহিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে। অতএব তাহার রূপ গুণ কিছু বলিতে হয়, কিন্তু আজি কালি রূপ বর্ণনার বাজার নরম—আর গুণ বর্ণনার—হাল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই। তবে ইহা বলিলে হয় যে, রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত। এ দিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা ইত্যাদিতে

সিদ্ধহস্ত ; আবার আলেপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত।

রোহিণী রূপসী ঠন্ ঠন্ করিয়া দালের হাঁড়িতে কাটি দিতেছিল, দূরে একটা বিড়াল থাবা পাতিয়া বসিয়া ছিল ; পশুজাতি রমণীদিগের বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষে শিহরে কি না, দেখিবার জন্য রোহিণী তাহার উপরে মধ্যে মধ্যে বিষপূর্ণ মধুর কটাক্ষ করিতেছিল ; বিড়াল সে মধুর কটাক্ষকে ভর্জ্জিত মৎস্যাহারের নিমন্ত্রণ মনে করিয়া অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছিল, এমত সময়ে হরলাল বাবু জুতা সমেত মস্ মস্ করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বিড়াল, ভীত হইয়া, ভর্জ্জিত মৎস্যের লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নে তৎপর হইল ; রোহিণী দালের কাটি ফেলিয়া দিয়া, হাত ধুইয়া, মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নখে নখ খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড় কাকা কবে এলেন ?"

হরলাল বলিল, "কাল এসেছি। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

রোহিণী শিহরিল ; বলিল, "আজি এখানে খাবেন ? সোরু চালের ভাত চড়াব কি ?"

হর। চড়াও, চড়াও। কিন্তু সে কথা নয়। তোমার একদিনের কথা মনে পড়ে কি ?

রোহিণী চুপ করিয়া মাটি পানে চাহিয়া রহিল। হরলাল বলিল, "সেই দিন, যে দিন তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে, যাত্রীদিগের দলছাড়া হইয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলে ? মনে পড়ে ?

রোহিণী। (বাঁ হাতের চারিটি আঙ্গুল দাইন হাতে ধরিয়া অধোবদনে) মনে পড়ে।

হর। যে দিন তুমি পথ হারাইয়া মাঠে পড়িয়াছিলে, মনে পড়ে ?

রো। পড়ে।

হর। যে দিন মাঠে তোমার রাত্রি হইল, তুমি একা ; জনকত বদমাস তোমার সঙ্গ নিল—মনে পড়ে ?

রো। পড়ে।

হর। সে দিন কে তোমায় রক্ষা করিয়াছিল ?

রো। তুমি। তুমি ঘোড়ার উপরে সেই মাঠ দিয়া কোথায় যাইতেছিলে—

হর। শালীর বাড়ী।

রো। তুমি দেখিতে পাইয়া আমায় রক্ষা করিলে—আমায় পাল্কি বেহারা করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলে। মনে পড়ে বই কি। সে ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।

হর। আজ সে ঋণ পরিশোধ করিতে পার—তার উপর আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিতে পার, করিবে?

রো। কি বলুন—আমি প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব।

হর। কর না কর, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

রো। প্রাণ থাকিতে নয়।

হর। দিব্য কর।

রোহিণী দিব্য করিল।

তখন হরলাল কৃষ্ণকান্তের আসল উইল ও জাল উইলের কথা বুঝাইয়া বলিল। শেষ বলিল, "সেই আসল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল তাহার বদলে রাখিয়া আসিতে হইবে। আমাদের বাড়ীতে তোমার যাতায়াত আছে। তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি অনায়াসে পার। আমার জন্য ইহা করিবে?"

রোহিণী শিহরিল। বলিল, "চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না।"

হর। স্ত্রীলোক এমন অসারই বটে—কথার রাশি মাত্র। এই বুঝি এ জন্মে তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না।

রো। আর যা বলুন, সব পারিব। মরিতে বলেন, মরিব। কিন্তু এ বিশ্বাস-ঘাতকের কাজ পারিব না।

হরলাল কিছুতেই রোহিণীকে সম্মত করিতে না পারিয়া, সেই হাজার টাকার নোট রোহিণীর হাতে দিতে গেল। বলিল, "এই হাজার টাকা পুরস্কার আগাম নাও। এ কাজ তোমার করিতে হইবে।"

রোহিণী নোট লইল না। বলিল, "টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্ত্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না। করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম।"

হরলাল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, বলিল, "মনে করিয়াছিলাম, রোহিণি, তুমি আমার হিতৈষী। পর কখন আপন হয়? দেখ, আজ যদি আমার স্ত্রী থাকিত, আমি তোমার খোষামোদ করিতাম না। সেই আমার এ কাজ করিত।"

এবার রোহিণী একটু হাসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিলে যে ?"

রো। আপনার স্ত্রীর নামে সেই বিধবা বিবাহের কথা মনে পড়িল। আপনি না কি বিধবা বিবাহ করিবেন ?

হর। ইচ্ছা ত আছে—কিন্তু মনের মত বিধবা পাই কই ?

রো। তা বিধবাই হৌক, সধবাই হৌক—বলি বিধবাই হৌক, কুমারীই হৌক—একটা বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেই ভাল হয়। আমরা আত্মীয় স্বজন সকলেরই তা হলে আহ্লাদ হয়।

হর। দেখ রোহিণি, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

রো। তা ত এখন লোকে বলিতেছে।

হর। দেখ, তুমিও একটা বিবাহ করিতে পার—কেন করিবে না ?

রোহিণী মাথার কাপড় একটু টানিয়া মুখ ফিরাইল। হরলাল বলিতে লাগিল, "দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম সুবাদ মাত্র—সম্পর্কে বাধে না।"

এবার রোহিণী লম্বা করিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, উনুন গোড়ায় বসিয়া, দালে কাটি দিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া হরলাল ফিরিয়া চলিল।

হরলাল দ্বার পর্য্যন্ত গেলে, রোহিণী বলিল, "কাগজখানা না হয় রাখিয়া যান, দেখি, কি করিতে পারি।"

হরলাল আহ্লাদিত হইয়া জাল উইল ও নোট রোহিণীর নিকটে রাখিল। দেখিয়া রোহিণী বলিল, "নোট না। শুধু উইলখানা রাখুন।"

হরলাল তখন জাল উইল রাখিয়া নোট লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐ দিবস রাত্রি আটটার সময়ে কৃষ্ণকান্ত রায় আপন শয়নমন্দিরে পর্য্যঙ্কে বসিয়া, উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, সটকায় তামাক টানিতেছিলেন এবং সংসারে একমাত্র ঔষধ—মাদকমধ্যে শ্রেষ্ঠ—অহিফেন ওরফে আফিমের নেশায় মিঠে রকম ঝিমাইতেছিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে খেয়াল দেখিতেছিলেন, যেন উইলখানি হঠাৎ বিক্রয় কোবালা হইয়া গিয়াছে। যেন হরলাল তিন টাকা তের আনা দুকড়া দুক্রান্তি মূল্যে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি কিনিয়া লইয়াছে। আবার যেন কে বলিয়া দিল যে, না, এ দানপত্র নহে,

এ তমস্সুক। তখনই যেন দেখিলেন যে, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিম কর্জ্জ লইয়া, এই দলিল লিখিয়া দিয়া, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন—মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোরক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এমত সময়ে, রোহিণী ধীরে ধীরে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা কি ঘুমাইয়াছ ?"

কৃষ্ণকান্ত ঝিমাইতে ঝিমাইতে কহিলেন, "কে, নন্দী ? ঠাকুরকে এইবেলা ফোরক্লোজ করিতে বল।"

রোহিণী বুঝিল যে, কৃষ্ণকান্তের আফিমের আমল হইয়াছে। হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, নন্দী কে ?"

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় না তুলিয়া বলিলেন, "হুম্, ঠিক বলেছ। বৃন্দাবনে গোয়ালাবাড়ী মাখন খেয়েছে—আজও তার কড়ি দেয় নাই।"

রোহিণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণকান্তের চমক হইল, মাথা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কে ও, অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী ?"

রোহিণী উত্তর করিল, "মৃগশিরা আর্দ্রা পুনর্ব্বসু পুষ্যা।"

কৃষ্ণ। অশ্লেষা মঘা পূর্ব্বফল্গুনী।

রো। ঠাকুরদাদা, আমি কি তোমার কাছে জ্যোতিষ শিখ্‌তে এয়েছি ?

কৃষ্ণ। তাই ত। তবে কি মনে করিয়া ? আফিঙ্গ চাই না ত ?

রো। যে সামগ্রী প্রাণ ধয়্যে দিতে পার্‌বে না, তার জন্যে কি আমি এসেছি ! আমাকে কাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই এসেছি।

কৃ। এই এই। তবে আফিঙ্গেরই জন্য।

রো। না, ঠাকুরদাদা, না। তোমার দিব্য, আফিঙ্গ চাই না। কাকা বল্‌লেন যে, যে উইল আজ লেখা পড়া হয়েছে, তাতে তোমার দস্তখত হয় নাই।

কৃষ্ণ। সে কি। আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে, আমি দস্তখত করিয়াছি।

রো। না, কাকা কহিলেন যে, তাঁহার যেন স্মরণ হচ্ছে, তুমি তাতে দস্তখত কর নাই ; ভাল, সন্দেহ রাখায় দরকার কি ? তুমি কেন সেখানা খুলে একবার দেখ না।

কৃষ্ণ। বটে—তবে আলোটা ধর দেখি।

বলিয়া কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া উপাধানের নিম্ন হইতে একটি চাবি লইলেন। রোহিণী নিকটস্থ দীপ হস্তে লইল। কৃষ্ণকান্ত প্রথমে একটি ক্ষুদ্র হাতবাক্স খুলিয়া একটি বিচিত্র

চাবি লইয়া, পরে একটা চেষ্ট ড্রয়ারের একটি দেরাজ খুলিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া ঐ উইল বাহির করিলেন। পরে বাক্স হইতে চসমা বাহির করিয়া নাসিকার উপর সংস্থাপনের উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু চসমা লাগাইতে লাগাইতে দুই চারি বার আফিঙ্গের ঝিমকিনি আসিল—সুতরাং তাহাতে কিছু কাল বিলম্ব হইল। পরিশেষে চসমা সুস্থির হইলে কৃষ্ণকান্ত উইলে নেত্রপাত করিয়া দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "রোহিণি, আমি কি বুড় হইয়া বিহ্বল হইয়াছি? এই দেখ, আমার দস্তখত।"

রোহিণী বলিল, "বালাই, বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল জোর করিয়া নাতিনী বল বই ত না। তা ভাল, আমি এখন যাই, কাকাকে বলি গিয়া।"

রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের শয়নমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

* * *

গভীর নিশাতে কৃষ্ণকান্ত নিদ্রা যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, তাঁহার শয়নগৃহে দীপ জ্বলিতেছে না। সচরাচর সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বলিত, কিন্তু সে রাত্রে দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে দেখিলেন। নিদ্রাভঙ্গকালে এমতও শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল যে, যেন কে একটা চাবি কলে ফিরাইল। এমতও বোধ হইল, যেন ঘরে কে মানুষ বেড়াইতেছে। মানুষ তাঁহার পর্য্যঙ্কের শিরোদেশ পর্য্যন্ত আসিল—তাঁহার বালিশে হাত দিল। কৃষ্ণকান্ত আফিঙ্গের নেশায় বিভোর; না নিদ্রিত, না জাগরিত, বড় কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ঘরে যে আলো নাই—তাহাও ঠিক বুঝেন নাই, কখন অর্দ্ধনিদ্রিত—কখন অর্দ্ধসচেতন—সচেতনেও চক্ষু খুলে না। একবার দৈবাৎ চক্ষু খুলিবায় কতকটা অন্ধকার বোধ হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখন মনে করিতেছিলেন যে, তিনি হরি ঘোষের মোকদ্দমায় জাল দলিল দাখিল করায়, জেলখানায় গিয়াছেন। জেলখানা ঘোরান্ধকার। কিছু পরে হঠাৎ যেন চাবি খোলার শব্দ অল্প কাণে গেল—এ কি জেলের চাবি পড়িল? হঠাৎ একটু চমক হইল। কৃষ্ণকান্ত সটকা হাতড়াইলেন, পাইলেন না—অভ্যাসবশতঃ ডাকিলেন, "হরি!"

কৃষ্ণকান্ত অন্তঃপুরে শয়ন করিতেন না—বহির্ব্বাটীতেও শয়ন করিতেন না। উভয়ের মধ্যে একটি ঘর ছিল। সেই ঘরে শয়ন করিতেন। সেখানে হরি নামক এক জন খানসামা তাঁহার প্রহরী স্বরূপ শয়ন করিত। আর কেহ না। কৃষ্ণকান্ত তাহাকেই ডাকিলেন, "হরি!"

কৃষ্ণকান্ত বারেক মাত্র হরিকে ডাকিয়া, আবার আফিমে ভোর হইয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আসল উইল, তাঁহার গৃহ হইতে সেই অবসরে অন্তর্হিত হইল। জাল উইল তৎপরিবর্ত্তে স্থাপিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে রোহিণী আবার রাঁধিতে বসিয়াছে, আবার সেখানে হরলাল উঁকি মারিতেছে। ভাগ্যশঃ ব্রহ্মানন্দ বাড়ী ছিল না—নহিলে কি একটা মনে করিতে পারিত।

হরলাল ধীরে ধীরে রোহিণীর কাছে গেল—রোহিণী বড় চাহিয়া দেখে না। হরলাল বলিল, "চাহিয়া দেখ—হাঁড়ি ফাটিবে না।"

রোহিণী চাহিয়া দেখিয়া হাসিল। হরলাল বলিল, "কি করিয়াছ?"

রোহিণী অপহৃত উইল আনিয়া হরলালকে দেখিতে দিল। হরলাল পড়িয়া দেখিল—আসল উইল বটে। তখন সে দুষ্টের মুখে হাসি ধরে না। উইল হাতে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকারে আনিলে?"

রোহিণী সে গল্প আরম্ভ করিল। প্রকৃত কিছুই বলিল না। একটি মিথ্যা উপন্যাস বলিতে লাগিল—বলিতে বলিতে সে হরলালের হাত হইতে উইলখানি লইয়া দেখাইল, কি প্রকারে কাগজখানা একটা কলমদানের ভিতর পড়িয়া ছিল। উইল চুরির কথা শেষ হইলে রোহিণী হঠাৎ উইলখানা হাতে করিয়া উঠিয়া গেল। যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার হাতে উইল নাই দেখিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "উইল কোথায় রাখিয়া আসিলে?"

রোহি। তুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

হর। আর তুলিয়া রাখিয়া কি হইবে? আমি এখনই যাইব।

রোহি। এখনই যাবে? এত তাড়াতাড়ি কেন?

হর। আমার থাকিবার যো নাই।

রোহি। তা যাও।

হর। উইল?

রো। আমার কাছে থাক্।

হর। সে কি? উইল আমায় দিবে না?

রোহি। তোমার কাছে থাকাও যে, আমার কাছে থাকাও সে।

হর। যদি আমাকে উইল দিবে না, তবে ইহা চুরি করিলে কেন?

রো। আপনারই জন্য। আপনারই জন্য ইহা রহিল। যখন আপনি বিধবা বিবাহ করিবেন, আপনার স্ত্রীকে এ উইল দিব। আপনি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।

হরলাল বুঝিল, বলিল, "তা হবে না—রোহিণি! টাকা যাহা চাও, দিব।"

রো। লক্ষ টাকা দিলেও নয়। যাহা দিবে বলিয়াছিলে, তাই চাই।

হর। তা হয় না। আমি জাল করি, চুরি করি, আপনারই হকের জন্য। তুমি চুরি করিয়াছ, কার হকের জন্য?

রোহিণীর মুখ শুকাইল। রোহিণী অধোবদনে রহিল। হরলাল বলিতে লাগিল, "আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।"

রোহিণী সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, মাথার কাপড় উঁচু করিয়া তুলিয়া, হরলালের মুখপানে চাহিল; বলিল, "আমি চোর! তুমি সাধু! কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল? সরলা স্ত্রীলোক দেখিয়া কে প্রবঞ্চনা করিল? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, যে মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, যা ইতরে বর্ব্বরে মুখেও আনিতে পারে না, তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে? হায়! হায়! আমি তোমার অযোগ্য? তোমার মত নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়ে মানুষ হইতে, তোমাকে আজ, যা দিয়া ঘর ঝাঁট দিই, তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দূর হও।"

হরলাল বুঝিল, উপযুক্ত হইয়াছে। মানে মানে বিদায় হইল—যাইবার সময় একটু টিপি টিপি হাসিয়া গেল। রোহিণীও বুঝিল যে, উপযুক্ত হইয়াছে,—উভয় পক্ষে। সেও খোঁপাটা একটু আঁটিয়া নিয়া রাঁধিতে বসিল। রাগে খোঁপাটা খুলিয়া গিয়াছিল। তার চোখে জল আসিতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তুমি, বসন্তের কোকিল! প্রাণ ভরিয়া ডাক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ যে, সময় বুঝিয়া ডাকিবে। সময়ে, অসময়ে, সকল সময়ে ডাকাডাকি ভাল নহে। দেখ, আমি বহু সন্ধানে, লেখনী মসীপাত্র ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাইয়া, আরও অধিক অনুসন্ধানের পর মনের সাক্ষাৎ পাইয়া, কৃষ্ণকান্তের উইলের কথা ফাঁদিয়া লিখিতে বসিতেছিলাম, এমত সময়ে তুমি আকাশ হইতে ডাকিলে "কুহু! কুহু! কুহু!" তুমি সুকণ্ঠ, আমি স্বীকার করি, কিন্তু সুকণ্ঠ বলিয়া কাহারও পিছু ডাকিবার অধিকার নাই। যাই হউক, আমার পলিত কেশ, চলিত কলম, এ সব স্থানে তোমার ডাকাডাকিতে বড় আসে যায় না। কিন্তু দেখ, যখন নব্য বাবু টাকার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া জমাখরচ লইয়া মাথা কুটাকুটি করিতেছেন, তখন তুমি হয় ত আপিসের ভগ্ন প্রাচীরের কাছ হইতে ডাকিলে, "কুহু"—বাবুর আর জমাখরচ মিলিল না। যখন বিরহসন্তপ্তা সুন্দরী, প্রায় সমস্ত দিনের পর অর্থাৎ বেলা নয়টার সময় দুটি ভাত মুখে দিতে বসিয়াছেন, কেবল ক্ষীরের বাটিটি কোলে টানিয়া লইয়াছেন মাত্র, অমনি তুমি ডাকিলে—"কুহু"—সুন্দরীর ক্ষীরের বাটি অমনি রহিল—হয় ত, তাহাতে অন্যমনে লুণ মাখিয়া খাইলেন। যাহা হউক, তোমার কুহুরবে কিছু যাদু আছে, নহিলে যখন তুমি বকুল গাছে বসিয়া ডাকিতেছিলে—আর বিধবা রোহিণী কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল—তখন—কিন্তু আগে জল আনিতে যাওয়ার পরিচয়টা দিই।

তা, কথাটা এই। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ দুঃখী লোক—দাসী চাকরাণীর বড় ধার ধারে না। সেটা সুবিধা, কি কুবিধা, তা বলিতে পারি না—সুবিধা হউক, কুবিধা হউক, যাহার চাকরাণী নাই, তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল, এবং ময়লা, এই চারিটি বস্তু নাই। চাকরাণী নামে দেবতা এই চারিটির সৃষ্টিকর্তা। বিশেষ যাহার অনেকগুলি চাকরাণী, তাহার বাড়ীতে নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—নিত্য রাবণবধ। কোন চাকরাণী ভীমরূপিণী, সর্ব্বদাই সম্মার্জ্জনীগদা হস্তে গৃহরণক্ষেত্রে ফিরিতেছেন; কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণতুল্য বীরগণকে ভর্ৎসনা করিতেছেন; কেহ কুম্ভকর্ণরূপিণী—ছয় মাস করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন; নিদ্রান্তে সর্ব্বস্ব খাইতেছেন; কেহ সুগ্রীব, গ্রীবা হেলাইয়া কুম্ভকর্ণের বধের উদ্যোগ করিতেছেন। ইত্যাদি।

ব্রহ্মানন্দের সে সকল আপদ্ বালাই ছিল না; সুতরাং জল আনা, বাসন মাজাটা, রোহিণীর ঘাড়ে পড়িয়াছিল। বৈকালে, অন্যান্য কাজ শেষ হইলে, রোহিণী জল আনিতে যাইত। যে দিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তাহার পরদিন নিয়মিত সময়ে রোহিণী কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল। বাবুদের একটা বড় পুকুর আছে—নাম বারুণী—জল তার বড় মিঠা—রোহিণী সেইখানে জল আনিতে যাইত। আজিও যাইতেছিল। রোহিণী একা জল আনিতে যায়—দল বাঁধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি হাসিতে হাসিতে হালকা কলসীতে হালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারি, চাল চলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতাপেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের উপর চারুবিনির্ম্মিতা কাল ভুজঙ্গিনীতুল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে; চলনের দোলনে, ধীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে, বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত, মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল—অমনি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, রোহিণী সুন্দরী সরোবরপথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল—এমন সময়ে বকুলের ডালে বসিয়া, বসন্তের কোকিল ডাকিল।

কুহুঃ কুহুঃ কুহুঃ! রোহিণী চারি দিক্ চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহিণীর সেই ঊর্দ্ধবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই—ক্ষুদ্র পাখিজাতি—তখনই সে, সে শরে বিদ্ধ হইয়া, উলটি পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু পাখীর অদৃষ্টে তাহা ছিল না—কার্য্যকারণের অনন্ত শ্রেণী-পরম্পরায় এটি গ্রন্থিবদ্ধ হয় নাই—অথবা পাখীর তত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ছিল না। মূর্খ পাখী আবার ডাকিল—"কুহু! কুহু! কুহু!"

"দূর হ! কালামুখো!" বলিয়া রোহিণী চলিয়া গেল। চলিয়া গেল, কিন্তু কোকিলকে ভুলিল না। আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে, কোকিল অসময়ে ডাকিয়াছিল। গরিব বিধবা যুবতী একা জল আনিতে যাইতেছিল, তখন ডাকাটা ভাল হয় নাই। কেন না, কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারাইবাতে জীবনসর্ব্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা আর

পাইব না। যেন কি নাই, কে যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।

আবার কুহুঃ, কুহুঃ, কুহুঃ। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুনগুনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ,—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তাহার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজিনির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিতবৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল! এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল "কু উ।" তখন রোহিণী সরোবরসোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।

কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না। আমি স্ত্রীলোকের মনের কথা কি প্রকারে বলিব? তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয়, ঐ দুষ্ট কোকিল রোহিণীকে কাঁদাইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বারুণী পুষ্করিণী লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম—আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ—নীল কাচের আয়না মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম—বাগানের ফ্রেম—পুষ্করিণীর চারি পাশে বাবুদের বাগান—উদ্যানবৃক্ষের এবং উদ্যানপ্রাচীরের বিরাম নাই।

সেই ফ্রেমখানা বড় জাঁকাল—লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা—নানা ফলের পাতর বসান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীগুলা এক একখানা বড় বড় হীরার মত অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে জ্বলিতেছিল। আর মাথার উপর আকাশ—সেও সেই বাগান ফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না। আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর সেই ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে সেই কোকিলটা ডাকিতেছিল। এ সকল এক রকম বুঝান যায়, কিন্তু সেই আকাশ, আর সেই পুকুর, আর সেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে রোহিণীর মনের কি সম্বন্ধ, সেইটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে, এই বারুণী পুকুর লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম।

আমিও গোলে পড়িলাম, আর গোবিন্দলালও বড় গোলে পড়িল। গোবিন্দলালও সেই কুসুমিতা লতার অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন যে, রোহিণী আসিয়া ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে। গোবিন্দলাল বাবু মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, এ, পাড়ায় কোন মেয়ে ছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে। আমরা গোবিন্দলালের সিদ্ধান্তে তত ভরাভর করি না। রোহিণী কাঁদিতে লাগিল।

রোহিণী কি ভাবিতেছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয় ভাবিতেছিল যে, কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না? কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী—মনে কর, ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য? দূর হৌক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই—কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি?

তা, আমরা ত বলিয়াছি, রোহিণী লোক ভাল নয়। দেখ, এটুকুতে কত হিংসা! রোহিণীর অনেক দোষ—তার কান্না দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি? করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই—পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না।

তা, তোমরা রোহিণীর জন্য একবার আহা বল। দেখ, এখনও রোহিণী, ঘাটে বসিয়া কপালে হাত দিয়া কাঁদিতেছে—শূন্য কলসী জলের উপর বাতাসে নাচিতেছে।

শেষে সূর্য্য অস্ত গেলেন; ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল—শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখী সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে লাগিল। গোরু সকল গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল—অন্ধকারের উপর মৃদু আলো ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহার কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে। তখন গোবিন্দলাল উদ্যান হইতে গৃহাভিমুখে চলিলেন—যাইবার সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া আছে।

এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া, তাঁহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল যে, এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ—আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না?

গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া, রোহিণীর কাছে গিয়া, তাহার পার্শ্বে চম্পকনির্ম্মিত মূর্ত্তিবৎ সেই চম্পকবর্ণ চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইলেন। রোহিণী দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "রোহিণি! তুমি এতক্ষণ একা বসিয়া কাঁদিতেছ কেন?"

রোহিণী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না।

গোবিন্দলাল পুনরপি বলিলেন, "তোমার কিসের দুঃখ, আমায় কি বলিবে না? যদি আমি কোন উপকার করিতে পারি।"

যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল—গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিছু বলিল না—গঠিত পুত্তলীর মত সেই সরোবরসোপানের শোভা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল স্বচ্ছ সরোবরজলে সেই ভাস্করকীর্ত্তিকল্প মূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের ছায়া দেখিলেন এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর—কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর। সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ। গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন। রোহিণীকে আবার বলিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও। নিজে না বলিতে পার, তবে আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের দ্বারায় জানাইও।"

রোহিণী এবার কথা কহিল। বলিল, "এক দিন বলিব। আজ নহে। এক দিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।"

গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইয়া, গৃহাভিমুখে গেলেন। রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া কলসী ধরিয়া, তাহাতে জল পূরিল—কলসী তখন বক্—বক্—গল্—গল্—করিয়া বিস্তর আপত্তি করিল। আমি জানি, শূন্য কলসীতে জল পূরিতে গেলে কলসী, কি মৃৎকলসী, কি মনুষ্যকলসী, এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকে—বড় গণ্ডগোল করে। পরে অন্তঃশূন্য কলসী, পূর্ণতোয় হইলে রোহিণী ঘাটে উঠিয়া, আর্দ্রবস্ত্রে দেহ সুচারুরূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া, ধীরে ধীরে ঘরে যাইতে লাগিল। তখন চলৎ ছলৎ ঠনাক্! ঝিনিক্ ঠিনিকি ঠিন্! বলিয়া, কলসীতে আর কলসীর জলেতে আর রোহিণীর বালাতে কথোপকথন হইতে লাগিল। আর রোহিণীর মনও সেই কথোপকথনে আসিয়া যোগ দিল—

রোহিণীর মন বলিল—উইল চুরি করা কাজটা!

জল বলিল—ছলাৎ!

রোহিণীর মন—কাজটা ভাল হয় নাই।

বালা বলিল—ঠিন্ ঠিনা—না! তা ত না—

রোহিণীর মন—এখন উপায়?

কলসী—ঠনক্ ঢনক্ ঢন্—উপায় আমি,—দড়ি সহযোগে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রোহিণী সকাল সকাল পাককার্য্য সমাধা করিয়া, ব্রহ্মানন্দকে ভোজন করাইয়া, আপনি অনাহারে শয়নগৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়া শয়ন করিল। নিদ্রার জন্য নহে—চিন্তার জন্য।

তুমি দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতামত ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া, আমার কাছে একটা মোটা কথা শুন। সুমতি নামে দেবকন্যা, এবং কুমতি নামে রাক্ষসী, এই দুই জন সর্ব্বদা মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে; এবং সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। যেমন দুইটা ব্যাঘ্রী, মৃত গাভী লইয়া পরস্পরে যুদ্ধ করে, যেমন দুই শৃগালী মৃত নরদেহ লইয়া বিবাদ করে, ইহারা জীবন্ত মনুষ্য লইয়া সেইরূপ করে। আজি, এই বিজন শয়নাগারে, রোহিণীকে লইয়া সেই দুই জনে সেইরূপ ঘোর বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল।

সুমতি বলিতেছিল, "এমন লোকেরও সর্ব্বনাশ করিতে আছে?"

কুমতি। উইল ত হরলালকে দিই নাই। সর্ব্বনাশ কই করিয়াছি?

সু। কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।

কু। বাঃ, যখন কৃষ্ণকান্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, "এ উইল তুমি কোথায় পাইলে, আর আমার দেরাজে আর একখানা জাল উইলই বা কোথা হইতে আসিল," তখন আমি কি বলিব? কি মজার কথা! কাকাতে আমাতে দুজনে থানায় যেতে বল না কি?

সু। তবে সকল কথা কেন গোবিন্দলালের কাছে খুলিয়া বলিয়া, তাহার পায়ে কাঁদিয়া পড় না? সে দয়ালু, অবশ্য তোমাকে রক্ষা করিবে।

কু। সেই কথা। কিন্তু গোবিন্দলালকে অবশ্য এ সকল কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে জানাইতে হইবে, নইলে উইলের বদল ভাঙ্গিবে না। কৃষ্ণকান্ত যদি থানায় দেয়, তবে গোবিন্দলাল রাখিবে কি প্রকারে? বরং আর এক পরামর্শ আছে। এখন চুপ করিয়া থাক—আগে কৃষ্ণকান্ত মরুক, তার পর তোমার পরামর্শ মতে গোবিন্দলালের কাছে গিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া পড়িব। তখন তাঁহাকে উইল দিব।

সু। তখন বৃথা হইবে। যে উইল কৃষ্ণকান্তের ঘরে পাওয়া যাইবে, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। গোবিন্দলাল সে উইল বাহির করিলে, জালের অপবাদগ্রস্ত হইতে পারে।

কু। তবে চুপ করিয়া থাক—যা হইয়াছে, তা হইয়াছে।

সুতরাং সুমতি চুপ করিল—তাহার পরাজয় হইল। তার পর দুই জনে সন্ধি করিয়া, সখ্যভাবে আর এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সেই বাপীতীরবিরাজিত, চন্দ্রালোক-প্রতিভাসিত, চম্পকদামবিনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি আনিয়া, রোহিণীর মানস চক্ষের অগ্রে ধরিল। রোহিণী দেখিতে লাগিল—দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে, কাঁদিল। রোহিণী সে রাত্রে ঘুমাইল না।

নবম পরিচ্ছেদ

সেই অবধি নিত্য কলসী কক্ষে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়; নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য সেই গোবিন্দলালকে পুষ্পকাননমধ্যে দেখিতে পায়, নিত্য সুমতি কুমতিতে সন্ধিবিগ্রহ উভয়ই ঘটনা হয়। সুমতি কুমতির বিবাদ বিসংবাদ মনুষ্যের

সহনীয়; কিন্তু সুমতি কুমতির সদ্ভাব অতিশয় বিপত্তিজনক। তখন সুমতি কুমতির রূপ ধারণ করে, কুমতি সুমতির কাজ করে। তখন কে সুমতি, কে কুমতি, চিনিতে পারা যায় না। লোকে সুমতি বলিয়া কুমতির বশ হয়।

যাই হউক, কুমতি হউক, সুমতি হউক, গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র। দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল। তখন সংসার তাহার চক্ষে—যাক্, পুরাতন কথা আমার তুলিয়া কাজ নাই। রোহিণী, সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল। কুমতির পুনর্ব্বার জয় হইল।

কেন যে এত কালের পর, তাহার এ দুর্দ্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে —কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি। সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ—এই সকল উপলক্ষে কিছু কাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। তাহাতে কি হয় না হয়, তাহা আমি জানি না, যেমন ঘটিয়াছে, আমি তেমনি লিখিতেছি।

রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী, একবারেই বুঝিল যে, মরিবার কথা। যদি গোবিন্দলাল ঘুণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে, তবে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না। হয় ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে এ কথা বলিবার নহে। রোহিণী অতি যত্নে, মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল।

কিন্তু যেমন লুক্কায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্তে তাহাই হইতে লাগিল। জীবনভার বহন করা, রোহিণীর পক্ষে কষ্টদায়ক হইল। রোহিণী মনে মনে রাত্রিদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।

কত লোকে যে মনে মনে মৃত্যুকামনা করে, কে তাহার সংখ্যা রাখে? আমার বোধ হয়, যাহারা সুখী, যাহারা দুঃখী, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কায়মনোবাক্যে মৃত্যু-কামনা করে। এ পৃথিবীর সুখ সুখ নহে, সুখও দুঃখময়, কোন সুখেই সুখ নাই, কোন সুখই সম্পূর্ণ নহে, এই জন্য অনেক সুখী জনে মৃত্যুকামনা করে—আর দুঃখী, দুঃখের ভার আর বহিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুকে ডাকে।

মৃত্যুকে ডাকে, কিন্তু কার কাছে মৃত্যু আসে? ডাকিলে মৃত্যু আসে না। যে সুখী, যে মরিতে চায় না, যে সুন্দর, যে যুবা, যে আশাপূর্ণ, যাহার চক্ষে পৃথিবী নন্দনকানন, মৃত্যু তাহারই কাছে আসে। রোহিণীর মত কাহারও কাছে আসে না। এ দিকে মনুষ্যের এমনি শক্তি অল্প যে, মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র সূচীবেধে, অর্দ্ধবিন্দু ঔষধভক্ষণে, এ নশ্বর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, এ চঞ্চল জলবিম্ব কালসাগরে মিলাইতে পারে—কিন্তু আন্তরিক মৃত্যুকামনা করিলেও প্রায় কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সূচ ফুটায় না, সে অর্দ্ধবিন্দু ঔষধ পান করে না। কেহ কেহ তাহা পারে, কিন্তু রোহিণী সে দলের নহে—রোহিণী তাহা পারিল না।

কিন্তু এক বিষয়ে রোহিণী কৃতসংকল্প হইল—জাল উইল চালান হইবে না। ইহার এক সহজ উপায় ছিল—কৃষ্ণকান্তকে বলিলে, কি কাহারও দ্বারা বলাইলেই হইল যে, মহাশয়ের উইল চুরি গিয়াছে—দেরাজ খুলিয়া যে উইল আছে, তাহা পড়িয়া দেখুন। রোহিণী যে চুরি করিয়াছিল, ইহাও প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই—যেই চুরি করুক, কৃষ্ণকান্তের মনে একবার সন্দেহমাত্র জন্মিলে, তিনি সিন্দুক খুলিয়া উইল পড়িয়া দেখিবেন—তাহা হইলেই জাল উইল দেখিয়া নূতন উইল প্রস্তুত করিবেন। গোবিন্দলালের সম্পত্তির রক্ষা হইবে, অথচ কেহ জানিতে পারিবে না যে, কে উইল চুরি করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ্—কৃষ্ণকান্ত জাল উইল পড়িলেই জানিতে পারিবেন যে, ইহা ব্রহ্মানন্দের হাতের লেখা—তখন ব্রহ্মানন্দ মহা বিপদে পড়িবেন। অতএব দেরাজে যে জাল উইল আছে, ইহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

অতএব হরলালের লোভে রোহিণী, গোবিন্দলালের যে গুরুতর অনিষ্ট সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎপ্রতিকারার্থ বিশেষ ব্যাকুলা হইয়াও সে খুল্লতাতের রক্ষানুরোধে কিছুই করিতে পারিল না। শেষ সিদ্ধান্ত করিল, যে প্রকারে প্রকৃত উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে জাল উইল লইয়া আসিবে।

নিশীথকালে, রোহিণী সুন্দরী, প্রকৃত উইলখানি লইয়া সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। খড়কীদ্বার রুদ্ধ; সদর ফটকে যথায় দ্বারবানেরা চারপাইয়ে উপবেশন করিয়া, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে, অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে, পিলু রাগিণীর পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, রোহিণী সেইখানে উপস্থিত হইল। দ্বারবানেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?" রোহিণী বলিল, "সখী।" সখী, বাটীর একজন যুবতী চাকরাণী, সুতরাং

দ্বারবানেরা আর কিছু বলিল না। রোহিণী নির্ব্বিঘ্নে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, পূর্ব্বপরিচিত পথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে গেলেন—পুরী সুরক্ষিত বলিয়া কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইত না। প্রবেশকালে কাণ পাতিয়া রোহিণী শুনিল যে, অবাধে কৃষ্ণকান্তের নাসিকাগর্জ্জন হইতেছে। তখন ধীরে ধীরে বিনা শব্দে উইলচোর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দীপ নির্ব্বাপিত করিল। পরে পূর্ব্বমত চাবি সংগ্রহ করিল। এবং পূর্ব্বমত, অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া, দেরাজ খুলিল।

রোহিণী অতিশয় সাবধান, হস্ত অতি কোমলগতি। তথাপি চাবি ফিরাইতে খট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

কৃষ্ণকান্ত ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, কি শব্দ হইল। কোন সাড়া দিলেন না—কাণ পাতিয়া রহিলেন।

রোহিণীও দেখিলেন যে, নাসিকাগর্জ্জনশব্দ বন্ধ হইয়াছে। রোহিণী বুঝিলেন, কৃষ্ণকান্তের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। রোহিণী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "কে ও?" কেহ কোন উত্তর দিল না।

সে রোহিণী আর নাই। রোহিণী এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা—বোধ হয় একটু ভয় হইয়াছিল—একটু নিশ্বাসের শব্দ হইয়াছিল। নিশ্বাসের শব্দ কৃষ্ণকান্তের কাণে গেল।

কৃষ্ণকান্ত হরিকে বার কয় ডাকিলেন। রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে পলাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দলালের প্রতীকার হয় না। রোহিণী মনে মনে ভাবিল, "দুষ্কর্ম্মের জন্য সে দিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজ সৎকর্ম্মের জন্য তাহা করিতে পারি না কেন? ধরা পড়ি পড়িব।" রোহিণী পলাইল না।

কৃষ্ণকান্ত কয় বার হরিকে ডাকিয়া কোন উত্তর পাইলেন না। হরি স্থানান্তরে সুখানুসন্ধানে গমন করিয়াছিল—শীঘ্র আসিবে। তখন কৃষ্ণকান্ত উপাধানতল হইতে অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা গ্রহণপূর্ব্বক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন। শলাকালোকে দেখিলেন, গৃহমধ্যে, দেরাজের কাছে, স্ত্রীলোক।

জ্বলিত শলাকাসংযোগে কৃষ্ণকান্ত বাতি জ্বালিলেন। স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কে?"

রোহিণী কৃষ্ণকান্তের কাছে গেল। বলিল, "আমি রোহিণী।"

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "এত রাত্রে অন্ধকারে এখানে কি করিতেছিলে?"
রোহিণী বলিল, "চুরি করিতেছিলাম।"

কৃষ্ণ। রঙ্গ রহস্য রাখ। কেন এ অবস্থায় তোমাকে দেখিলাম বল। তুমি চুরি করিতে আসিয়াছ, এ কথা সহসা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোরের অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতেছি।

রোহিণী বলিল, "তবে আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা আপনার সম্মুখেই করি, দেখুন। পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন। আমি ধরা পড়িয়াছি, পলাইতে পারিব না। পলাইব না।"

এই বলিয়া রোহিণী, দেরাজের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া দেরাজ টানিয়া খুলিল। তাহার ভিতর হইতে জাল উইল বাহির করিয়া, প্রকৃত উইল সংস্থাপিত করিল। পরে জাল উইলখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফাড়িয়া ফেলিল।

"হাঁ হাঁ, ও কি ফাড়? দেখি দেখি" বলিয়া কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিলেন। কিন্তু তিনি চীৎকার করিতে করিতে রোহিণী সেই খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন উইল, অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে লোচন আরক্ত করিয়া বলিলেন, "ও কি পোড়াইলি?"

রোহিণী। একখানি কৃত্রিম উইল।

কৃষ্ণকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন, "উইল! উইল! আমার উইল কোথায়?"

রো। আপনার উইল দেরাজের ভিতর আছে, আপনি দেখুন না।

এই যুবতীর স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "কোন দেবতা ছলনা করিতে আসেন নাই ত?"

কৃষ্ণকান্ত তখন দেরাজ খুলিয়া দেখিলেন, একখানি উইল তন্মধ্যে আছে। সেখানি বাহির করিলেন, চস্‌মা বাহির করিলেন; উইলখানি পড়িয়া দেখিয়া জানিলেন, তাঁহার প্রকৃত উইল বটে। বিস্মিত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পোড়াইলে কি?"

রো। একখানি জাল উইল।

কৃ। জাল উইল? জাল উইল কে করিল? তুমি তাহা কোথা পাইলে?

রো। কে করিল, তাহা বলিতে পারি না—উহা আমি এই দেরাজের মধ্যে পাইয়াছি।

কৃ। তুমি কি প্রকারে সন্ধান জানিলে যে, দেরাজের ভিতর কৃত্রিম উইল আছে?

রো। তাহা আমি বলিতে পারিব না।

কৃষ্ণকান্ত কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "যদি আমি তোমার মত স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্রবুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিব, তবে এ বিষয় সম্পত্তি এত কাল রক্ষা করিলাম কি প্রকারে? এ জাল উইল হরলালের তৈয়ারি। বোধ হয় তুমি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে! তার পর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ঠিক কথা কি না?"

রো। তাহা নহে।

কৃ। তাহা নহে? তবে কি?

রো। আমি কিছু বলিব না। আমি আপনার ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমাকে যাহা করিতে হয় করুন।

কৃ। তুমি মন্দ কর্ম্ম করিতে আসিয়াছিলে সন্দেহ নাই, নহিলে এ প্রকারে চোরের মত আসিবে কেন? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিষে দিব না, কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আজ তুমি কয়েদ থাক।

রোহিণী সে রাত্রে আবদ্ধ রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রের প্রভাতে শয্যাগৃহে মুক্ত বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া, গোবিন্দলাল। ঠিক প্রভাত হয় নাই—কিছু বাকি আছে। এখনও গৃহপ্রাঙ্গণস্থ কামিনীকুঞ্জে, কোকিল প্রথম ডাক ডাকে নাই। কিন্তু দোয়েল গীত আরম্ভ করিয়াছে। ঊষার শীতল বাতাস উঠিয়াছে —গোবিন্দলাল বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া, সেই উদ্যানস্থিত মল্লিকা গন্ধরাজ কুটজের পরিমলবাহী শীতল প্রভাতবায়ু সেবনজন্য তৎসমীপে দাঁড়াইলেন। অমনি তাঁহার পাশে আসিয়া একটি ক্ষুদ্রশরীরা বালিকা দাঁড়াইল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আবার তুমি এখানে কেন?"

বালিকা বলিল, "তুমি এখানে কেন?" বলিতে হইবে না যে, এই বালিকা গোবিন্দলালের স্ত্রী।

গোবিন্দ। আমি একটু বাতাস খেতে এলেম, তাও কি তোমার সইল না?

বালিকা বলিল, "সবে কেন? এখনই আবার খাই খাই? ঘরের সামগ্রী খেয়ে মন উঠে না, আবার মাঠে ঘাটে বাতাস খেতে উকি মারেন!"

গো। ঘরের সামগ্রী এত কি খাইলাম?

"কেন, এইমাত্র আমার কাছে গালি খাইয়াছ?"

গোবিন্দ। জান না, ভোমরা, গালি খাইলে যদি বাঙ্গালীর ছেলের পেট ভরিত, তাহা হইলে, এ দেশের লোক এত দিনে সগোষ্ঠী বদ হজমে মরিয়া যাইত। ও সামগ্রীটি অতি সহজে বাঙ্গালা পেটে জীর্ণ হয়। তুমি আর একবার নথ নাড়ো, ভোমরা, আমি আর একবার দেখি।

গোবিন্দলালের পত্নীর যথার্থ নাম কৃষ্ণমোহিনী, কি কৃষ্ণকামিনী, কি অনঙ্গমঞ্জরী, কি এমনই একটা কি তাঁহার পিতা মাতা রাখিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে লেখে না। অব্যবহারে সে নাম লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার আদরের নাম "ভ্রমর" বা "ভোমরা"। সার্থকতাবশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল। ভোমরা কালো।

ভোমরা নথ নাড়ার পক্ষে বিশেষ আপত্তি জানাইবার জন্য নথ খুলিয়া, একটা হুকে রাখিয়া, গোবিন্দলালের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। পরে গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল,—মনে মনে জ্ঞান, যেন বড় একটা কীর্ত্তি করিয়াছি। গোবিন্দলালও তাহার মুখপানে চাহিয়া অতৃপ্তলোচনে দৃষ্টি করিতেছিলেন। সেই সময়ে, সূর্য্যোদয়সূচক প্রথম রশ্মিকিরীট পূর্ব্বগগনে দেখা দিল—তাহার মৃদুল জ্যোতিঃপুঞ্জ ভূমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নবীনালোক পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া পূর্ব্বমুখী ভ্রমরের মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই উজ্জ্বল, পরিষ্কার, কোমল, শ্যামচ্ছবি মুখকান্তির উপর কোমল প্রভাতালোক পড়িয়া তাহার বিস্ফারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জ্বলিল, তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডে প্রভাসিত হইল। হাসি—চাহনিতে, সেই আলোতে, গোবিন্দলালের আদরে আর প্রভাতের বাতাসে—মিলিয়া গেল।

এই সময়ে সুপ্তোত্থিতা চাকরাণী মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তৎপূর্বে ঘর ঝাঁটান, জল ছড়ান, বাসন মাজা, ইত্যাদির একটা সপ্ সপ্ ছপ্ ছপ্ ঝন্ ঝন্ খন্ খন্ শব্দ হইতেছিল, অকস্মাৎ সে শব্দ বন্ধ হইয়া, "ও মা, কি হবে!" "কি সর্ব্বনাশ!" "কি আস্পর্দ্ধা!" "কি সাহস!" মাঝে মাঝে হাসি টিট্কারি ইত্যাদি গোলযোগ উপস্থিত হইল। শুনিয়া ভ্রমর বাহিরে আসিল।

চাকরাণী সম্প্রদায় ভ্রমরকে বড় মানিত না, তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। একে ভ্রমর ছেলে মানুষ, তাতে ভ্রমর স্বয়ং গৃহিণী নহেন, তাঁহার শাশুড়ী ননদ ছিল, তার পর আবার ভ্রমর নিজে হাসিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিলেন না। ভ্রমরকে দেখিয়া চাকরাণীর দল বড় গোলযোগ বাড়াইল--

নং ১—আর শুনেছ বৌ ঠাকরুণ ?

নং ২—এমন সর্ব্বনেশে কথা কেহ কখনও শুনে নাই।

নং ৩—কি সাহস। মাগীকে ঝাঁটাপেটা করে আস্‌বো এখন।

নং ৪—শুধু ঝাঁটা—বৌ ঠাকরুণ—বল, আমি তার নাক কেটে নিয়ে আসি।

নং ৫—কার পেটে কি আছে মা—তা কেমন করে জান্‌বো মা—

ভ্রমরা হাসিয়া বলিল, "আগে বল না কি হয়েছে, তার পর যার মনে যা থাকে করিস্।" তখনই আবার পূর্ব্ববৎ গোলযোগ আরম্ভ হইল।

নং ১ বলিল—শোন নি ? পাড়াশুদ্ধ গোলমাল হয়ে গেল যে—

নং ২ বলিল—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

নং ৩—মাগীর ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়িয়া দিই।

নং ৪—কি বল্‌ব বৌ ঠাকরুণ, বামন হয়ে চাঁদে হাত।

নং ৫—ভিজে বেরালকে চিন্‌তে জোগায় না।—গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!

ভ্রমর বলিলেন, "তোদের।"

চাকরাণীরা তখন একবাক্যে বলিতে লাগিল, "আমাদের কি দোষ! আমরা কি করিলাম! তা জানি গো জানি। যে যেখানে যা কর্‌বে, দোষ হবে আমাদের। আমাদের আর উপায় নাই বলিয়া গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি।" এই বক্তৃতা সমাপন করিয়া, দুই এক জন চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এক জনের মৃত পুত্রের শোক উছলিয়া উঠিল। ভ্রমর কাতর হইলেন—কিন্তু হাসিও সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তোদের গলায় দড়ি এই জন্য যে, এখনও তোরা বলিতে পারিলি না যে, কথাটা কি। কি হয়েছে ?"

তখন আবার চারি দিক্ হইতে চারি পাঁচ রকমের গলা ছুটিল। বহুকষ্টে, ভ্রমর, সেই অনন্ত বক্তৃতাপরম্পরা হইতে এই ভাবার্থ সঙ্কলন করিলেন যে, গত রাত্রে কর্ত্তা মহাশয়ের শয়ন-কক্ষে একটা চুরি হইয়াছে। কেহ বলিল, চুরি নহে, ডাকাতি, কেহ বলিল, সিঁদ, কেহ বলিল, না, কেবল জন চারি পাঁচ চোর আসিয়া লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ লইয়া গিয়াছে।

ভ্রমর বলিল, "তার পর ? কোন্ মাগীর নাক কাটিতে চাহিতেছিলি ?"

নং ১—রোহিণী ঠাকরুণের—আর কার ?

নং ২—সেই আবাগীই ত সর্ব্বনাশের গোড়া।

নং ৩—সেই না কি ডাকাতের দল সঙ্গে করিয়া নিয়ে এসেছিল।

নং ৪—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

নং ৫—এখন মরুন জেল খেটে।

ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "রোহিণী যে চুরি করিতে আসিয়াছিল, তোরা কেমন করে জানলি ?"

"কেন, সে যে ধরা পড়েছে। কাছারির গারদে কয়েদ আছে।"

ভ্রমর যাহা শুনিলেন, তাহা গিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন। গোবিন্দলাল ভাবিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

ভ্র। ঘাড় নাড়িলে যে ?

গো। আমার বিশ্বাস হইল না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয় ?

ভোমরা বলিল, "না।"

গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি ? লোকে ত বলিতেছে

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি ?

গো। তা সময়ান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে বল।

ভ্র। তুমি আগে বল।

গোবিন্দলাল হাসিল, বলিল, "তুমি আগে।"

ভ্র। কেন আগে বলিব ?

গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে।

ভ্র। সত্য বলিব ?

গো। সত্য বল।

ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরবে রহিল।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রোহিণী যে নিরপরাধিনী, ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্তিত্বে যতদূর বিশ্বাস, ভ্রমর উহার নির্দ্দোষিতায়

ততদূর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না—কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছেন যে, "সে নির্দ্দোষী, আমার এইরূপ বিশ্বাস।" গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই সে কালো এত ভালবাসিতেন।

হাসিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি বলিব, কেন তুমি রোহিণীর দিকে?"

ভ্র। কেন?

গো। সে তোমায় কালো না বলিয়া উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে।

ভ্রমর কোপকুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিল, "যাও।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যাই।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিলেন।

ভ্রমর তাঁহার বসন ধরিল—"কোথা যাও?"

গো। কোথা যাই বল দেখি?

ভ্র। এবার বলিব?

গো। বল দেখি?

ভ্র। রোহিণীকে বাঁচাইতে।

"তাই।" বলিয়া গোবিন্দলাল ভোমরার মুখচুম্বন করিলেন। পরদুঃখকাতরের হৃদয় পরদুঃখকাতরে বুঝিল—তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরের মুখচুম্বন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্ত রায়ের সদর কাছারিতে গিয়া দর্শন দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত প্রাতঃকালেই কাছারিতে বসিয়াছিলেন। গদির উপর মস্‌নদ করিয়া বসিয়া, সোণার আলবোলায় অম্বুরি তামাকু চড়াইয়া, মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গের অনুকরণ করিতেছিলেন। এক পাশে রাশি রাশি দপ্তরে বাঁধা চিঠা, খতিয়ান, দাখিলা, জমাওয়াশীল, থোকা, করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়—আর এক পাশে নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, মুহরি, তহশীলদার, আমীন, পাইক, প্রজা। সম্মুখে অধোবদনা অবগুণ্ঠনবতী রোহিণী।

গোবিন্দলাল আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে জ্যেঠা মহাশয়?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, রোহিণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া, তাঁহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার কথায় কি উত্তর করিলেন, তৎপ্রতি গোবিন্দলাল বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, সেই কটাক্ষের অর্থ কি। শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন, "এ কাতর কটাক্ষের অর্থ, ভিক্ষা।"

কি ভিক্ষা? গোবিন্দলাল ভাবিলেন, আর্ত্তের ভিক্ষা আর কি? বিপদ্ হইতে উদ্ধার। সেই বাপীতীরে সোপানোপরে দাঁড়াইয়া যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার এই সময়ে মনে পড়িল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ের কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও।" আজি ত রোহিণীর কষ্ট বটে, বুঝি এই ইঙ্গিতে রোহিণী তাঁহাকে তাহা জানাইল।

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, "তোমার মঙ্গল সাধি, ইহা আমার ইচ্ছা; কেন না, ইহলোকে তোমার সহায় কেহ নাই দেখিতেছি। কিন্তু তুমি যে লোকের হাতে পড়িয়াছ—তোমার রক্ষা সহজ নহে।" এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে জ্যেষ্ঠতাতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে জ্যেঠা মহাশয়?"

বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত একবার সকল কথা আনুপূর্ব্বিক গোবিন্দলালকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীর কটাক্ষের ব্যাখ্যায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, কাণে কিছুই শুনেন নাই। ভ্রাতুষ্পুত্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, জ্যেঠা মহাশয়?" শুনিয়া বৃদ্ধ মনে মনে ভাবিল, "হয়েছে! ছেলেটা বুঝি মাগীর চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভুলে গেল।" কৃষ্ণকান্ত আবার আনুপূর্ব্বিক গত রাত্রের বৃত্তান্ত গোবিন্দলালকে শুনাইলেন। সমাপন করিয়া বলিলেন, "এ সেই হরা পাজির কারসাজি। বোধ হইতেছে, এ মাগী তাহার কাছে টাকা খাইয়া, জাল উইল রাখিয়া, আসল উইল চুরি করিবার জন্য আসিয়াছিল। তার পর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।"

গো। রোহিণী কি বলে?

কৃ। ও আর বলিবে কি? বলে, তা নয়।

গোবিন্দলাল রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা নয় ত তবে কি রোহিণি?"

রোহিণী মুখ না তুলিয়া, গদগদ কণ্ঠে বলিল, "আমি আপনাদের হাতে পড়িয়াছি, যাহা করিবার হয় করুন। আমি আর কিছু বলিব না।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেখিলে বদ্‌জাতি?"

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, এ পৃথিবীতে সকলেই বদ্‌জাত নহে। ইহার ভিতর বদ্‌জাতি ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "ইহার প্রতি কি হুকুম দিয়াছেন? একে কি থানায় পাঠাইবেন?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারি কি! আমিই থানা, আমিই মেজেষ্টর, আমিই জজ। বিশেষ এই ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে জেলে দিয়া আমার কি পৌরুষ বাড়িবে?"

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি করিবেন?"

কৃ। ইহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, কুলার বাতাস দিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আমার এলেকায় আর না আসিতে পারে।

গোবিন্দলাল আবার রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল, রোহিণি?"

রোহিণী বলিল, "ক্ষতি কি!"

গোবিন্দলাল বিস্মিত হইলেন। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন, "একটা নিবেদন আছে।"

কৃ। কি?

গো। ইহাকে একবার ছাড়িয়া দিন। আমি জামিন হইতেছি—বেলা দশটার সময়ে আনিয়া দিব।

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "বুঝি যা ভেবেছি, তাই। বাবাজির কিছু গরজ দেখ্‌ছি।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "কোথায় যাইবে? কেন ছাড়িব?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আসল কথা কি, জানা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এত লোকের সাক্ষাতে আসল কথা এ প্রকাশ করিবে না। ইহাকে একবার অন্দরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিব।"

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "ওর গোষ্ঠীর মুণ্ডু কর্‌বে। এ কালের ছেলেপুলে বড় বেহায়া হয়ে উঠেছে। রহ ছুঁচো! আমিও তোর উপর এক চাল চালিব।" এই ভাবিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "বেশ ত।" বলিয়া কৃষ্ণকান্ত এক জন নগদীকে বলিলেন, "ও রে! একে সঙ্গে করিয়া, এক জন চাকরাণী দিয়া, মেজ বৌমার কাছে পাঠিয়ে দে ত, দেখিস্, যেন পালায় না।"

নগদী রোহিণীকে লইয়া গেল। গোবিন্দলাল প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "দুর্গা! দুর্গা! ছেলেগুলো হলো কি?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন যে, ভ্রমর, রোহিণীকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাল কথা বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এ দায় সম্বন্ধে ভাল কথা বলিলেও রোহিণীর কান্না আসে, এ জন্য তাহাও বলিতে পারিতেছে না। গোবিন্দলাল আসিলেন দেখিয়া ভ্রমর যেন দায় হইতে উদ্ধার পাইল। শীঘ্রগতি দূরে গিয়া গোবিন্দলালকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে গেলেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোহিণী এখানে কেন?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি গোপনে উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। তাহার পর উহার কপালে যা থাকে, হবে।"

ভ্র। কি জিজ্ঞাসা করিবে?

গো। উহার মনের কথা। আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয়, আড়াল হইতে শুনিও।

ভোমরা বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পলাইল। একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইয়া, পিছন হইতে পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "রাঁধুনি ঠাকুরঝি! রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে একটি রূপকথা বল না।"

এ দিকে গোবিন্দলাল, রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বৃত্তান্ত আমাকে সকল বিশেষ করিয়া বলিবে কি?" বলিবার জন্য রোহিণীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—কিন্তু যে জাতি জীয়ন্তে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিণীও সেই জাতীয়া—আর্য্যকন্যা। বলিল, "কর্ত্তার কাছে সবিশেষ শুনিয়াছেন ত।"

গো। কর্ত্তা বলেন, তুমি জাল উইল রাখিয়া, আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে। তাই কি?

রো। তা নয়।

গো। তবে কি?

রো। বলিয়া কি হইবে?

গো। তোমার ভাল হইতে পারে।

রো। আপনি বিশ্বাস করিলে ত?

গো। বিশ্বাসযোগ্য কথা হইলে কেন বিশ্বাস করিব না?

রো। বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে।

গো। আমার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য, কি অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমি জানি, তুমি জানিবে কি প্রকারে? আমি অবিশ্বাসযোগ্য কথাতেও কখনও কখনও বিশ্বাস করি।

রোহিণী মনে মনে বলিল, "নহিলে আমি তোমার জন্যে মরিতে বসিব কেন? যাই হৌক, আমি ত মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব।" প্রকাশ্যে বলিল, "সে আপনার মহিমা। কিন্তু আপনাকে এ দুঃখের কাহিনী বলিয়াই বা কি হইবে?"

গো। যদি আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারি।

রো। কি উপকার করিবেন?

গোবিন্দলাল ভাবিলেন, "ইহার যোড়া নাই। যাই হউক, এ কাতরা—ইহাকে সহজে পরিত্যাগ করা নহে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "যদি পারি, কর্ত্তাকে অনুরোধ করিব। তিনি তোমায় ত্যাগ করিবেন।"

রো। আর যদি আপনি অনুরোধ না করেন, তবে তিনি আমায় কি করিবেন?

গো। শুনিয়াছ ত?

রো। আমার মাথা মুড়াইবেন, ঘোল ঢালিয়া দিবেন, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। ইহার ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।—এ কলঙ্কের পর, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেই আমার উপকার। আমাকে তাড়াইয়া না দিলে, আমি আপনিই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব। আর এ দেশে মুখ দেখাইব কি প্রকারে? ঘোল ঢালা বড় গুরুতর দণ্ড নয়, ধুইলেই ঘোল যাইবে। বাকি এই কেশ—

এই বলিয়া রোহিণী একবার আপনার তরঙ্গক্ষুব্ধ কৃষ্ণতড়াগতুল্য কেশদাম প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিতে লাগিল, "এই কেশ—আপনি কাঁচি আনিতে বলুন, আমি বৌ ঠাকুরুণের চুলের দড়ি বিনাইবার জন্য ইহার সকলগুলি কাটিয়া দিয়া যাইতেছি।"

গোবিন্দলাল ব্যথিত হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি রোহিণী। কলঙ্কই তোমার দণ্ড। সে দণ্ড হইতে রক্ষা না হইলে, অন্য দণ্ডে তোমার আপত্তি নাই।"

রোহিণী এবার কাঁদিল। হৃদয়মধ্যে গোবিন্দলালকে শত সহস্র ধন্যবাদ করিতে লাগিল। বলিল, "যদি বুঝিয়াছেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্কদণ্ড হইতে কি আমায় রক্ষা করিতে পারিবেন?"

গোবিন্দলাল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। আসল কথা শুনিতে পাইলে, বলিতে পারি যে, পারিব কি না।"

রোহিণী বলিল, "কি জানিতে চাহেন, জিজ্ঞাসা করুন।"

গো। তুমি যাহা পোড়াইয়াছ, তাহা কি ?

রো। জাল উইল।

গো। কোথায় পাইয়াছিলে ?

রো। কর্ত্তার ঘরে, দেরাজে।

গো। জাল উইল সেখানে কি প্রকারে আসিল ?

রো। আমিই রাখিয়া গিয়াছিলাম। যে দিন আসল উইল লেখা পড়া হয়, সেই দিন রাত্রে আসিয়া, আসল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল রাখিয়া গিয়াছিলাম।

গো। কেন, তোমার কি প্রয়োজন ?

রো। হরলাল বাবুর অনুরোধে।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে কালি রাত্রে আবার কি করিতে আসিয়াছিলে ?"

রো। আসল উইল রাখিয়া, জাল উইল চুরি করিবার জন্য।

গো। কেন ? জাল উইলে কি ছিল ?

রো। বড় বাবুর বার আনা—আপনার এক পাই।

গো। কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে ? আমি ত কোন অনুরোধ করি নাই।

রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। বহু কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "না—অনুরোধ করেন নাই—কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই—যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।"

গো। কি সে রোহিণি ?

রো। সেই বারুণী পুকুরের তীরে, মনে করুন।

গো। কি রোহিণি ?

রো। কি ? ইহজন্মে আমি বলিতে পারিব না—কি। আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই—আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম। কিন্তু সে আপনার বাড়ীতে নহে। আপনি আমার অন্য উপকার করিতে পারেন না—কিন্তু এক উপকার করিতে পারেন—একবার ছাড়িয়া দিন, কাঁদিয়া আসি। তার পর যদি

আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে না হয়, আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবেন।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইল না—রাগও হইল না—সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল। বলিলেন, "রোহিণি, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি—আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন?"

গোবিন্দলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রোহিণী বলিল, "বলুন না?"

গো। তোমাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

রো। কেন?

গো। তুমি আপনিই ত বলিতেছিলে, তুমি এ দেশ ত্যাগ করিতে চাও।

রো। আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন?

গো। তোমায় আমায় আর দেখা শুনা না হয়।

রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন। মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল—বড় সুখী হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। আবার তাহার বাঁচিতে সাধ হইল। আবার তাহার দেশে থাকিতে বাসনা জন্মিল। মনুষ্য বড়ই পরাধীন।

রোহিণী বলিল, "আমি এখনই যাইতে রাজি আছি। কিন্তু কোথায় যাইব?"

গো। কলিকাতায়। সেখানে আমি আমার এক জন বন্ধুকে পত্র দিতেছি। তিনি তোমাকে একখানি বাড়ী কিনিয়া দিবেন, তোমার টাকা লাগিবে না।

রো। আমার খুড়ার কি হইবে?

গো। তিনি তোমার সঙ্গে যাইবেন, নহিলে তোমাকে কলিকাতায় যাইতে বলিতাম না।

রো। সেখানে দিনপাত করিব কি প্রকারে?

গো। আমার বন্ধু তোমার খুড়ার একটি চাকরি করিয়া দিবেন।

রো। খুড়া দেশত্যাগে সম্মত হইবেন কেন?

গো। তুমি কি তাঁহাকে এই ব্যাপারের পর সম্মত করিতে পারিবে না?

রো। পারিব। কিন্তু আপনার জ্যেষ্ঠতাতকে সম্মত করিবে কে? তিনি আমাকে ছাড়িবেন কেন?

গো। আমি অনুরোধ করিব।

রো। তাহা হইলে আমার কলঙ্কের উপর কলঙ্ক। আপনারও কিছু কলঙ্ক।

গো। সত্য; তোমার জন্য, কর্ত্তার কাছে ভ্রমর অনুরোধ করিবে। তুমি এখন ভ্রমরের অনুসন্ধানে যাও। তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া, আপনি এই বাড়ীতেই থাকিও। ডাকিলে যেন পাই।

রোহিণী সজলনয়নে গোবিন্দলালকে দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অনুসন্ধানে গেল। এইরূপে কলঙ্কে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর শ্বশুরকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইল না—বড় লজ্জা করে, ছি!

অগত্যা গোবিন্দলাল স্বয়ং কৃষ্ণকান্তের কাছে গেলেন। কৃষ্ণকান্ত তখন আহারান্তে পালঙ্কে অর্দ্ধশয়নাবস্থায়, আলবোলার নল হাতে করিয়া—সুষুপ্ত। এক দিকে তাঁহার নাসিকা নাদসুরে গমকে গমকে তানমূর্চ্ছনাদি সহিত নানাবিধ রাগরাগিণীর আলাপ করিতেছে—আর এক দিকে, তাঁহার মন, অহিফেনপ্রসাদাৎ ত্রিভুবনগামী অশ্বে আরূঢ় হইয়া নানা স্থান পর্য্যটন করিতেছে। রোহিণীর চাঁদপানা মুখখানা বুড়ারও মনের ভিতর ঢুকিয়াছিল বোধ হয়,—চাঁদ কোথায় উদয় না হয়?—নহিলে বুড়া আফিঙ্গের ঝোঁকে ইন্দ্রাণীর স্কন্ধে সে মুখ বসাইবে কেন? কৃষ্ণকান্ত দেখিতেছেন যে, রোহিণী হঠাৎ ইন্দ্রের শচী হইয়া, মহাদেবের গোহাল হইতে ষাঁড় চুরি করিতে গিয়াছে। নন্দী ত্রিশূল হস্তে ষাঁড়ের জাব দিতে গিয়া তাহাকে ধরিয়াছে। দেখিতেছেন, নন্দী রোহিণীর আলুলায়িত কুন্তলদাম ধরিয়া টানাটানি লাগাইয়াছে, এবং ষড়াননের ময়ূর, সন্ধান পাইয়া, তাহার সেই আগুল্ফ-বিলম্বিত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছকে স্ফীতফণা ফণিশ্রেণী ভ্রমে গিলিতে গিয়াছে—এমত সময়ে স্বয়ং ষড়ানন ময়ূরের দৌরাত্ম্য দেখিয়া নালিশ করিবার জন্য মহাদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া ডাকিতেছেন, "জ্যেঠা মহাশয়!"

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, "কার্ত্তিক মহাদেবকে কি সম্পর্কে জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিতেছেন?" এমত সময়ে কার্ত্তিক আবার ডাকিলেন, "জ্যেঠা মহাশয়!" কৃষ্ণকান্ত বড় বিরক্ত হইয়া, কার্ত্তিকের কাণ মলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে হস্ত উত্তোলন

করিলেন। অমনি কৃষ্ণকান্তের হস্তস্থিত আলবোলার নল হাত হইতে খসিয়া ঝনাৎ করিয়া পানের বাটার উপর পড়িয়া গেল, পানের বাটা ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ করিয়া পিকদানির উপর পড়িয়া গেল ; এবং নল, বাটা, পিকদানি, সকলেই একত্রে সহগমন করিয়া ভূতলশায়ী হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন যে, কার্ত্তিকেয় যথার্থই উপস্থিত। মূর্ত্তিমান স্কন্দবীরের ন্যায়, গোবিন্দলাল তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—ডাকিতেছেন, "জ্যেঠা মহাশয়!" কৃষ্ণকান্ত শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা গোবিন্দলাল ?" গোবিন্দলালকে বুড়া বড় ভালবাসিত।

গোবিন্দলালও কিছু অপ্রতিভ হইলেন—বলিলেন, "আপনি নিদ্রা যান—আমি এমন কিছু কাজে আসি নাই।" এই বলিয়া, গোবিন্দলাল পিকদানিটি উঠাইয়া সোজা করিয়া রাখিয়া, পানবাটা উঠাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, নলটি কৃষ্ণকান্তের হাতে দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত শক্ত বুড়া—সহজে ভুলে না—মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "কিছু না, এ ছুঁচো আবার সেই চাঁদমুখো মাগীর কথা বলিতে আসিয়াছে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "না। আমার ঘুম হইয়াছে—আর ঘুমাইব না।"

গোবিন্দলাল একটু গোলে পড়িলেন। রোহিণীর কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে বলিতে প্রাতে তাঁহার কোন লজ্জা করে নাই—এখন একটু লজ্জা করিতে লাগিল—কথা বলি বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না। রোহিণীর সঙ্গে বারুণী পুকুরের কথা হইয়াছিল বলিয়া কি এখন লজ্জা ?

বুড়া রঙ্গ দেখিতে লাগিল। গোবিন্দলাল, কোন কথা পাড়িতেছে না দেখিয়া, আপনি জমীদারির কথা পাড়িল—জমীদারির কথার পর সাংসারিক কথা, সাংসারিক কথার পর মোকদ্দমার কথা, তথাপি রোহিণীর দিক্ দিয়াও গেল না। গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা কিছুতেই পাড়িতে পারিলেন না। কৃষ্ণকান্ত মনে মনে ভারি হাসি হাসিতে লাগিলেন। বুড়া বড় দুষ্ট।

অগত্যা গোবিন্দলাল ফিরিয়া যাইতেছিলেন,—তখন কৃষ্ণকান্ত প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকাল বেলা যে মাগীকে তুমি জামিন হইয়া লইয়া গিয়াছিলে, সে মাগী কিছু স্বীকার করিয়াছে ?"

তখন গোবিন্দলাল পথ পাইয়া যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, সংক্ষেপে বলিলেন। বারুণী পুষ্করিণী ঘটিত কথাগুলি গোপন করিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "এখন তাহার প্রতি কিরূপ করা তোমার অভিপ্রায় ?"

গোবিন্দলাল লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনার যে অভিপ্রায়, আমাদিগেরও সেই অভিপ্রায়।"

কৃষ্ণকান্ত মনে মনে হাসিয়া, মুখে কিছুমাত্র হাসির লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, "আমি উহার কথায় বিশ্বাস করি না। উহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, দেশের বাহির করিয়া দাও—কি বল?"

গোবিন্দলাল চুপ করিয়া রহিলেন। তখন দুষ্ট বুড়া বলিল, "আর তোমরা যদি এমনই বিবেচনা কর যে, উহার দোষ নাই—তবে ছাড়িয়া দাও।"

গোবিন্দলাল তখন নিশ্বাস ছাড়িয়া, বুড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রোহিণী, গোবিন্দলালের অনুমতিক্রমে খুড়ার সঙ্গে বিদেশ যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আসিল। খুড়াকে কিছু না বলিয়া, ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া, রোহিণী কাঁদিতে বসিল।

"এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না—না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না? আমি যাইব না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির। এই হরিদ্রাগ্রামই আমার শ্মশান, এখানে আমি পুড়িয়া মরিব। শ্মশানে মরিতে পায় না, এমন কপালও আছে। আমি যদি এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া না যাই, ত আমার কে কি করিতে পারে? কৃষ্ণকান্ত রায় আমার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবে? আমি আবার আসিব। গোবিন্দলাল রাগ করিবে? করে করুক,—তবু আমি তাহাকে দেখিব। আমার চক্ষু ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না—কোথাও যাব না। যাই ত যমের বাড়ী যাব। আর কোথাও না।"

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, কালামুখী রোহিণী উঠিয়া দ্বার খুলিয়া আবার—"পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ"—সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল। মনে মনে বলিতে বলিতে চলিল,—"হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে

যাইতেছি—তাহাকে যতবার দেখিব, ততবার—আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু?—রাখিব কি প্রভু?—হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালি—হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও—আমার প্রাণ স্থির কর—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।"

তবু সেই স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়—থামিল না। কখনও ভাবিল, গরল খাই; কখনও ভাবিল, গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া, অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি; কখনও ভাবিল, পলাইয়া যাই; কখনও ভাবিল, বারুণীতে ডুবে মরি; কখনও ভাবিল, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই। রোহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দলালের কাছে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল।

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন? কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল ত?"

রো। না।

গো। সে কি? এইমাত্র আমার কাছে স্বীকার করিয়াছিলে?

রো। যাইতে পারিব না।

গো। বলিতে পারি না। জোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই—কিন্তু গেলে ভাল হইত।

রো। কিসে ভাল হইত?

গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন। স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলিবার তিনি কে?

রোহিণী তখন চক্ষের জল লুকাইয়া মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। গোবিন্দলাল নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন ভোমরা নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "ভাবৃছ কি?"

গো। বল দেখি?

ভ্র। আমার কালো রূপ।

গো। ইঃ—

ভোমরা ঘোরতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল, "সে কি? আমায় ভাবৃছ না? আমি ছাড়া, পৃথিবীতে তোমার অন্য চিন্তা আছে?"

গো। আছে না ত কি? সর্ব্বে সর্ব্বময়ী আর কি! আমি অন্য মানুষ ভাবৃতেছি।

ভ্রমর, তখন গোবিন্দলালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখচুম্বন করিয়া, আদরে গলিয়া গিয়া, আধো আধো, মৃদু মৃদু হাসিমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য মানুষ—কাকে ভাব্‌ছ বল না?"

গো। কি হবে তোমায় বলিয়া?

ভ্র। বল না।

গো। তুমি রাগ করিবে।

ভ্র। করি কর্‌বো—বল না।

গো। যাও, দেখ গিয়া সকলের খাওয়া হলো কি না।

ভ্র। দেখ্‌বো এখন—বল না কে মানুষ?

গো। সিয়াকুল কাঁটা! রোহিণীকে ভাব্‌ছিলাম।

ভ্র। কেন রোহিণীকে ভাব্‌ছিলে?

গো। তা কি জানি?

ভ্র। জান—বল না।

গো। মানুষ কি মানুষকে ভাবে না?

ভ্র। না। যে যাকে ভাল বাসে, সে তাকেই ভাবে, আমি তোমাকে ভাবি—তুমি আমাকে ভাব।

গো। তবে আমি রোহিণীকে ভাল বাসি।

ভ্র। মিছে কথা—তুমি আমাকে ভাল বাস—আর কাকেও তোমার ভাল বাস্‌তে নাই—কেন রোহিণীকে ভাব্‌ছিলে বল না?

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে আছে?

ভ্র। না।

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিণীর মা মাছ খায় কেন?

ভ্র। তার পোড়ার মুখ—যা কর্‌তে নাই, তাই করে।

গো। আমারও পোড়ার মুখ, যা কর্‌তে নাই, তাই করি। রোহিণীকে ভাল বাসি।

ধাঁ করিয়া গোবিন্দলালের গালে ভোমরা এক ঠোনা মারিল। বড় রাগ করিয়া বলিল, "আমি শ্রীমতী ভোমরা দাসী—আমার সাক্ষাতে মিছে কথা?"

গোবিন্দলাল হারি মানিল। ভ্রমরের স্কন্ধে হস্ত আরোপিত করিয়া, প্রফুল্লনীলোৎপল-দলতুল্য মধুরিমাময় তাহার মুখমণ্ডল স্বকরপল্লবে গ্রহণ করিয়া, মৃদু মৃদু অথচ গম্ভীর, কাতর

কণ্ঠে গোবিন্দলাল বলিল, "মিছে কথাই ভোমরা। আমি রোহিণীকে ভাল বাসি না। রোহিণী আমায় ভাল বাসে।"

তীব্র বেগে গোবিন্দলালের হাত হইতে মুখমণ্ডল মুক্ত করিয়া, ভোমরা দূরে গিয়া দাঁড়াইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "—আবাগী—পোড়ারমুখী—বাঁদরী মরুক! মরুক! মরুক! মরুক! মরুক!

গোবিন্দলাল হাসিয়া বলিলেন, "এখনই এত গালি কেন? তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি।"

ভোমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দূর, তা কেন—তা কি পারে—তা মাগী তোমার সাক্ষাতে বলিল কেন?"

গো। ঠিক ভোমরা—বলা তাহার উচিত ছিল না—তাই ভাবিতেছিলাম। আমি তাহাকে বাস উঠাইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম—খরচ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম।

ভো। তার পর?

গো। তার পর, সে রাজি হইল না।

ভো। ভাল, আমি তাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি?

গো। পার, কিন্তু আমি পরামর্শটা শুনিব।

ভো। শোন।

এই বলিয়া ভোমরা "ক্ষীরি! ক্ষীরি!" করিয়া এক জন চাকরাণীকে ডাকিল।

তখন ক্ষীরোদা—ওরফে ক্ষীরোদমণি—ওরফে ক্ষীরাব্ধিতনয়া—ওরফে শুধু ক্ষীরি আসিয়া দাঁড়াইল—মোটাসোটা গাটা গোটা—মল পায়ে—গোট পরা—হাসি চাহনিতে ভরা ভরা। ভোমরা বলিল, "ক্ষীরি,—রোহিণী পোড়ারমুখীর কাছে এখনই একবার যাইতে পার্‌বি?"

ক্ষীরি বলিল, "পার্‌ব না কেন? কি বল্‌তে হবে?"

ভোমরা বলিল, "আমার নাম করিয়া বলিয়া আয় যে, তিনি বল্‌লেন, তুমি মর।"

"এই? যাই।" বলিয়া ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি—মল বাজাইয়া চলিল। গমনকালে ভোমরা বলিয়া দিল, "কি বলে, আমায় বলিয়া যাস্‌।"

"আচ্ছা।" বলিয়া ক্ষীরোদা গেল। অল্পকালমধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বলিয়া আসিয়াছি।"

ভো। সে কি বলিল ?

ক্ষীরি। সে বলিল, উপায় বলিয়া দিতে বলিও।

ভো। তবে আবার যা। বলিয়া আয় যে—বারুণী পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা কলসী গলায় দিয়ে—বুঝেছিস্ ?

ক্ষীরি। আচ্ছা।

ক্ষীরি আবার গেল। আবার আসিল। ভোমরা জিজ্ঞাসা করিল, "বারুণী পুকুরের কথা বলেছিস্ ?"

ক্ষীরি। বলিয়াছি।

ভো। সে কি বলিল ?

ক্ষীরি। বলিল যে, "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ছি ভোমরা !"

ভোমরা বলিল, "ভাবিও না। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে—সে কি মরিতে পারে ?"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দৈনিক কার্য্য সমস্ত সমাপ্ত করিয়া, প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গোবিন্দলাল দিনান্তে বারুণীর তীরবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যানভ্রমণ একটি প্রধান সুখ। সকল বৃক্ষের তলায় দুই চারি বার বেড়াইতেন। কিন্তু আমরা সকল বৃক্ষের কথা এখন বলিব না। বারুণীর কূলে, উদ্যানমধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা ছিল, বেদিকামধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তরখোদিত স্ত্রীপ্রতিমূর্ত্তি—স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা, বিনতলোচনা—একটি ঘট হইতে আপন চরণদ্বয়ে যেন জল ঢালিতেছে,—তাহার চারি পার্শ্বে বেদিকার উপরে উজ্জ্বলবর্ণরঞ্জিত মৃণ্ময় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপুষ্প বৃক্ষ—জিরানিয়ম, ভর্বিনা, ইউফর্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ—নীচে, সেই বেদিকা বেষ্টন করিয়া, কামিনী, যূথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন আমোদিত করিতেছে—তাহারই পরে বহুবিধ উজ্জ্বল নীল পীত রক্ত শ্বেত নানা বর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্জনকারী পাতার গাছের শ্রেণী। সেইখানে গোবিন্দলাল বসিতে ভাল বাসিতেন।

জ্যোৎস্না রাত্রে কখনও কখনও ভ্রমরকে উদ্যানভ্রমণে আনিয়া সেইখানে বসাইতেন। ভ্রমর পাষাণময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা দেখিয়া তাহাকে কালামুখী বলিয়া গালি দিত—কখনও কখনও আপনি অঞ্চল দিয়া তাহার অঙ্গ আবৃত করিয়া দিত—কখনও কখনও গৃহ হইতে উত্তম বস্ত্র সঙ্গে আনিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়া যাইত—কখনও কখনও তাহার হস্তস্থিত ঘট লইয়া টানাটানি বাধাইত।

সেইখানে আজি, গোবিন্দলাল সন্ধ্যাকালে বসিয়া, দর্পণানুরূপ বারুণীর জলশোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, সেই পুষ্করিণীর সুপরিসর প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান-পরম্পরায় রোহিণী কলসীকক্ষে অবরোহণ করিতেছে। সব না হইলে চলে, জল না হইলে চলে না। এ দুঃখের দিনেও রোহিণী জল লইতে আসিয়াছে। রোহিণী জলে নামিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিবার সম্ভাবনা—দৃষ্টিপথে তাঁহার থাকা অকর্ত্তব্য বলিয়া গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ গোবিন্দলাল এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইলেন। শেষ মনে করিলেন, এতক্ষণ রোহিণী উঠিয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া আবার সেই বেদিকাতলে জলনিষেকনিরতা পাষাণসুন্দরীর পদপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন। আবার সেই বারুণীর শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রোহিণী বা কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ কোথাও কেহ নাই। কেহ কোথাও নাই—কিন্তু সে জলোপরে একটি কলসী ভাসিতেছে।

কার কলসী? হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হইল—কেহ জল লইতে আসিয়া ডুবিয়া যায় নাই ত? রোহিণীই এইমাত্র জল লইতে আসিয়াছিল—তখন অকস্মাৎ পূর্ব্বাহ্ণের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, ভ্রমর রোহিণীকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, বারুণী পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা—কলসী গলায় বেঁধে। মনে পড়িল যে, রোহিণী প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ পুষ্করিণীর ঘাটে আসিলেন। সর্ব্বশেষ সোপানে দাঁড়াইয়া পুষ্করিণীর সর্ব্বত্র দেখিতে লাগিলেন। জল কাচতুল্য স্বচ্ছ। ঘাটের নীচে জলতলস্থ ভূমি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। দেখিলেন, স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈমপ্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া ডুব দিয়া, রোহিণীকে উঠাইয়া, সোপান উপরি শায়িত করিলেন। দেখিলেন, রোহিণী জীবিত আছে কি না সন্দেহ; সে সংজ্ঞাহীন; নিশ্বাসপ্রশ্বাসরহিত।

উদ্যান হইতে গোবিন্দলাল এক জন মালীকে ডাকিলেন। মালীর সাহায্যে রোহিণীকে বহন করিয়া উদ্যানস্থ প্রমোদগৃহে শুশ্রূষা জন্য লইয়া গেলেন। জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষ গোবিন্দলালের গৃহে প্রবেশ করিল। ভ্রমর ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক কখনও সে উদ্যানগৃহে প্রবেশ করে নাই।

বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশালদীর্ঘবিলম্বিত ঘোরকৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জলবৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত; কিন্তু সেই মুদ্রিত পক্ষ্মের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণশোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট—স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয়বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট —গণ্ড এখনও উজ্জ্বল—অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল। গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন, "মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?" এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল—এ কথা মনে করিয়া তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল।

যদি রোহিণীর জীবন থাকে, রোহিণীকে বাঁচাইতে হইবে। জলমগ্নকে কি প্রকারে বাঁচাইতে হয়, গোবিন্দলাল তাহা জানিতেন। উদরস্থ জল সহজেই বাহির করান যায়। দুই চারি বার রোহিণীকে উঠাইয়া, বসাইয়া, পাশ ফিরাইয়া, ঘুরাইয়া, জল উদগীর্ণ করাইলেন। কিন্তু তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিল না। সেইটি কঠিন কাজ।

গোবিন্দলাল জানিতেন, মুমূর্ষুর বাহুদ্বয় ধরিয়া উর্দ্ধোত্তোলন করিলে, অন্তরস্থ বায়ুকোষ স্ফীত হয়, সেই সময়ে রোগীর মুখে ফুৎকার দিতে হয়। পরে উত্তোলিত বাহুদ্বয়, ধীরে ধীরে নামাইতে হয়। নামাইলে বায়ুকোষ সঙ্কুচিত হয়; তখন সেই ফুৎকার-প্রেরিত বায়ু আপনিই নির্গত হইয়া আইসে। ইহাতে কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে বায়ুকোষের কার্য্য স্বতঃ পুনরাগত হইতে থাকে; কৃত্রিম

নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করাইতে করাইতে সহজ নিশ্বাস প্রশ্বাস আপনি উপস্থিত হয়। রোহিণীকে তাই করিতে হইবে। দুই হাতে দুইটি বাহু তুলিয়া ধরিয়া তাহার মুখে ফুৎকার দিতে হইবে, তাহার সেই পক্কবিম্ববিনিন্দিত, এখনও সুধাপরিপূর্ণ, মদনমদোন্মাদহলাহলকলসী-তুল্য রাঙ্গা রাঙ্গা মধুর অধরে অধর দিয়া ফুৎকার দিতে হইবে। কি সর্ব্বনাশ। কে দিবে?

গোবিন্দলালের এক সহায়, উড়িয়া মালী। বাগানের অন্য চাকরেরা ইতিপূর্ব্বেই গৃহে গিয়াছিল। তিনি মালীকে বলিলেন, "আমি ইহার হাত দুইটি তুলে ধরি, তুই ইহার মুখে ফুঁ দে দেখি।"

মুখে ফুঁ। সর্ব্বনাশ। ঐ রাঙ্গা রাঙ্গা সুধামাখা অধরে, মালীর মুখের ফুঁ—"সেহি পারিব না মুনিমা।"

মালীকে মুনিব যদি শালগ্রামশিলা চর্ব্বণ করিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে করিলে করিতে পারিত, কিন্তু সেই চাঁদ মুখের রাঙ্গা অধরে—সেই কট্‌কি মুখের ফুঁ। মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল। স্পষ্ট বলিল, "মু সে পারিবি না অবধড়।"

মালী ঠিক বলিয়াছিল। মালী সেই দেবদুর্ল্লভ ওষ্ঠাধরে যদি একবার মুখ দিয়া ফুঁ দিত, তার পর যদি রোহিণী বাঁচিয়া উঠিয়া আবার সেই ঠোঁট ফুলাইয়া কলসীকক্ষে জল লইয়া, মালীর পানে চাহিয়া, ঘরে যাইত—তবে আর তাহাকে ফুলবাগানের কাজ করিতে হইত না। সে খোন্তা, খুর্‌পো, নিড়িন, কাঁচি, কোদালি বারুণীর জলে ফেলিয়া দিয়া, এক দৌড়ে ভদরক পানে ছুটিত সন্দেহ নাই—বোধ হয় সুবর্ণরেখার নীল জলে ডুবিয়া মরিত। মালী অত ভাবিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু মালী ফুঁ দিতে রাজি হইল না।

অগত্যা গোবিন্দলাল তাহাকে বলিলেন, "তবে তুই এইরূপ ইহার হাত দুইটি ধীরে ধীরে উঠাইতে থাক্—আমি ফুঁ দিই। তাহার পর ধীরে ধীরে হাত নামাইবি।" মালী তাহা স্বীকার করিল। সে হাত দুইটি ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠাইল—গোবিন্দলাল তখন সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া—রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন।

সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।

মালী রোহিণীর বাহুদ্বয় নামাইল। আবার উঠাইল। আবার গোবিন্দলাল ফুৎকার দিলেন। আবার সেইরূপ হইল। আবার সেইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিলেন। দুই তিন ঘণ্টা এইরূপ করিলেন। রোহিণীর নিশ্বাস বহিল। রোহিণী বাঁচিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রোহিণীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিলে, গোবিন্দলাল তাহাকে ঔষধ পান করাইলেন। ঔষধ বলকারক—ক্রমে রোহিণীর বলসঞ্চার হইতে লাগিল। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সজ্জিত রম্য গৃহমধ্যে মন্দ মন্দ শীতল পবন বাতায়নপথে পরিভ্রমণ করিতেছে—এক দিকে স্ফাটিকাধারে স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বলিতেছে—আর এক দিকে হৃদয়াধারের জীবনপ্রদীপ জ্বলিতেছে। এ দিকে রোহিণী, গোবিন্দলাল-হস্ত-প্রদত্ত মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করিয়া, মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল—আর এক দিকে তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী কথা শ্রবণপথে পান করিয়া মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল। প্রথমে নিশ্বাস, পরে চৈতন্য, পরে দৃষ্টি, পরে স্মৃতি, শেষে বাক্য স্ফুরিত হইতে লাগিল। রোহিণী বলিল, "আমি মরিয়াছিলাম, আমাকে কে বাঁচাইল ?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যেই বাঁচাক, তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ, এই যথেষ্ট।"

রোহিণী বলিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন ? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে, মরণেও আপনি প্রতিবাদী ?"

গো। তুমি মরিবে কেন ?

রো। মরিবারও কি আমার অধিকার নাই ?

গো। পাপে কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা পাপ।

রো। আমি পাপ পুণ্য জানি না—আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি পাপ পুণ্য মানি না—কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড ? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহাব বেশী কি হইবে ? আমি মরিব। এবার না হয়, তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম বলিয়া তুমি রক্ষা করিয়াছ। ফিরে বার যাহাতে তোমার চক্ষে না পড়ি, সে যত্ন করিব।

গোবিন্দলাল বড় কাতর হইলেন ; বলিলেন, "তুমি কেন মরিবে ?"

"চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা, একেবারে মরা ভাল।"

গো। কিসের এত যন্ত্রণা ?

রো। রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।

গোবিন্দলাল তখন বলিলেন যে, "আর এ সব কথায় কাজ নাই—চল, তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।"

রোহিণী বলিল, "না, আমি একাই যাইব।"

গোবিন্দলাল বুঝিলেন, আপত্তিটা কি। গোবিন্দলাল আর কিছু বলিলেন না। রোহিণী একাই গেল।

তখন গোবিন্দলাল, সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!—তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইব?—আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "আজি এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে ছিলে কেন?"

গো। কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আর কখনও কি থাকি না?

ভ্র। থাক—কিন্তু আজি তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার কথার আওয়াজে বোধ হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে।

গো। কি হইয়াছে?

ভ্র। কি হইয়াছে, তাহা তুমি না বলিলে আমি কি প্রকারে বলিব? আমি কি সেখানে ছিলাম?

গো। কেন, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পার না?

ভ্র। তামাসা রাখ। কথাটা ভাল কথা নহে, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পারিতেছি।—আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হইতেছে।

বলিতে বলিতে ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোবিন্দলাল, ভ্রমরের চক্ষের জল মুছাইয়া, আদর করিয়া বলিলেন, "আর এক দিন বলিব ভ্রমর—আজ নহে।"

ভ্র। আজ নহে কেন?

গো। তুমি এখন বালিকা, সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।

ভ্র। কাল কি আমি বুড়া হইব?

গো। কালও বলিব না—দুই বৎসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা করিও না, ভ্রমর!

ভ্রমর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তবে তাই—দুই বৎসর পরেই বলিও—আমার শুনিবার বড় সাধ ছিল—কিন্তু তুমি যদি বলিলে না—তবে আমি শুনিব কি প্রকারে? আমার বড় মন কেমন কেমন করিতেছে।"

কেমন একটা বড় ভারি দুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল। যেমন বসন্তের আকাশ—বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল,—কোথাও কিছু নাই—অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারি দিক্ আঁধার করিয়া ফেলে—ভোমরার বোধ হইল, যেন তার বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া, সহসা চারি দিক্ আঁধার করিয়া ফেলিল। ভ্রমরের চক্ষে জল আসিতে লাগিল। ভ্রমর মনে করিল, আমি অকারণে কাঁদিতেছি—আমি বড় দুষ্ট হইয়াছি—আমার স্বামী রাগ করিবেন। অতএব ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁদিতে, বাহির হইয়া গিয়া, কোণে বসিয়া পা ছড়াইয়া অন্নদামঙ্গল পড়িতে বসিল। কি মাথা মুণ্ড পড়িল, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু বুকের ভিতর হইতে সে কালো মেঘখানা কিছুতেই নামিল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল বাবু জ্যেঠা মহাশয়ের সঙ্গে বৈষয়িক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। কথোপকথনচ্ছলে কোন্ জমিদারীর কিরূপ অবস্থা, তাহা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের বিষয়ানুরাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা যদি একটু একটু দেখ শুন, তবে বড় ভাল হয়। দেখ, আমি আর কয় দিন? তোমরা এখন হইতে সব দেখিয়া শুনিয়া না রাখিলে, আমি মরিলে, কিছু বুঝিতে পারিবে না। দেখ, আমি বুড়া হইয়াছি, আর কোথাও যাইতে পারি না। কিন্তু বিনা তদারকে মহাল সব খারাব হইয়া উঠিল।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আপনি পাঠাইলে আমি যাইতে পারি। আমারও ইচ্ছা, সকল মহালগুলি এক একবার দেখিয়া আসি।"

কৃষ্ণকান্ত আহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন, "আমার তাহাতে বড় আহ্লাদ। আপাততঃ বন্দরখালিতে কিছু গোলমাল উপস্থিত। নায়েব বলিতেছে যে, প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে, টাকা দেয় না; প্রজারা বলে, আমরা খাজনা দিতেছি, নায়েব উসুল দেয় না। তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে বল, আমি তোমাকে সেখানে পাঠাইবার উদ্যোগ করি।"

গোবিন্দলাল সম্মত হইলেন। তিনি এই জন্যই কৃষ্ণকান্তের কাছে আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গতুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়া মনে মনে শপথ করিয়া, স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিষয়কর্ম্মে মনোভিনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব—স্থানান্তরে গেলে নিশ্চিত ভুলিতে পারিব। এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া তিনি পিতৃব্যের কাছে গিয়া বিষয়ালোচনা করিতে বসিয়াছিলেন। বন্দরখালির কথা শুনিয়া, আগ্রহসহকারে তথায় গমনে সম্মত হইলেন।

ভ্রমর শুনিল, মেজ বাবু দেহাত যাইবেন। ভ্রমর ধরিল, আমিও যাইব। কাঁদাকাটি, হাঁটাহাঁটি পড়িয়া গেল। কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না। তরণী সজ্জিত করিয়া, ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, ভ্রমরের মুখচুম্বন করিয়া, গোবিন্দলাল দশ দিনের পথ বন্দরখালি যাত্রা করিলেন।

ভ্রমর আগে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিল। তার পর উঠিয়া, অন্নদামঙ্গল ছিঁড়িয়া ফেলিল, খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল, পুতুল সকল জলে ফেলিয়া দিল, টবের ফুলগাছ সকল কাটিয়া ফেলিল, আহারের অন্ন পাচিকার গায়ে ছড়াইয়া দিল, চাকরাণীর খোঁপা ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিল—ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল—এইরূপ নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া, শয়ন করিল। শুইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে অনুকূল পবনে চালিত হইয়া, গোবিন্দলালের তরণী তরঙ্গিণী-তরঙ্গ বিভিন্ন করিয়া চলিল।

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

কিছু ভাল লাগে না—ভ্রমর একা। ভ্রমর শয্যা তুলিয়া ফেলিল—বড় নরম,—খাটের পাখা খুলিয়া ফেলিল—বাতাস বড় গরম; চাকরাণীদিগকে ফুল আনিতে বারণ করিল—ফুলে বড় পোকা। তাসখেলা বন্ধ করিল—সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাস খেলিলে শাশুড়ী রাগ করেন। সূচ, সূতা, উল, পেটার্ণ,—সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বিলাইয়া দিল—জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বড় চোখ জ্বালা করে। বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে গৃহ পরিপূর্ণ। মাথার চুলের সঙ্গে চিরুণীর সম্পর্ক রহিত হইয়া আসিয়াছিল—উলুবনের খড়ের মত চুল বাতাসে দুলিত, জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রমর হাসিয়া, চুলগুলি হাত দিয়া টানিয়া খোঁপায় গুজিত—ঐ পর্য্যন্ত। আহারাদির সময় ভ্রমর নিত্য বাহনা করিতে আরম্ভ করিল—"আমি খাইব না, আমার জ্বর হইয়াছে।" শাশুড়ী কবিরাজ দেখাইয়া, পাঁচন ও বড়ির ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন যে, "বৌমাকে ঔষধগুলি খাওয়াইবি।" বৌমা ক্ষীরির হাত হইতে বড়ি পাঁচন কাড়িয়া লইয়া, জানেলা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।

ক্রমে ক্রমে এতটা বাড়াবাড়ি ক্ষীরি চাকরাণীর চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্ষীরি বলিল, "ভাল, বউ ঠাকুরাণি, কার জন্য তুমি অমন কর? যাঁর জন্য তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলে, তিনি কি তোমার কথা এক দিনের জন্য ভাবেন? তুমি মর্‌ছে কেঁদে কেটে, আর তিনি হয় ত হুঁকার নল মুখে দিয়া, চক্ষু বুজিয়া রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন।"

ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিল। ভ্রমরের হাত বিলক্ষণ চলিত। প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "তুই যা ইচ্ছা তাই বকিবি ত আমার কাছ থেকে উঠিয়া যা।"

ক্ষীরি বলিল, "তা চড় চাপড় মারিলেই কি লোকের মুখ চাপা থাকিবে? তুমি রাগ করিবে বলিয়া আমরা ভয়ে কিছু বলিব না। কিন্তু না বলিলেও বাঁচি না। পাঁচি চাঁড়ালনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি,—সে দিন অত রাত্রে রোহিণী, বাবুর বাগান হইতে আসিতেছিল কি না?"

ক্ষীরোদার কপাল মন্দ, তাই এমন কথা সকাল বেলা ভ্রমরের কাছে বলিল। ভ্রমর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষীরোদাকে চড়ের উপর চড় মারিল, কিলের উপর কিল মারিল, তাহাকে

ঠেলা মারিয়া ফেলিয়া দিল, তাহার চুল ধরিয়া টানিল। শেষে আপনি কাঁদিতে লাগিল।

ক্ষীরোদা, মধ্যে মধ্যে ভ্রমরের কাছে চড়টা চাপড়টা খাইত, কখনও রাগ করিত না; কিন্তু আজি কিছু বাড়াবাড়ি, আজ একটু রাগিল। বলিল, "তা ঠাকুরুণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে—তোমারই জন্য আমরা বলি। তোমাদের কথা লইয়া লোকে একটা হৈ হৈ করে, আমরা তা সইতে পারি না। তা আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তুমি পাঁচিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর।"

ভ্রমর, ক্রোধে দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তোর জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তুই কর্‌গে—আমি কি তোদের মত ছুঁচো পাজি যে, আমার স্বামীর কথা পাঁচি চাঁড়ালনীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? তুই এত বড় কথা আমাকে বলিস্! ঠাকুরাণীকে বলিয়া আমি ঝাঁটা মেরে তোকে দূর করিয়া দিব। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা।"

তখন সকাল বেলা উত্তম মধ্যম ভোজন করিয়া ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি চাকরাণী, রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এ দিকে ভ্রমর ঊর্দ্ধমুখে সজলনয়নে, যুক্তকরে, মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে গুরো! শিক্ষক, ধর্ম্মজ্ঞ, আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ! তুমি কি সে দিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে!"

তার মনের ভিতর যে মন, হৃদয়ের যে লুক্কায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না—যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখান পর্য্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না। ভ্রমর কেবল একবারমাত্র মনে ভাবিলেন যে, "তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন দুঃখ কি? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে।" হিন্দুর মেয়ে, মরা বড় সহজ মনে করে।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এখন ক্ষীরি চাকরাণী মনে করিল যে, এ বড় কলিকাল—এক রত্তি মেয়েটা, আমার কথায় বিশ্বাস করে না। ক্ষীরোদার সরল অন্তঃকরণে ভ্রমরের উপর রাগ দ্বেষাদি কিছুই নাই, সে ভ্রমরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বটে, তাহার অমঙ্গল চাহে না; তবে ভ্রমর যে

তাহার ঠকামি কাণে তুলিল না, সেটা অসহ্য। ক্ষীরোদা তখন সুচিক্কণ দেহযষ্টি সংক্ষেপে তৈলনিষিক্ত করিয়া, রঙ্গকরা গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া, কলসীকক্ষে, বারুণীর ঘাটে স্নান করিতে চলিল।

হরমণি ঠাকুরাণী, বাবুদের বাড়ীর এক জন পাচিকা, সেই সময় বারুণীর ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিতেছিল, প্রথমে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হরমণিকে দেখিয়া ক্ষীরোদা আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "বলে, যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর—আর বড়লোকের কাজ করা হল না—কখন কার মেজাজ কেমন থাকে, তার ঠিকানাই নাই।"

হরমণি, একটু কোন্দলের গন্ধ পাইয়া, দাহিন হাতের কাচা কাপড়খানি বাঁ হাতে রাখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো ক্ষীরোদা—আবার কি হয়েছে?"

ক্ষীরোদা তখন মনের বোঝা নামাইল। বলিল, "দেখ দেখি গা—পাড়ার কালামুখীরা বাবুর বাগানে বেড়াইতে যাবে—তা আমরা চাকর বাকর—আমরা কি তা মুনিবের কাছে বলিতে পারি না।"

হর। সে কি লো? পাড়ার মেয়ে আবার বাবুর বাগান বেড়াইতে কে গেল?

ক্ষী। আর কে যায়? সেই কালামুখী রোহিণী।

হর। কি পোড়া কপাল! রোহিণীর আবার এমন দশা কত দিন? কোন্ বাবুর বাগানে রে ক্ষীরোদা?

ক্ষীরোদা মেজ বাবুর নাম করিল। তখন দুই জনে একটু চাওয়াচাওয়ি করিয়া, একটু রসের হাসি হাসিয়া, যে যে দিকে যাইবার, সে সেই দিকে গেল। কিছু দূর গিয়াই ক্ষীরোদার সঙ্গে পাড়ার রামের মার দেখা হইল। ক্ষীরোদা তাহাকেও হাসির ফাঁদে ধরিয়া ফেলিয়া, দাঁড় করাইয়া রোহিণীর দৌরাত্ম্যের কথার পরিচয় দিল। আবার দুজনে হাসি চাহনি ফেরাফিরি করিয়া অভীষ্ট পথে গেল।

এইরূপে ক্ষীরোদা, পথে রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারী, পারী, যাহার দেখা পাইল, তাহারই কাছে আপন মর্ম্মপীড়ার পরিচয় দিয়া, পরিশেষে সুস্থশরীরে প্রফুল্লহৃদয়ে বারুণীর স্ফাটিক বারিরাশিমধ্যে অবগাহন করিল। এ দিকে হরমণি, রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারী, পারী, যাহাকে যেখানে দেখিল, তাহাকে সেইখানে ধরিয়া শুনাইয়া দিল যে, রোহিণী হতভাগিনী মেজ বাবুর বাগান বেড়াইতে গিয়াছিল। একে শূন্য দশ হইল, দশে শূন্য শত হইল, শতে শূন্য সহস্র হইল। যে সূর্য্যের নবীন কিরণ তেজস্বী না হইতে হইতেই,

ক্ষীরি প্রথম ভ্রমরের সাক্ষাতে রোহিণীর কথা পাড়িয়াছিল, তাঁহার অস্তগমনের পূর্ব্বেই গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল যে, রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা। কেবল বাগানের কথা হইতে অপরিমেয় প্রণয়ের কথা, অপরিমেয় প্রণয়ের কথা হইতে অপরিমেয় অলঙ্কারের কথা, আর কত কথা উঠিল, তাহা আমি—হে রটনাকৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকণ্ঠা কুল-কামিনীগণ! তাহা আমি অধম সত্যশাসিত পুরুষ লেখক আপনাদিগের কাছে সবিস্তারে বলিয়া বাড়াবাড়ি করিতে চাহি না।

ক্রমে ভ্রমরের কাছে সংবাদ আসিতে লাগিল। প্রথমে বিনোদিনী আসিয়া বলিল, "সত্য কি লা?" ভ্রমর, একটু শুষ্ক মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুকে বলিল, "কি সত্য ঠাকুরঝি?" ঠাকুরঝি তখন ফুলধনুর মত দুইখানি ভ্রূ একটু জড় সড় করিয়া, অপাঙ্গে একটু বৈদ্যুতী প্রেরণ করিয়া, ছেলেটিকে কোলে টানিয়া বসাইয়া বলিল, "বলি, রোহিণীর কথাটা?"

ভ্রমর, বিনোদিনীকে কিছু না বলিতে পারিয়া, তাহার ছেলেটিকে টানিয়া লইয়া, কোন বালিকাসুলভ কৌশলে, তাহাকে কাঁদাইল। বিনোদিনী বালককে স্তন্যপান করাইতে করাইতে স্বস্থানে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর পর সুরধুনী আসিয়া বলিলেন, "বলি মেজ বৌ, বলি বলেছিলুম, মেজ বাবুকে অষুধ কর। তুমি হাজার হোক গৌরবর্ণ নও, পুরুষ মানুষের মন ত কেবল কথায় পাওয়া যায় না, একটু রূপ গুণ চাই। তা ভাই, রোহিণীর কি আক্কেল, কে জানে?"

ভ্রমর বলিল, "রোহিণীর আবার আক্কেল কি?"

সুরধুনী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "পোড়া কপাল! এত লোক শুনিয়াছে—কেবল তুই শুনিস্ নাই? মেজ বাবু যে রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছে।"

ভ্রমর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া, মনে মনে সুরধুনীকে যমের হাতে সমর্পণ করিল। প্রকাশ্যে, একটা পুত্তলের মুণ্ড মোচড় দিয়া ভাঙ্গিয়া সুরধুনীকে বলিল, "তা আমি জানি। খাতা দেখিয়াছি। তোর নামে চৌদ্দ হাজার টাকার গহনা লেখা আছে।"

বিনোদিনী সুরধুনীর পর রামী, বামী, শ্যামী, কামিনী, রমণী, শারদা, প্রমদা, সুখদা, বরদা, কমলা, বিমলা, শীতলা, নির্ম্মলা, মাধু, নিধু, বিধু, তারিণী, নিস্তারিণী, দীনতারিণী, ভবতারিণী, সুরবালা, গিরিবালা, ব্রজবালা, শৈলবালা প্রভৃতি অনেকে আসিয়া, একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, তিনে তিনে, দুঃখিনী বিরহকাতরা বালিকাকে জানাইল যে, তোমার স্বামী রোহিণীর প্রণয়াসক্ত। কেহ যুবতী, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ বর্ষীয়সী, কেহ বা বালিকা, সকলেই আসিয়া ভ্রমরাকে বলিল, "আশ্চর্য্য কি? মেজ বাবুর রূপ দেখে কে না ভোলে?

রোহিণীর রূপ দেখে তিনিই না ভুলিবেন কেন?" কেহ আদর করিয়া, কেহ চিড়াইয়া, কেহ রসে, কেহ রাগে, কেহ সুখে, কেহ দুঃখে, কেহ হেসে, কেহ কেঁদে, ভ্রমরকে জানাইল যে, ভ্রমর, তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত—কালো কুৎসিতের এত সুখ—অনন্ত ঐশ্বর্য্য—দেবীদুর্ল্লভ স্বামী—লোকে কলঙ্কশূন্য যশ—অপরাজিতাতে পদ্মের আদর? আবার তার উপর মল্লিকার সৌরভ? গ্রামের লোকের এত সহিত না। তাই, পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া, কেহ কবরী বাঁধিয়া, কেহ কবরী বাঁধিতে বাঁধিতে, কেহ এলোচুলে সংবাদ দিতে আসিলেন, "ভ্রমর, তোমার সুখ গিয়াছে।"—কাহারও মনে হইল না যে, ভ্রমর পতিবিরহবিধুরা, নিতান্ত দোষশূন্যা, দুঃখিনী বালিকা।

ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "হে সন্দেহভঞ্জন! হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে, সকলে বলিবে কেন। তুমি এখানে নাই, আজি আমার সন্দেহভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহভঞ্জন হইল না—তবে মরি না কেন? এ সন্দেহ লইয়া কি বাঁচা যায়? আমি মরি না কেন? ফিরিয়া আসিয়া প্রাণেশ্বর! আমায় গালি দিও না যে, ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।"

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এখন, ভ্রমরেরও যে জ্বালা, রোহিণীরও সেই জ্বালা। কথা যদি রটিল, রোহিণীর কাণেই বা না উঠিবে কেন? রোহিণী শুনিল গ্রামে রাষ্ট্র যে, গোবিন্দলাল তাহার গোলাম—সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। কথা যে কোথা হইতে রটিল, তাহা রোহিণী শুনে নাই—কে রটাইল, তাহার কোন তদন্ত করে নাই; একেবারে সিদ্ধান্ত করিল যে, তবে ভ্রমরই রটাইয়াছে, নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার? রোহিণী ভাবিল—ভ্রমর আমাকে বড় জ্বালাইল। সে দিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ। এ দেশে আর আমি থাকিব না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।

রোহিণী না পারে, এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্ব্বপরিচয়ে জানা গিয়াছে। রোহিণী কোন প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানি বানারসী শাড়ী ও এক সুট গিল্‌টির গহনা চাহিয়া আনিল। সন্ধ্যা হইলে, সেইগুলি পুঁটুলি বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া রায়দিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যথায় ভ্রমর একাকিনী মৃৎশয্যায় শয়ন করিয়া, এক একবার কাঁদিতেছে, এক একবার চক্ষের জল মুছিয়া কড়ি পানে চাহিয়া ভাবিতেছে, তথায় রোহিণী গিয়া পুঁটুলি রাখিয়া উপবেশন করিল। ভ্রমর বিস্মিত হইল—রোহিণীকে দেখিয়া বিষের জ্বালায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সহিতে না পারিয়া ভ্রমর বলিল, "তুমি সে দিন রাত্রে ঠাকুরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিলে? আজ রাত্রে কি আমার ঘরে সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছ না কি?"

রোহিণী মনে মনে বলিল যে, তোমার মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি। প্রকাশ্যে বলিল, "এখন আর আমার চুরির প্রয়োজন নাই; আমি আর টাকার কাঙ্গাল নহি। মেজ বাবুর অনুগ্রহে আমার আর খাইবার পরিবার দুঃখ নাই। তবে লোকে যতটা বলে, ততটা নহে।"

ভ্রমর বলিল, "তুমি এখান হইতে দূর হও।"

রোহিণী সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিতে লাগিল, "লোকে যতটা বলে, ততটা নহে। লোকে বলে, আমি সাত হাজার টাকার গহনা পাইয়াছি। মোটে তিন হাজার টাকার গহনা, আর এই শাড়ীখানি পাইয়াছি। তাই তোমায় দেখাইতে আসিয়াছি। সাত হাজার টাকা লোকে বলে কেন?"

এই বলিয়া রোহিণী পুঁটুলি খুলিয়া বানারসী শাড়ী ও গিল্‌টির গহনাগুলি ভ্রমরকে দেখাইল। ভ্রমর নাথি মারিয়া অলঙ্কারগুলি চারি দিকে ছড়াইয়া দিল।

রোহিণী বলিল, "সোনায় পা দিতে নাই।" এই বলিয়া রোহিণী নিঃশব্দে গিল্‌টির অলঙ্কারগুলি একে একে কুড়াইয়া, আবার পুঁটুলি বাঁধিল। পুঁটুলি বাঁধিয়া, নিঃশব্দে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমাদের বড় দুঃখ রহিল। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীকে একটি কীলও মারিল না, এই আমাদের আন্তরিক দুঃখ। আমাদের পাঠিকারা উপস্থিত থাকিলে, রোহিণীকে যে স্বহস্তে প্রহার করিতেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় নাই। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, এ কথা মানি। কিন্তু রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলিতে নাই, এ কথা তত মানি না। তবে ভ্রমর যে রোহিণীকে কেন মারিল না,

তাহা বুঝাইতে পারি। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে ভাল বাসিত, সেই জন্য তাহাকে মারপিট করিয়াছিল। রোহিণীকে ভাল বাসিত না, এজন্য হাত উঠিল না। ছেলেয় ছেলেয় ঝকড়া করিলে জননী আপনার ছেলেটিকে মারে, পরের ছেলেটিকে মারে না।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি প্রভাত না হইতেই ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লেখাপড়া গোবিন্দলাল শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমর লেখাপড়ায় তত মজবুত হইয়া উঠে নাই। ফুলটি পুতুলটি পাখীটি স্বামীটিতে ভ্রমরের মন, লেখাপড়া বা গৃহকর্ম্মে তত নহে। কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলে, একবার মুছিত, একবার কাটিত, একবার কাগজ বদলাইয়া আবার মুছিত, আবার কাটিত। শেষ ফেলিয়া রাখিত। দুই তিন দিনে একখানা পত্র শেষ হইত না, কিন্তু আজ সে সকল কিছু হইল না। তেড়া বাঁকা ছাঁদে, যাহা লেখনীর অগ্রে বাহির হইল, আজ তাহাই ভ্রমরের মঞ্জুর। "ম"গুলা "স"র মত হইল—"স"গুলা "ম"র মত হইল—"ধ"গুলা "ফ"র মত, "ফ"গুলা "থ"র মত, "থ"গুলা "খ"র মত, ইকারের স্থানে আকার—আকারের একেবারে লোপ, যুক্ত অক্ষরের স্থানে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর, কোন কোন অক্ষরের লোপ,—ভ্রমর কিছু মানিল না। ভ্রমর আজি এক ঘণ্টার মধ্যে এক দীর্ঘ পত্র স্বামীকে লিখিয়া ফেলিল। কাটাকুটি যে ছিল না, এমত নহে। আমরা পত্রখানির কিছু পরিচয় দিতেছি।

ভ্রমর লিখিতেছে—

"সেবিকা শ্রী ভোমরা" (তার পর ভোমরা কাটিয়া ভ্রমরা করিল) "দাস্যাঃ" (আগে দাম্মা, তাহা কাটিয়া দাস্য—তাহা কাটিয়া দাস্যো—দাস্যাঃ ঘটিয়া উঠে নাই) "প্রণামাঃ ("প্র" লিখিতে প্রথমে "স্র", তার পর "শ্র", শেষে "প্র") "নিবেদনঞ্চ" (প্রথমে নিবেদঞ্চ, তার পর নিবেদনঞ্চ), "বিশেস" (বিশেষঃ হইয়া উঠে নাই)।

এইরূপ পত্র লেখার প্রণালী। যাহা লিখিয়াছিল, তাহার বর্ণগুলি শুদ্ধ করিয়া, ভাষা একটুকু সংশোধন করিয়া নিম্নে লিখিতেছি।

"সে দিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরি হইয়াছিল, তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলে না। দুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই

তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছ, তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে।

তুমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমারও ভক্তি; যত দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব।"

গোবিন্দলাল যথাকালে সেই পত্র পাইলেন। তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কেবল হস্তাক্ষরে এবং বর্ণশুদ্ধির প্রণালী দেখিয়াই তিনি বিশ্বাস করিলেন যে, এ ভ্রমরের লেখা। তথাপি মনে অনেক বার সন্দেহ করিলেন—ভ্রমর তাঁহাকে এমন পত্র লিখিতে পারে, তাহা তিনি কখনও বিশ্বাস করেন নাই।

সেই ডাকে আরও কয়খানি পত্র আসিয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমেই ভ্রমরের পত্র খুলিয়াছিলেন; পড়িয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন; তার পর সে পত্রগুলি অন্যমনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের একখানি পত্র পাইলেন। কবিতাপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ লিখিতেছেন—

"ভাই হে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলু খড়ের প্রাণ যায়। তোমার উপর বৌমা সকল দৌরাত্ম্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা দুঃখী প্রাণী, আমাদিগের উপর এ দৌরাত্ম্য কেন? তিনি রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও কত কদর্য্য কথা রটিয়াছে, তাহা তোমাকে লিখিতে লজ্জা করে।—যাহা হৌক, তোমার কাছে আমার নালিশ—তুমি ইহার বিহিত করিবে। নহিলে আমি এখানকার বাস উঠাইব। ইতি।"

গোবিন্দলাল আবার বিস্মিত হইলেন।—ভ্রমর রটাইয়াছে? মর্ম্ম কিছুই না বুঝিতে পারিয়া, গোবিন্দলাল সেই দিন আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, এখানকার জলবায়ু আমার সহ্য হইতেছে না—আমি কালই বাটী যাইব। নৌকা প্রস্তুত কর।

পরদিন নৌকারোহণে, বিষণ্ণমনে গোবিন্দলাল গৃহে যাত্রা করিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে, তবে সুতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে। যাহাকে বিদায় দিবার সময়ে কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না,—কয় বৎসর পরে তাহার সহিত আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছ—"ভাল আছ ত?" হয় ত সে কথাও হয় নাই—কথাই হয় নাই—আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয় ত রাগে, অভিমানে আর দেখাই হয় নাই। তত নাই হউক, একবার চক্ষের বাহির হইলেই, যা ছিল, তা আর হয় না। যা যায়, তা আর আসে না। যা ভাঙ্গে, আর তা গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ?

ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশ যাইতে দিয়া ভাল করেন নাই। এ সময় দুই জনে একত্রে থাকিলে, এ মনের মালিন্য বুঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত। ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে এই সর্ব্বনাশ হইত না।

গোবিন্দলাল স্বদেশে যাত্রা করিলে, নায়েব কৃষ্ণকান্তের নিকট এক এত্তেলা পাঠাইল যে, মধ্যম বাবু অদ্য প্রাতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সে পত্র ডাকে আসিল। নৌকার অপেক্ষা ডাক আগে আসে। গোবিন্দলাল স্বদেশে পৌঁছিবার চারি পাঁচ দিন আগে, কৃষ্ণকান্তের নিকট নায়েবের পত্র পৌঁছিল। ভ্রমর শুনিলেন, স্বামী আসিতেছেন। ভ্রমর তখনই আবার পত্র লিখিতে বসিলেন। খান চারি পাঁচ কাগজ কালিতে পুরাইয়া, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, ঘণ্টা দুই চারি মধ্যে একখানা পত্র লিখিয়া খাড়া করিলেন। এ পত্রে মাতাকে লিখিলেন যে, "আমার বড় পীড়া হইয়াছে। তোমরা যদি একবার আমাকে লইয়া যাও, তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি। বিলম্ব করিও না, পীড়া বৃদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে না। পার যদি, কালি লোক পাঠাইও। এখানে পীড়ার কথা বলিও না।" এই পত্র লিখিয়া, গোপনে ক্ষীরি চাকরাণীর দ্বারা লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর তাহা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল।

যদি মা না হইয়া, আর কেহ হইত, তবে ভ্রমরের পত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিত যে, ইহার ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে। কিন্তু মা, সন্তানের পীড়ার কথা শুনিয়া একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশে ভ্রমরের শাশুড়ীকে এক লক্ষ গালি দিয়া, স্বামীকে কিছু গালি দিলেন, এবং কাঁদিয়া কাটিয়া স্থির করিলেন যে, আগামী কল্য বেহারা পাল্কী লইয়া

চাকর চাকরাণী ভ্রমরকে আনিতে যাইবে। ভ্রমরের পিতা, কৃষ্ণকান্তকে পত্র লিখিলেন। কৌশল করিয়া, ভ্রমরের পাড়ার কোন কথা না লিখিয়া, লিখিলেন যে, "ভ্রমরের মাতা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছেন—ভ্রমরকে একবার দেখিতে পাঠাইয়া দিবেন।" দাস দাসী-দিগকে সেই মত শিক্ষা দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বড় বিপদে পড়িলেন। এ দিকে গোবিন্দলাল আসিতেছে, এ সময় ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠান অকর্ত্তব্য। ও দিকে ভ্রমরের মাতা পীড়িতা, না পাঠাইলেও নয়। সাত পাঁচ ভাবিয়া, চারি দিনের করারে ভ্রমরকে পাঠাইয়া দিলেন।

চারি দিনের দিন গোবিন্দলাল আসিয়া পৌছিলেন। শুনিলেন যে, ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে, আজি তাহাকে আনিতে পাল্কী যাইবে। গোবিন্দলাল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বড় অভিমান হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?"

এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলেন। কেন নিষেধ করিলেন, তাহা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সম্মতি পাইয়া, কৃষ্ণকান্ত বধূ আনিবার জন্য আর কোন উদ্যোগ করিলেন না।

পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এইরূপে দুই চারি দিন গেল। ভ্রমরকে কেহ আনিল না, ভ্রমরও আসিল না। গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরের বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব। মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব। এক একবার শূন্য গৃহ দেখিয়া আপনি একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া এক একবার একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের সঙ্গে কলহ, এ কথা ভাবিয়া কান্না আসিল। আবার চোখের জল মুছিয়া, রাগ করিলেন। রাগ করিয়া ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। ভুলিবার সাধ্য কি? সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে।

শেষ দুর্ব্বুদ্ধি গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিন্তা। রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা, এক দিনও গোবিন্দলালের হৃদয় পরিত্যাগ করে নাই। গোবিন্দলাল জোর করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্তু সে ছাড়িত না।

উপন্যাসে শুনা যায়, কোন গৃহে ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে, ভূত দিবারাত্রি উঁকি ঝুঁকি মারে, কিন্তু ওঝা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। রোহিণী প্রেতিনী তেমনি দিবারাত্র গোবিন্দলালের হৃদয়মন্দিরে উঁকি ঝুঁকি মারে, গোবিন্দলাল তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। যেমন জলতলে চন্দ্রসূর্য্যের ছায়া আছে, চন্দ্র সূর্য্য নাই, তেমনি গোবিন্দলালের হৃদয়ে অহরহঃ রোহিণীর ছায়া আছে, রোহিণী নাই। গোবিন্দলাল ভাবিলেন, যদি ভ্রমরকে আপাততঃ ভুলিতে হইবে, তবে রোহিণীর কথাই ভাবি—নহিলে এ দুঃখ ভুলা যায় না। অনেক কুচিকিৎসক ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন। গোবিন্দলালও ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দলাল আপন ইচ্ছায় আপনি আপন অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রোহিণীর কথা প্রথমে স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল বারুণীতটে, পুষ্পবৃক্ষপরিবেষ্টিত মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করিয়া সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন। বর্ষাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাদল হইয়াছে---বৃষ্টি কখনও কখনও জোরে আসিতেছে—কখনও মৃদু হইতেছে। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়া নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। প্রায়াগতা যামিনীর অন্ধকার, তাহার উপর বাদলের অন্ধকার, বারুণীর ঘাট স্পষ্ট দেখা যায় না। গোবিন্দলাল অস্পষ্টরূপে দেখিলেন যে, এক জন স্ত্রীলোক নামিতেছে। রোহিণীর সেই সোপানাবতরণ গোবিন্দলালের মনে হইল। বাদলে ঘাট বড় পিছল হইয়াছে—পাছে পিছলে পা পিছলাইয়া স্ত্রীলোকটি জলে পড়িয়া গিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, ভাবিয়া গোবিন্দলাল কিছু ব্যস্ত হইলেন। পুষ্পমণ্ডপ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "কে গা তুমি, আজ ঘাটে নামিও না—বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে।"

স্ত্রীলোকটি তাঁহার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। বৃষ্টি পড়িতেছিল—বোধ হয় বৃষ্টির শব্দে সে ভাল করিয়া শুনিতে পায় নাই। সে কুক্ষিস্থ কলসী ঘাটে নামাইল। সোপান পুনরারোহণ করিল। ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান অভিমুখে চলিল। উদ্যানদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। গোবিন্দলালের কাছে, মণ্ডপতলে গিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দলাল দেখিলেন, সম্মুখে রোহিণী।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ভিজিতে ভিজিতে এখানে কেন রোহিণি ?"

রো। আপনি কি আমাকে ডাকিলেন ?

গো। ডাকি নাই। ঘাটে বড় পিছল, নামিতে বারণ করিতেছিলাম। দাঁড়াইয়া ভিজিতেছ কেন?

রোহিণী সাহস পাইয়া মণ্ডপমধ্যে উঠিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "লোকে দেখিলে কি বলিবে?"

রো। যা বলিবার তা বলিতেছে। সে কথা আপনার কাছে একদিন বলিব বলিয়া অনেক যত্ন করিতেছি।

গো। আমারও সে সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। কে এ কথা রটাইল? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন?

রো। সকল বলিতেছি। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি?

গো। না। আমার সঙ্গে আইস।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল, রোহিণীকে ডাকিয়া বাগানের বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

সেখানে উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। কেবল এই মাত্র বলিব যে, সে রাত্রে রোহিণী, গৃহে যাইবার পূর্ব্বে বুঝিয়া গেলেন যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী-শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল।

গোবিন্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে। কিন্তু যেমন বাহ্য জগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়। গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল—কেন না, রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না।

ক্রমে কৃষ্ণকান্তের কাণে রোহিণী ও গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্ত দুঃখিত হইলেন। গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক ঘটিলে তাঁহার বড় কষ্ট। মনে মনে ইচ্ছা হইল, গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি

কিছু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শয়নমন্দির ত্যাগ করিতে পারিতেন না। সেখানে গোবিন্দলাল তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিত, কিন্তু সর্ব্বদা তিনি সেবকগণ পরিবেষ্টিত থাকিতেন, গোবিন্দলালকে সকলের সাক্ষাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইল। হঠাৎ কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যে, বুঝি চিত্রগুপ্তের হিসাব নিকাশ হইয়া আসিল—এ জীবনের সাগরসঙ্গম বুঝি সম্মুখে। আর বিলম্ব করিলে কথা বুঝি বলা হইবে না। এক দিন গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন কৃষ্ণকান্ত মনের কথা বলিবেন মনে করিলেন। গোবিন্দলাল দেখিতে আসিলেন। কৃষ্ণকান্ত পার্শ্ববর্ত্তিগণকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। পার্শ্ববর্ত্তিগণ সকলে উঠিয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আজ কেমন আছেন?" কৃষ্ণকান্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আজি বড় ভাল নই। তোমার এত রাত্রি হইল কেন?"

গোবিন্দলাল্ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, কৃষ্ণকান্তের প্রকোষ্ঠ হস্তমধ্যে লইয়া নাড়ি টিপিয়া দেখিলেন। অকস্মাৎ গোবিন্দলালের মুখ শুকাইয়া গেল। কৃষ্ণকান্তের জীবনপ্রবাহ অতি ধীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে। গোবিন্দলাল কেবল বলিলেন, "আমি আসিতেছি।" কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহ হইতে নির্গত হইয়া গোবিন্দলাল একবারে স্বয়ং বৈদ্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈদ্য বিস্মিত হইল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "মহাশয়, শীঘ্র ঔষধ লইয়া আসুন, জ্যেষ্ঠতাতের অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।" বৈদ্য শশব্যস্তে একরাশি বটিকা লইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন।—কৃষ্ণকান্তের গৃহে গোবিন্দলাল বৈদ্যসহিত উপস্থিত হইলেন, কৃষ্ণকান্ত কিছু ভীত হইলেন। কবিরাজ হাত দেখিলেন। কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কিছু শঙ্কা হইতেছে কি?" বৈদ্য বলিলেন, "মনুষ্যশরীরে শঙ্কা কখন নাই?"

কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন, বলিলেন, "কতক্ষণ মিয়াদ?"

বৈদ্য বলিলেন, "ঔষধ খাওয়াইয়া পশ্চাৎ বলিতে পারিব।" বৈদ্য ঔষধ মাড়িয়া সেবন জন্য কৃষ্ণকান্তের নিকট উপস্থিত করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ঔষধের খল হাতে লইয়া একবার মাথায় স্পর্শ করাইলেন। তাহার পর ঔষধটুকু সমুদায় পিকদানিতে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

বৈদ্য বিষণ্ণ হইল। কৃষ্ণকান্ত দেখিয়া বলিলেন, "বিষণ্ণ হইবেন না। ঔষধ খাইয়া বাঁচিবার বয়স আমার নহে। ঔষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার। তোমরা হরিনাম কর, আমি শুনি।"

কৃষ্ণকান্ত ভিন্ন কেহই হরিনাম করিল না, কিন্তু সকলেই স্তম্ভিত, ভীত, বিস্মিত হইল। কৃষ্ণকান্ত একাই ভয়শূন্য। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে বলিলেন, "আমার শিওরে দেরাজের চাবি আছে, বাহির কর।"

গোবিন্দলাল বালিসের নীচে হইতে চাবি লইলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেরাজ খুলিয়া আমার উইল বাহির কর।"

গোবিন্দলাল দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার আমলা মুহুরি ও দশ জন গ্রামস্থ ভদ্রলোক ডাকাও।"

তখনই নাএব মুহুরি গোমস্তা কারকুনে, চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যে, ঘোষ বসু মিত্র দত্তে ঘর পুরিয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত এক জন মুহুরিকে আজ্ঞা করিলেন, "আমার উইল পড়।"

মুহুরি পড়িয়া সমাপ্ত করিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "ও উইল ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। নূতন উইল লেখ।"

মুহুরি জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ লিখিব?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "যেমন আছে, সব সেইরূপ, কেবল—"

"কেবল কি?"

"কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া দিয়া, তাহার স্থানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ভ্রমরের নাম লেখ। ভ্রমরের অবর্ত্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্দ্ধাংশ পাইবে লেখ।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কেহ কোন কথা কহিল না। মুহুরি গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিল। গোবিন্দলাল ইঙ্গিত করিলেন, লেখ।

মুহুরি লিখিতে আরম্ভ করিল। লেখা সমাপন হইলে কৃষ্ণকান্ত স্বাক্ষর করিলেন। সাক্ষিগণ স্বাক্ষর করিল। গোবিন্দলাল আপনি উপযাচক হইয়া, উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষি স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন।

উইলে গোবিন্দলালের এক কপর্দ্দকও নাই—ভ্রমরের অর্দ্ধাংশ।

সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে তুলসীতলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোক গমন করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুসংবাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে, কেহ বলিল, একটা দিক্‌পাল মরিয়াছে, কেহ বলিল, পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন। এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে যথেষ্ট দান করিতেন। সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য কাতর হইল।

সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রমর। এখন কাজে কাজেই ভ্রমরকে আনিতে হইল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর দিনেই গোবিন্দলালের মাতা উদ্যোগী হইয়া পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন। ভ্রমর আসিয়া কৃষ্ণকান্তের জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গোবিন্দলালের সঙ্গে ভ্রমরের প্রথম সাক্ষাতে, রোহিণীর কথা লইয়া কোন মহাপ্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের শোকে সে সকল কথা এখন চাপা পড়িয়া গেল। ভ্রমরের সঙ্গে গোবিন্দলালের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন ভ্রমর জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের জন্য কাঁদিতেছে। গোবিন্দলালকে দেখিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলালও অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

অতএব যে বড় হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল, সেটা গোলমালে মিটিয়া গেল। দুই জনেই তাহা বুঝিল। দুই জনেই মনে মনে স্থির করিল যে, যখন প্রথম দেখায় কোন কথাই হইল না, তবে আর গোলযোগ করিয়া কাজ নাই—গোলযোগের এ সময় নহে; মানে মানে কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া যাক্—তাহার পরে যাহার মনে যা থাকে, তাহা হইবে। তাই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, একদা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভ্রমরকে বলিয়া রাখিলেন, "ভ্রমর, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে। কথাগুলি বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। পিতৃশোকের অধিক যে শোক, আমি সেই শোকে এক্ষণে কাতর। এখন আমি সে সকল কথা তোমায় বলিতে পারি না; শ্রাদ্ধের পর যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব। ইহার মধ্যে সে সকল কথার কোন প্রসঙ্গে কাজ নাই।"

ভ্রমর, অতি কষ্টে নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া, বাল্যপরিচিত দেবতা, কালী, দুর্গা, শিব, হরি স্মরণ করিয়া বলিল, "আমারও কিছু বলিবার আছে। তোমার যখন অবকাশ হইবে, জিজ্ঞাসা করিও।"

আর কোন কথা হইল না। দিন যেমন কাটিত, তেমনি কাটিতে লাগিল—দেখিতে, তেমনি দিন কাটিতে লাগিল; দাস দাসী, গৃহিণী, পৌরস্ত্রী, আত্মীয় স্বজন কেহ জানিতে পারিল না যে, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে, এ চারু প্রেমপ্রতিমায় ঘুণ লাগিয়াছে। কিন্তু ঘুণ লাগিয়াছে ত সত্য। যাহা ছিল, তাহা আর নাই। যে হাসি ছিল, সে হাসি আর নাই। ভ্রমর কি হাসে না? গোবিন্দলাল কি হাসে না? হাসে, কিন্তু সে হাসি আর নাই। নয়নে নয়নে মিলিতে মিলিতে যে হাসি আপনি উছলিয়া উঠে, সে হাসি আর নাই; যে হাসি আধ হাসি আধ প্রীতি, সে হাসি আর নাই; যে হাসি অর্দ্ধেক বলে, সংসার সুখময়, অর্দ্ধেক বলে, সুখের আকাঙ্ক্ষা পূরিল না—সে হাসি আর নাই। সে চাহনি নাই—যে চাহনি দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত, "এত রূপ!"—যে চাহনি দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিত, "এত গুণ!" সে চাহনি আর নাই। যে চাহনিতে গোবিন্দলালের স্নেহপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি প্রমত্ত চক্ষু দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত, বুঝি এ সমুদ্র আমার ইহজীবনে আমি সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিব না,—যে চাহনি দেখিয়া, গোবিন্দলাল ভাবিয়া ভাবিয়া, এ সংসার সকল ভুলিয়া যাইত, সে চাহনি আর নাই। সে সকল প্রিয়-সম্বোধন আর নাই—সে "ভ্রমর", "ভোমরা", "ভোমর", "ভোম", "ভুমরি", "ভুমি", ভুম", "ভোঁ ভোঁ",—সে সব নিত্য নূতন, নিত্য স্নেহপূর্ণ, রঙ্গপূর্ণ, সুখপূর্ণ সম্বোধন আর নাই। সে কালো, কালা, কালাচাঁদ, কেলেসোণা, কালোমাণিক, কালিন্দী, কালীয়ে—সে প্রিয়সম্বোধন আর নাই। সে ও, ওগো, ওহে, ওলো,—সে প্রিয়সম্বোধন আর নাই। সে মিছামিছি ডাকাডাকি আর নাই। সে মিছামিছি বকাবকি আর নাই। সে কথা কহার প্রণালী আর নাই। আগে কথা কুলাইত না—এখন তাহা খুঁজিয়া আনিতে হয়। যে কথা অর্দ্ধেক ভাষায়, অর্দ্ধেক নয়নে নয়নে, অধরে অধরে প্রকাশ পাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। সে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল উত্তরে কণ্ঠস্বর শুনিবার প্রয়োজন, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। আগে যখন গোবিন্দলাল ভ্রমর একত্রিত থাকিত, তখন গোবিন্দলালকে ডাকিলে কেহ সহজে পাইত না—ভ্রমরকে ডাকিলে একেবারে পাইত না। এখন ডাকিতে হয় না—হয় "বড় গরমি," নয় "কে ডাকিতেছে," বলিয়া এক জন উঠিয়া যায়। সে সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে। কার্ত্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে। কে খাঁটি সোণায় দস্তার খাদ মিশাইয়াছে—কে সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।

আর সেই মধ্যাহ্নরবিকরপ্রফুল্ল হৃদয়মধ্যে অন্ধকার হইয়াছে। গোবিন্দলাল সে অন্ধকারে আলো করিবার জন্য ভাবিত রোহিণী,—ভ্রমর সে ঘোর, মহাঘোর অন্ধকারে,

আলো করিবার জন্য ভাবিত—যম। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, প্রেমশূন্যের প্রীতিস্থান তুমি, যম। চিত্তবিনোদন, দুঃখবিনাশন, বিপদ্‌ভঞ্জন, দীনরঞ্জন তুমি যম। আশাশূন্যের আশা, ভালবাসাশূন্যের ভালবাসা, তুমি যম। ভ্রমরকে গ্রহণ কর, হে যম!

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

তার পর কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। শত্রুপক্ষ বলিল যে, হাঁ, ঘটা হইয়াছে বটে, পাঁচ সাত দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষ বলিল, লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উত্তরাধিকারিগণ মিত্রপক্ষের নিকট গোপনে বলিল, আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা খাতা দেখিয়াছি, মোট ব্যয়, ৩২৩৫৬ ।/১২॥।

যাহা হউক, দিনকতক বড় হাঙ্গামা গেল। হরলাল শ্রাদ্ধাধিকারী, আসিয়া শ্রাদ্ধ করিল। দিনকতক মাছির ভনভনানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে, কাঙ্গালির কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে কাণ পাতা গেল না। সন্দেশ মিঠাইয়ের আমদানি, কাঙ্গালির আমদানি, টিকী নামাবলীর আমদানি, কুটুম্বের কুটুম্ব, তস্য কুটুম্ব, তস্য কুটুম্বের আমদানি। ছেলেগুলা মিহিদানা সীতাভোগ লইয়া ভাঁটা খেলাইতে আরম্ভ করিল; মাগীগুলা নারিকেল তৈল মহার্ঘ দেখিয়া, মাথায় লুচিভাজা ঘি মাখিতে আরম্ভ করিল; গুলির দোকান বন্ধ হইল, সব গুলিখোর ফলাহারে; মদের দোকান বন্ধ হইল, সব মাতাল, টিকী রাখিয়া নামাবলী কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে গিয়াছে। চাল মহার্ঘ হইল, কেন না, কেবল অন্নব্যয় নয়, এত ময়দা খরচ যে, আর চালের গুঁড়িতে কুলান যায় না; এত ঘৃতের খরচ যে, রোগীরা আর কাষ্টর অয়েল পায় না; গোয়ালার কাছে ঘোল কিনিতে গেলে তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল, আমার ঘোলটুকু ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে দই হইয়া গিয়াছে।

কোনমতে শ্রাদ্ধের গোল থামিল, শেষ উইল পড়ার যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। উইল পড়িয়া, হরলাল দেখিলেন, উইলে বিস্তর সাক্ষী—কোন গোল করিবার সম্ভাবনা নাই। হরলাল শ্রাদ্ধান্তে স্বস্থানে গমন করিলেন।

উইল পড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন, "উইলের কথা শুনিয়াছ?"

ভ্র। কি?

গো। তোমার অর্দ্ধাংশ।

ভ্র। আমার, না তোমার?

গো। এখন আমার তোমার একটু প্রভেদ হইয়াছে। আমার নয়, তোমার।

ভ্র। তাহা হইলেই তোমার।

গো। তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।

ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল, কিন্তু ভ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া, রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "তবে কি করিবে?"

গো। যাহাতে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারি, তাহাই করিব।

ভ্র। সে কি?

গো। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া চাকরির চেষ্টা করিব।

ভ্র। বিষয় আমার জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের নহে, আমার শ্বশুরের। তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী, আমি নহি। জ্যেঠার উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। উইল অসিদ্ধ। আমার পিতা শ্রাদ্ধের সময়ে নিমন্ত্রণে আসিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিষয় তোমার, আমার নহে।

গো। আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না। বিষয় তোমার, আমার নহে। তিনি যখন তোমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন বিষয় তোমার, আমার নহে।

ভ্র। যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি না হয় তোমাকে লিখিয়া দিতেছি।

গো। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিতে হইবে?

ভ্র। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি তোমার দাসানুদাসী বই ত নই?

গো। আজি কালি ও কথা সাজে না, ভ্রমর!

ভ্র। কি করিয়াছি? আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি না। আট বৎসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুত্তুল—আমার কি অপরাধ হইল?

গো। মনে করিয়া দেখ।

ভ্র। অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়াছে, আমার শত-সহস্র অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।

গোবিন্দলাল কথা কহিল না। তাহার অগ্রে আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা। গোবিন্দলাল কথা কহিল না। গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল, "এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এত কাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব।—আমার এ অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা, সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে—ক্ষমা কর! আমি বালিকা!

যিনি অনন্ত সুখদুঃখের বিধাতা, অন্তর্যামী, কাতরের বন্ধু, অবশ্যই তিনি এ কথাগুলি শুনিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা শুনিল না। নীরব হইয়া রহিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল। তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী অনন্তপ্রভাশালিনী প্রভাত-শুক্রতারারূপিণী রূপতরঙ্গিণী চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।

ভ্রমর উত্তর না পাইয়া বলিল, "কি বল?"

গোবিন্দলাল বলিল, "আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।"

ভ্রমর পদ ত্যাগ করিল। উঠিল। বাহিরে যাইতেছিল। চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"কি অপরাধ আমি করিয়াছি যে, আমাকে ত্যাগ করিবে?"

এ কথা ভ্রমর গোবিন্দলালকে মুখে বলিতে পারিল না—কিন্তু এই ঘটনার পর পলে পলে, মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমার কি অপরাধ?

গোবিন্দলালও মনে মনে অনুসন্ধান করিতে লাগিল যে, ভ্রমরের কি অপরাধ? ভ্রমরের যে বিশেষ গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, তাহা গোবিন্দলালের মনে এক প্রকার স্থির হইয়াছে। কিন্তু অপরাধটা কি, তাহা তত ভাবিয়া দেখেন নাই। ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হইত, ভ্রমর যে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছিল, অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে এত কঠিন পত্র লিখিয়াছিল—একবার তাঁহাকে মুখে সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিল না, এই তাহার অপরাধ। যার জন্য এত করি, সে এত সহজে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, এই তাহার অপরাধ। আমরা কুমতি সুমতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গোবিন্দলালের হৃদয়ে

পাশাপাশি উপবেশন করিয়া, কুমতি সুমতি যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহা সকলকে শুনাইব।

কুমতি বলিল, "ভ্রমরের প্রথম এইটি অপরাধ, এই অবিশ্বাস।"

সুমতি উত্তর করিল, "যে অবিশ্বাসের যোগ্য, তাহাকে অবিশ্বাস না করিবে কেন? তুমি রোহিণীর সঙ্গে এই আনন্দ উপভোগ করিতেছ, ভ্রমর সেইটা সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়াই কি তার এত দোষ?"

কুমতি। এখন যেন আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্তু যখন ভ্রমর অবিশ্বাস করিয়াছিল, তখন আমি নির্দ্দোষী।

সুমতি। দুদিন আগে পাছেতে বড় আসিয়া যায় না—দোষ ত করিয়াছ। যে দোষ করিতে সক্ষম, তাহাকে দোষী মনে করা কি এত গুরুতর অপরাধ?

কুমতি। ভ্রমর আমাকে দোষী মনে করিয়াছে বলিয়াই আমি দোষী হইয়াছি। সাধুকে চোর বলিতে বলিতে চোর হয়।

সুমতি। দোষটা যে চোর বলে, তার। যে চুরি করে, তার কিছু নয়।

কুমতি। তোর সঙ্গে ঝকড়ায় আমি পার্‌ব না। দেখ্‌ না, ভ্রমর আমার কেমন অপমানটা করিল? আমি বিদেশ থেকে আস্‌ছি শুনে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

সুমতি। যদি সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে সে সঙ্গত কাজই করিয়াছে। স্বামী পরদারনিরত হইলে নারীদেহ ধারণ করিয়া কে রাগ না করিবে?

কুমতি। সেই বিশ্বাসই তাহার ভ্রম—আর দোষ কি?

সুমতি। এ কথা কি তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ?

কুমতি। না।

সুমতি। তুমি না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিতেছ, আর ভ্রমর নিতান্ত বালিকা, না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিয়াছিল বলিয়া এত হাঙ্গাম? সে সব কাজের কথা নহে—আসল রাগের কারণ কি, বলিব?

কুমতি। কি, বল না?

সুমতি। আসল কথা রোহিণী। রোহিণীতে প্রাণ পড়িয়াছে—তাই আর কালো ভোমরা ভাল লাগে না।

কুমতি। এত কাল ভোমরা ভাল লাগিল কিসে?

সুমতি। এত কাল রোহিণী জোটে নাই। এক দিনে কোন কিছু ঘটে না। সময়ে সকল উপস্থিত হয়। আজ রৌদ্রে ফাটিতেছে বলিয়া কাল দুর্দ্দিন হইবে না কেন? শুধু কি তাই—আরও আছে।

কুমতি। আর কি?

সুমতি। কৃষ্ণকান্তের উইল। বুড়া মনে মনে জানিত, ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গেলে—বিষয় তোমারই রহিল। ইহাও জানিত যে, ভ্রমর এক মাসের মধ্যে তোমাকে উহা লিখিয়া দিবে। কিন্তু আপাততঃ তোমাকে একটু কুপথগামী দেখিয়া তোমার চরিত্রশোধন জন্য তোমাকে ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গেল। তুমি অতটা না বুঝিয়া ভ্রমরের উপর রাগিয়া উঠিয়াছ।

কুমতি। তা সত্যই। আমি কি স্ত্রীর মাসহরা খাইব না কি?

সুমতি। তোমার বিষয়, তুমি কেন ভ্রমরের কাছে লিখিয়া লও না?

কুমতি। স্ত্রীর দানে দিনপাত করিব?

সুমতি। আরে বাপ রে! কি পুরুষসিংহ! তবে ভ্রমরের সঙ্গে মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী করিয়া লও না—তোমার পৈতৃক বিষয় বটে।

কুমতি। স্ত্রীর সঙ্গে মোকদ্দমা করিব?

সুমতি। তবে আর কি করিবে? গোল্লায় যাও।

কুমতি। সেই চেষ্টায় আছি।

সুমতি। রোহিণী—সঙ্গে যাবে কি?

তখন কুমতিতে সুমতিতে ভারি চুলোচুলি ঘুষোঘুষি আরম্ভ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বধূর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রীলোক ইহা সহজেই বুঝিতে পারে। যদি তিনি এই সময়ে সদুপদেশে, স্নেহবাক্যে এবং স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ অন্যান্য সদুপায়ে তাহার প্রতীকার করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝি সুফল ফলাইতে পারিতেন। কিন্তু

গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন, বিশেষ পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপরে একটু বিদ্বেষাপন্নাও হইয়াছিলেন। যে স্নেহের বলে তিনি ভ্রমরের ইষ্টকামনা করিবেন, ভ্রমরের উপর তাঁহার সে স্নেহ ছিল না। পুত্র থাকিতে, পুত্রবধূর বিষয় হইল, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি একবারও অনুভব করিতে পারিলেন না যে, ভ্রমর গোবিন্দলাল অভিন্নসম্পত্তি জানিয়া, গোবিন্দলালের চরিত্রদোষ-সম্ভাবনা দেখিয়া, কৃষ্ণকান্ত রায় গোবিন্দলালের শাসন জন্য ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গিয়াছিলেন। একবারও তিনি মনে ভাবিলেন না যে, কৃষ্ণকান্ত মুমূর্ষু অবস্থায় কতকটা লুপ্তবুদ্ধি হইয়া, কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই এ অবিধেয় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, পুত্রবধূর সংসারে তাঁহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী, এবং অন্নদাস পৌরবর্গের মধ্যে গণ্যা হইয়া ইহজীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব সংসার ত্যাগ করাই ভাল, স্থির করিলেন। একে পতিহীনা, কিছু আত্মপরায়ণা, তিনি স্বামিবিয়োগকাল হইতেই কাশীযাত্রা কামনা করিতেন, কেবল স্ত্রীস্বভাবসুলভ পুত্রস্নেহবশতঃ এত দিন যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে সে বাসনা আরও প্রবল হইল।

তিনি গোবিন্দলালকে বলিলেন, "কর্ত্তারা একে একে স্বর্গারোহণ করিলেন, এখন আমার সময় নিকট হইয়া আসিল। তুমি পুত্রের কাজ কর; এই সময় আমাকে কাশী পাঠাইয়া দাও।"

গোবিন্দলাল হঠাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে আপনি কাশী রাখিয়া আসিব।" দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ভ্রমর একবার ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। কেহই তাঁহাকে নিষেধ করে নাই। অতএব ভ্রমরের অজ্ঞাতে গোবিন্দলাল কাশীযাত্রার সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিজনামে কিছু সম্পত্তি ছিল—তাহা গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থসঞ্চয় করিলেন। কাঞ্চন হীরকাদি মূল্যবান্ বস্তু যাহা নিজের সম্পত্তি ছিল—তাহা বিক্রয় করিলেন। এইরূপে প্রায় লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইল। গোবিন্দলাল ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে দিনপাত করিবেন স্থির করিলেন।

তখন মাতৃসঙ্গে কাশীযাত্রার দিন স্থির করিয়া ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন। শাশুড়ী কাশীযাত্রা করিবেন শুনিয়া ভ্রমর তাড়াতাড়ি আসিল। আসিয়া শাশুড়ীর চরণে ধরিয়া অনেক বিনয় করিল; শাশুড়ীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "মা, আমি বালিকা—আমায় একা রাখিয়া যাইও না—আমি সংসারধর্ম্মের কি বুঝি? মা, সংসার সমুদ্র, আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাসাইয়া যাইও না।" শাশুড়ী বলিলেন, "তোমার বড়

ননদ রহিল। সেই তোমাকে আমার মত যত্ন করিবে—আর তুমিও গৃহিণী হইয়াছ।” ভ্রমর কিছুই বুঝিল না—কেবল কাঁদিতে লাগিল।

ভ্রমর দেখিল, বড় বিপদ্ সম্মুখে। শাশুড়ী ত্যাগ করিয়া চলিলেন—আবার স্বামীও তাঁহাকে রাখিতে চলিলেন—তিনিও রাখিতে গিয়া বুঝি আর না আইসেন! ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—বলিল, “কত দিনে আসিবে, বলিয়া যাও।”

গোবিন্দলাল বলিলেন, “বলিতে পারি না। আসিতে বড় ইচ্ছা নাই।”

ভ্রমর পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মনে ভাবিল, “ভয় কি? বিষ খাইব।”

তার পরে স্থিরীকৃত যাত্রার দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রাম হইতে কিছু দূর শিবিকারোহণে গিয়া ট্রেন পাইতে হইবে। শুভ যাত্রিক লগ্ন উপস্থিত—সকল প্রস্তুত। ভারে ভারে সিন্দুক, তোরঙ্গ, বাক্স, বেগ, গাঁটরি বাহকেরা বহিতে আরম্ভ করিল। দাস দাসী সুবিমল ধৌতবস্ত্র পরিয়া, কেশ রঞ্জিত করিয়া, দরওয়াজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে লাগিল—তাহারা সঙ্গে যাইবে। দ্বারবানেরা ছিটের জামার বন্ধক আঁটিয়া লাঠি হাতে করিয়া, বাহকদিগের সঙ্গে বকাবকি আরম্ভ করিল। পাড়ার মেয়ে ছেলে দেখিবার জন্য ঝুঁকিল। গোবিন্দলালের মাতা গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া, পৌরজন সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিকারোহণ করিলেন; পৌরজন সকলেই কাঁদিতে লাগিল। তিনি শিবিকারোহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন।

এ দিকে গোবিন্দলাল অন্যান্য পৌরস্ত্রীগণকে যথোচিত সম্বোধন করিয়া শয়নগৃহে রোরুদ্যমানা ভ্রমরের কাছে বিদায় হইতে গেলেন। ভ্রমরকে রোদনবিবশা দেখিয়া তিনি যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে না পারিয়া, কেবল বলিলেন, “ভ্রমর! আমি মাকে রাখিতে চলিলাম।”

ভ্রমর চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, “মা সেখানে বাস করিবেন। তুমি আসিবে না কি?”

কথা যখন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, তখন তাহার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছিল; তাহার স্বরের স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, তাহার অধরে স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া গোবিন্দলাল কিছু বিস্মিত হইলেন। হঠাৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ভ্রমর স্বামীকে নীরব দেখিয়া পুনরপি বলিল, “দেখ, তুমিই আমাকে শিখাইয়াছ, সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম, সত্যই একমাত্র সুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও—আমি তোমার আশ্রিত বালিকা—আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও না—কবে আসিবে?”

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে সত্যই শোন। ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।"

ভ্রমর। কেন ইচ্ছা নাই—তাহা বলিয়া যাইবে না কি ?

গো। এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাস হইয়া থাকিতে হইবে।

ভ্রমর। তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? আমি ত তোমার দাসানুদাসী।

গো। আমার দাসানুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানেলায় বসিয়া থাকিবে। তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না।

ভ্রমর। তাহার জন্য কত পায়ে ধরিয়াছি—এক অপরাধ কি মার্জ্জনা হয় না ?

গো। এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী।

ভ্রমর। তা নয়। আমি এবার বাপের বাড়ী গিয়া, বাপের সাহায্যে যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ।

এই বলিয়া ভ্রমর একখানা কাগজ দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, "পড়।"

গোবিন্দলাল পড়িয়া দেখিলেন—দানপত্র। ভ্রমর, উচিত মূল্যের ষ্ট্যাম্পে, আপনার সমুদায় সম্পত্তি স্বামীকে দান করিতেছেন। তাহা রেজিষ্টারী হইয়াছে। গোবিন্দলাল পড়িয়া বলিলেন, "তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ। কিন্তু তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে। তুমি বিষয় দান করিবে, আমি ভোগ করিব—এ সম্বন্ধ নহে।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল বহুমূল্য দানপত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

ভ্রমর বলিলেন, "পিতা বলিয়া দিয়াছেন, ইহা ছিঁড়িয়া ফেলা বৃথা। সরকারিতে ইহার নকল আছে।"

গো। থাকে থাক্। আমি চলিলাম।

ভ্র। কবে আসিবে ?

গো। আসিব না।

ভ্র। কেন ? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা—তোমার দাসানুদাসী—তোমার কথার ভিখারী—আসিবে না কেন ?

গো। ইচ্ছা নাই।

ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি ?

গো। বুঝি আমার তাও নাই।

বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল—ভ্রমর যোড়-হাত করিয়া, অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর।—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও—এক দিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—এক দিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়?—দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে, আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী! তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই! তুমি আমারই—রোহিণীর নও।"

এই বলিয়া ভ্রমর, ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া, গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই আখ্যায়িকা আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে ভ্রমরের একটি পুত্র হইয়া সূতিকাগারেই নষ্ট হয়। ভ্রমর আজি কক্ষান্তরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সেই সাত দিনের ছেলের জন্য কাঁদিতে বসিল। মেঝের উপর পড়িয়া, ধূলায় লুটাইয়া অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল। "আমার ননীর পুত্তলী, আমার কাঙ্গালের সোণা, আজ তুমি কোথায়? আজি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি কুরূপা কুৎসিতা, তোকে কে কুৎসিত বলিত? তোর চেয়ে কে সুন্দর? একবার দেখা দে বাপ্—এই বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস্ না—মরিলে কি আর দেখা দেয় না?—"

ভ্রমর তখন যুক্তকরে, মনে মনে ঊর্দ্ধমুখে, অথচ অস্ফুট বাক্যে দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কেহ আমাকে বলিয়া দাও—আমার কি দোষে, এই সতের বৎসর মাত্র বয়সে এমন অসম্ভব দুর্দ্দশা ঘটিল; আমার পুত্র মরিয়াছে—আমায় স্বামী ত্যাগ করিল—আমার সতের বৎসর মাত্র বয়স, আমি এই বয়সে স্বামীর ভালবাসা বিনা আর কিছু

ভালবাসি নাই—আমার ইহলোকে আর কিছু কামনা নাই—আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই—আমি আজ এই সতের বৎসর বয়সে তাহাতে নিরাশ হইলাম কেন ?"

ভ্রমর কাঁদিয়া কাটিয়া সিদ্ধান্ত করিল—দেবতারা নিতান্ত নিষ্ঠুর। যখন দেবতা নিষ্ঠুর, তখন মনুষ্য আর কি করিবে—কেবল কাঁদিবে। ভ্রমর কেবল কাঁদিতে লাগিল।

এ দিকে গোবিন্দলাল, ভ্রমরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব—গোবিন্দলাল চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আসিলেন। বালিকার অতি সরল যে প্রীতি,—অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিনরাত্রি ছুটিতেছে—ভ্রমরের কাছে সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না। ভাবিলেন, যাহা করিয়াছি, তাহা আর এখন ফিরে না—এখন ত যাই। এখন যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই। বুঝি আর ফেরা হইবে না। যাই হউক, যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই।

সেই সময়ে যদি গোবিন্দলাল দুই পা ফিরিয়া গিয়া, ভ্রমরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া একবার বলিতেন—"ভ্রমর, আমি আবার আসিতেছি," তবে সকল মিটিত। গোবিন্দলালের অনেক বার সে ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলেও তাহা করিলেন না। ইচ্ছা হইলেও একটু লজ্জা করিল। ভাবিলেন, এত তাড়াতাড়ি কি ? যখন মনে করিব, তখন ফিরিব। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। আবার ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। যাহা হয় একটা স্থির করিবার বুদ্ধি হইল না। যে পথে যাইতেছেন, সেই পথে চলিলেন। তিনি চিন্তাকে বর্জ্জন করিয়া—বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সজ্জিত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক কশাঘাত করিলেন। পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয়-মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম বৎসর

হরিদ্রাগ্রামের বাড়ীতে সংবাদ আসিল,—গোবিন্দলাল, মাতা প্রভৃতি সঙ্গে, নির্ব্বিঘ্নে সুস্থ শরীরে কাশীধামে পৌঁছিয়াছেন। ভ্রমরের কাছে কোন পত্র আসিল না। অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখিল না। পত্রাদি আমলাবর্গের কাছে আসিতে লাগিল।

এক মাস গেল, দুই মাস গেল। পত্রাদি আসিতে লাগিল। শেষ এক দিন সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাটী যাত্রা করিয়াছেন।

ভ্রমর শুনিয়া বুঝিল যে, গোবিন্দলাল কেবল মাকে ভুলাইয়া, অন্যত্র গমন করিয়াছেন। বাড়ী আসিবেন, এমন ভরসা হইল না।

এই সময়ে ভ্রমর গোপনে সর্ব্বদা রোহিণীর সংবাদ লইতে লাগিল। রোহিণী রাঁধে বাড়ে, খায়, গা ধোয়, জল আনে। আর কিছুই সংবাদ নাই। ক্রমে এক দিন সংবাদ আসিল, রোহিণী পীড়িতা। ঘরের ভিতর মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, বাহির হয় না। ব্রহ্মানন্দ আপনি রাঁধিয়া খায়।

তার পর এক দিন সংবাদ আসিল যে, রোহিণী কিছু সারিয়াছে, কিন্তু পীড়ার মূল যায় নাই। শূলরোগ—চিকিৎসা নাই—রোহিণী আরোগ্য জন্য তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইবে। শেষ সংবাদ—রোহিণী হত্যা দিতে তারকেশ্বর গিয়াছে। একাই গিয়াছে—কে সঙ্গে যাইবে?

এ দিকে তিন চারি মাস গেল—গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিল না। পাঁচ মাস ছয় মাস হইল, গোবিন্দলাল ফিরিল না। ভ্রমরের রোদনের শেষ নাই। কেবল মনে করিত, এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন—সংবাদ পাইলেই বাঁচি। এ সংবাদও পাই না কেন?

শেষ ননন্দাকে বলিয়া শাশুড়ীকে পত্র লিখাইল—আপনি মাতা, অবশ্য পুত্রের সংবাদ পান। শাশুড়ী লিখিলেন, তিনি গোবিন্দলালের সংবাদ পাইয়া থাকেন।

গোবিন্দলাল প্রয়াগ, মথুরা, জয়পুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া, আপাততঃ দিল্লী অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্র সেখান হইতে স্থানান্তরে গমন করিবেন। কোথাও স্থায়ী হইতেছেন না।

এ দিকে রোহিণীও আর ফিরিল না। ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ জানেন, রোহিণী কোথায় গেল! আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমুখে ব্যক্ত করিব না। ভ্রমর আর সহ্য করিতে পারিলেন না; কাঁদিতে কাঁদিতে ননন্দাকে বলিয়া শিবিকারোহণে পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

সেখানে গিয়া গোবিন্দলালের কোন সংবাদ পাওয়া দুরূহ দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া হরিদ্রাগ্রামেও স্বামীর কোন সংবাদ না পাইয়া, আবার শাশুড়ীকে পত্র লিখাইলেন। শাশুড়ী এবার লিখিলেন, "গোবিন্দলাল আর কোন সংবাদ দেয় না; এখন সে কোথায় আছে জানি না। কোনও সংবাদ পাই না।" এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল। প্রথম বৎসরের শেষে ভ্রমর রুগ্নশয্যায় শয়ন করিলেন। অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভ্রমর রুগ্নশয্যাশায়িনী শুনিয়া ভ্রমরের পিতা ভ্রমরকে দেখিতে আসিলেন। ভ্রমরের পিতার পরিচয় আমরা সবিশেষ দিই নাই—এখন দিব। তাঁহার পিতা মাধবীনাথ সরকারের বয়স একচত্বারিংশৎ বৎসর। তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে বড় মতভেদ ছিল। অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিত—অনেকে বলিত, তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই। তিনি যে চতুর, তাহা সকলেই স্বীকার করিত—এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত।

মাধবীনাথ কন্যার দশা দেখিয়া, অনেক রোদন করিলেন। দেখিলেন—সেই শ্যামাসুন্দরী, যাহার সর্ব্বাবয়ব সুললিত গঠন ছিল—এক্ষণে বিশুষ্কবদন, শীর্ণশরীর, প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্ননয়নেন্দীবর। ভ্রমরও অনেক কাঁদিল। শেষ উভয়ে রোদন সংবরণ করিলে পর ভ্রমর বলিল, "বাবা, আমার বোধ হয় আর দিন নাই। আমায় কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করাও। আমি ছেলে মানুষ হলে কি হয়, আমার ত দিন ফুরাল। দিন ফুরাল ত আর

বিলম্ব করিব কেন? আমার অনেক টাকা আছে, আমি ব্রত নিয়ম করিব। কে এ সকল করাইবে? বাবা, তুমি তাহার ব্যবস্থা কর।"

মাধবীনাথ কোন উত্তর করিলেন না—যন্ত্রণা অসহ্য হইলে তিনি বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। বহির্ব্বাটীতে অনেক ক্ষণ বসিয়া রোদন করিলেন। কেবল রোদন নহে—সেই মর্ম্মভেদী দুঃখ মাধবীনাথের হৃদয়ে ঘোরতর ক্রোধে পরিণত হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, "যে আমার কন্যার উপর এ অত্যাচার করিয়াছে—তাহার উপর তেমনই অত্যাচার করে, এমন কি জগতে কেহ নাই?" ভাবিতে ভাবিতে মাধবীনাথের হৃদয় কাতরতার পরিবর্ত্তে প্রদীপ্ত ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইল। মাধবীনাথ তখন রক্তোৎফুল্ল-লোচনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যে আমার ভ্রমরের এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছে—আমি তাহার এমনই সর্ব্বনাশ করিব।"

তখন মাধবীনাথ কতক সুস্থির হইয়া অন্তঃপুরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। কন্যার কাছে গিয়া বলিলেন, "মা, তুমি ব্রত নিয়ম করিবার কথা বলিতেছিলে, আমি সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। এখন তোমার শরীর বড় রুগ্ন; ব্রত নিয়ম করিতে গেলে অনেক উপবাস করিতে হয়; এখন তুমি উপবাস সহ্য করিতে পারিবে না। একটু শরীর সারুক—"

ভ্র। এ শরীর কি আর সারিবে?

মা। সারিবে মা—কি হইয়াছে? তোমার একটু এখানে চিকিৎসা হইতেছে না—কেমন করিয়াই বা হইবে? শ্বশুর নাই—শাশুড়ী নাই, কেহ কাছে নাই—কে চিকিৎসা করাইবে? তুমি এখন আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। আমি এখন দুই দিন এখানে থাকিব—তাহার পরে তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া রাজগ্রামে যাইব।

রাজগ্রামে ভ্রমরের পিত্রালয়।

কন্যার নিকট হইতে বিদায় হইয়া মাধবীনাথ কন্যার কার্য্যকারকবর্গের নিকট গেলেন। দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বাবুর কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে?" দেওয়ানজী উত্তর করিল, "কিছু না।"

মাধবীনাথ। তিনি এখন কোথায় আছেন?

দেওয়ানজী। তাঁহার কোন সংবাদই আমরা কেহ বলিতে পারি না। তিনি কোন সংবাদই পাঠান না।

মা। কাহার কাছে এ সংবাদ পাইতে পারিব?

দে। তাহা জানিলে ত আমরা সংবাদ লইতাম। কাশীতে মা ঠাকুরাণীর কাছে সংবাদ জানিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম—কিন্তু সেখানেও কোন সংবাদ আইসে না। বাবুর এক্ষণে অজ্ঞাতবাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ কন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহার প্রতীকার করিবেন। গোবিন্দলাল ও রোহিণী এই অনিষ্টের মূল। অতএব প্রথমেই সন্ধান কর্ত্তব্য, সেই পামর পামরী কোথায় আছে। নচেৎ দুষ্টের দণ্ড হইবে না—ভ্রমরও মরিবে।

তাহারা একেবারে লুকাইয়াছে। যে সকল সূত্রে তাহাদের ধরিবার সম্ভাবনা, সকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে; পদচিহ্নমাত্র মুছিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মাধবীনাথ বলিলেন যে, যদি আমি তাহাদের সন্ধান করিতে না পারি, তবে বৃথায় আমার পৌরুষের শ্লাঘা করি।

এইরূপ স্থির সঙ্কল্প করিয়া মাধবীনাথ একাকী রায়দিগের বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। হরিদ্রাগ্রামে একটি পোষ্ট আপিস ছিল; মাধবীনাথ বেত্রহস্তে, হেলিতে দুলিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, ধীরে ধীরে, নিরীহ ভালমানুষের মত, সেইখানে গিয়া দর্শন দিলেন।

ডাকঘরে, অন্ধকার চালাঘরের মধ্যে মাসিক পনর টাকা বেতনভোগী একটি ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বিরাজ করিতেছিলেন। একটি আম্রকাষ্ঠের ভগ্ন টেবিলের উপরে কতকগুলি চিঠি, চিঠির ফাইল, চিঠির খাম, একখানি খুরিতে কতকটা জিউলির আটা, একটি নিক্তি, ডাকঘরের মোহর ইত্যাদি লইয়া, পোষ্ট মাষ্টার ওরফে পোষ্ট বাবু গম্ভীরভাবে, পিয়ন মহাশয়ের নিকট আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বাবু পান পনর টাকা, পিয়ন পায় ৭ টাকা। সুতরাং পিয়ন মনে করে, সাত আনা আর পনর আনায় যে তফাৎ, বাবুর সঙ্গে আমার সঙ্গে তাহার অধিক তফাৎ নহে। কিন্তু বাবু মনে মনে জানেন যে, আমি একটা ডিপুটি—ও বেটা পিয়াদা—আমি উহার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ—উহাতে আমাতে জমীন আশমান্ ফারাক। সেই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য, পোষ্ট মাষ্টার বাবু সর্ব্বদা সে গরিবকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকেন—সেও সাত আনার ওজনে উত্তর দিয়া থাকে। বাবু আপাততঃ চিঠি ওজন করিতেছিলেন, এবং পিয়াদাকে সঙ্গে সঙ্গে আশী আনার ওজনে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রশান্তমূর্ত্তি সহাস্যবদন

মাধবীনাথ বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক দেখিয়া, পোষ্ট মাষ্টার বাবু আপাততঃ পিয়াদার সঙ্গে কচকচি বন্ধ করিয়া, হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। ভদ্রলোককে সমাদর করিতে হয়, এমন কতকটা তাঁহার মনে উদয় হইল—কিন্তু সমাদর কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা তাঁহার শিক্ষার মধ্যে নহে—সুতরাং তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

মাধবীনাথ দেখিলেন, একটা বানর। সহাস্যবদনে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ?"

পোষ্ট মাষ্টার বলিলেন, "হাঁ—তু—তুমি—আপনি?"

মাধবীনাথ ঈষৎ হাস্য সংবরণ করিয়া অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রাতঃপ্রণাম।"

তখন পোষ্ট মাষ্টার বাবু বলিলেন, "বসুন।"

মাধবীনাথ কিছু বিপদে পড়িলেন;—পোষ্ট বাবু ত বলিলেন "বসুন," কিন্তু তিনি বসেন কোথা—বাবু খোদ এক অতি প্রাচীন ত্রিপাদমাত্রাবশিষ্ট চৌকিতে বসিয়া আছেন—তাহা ভিন্ন আর আসন কোথাও নাই। তখন সেই পোষ্ট মাষ্টার বাবুর সাত আনা, হরিদাস পিয়াদা—একটা ভাঙ্গা টুলের উপর হইতে রাশিখানি ছেঁড়া বহি নামাইয়া রাখিয়া, মাধবীনাথকে বসিতে দিল। মাধবীনাথ বসিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "কি হে বাপু, কেমন আছ? তোমাকে দেখিয়াছি না?"

পিয়াদা। আজ্ঞা, আমি চিঠি বিলি করিয়া থাকি।

মাধবী। তাই চিনিতেছি। এক ছিলিম তামুক সাজো দেখি—

মাধবীনাথ গ্রামান্তরের লোক, তিনি কখনই হরিদাস বৈরাগী পিয়াদাকে দেখেন নাই এবং বৈরাগী বাবাজিও কখনও তাঁহাকে দেখেন নাই। বাবাজি মনে করিলেন—বাবুটা রকমসই বটে, চাহিলে কোন্ না চারি গণ্ডা বকশিষ দিবে। এই ভাবিয়া হরিদাস হুঁকার তল্লাসে ধাবিত হইলেন।

মাধবীনাথ আদৌ তামাকু খান না—কেবল হরিদাস বাবাজিকে বিদায় করিবার জন্য তামাকুর ফরমায়েস্ করিলেন।

পিয়াদা মহাশয় স্থানান্তরে গমন করিলে, মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে বলিলেন, "আপনার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসা হইয়াছে।"

পোষ্ট মাষ্টার বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয়—নিবাস বিক্রমপুর। অন্য দিকে যেমন নির্ব্বোধ হউন না কেন—আপনার কাজ বুঝিতে সুচ্যগ্রবুদ্ধি। বুঝিলেন যে, বাবুটি কোন বিষয়ের সন্ধানে আসিয়াছেন। বলিলেন, "কি কথা মহাশয়?"

মাধ। ব্রহ্মানন্দকে আপনি চিনেন?

পোষ্ট। চিনি না—চিনি—ভাল চিনি না।

মাধবীনাথ বুঝিলেন, অবতার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে। বলিলেন, "আপনার ডাকঘরে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের নামে কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে?"

পোষ্ট। আপনার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের আলাপ নাই?

মাধ। থাক বা না থাক, কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে আপনার কাছে আসিয়াছি।

পোষ্ট মাষ্টার বাবু তখন আপনার উচ্চ পদ এবং ডিপুটি অভিধান স্মরণপূর্ব্বক অতিশয় গম্ভীর হইয়া বসিলেন, এবং অল্প রুষ্টভাবে বলিলেন, "ডাকঘরের খবর আমাদের বলিতে বারণ আছে।" ইহা বলিয়া পোষ্ট মাষ্টার নীরবে চিঠি ওজন করিতে লাগিলেন।

মাধবীনাথ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন; প্রকাশ্যে বলিলেন, "ওহে বাপু, তুমি অমনি কথা কবে না, তা জানি। সে জন্য কিছু সঙ্গেও আনিয়াছি—কিছু দিয়া যাইব—এখন যা যা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক বল দেখি—"

তখন, পোষ্ট বাবু হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিলেন, "কি কন?"

মা। কই এই, ব্রহ্মানন্দের নামে কোন চিঠি পত্র ডাকঘরে আসিয়া থাকে?

পো। আসে।

মা। কত দিন অন্তর?

পোষ্ট। যে কথাটি বলিয়া দিলাম, তাহার এখনও টাকা পাই নাই। আগে তার টাকা বাহির করুন; তবে নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

মাধবীনাথের ইচ্ছা ছিল, পোষ্ট মাষ্টারকে কিছু দিয়া যান। কিন্তু তাহার চরিত্রে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন, "বাপু, তুমি ত বিদেশী মানুষ দেখ্‌ছি—আমায় চেন কি?"

পোষ্ট মাষ্টার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না। তা আপনি যেই হউন না কেন—আমরা কি পোষ্ট আপিসের খবর যাকে তাকে বলি? কে তুমি?"

মা। আমার নাম মাধবীনাথ সরকার—বাড়ী রাজগ্রাম। আমার পাল্লায় কত লাঠিয়াল আছে, খবর রাখ?

পোষ্ট বাবুর ভয় হইল—মাধবী বাবুর নাম ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ শুনিয়াছিলেন। পোষ্ট বাবু একটু চুপ করিলেন।

মাধবীনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি যাহা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—সত্য সত্য জবাব দাও। কিছু তঞ্চক করিও না। করিলে তোমায় কিছু দিব না—এক পয়সাও

নহে। কিন্তু যদি না বল, মিছা বল, তবে তোমার ঘরে আগুন দিব, তোমার ডাকঘর লুঠ করিব; আদালতে প্রমাণ করাইব যে, তুমি নিজে লোক দিয়া সরকারি টাকা অপহরণ করিয়াছ—কেমন, এখন বলিবে?"

পোষ্ট বাবু থরহরি কাঁপিতে লাগিলেন—বলিলেন, "আপনি রাগ করেন কেন? আমি ত আপনাকে চিনিতাম না, বাজে লোক মনে করিয়াই ওরূপ বলিয়াছিলাম—আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা বলিব।"

মা। কত দিন অন্তর ব্রহ্মানন্দের চিঠি আসে?

পোষ্ট। প্রায় মাসে মাসে—ঠিক ঠাওর নাই।

মা। তবে রেজিষ্টরি হইয়াই চিঠি আসে?

পোষ্ট। হাঁ—প্রায় অনেক চিঠিই রেজিষ্টরি করা।

মা। কোন্ আপিস হইতে রেজিষ্টরি হইয়া আইসে?

পোষ্ট। মনে নাই।

মাধবী। তোমার আপিসে একখানা করিয়া রসিদ থাকে না?

পোষ্ট মাষ্টার রসিদ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। একখানি পড়িয়া বলিলেন, "প্রসাদপুর।"

"প্রসাদপুর কোন্ জেলা? তোমাদের লিষ্টি দেখ।"

পোষ্ট মাষ্টার কাঁপিতে কাঁপিতে ছাপান লিষ্টি দেখিয়া বলিল, "যশোর।"

মা। দেখ, তবে আর কোথা কোথা হইতে রেজিষ্টরি চিঠি উহার নামে আসিয়াছে। সব রসিদ দেখ।

পোষ্ট বাবু দেখিলেন, ইদানীন্তন যত পত্র আসিয়াছে, সকলই প্রসাদপুর হইতে। মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টার বাবুর কম্পমান হস্তে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখনও হরিদাস বাবাজির হুঁকা জুটিয়া উঠে নাই। মাধবীনাথ হরিদাসের জন্যও একটি টাকা রাখিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে, পোষ্ট বাবু তাহা আত্মসাৎ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। মাধবীনাথ, গোবিন্দলাল ও রোহিণীর অধঃপতনকাহিনী সকলই লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, রোহিণী গোবিন্দলাল এক স্থানেই গোপনে বাস করিতেছে। ব্রহ্মানন্দের অবস্থাও তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন—জানিতেন যে, রোহিণী ভিন্ন তাঁহার আর কেহই নাই। অতএব যখন পোষ্ট আপিসে জানিলেন যে, ব্রহ্মানন্দের নামে মাসে মাসে রেজিষ্টরি হইয়া চিঠি আসিতেছে—তখন বুঝিলেন যে, হয় রোহিণী, নয় গোবিন্দলাল তাঁহাকে মাসে মাসে খরচ পাঠায়। প্রসাদপুর হইতে চিঠি আসে, অতএব উভয়েই প্রসাদপুরে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবশ্য বাস করিতেছে, কিন্তু নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য তিনি কন্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়াই ফাঁড়িতে একটি লোক পাঠাইলেন। সব্ ইন্স্পেক্টরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, একটি কন্ষ্টেবল পাঠাইবেন, বোধ হয় কতকগুলি চোরা মাল ধরাইয়া দিতে পারিব।

সব্ ইন্স্পেক্টর, মাধবীনাথকে বিলক্ষণ জানিতেন—ভয়ও করিতেন—পত্রপ্রাপ্তি মাত্র নিদ্রাসিংহ কন্ষ্টেবলকে পাঠাইয়া দিলেন।

মাধবীনাথ নিদ্রাসিংহের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, "বাপু হে—হিন্দি মিন্দি কইও না—যা বলি, তাই কর। ঐ গাছতলায় গিয়া, লুকাইয়া থাক। কিন্তু এমন ভাবে গাছতলায় দাঁড়াইবে, যেন এখান হইতে তোমাকে দেখা যায়। আর কিছু করিতে হইবে না।" নিদ্রাসিংহ স্বীকৃত হইয়া বিদায় হইল। মাধবীনাথ তখন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মানন্দ আসিয়া নিকটে বসিল। তখন আর কেহ সেখানে ছিল না।

পরস্পরে স্বাগত জিজ্ঞাসার পর মাধবীনাথ বলিলেন, "মহাশয় আমার স্বর্গীয় বৈবাহিক মহাশয়ের বড় আত্মীয় ছিলেন। এখন তাঁহারা ত কেহ নাই—আমার জামাতাও বিদেশস্থ। আপনার কোন বিপদ্ আপদ্ পড়িলেই আমাদিগকেই দেখিতে হয়—তাই আপনাকে ডাকাইয়াছি।"

ব্রহ্মানন্দের মুখ শুকাইল। বলিল, "বিপদ্ কি মহাশয়?" মাধবীনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত বটে।"

ব্র। কি বিপদ্ মহাশয়?

মা। বিপদ্ সমূহ। পুলিষে কি প্রকারে নিশ্চয় জানিয়াছে যে, আপনার কাছে একখানা চোরা নোট আছে।

ব্রহ্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল। "সে কি। আমার কাছে চোরা নোট।"

মাধবী। তোমার জানা, চোরা না হইতে পারে। অন্যে তোমাকে চোরা নোট দিয়াছে, তুমি না জানিয়া তুলিয়া রাখিয়াছ।

ব্র। সে কি মহাশয়। আমাকে নোট কে দিবে?

মাধবীনাথ তখন আওয়াজ ছোট করিয়া বলিলেন, "আমি সকলই জানিয়াছি—পুলিষেও জানিয়াছে। বাস্তবিক পুলিষের কাছেই এ সকল কথা শুনিয়াছি। চোরা নোট প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে। ঐ দেখ, এক জন পুলিষের কন্‌ষ্টেবল আসিয়া তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছে—আমি তাহাকে কিছু দিয়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছি।"

মাধবীনাথ তখন বৃক্ষতলবিহারী রুলধারী গুম্ফশ্মশ্রু-শোভিত জলধরসন্নিভ কন্‌ষ্টেবলের কান্তমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন।

ব্রহ্মানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল। মাধবীনাথের পায়ে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল, "আপনি রক্ষা করুন।"

মা। ভয় নাই। এবার প্রসাদপুর হইতে কোন্ কোন্ নম্বরের নোট পাইয়াছ, বল দেখি। পুলিষের লোক আমার কাছে নোটের নম্বর রাখিয়া গিয়াছে। যদি সে নম্বরের নোট না হয়, তবে ভয় কি? নম্বর বদলাইতে কতক্ষণ? এবারকার প্রসাদপুরের পত্রখানি লইয়া আইস দেখি—নোটের নম্বর দেখি।

ব্রহ্মানন্দ যায় কি প্রকারে? ভয় করে—কন্‌ষ্টেবল যে গাছতলায়।

মাধবীনাথ বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি।" মাধবীনাথের আদেশমত এক জন দ্বারবান ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে গেল। ব্রহ্মানন্দ রোহিণীর পত্র লইয়া আসিলেন। সেই পত্রে, মাধবীনাথ যাহা যাহা খুঁজিতেছিলেন, সকলই পাইলেন।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এ নম্বরের নোট নহে। কোন ভয় নাই—তুমি ঘরে যাও। আমি কন্‌ষ্টেবলকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

ব্রহ্মানন্দ মৃতদেহে প্রাণ পাইল। ঊর্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিল।

মাধবীনাথ কন্যাকে চিকিৎসার্থ স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তাহার চিকিৎসার্থ উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, স্বয়ং কলিকাতায় চলিলেন। ভ্রমর অনেক আপত্তি করিল—মাধবীনাথ শুনিলেন না। শীঘ্রই আসিতেছি, এই বলিয়া কন্যাকে প্রবোধ দিয়া গেলেন।

কলিকাতায় নিশাকর দাস নামে মাধবীনাথের এক জন বড় আত্মীয় ছিলেন। নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট দশ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। নিশাকর কিছু করেন না—পৈতৃক বিষয় আছে—কেবল একটু একটু গীতবাদ্যের অনুশীলন করেন। নিষ্কর্ম্মা বলিয়া সর্ব্বদা পর্য্যটনে গমন করিয়া থাকেন। মাধবীনাথ তাঁহার কাছে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য কথার পর নিশাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে, বেড়াইতে যাইবে?"

নিশা। কোথায়?

মা। যশোর।

নি। সেখানে কেন?

মা। নীলকুঠি কিনব।

নি। চল।

তখন বিহিত উদ্যোগ করিয়া, দুই বন্ধু দুই এক দিনের মধ্যে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে প্রসাদপুর যাইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেখ, ধীরে ধীরে শীর্ণশরীরা চিত্রানদী বহিতেছে—তীরে অশ্বত্থ কদম্ব আম্র খর্জ্জুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোভিত উপবনে কোকিল দয়েল পাপিয়া ডাকিতেছে। নিকটে গ্রাম নাই; প্রসাদপুর নামে একটি ক্ষুদ্র বাজার প্রায় এক ক্রোশ পথ দূর। এখানে মনুষ্যসমাগম নাই দেখিয়া, নিঃশঙ্কে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া, পূর্ব্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে নীলকর এবং তাহার ঐশ্বর্য্য ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে—তাহার আমীন তাগাদগীর নায়েব গোমস্তা সকলে উপযুক্ত স্থানে স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগ করিতেছেন। এক জন বাঙ্গালী সেই জনশূন্য প্রান্তরস্থিত রম্য অট্টালিকা ক্রয় করিয়া, তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পুষ্পে, প্রস্তরপুত্তলে, আসনে, দর্পণে, চিত্রে, গৃহ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অভ্যন্তরে দ্বিতলস্থ বৃহৎ কক্ষমধ্যে আমরা প্রবেশ করি। কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র—কিন্তু কতকগুলি সুরুচিবিগর্হিত—অবর্ণনীয়। নির্ম্মল সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়া এক জন শ্মশ্রুধারী মুসলমান একটা তম্বুরার কাণ মুচড়াইতেছে—কাছে বসিয়া এক যুবতী

ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্বর্ণালঙ্কার ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিতেছে—পার্শ্বস্থ প্রাচীরবিলম্বী দুইখানি বৃহৎ দর্পণে উভয়ের ছায়াও ঐরূপ করিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া, এক জন যুবা পুরুষ নবেল পড়িতেছেন এবং মধ্যস্থ মুক্ত দ্বারপথে যুবতীর কার্য্য দেখিতেছেন।

তম্বুরার কাণ মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়ীধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার খ্যান্ খ্যান্ ওস্তাদজির বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল—তখন তিনি সেই গুম্ফ শ্মশ্রুর অন্ধকারমধ্য হইতে কতকগুলি তুষারধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া, বৃষভদুর্লভ কণ্ঠরব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। রব নির্গত করিতে করিতে সে তুষারধবল দন্তগুলি বহুবিধ খিচুনিতে পরিণত হইতে লাগিল, এবং ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাশি তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া নানাপ্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল। তখন যুবতী খিচুনিসন্তাড়িত হইয়া সেই বৃষভদুর্লভ রবের সঙ্গে আপনার কোমল কণ্ঠ মিশাইয়া, গীত আরম্ভ করিল—তাহাতে সরু মোটা আওয়াজে, সোনালি রূপালি রকম এক প্রকার গীত হইতে লাগিল।

এইখানে যবনিকা পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব। কিন্তু তথাপি সেই অশোক বকুল কুটজ কুরুবক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকূজন, সেই ক্ষুদ্রনদীতরঙ্গচালিত রাজহংসের কলনাদ, সেই যুথি জাতি মল্লিকা মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নীলকাচপ্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব্ব মাধুরী, সেই রজতস্ফটিকাদিনির্ম্মিত পুষ্পাধারে সুবিন্যস্ত কুসুমগুচ্ছের শোভা, সেই গৃহশোভাকারী দ্রব্যজাতের বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণ আর সেই গায়কের বিশুদ্ধস্বরসপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টি, এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম। কেন না, যে যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে, তাহার হৃদয়ে ঐ কটাক্ষের মাধুর্য্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

এই যুবা গোবিন্দলাল—ঐ যুবতী রোহিণী। এই গৃহ গোবিন্দলাল ক্রয় করিয়াছেন। এইখানেই ইহারা স্থায়ী।

অকস্মাৎ রোহিণীর তব্‌লা বেসুরা বলিল। ওস্তাদজির তম্বুরার তার ছিঁড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল—গীত বন্ধ হইল; গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল। সেই সময় সেই প্রমোদগৃহের দ্বারে এক জন অপরিচিত যুবা পুরুষ প্রবেশ করিল। আমরা তাহাকে চিনি—সে নিশাকর দাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বিতল অট্টালিকার উপরতলে রোহিণীর বাস—তিনি হাপ পরদানসীন্। নিম্নতলে ভৃত্যগণ বাস করে। সে বিজনমধ্যে প্রায় কেহই কখনও গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত না—সুতরাং সেখানে বহির্ব্বাটীর প্রয়োজন ছিল না। যদি কালে ভদ্রে কোন দোকানদার বা অপর কেহ আসিত, উপরে বাবুর কাছে সংবাদ যাইত; বাবু নীচে আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। অতএব বাবুর বসিবার জন্য নীচেও একটি ঘর ছিল।

নিম্নতলে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিশাকর দাস কহিলেন, "কে আছ গা এখানে?"

গোবিন্দলালের সোণা রূপো নামে দুই ভৃত্য ছিল। মনুষ্যের শব্দে দুই জনেই দ্বারের নিকট আসিয়া নিশাকরকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। নিশাকরকে দেখিয়াই বিশেষ ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইল—নিশাকরও বেশভূষা সম্বন্ধে একটু জাঁক করিয়া গিয়াছেন। সেরূপ লোক কখনও সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই—দেখিয়া ভৃত্যেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওই করিতে লাগিল। সোণা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাকে খুঁজেন?"

নিশা। তোমাদেরই। বাবুকে সংবাদ দাও যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

সোণা। কি নাম বলিব?

নিশা। নামের প্রয়োজনই বা কি? একটি ভদ্রলোক বলিয়া বলিও।

এখন, চাকরেরা জানিত যে, কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবু সাক্ষাৎ করেন না—সেরূপ স্বভাবই নয়। সুতরাং চাকরেরা সংবাদ দিতে বড় ইচ্ছুক ছিল না। সোণা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রূপো বলিল, "আপনি অনর্থক আসিয়াছেন—বাবু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।"

নিশা। তবে তোমরা থাক—আমি বিনা সংবাদেই উপরে যাইতেছি।

চাকরেরা ফাঁপরে পড়িল। বলিল, "না মহাশয়, আমাদের চাকরী যাবে।"

নিশাকর তখন একটি টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, "যে সংবাদ করিবে, তাহার এই টাকা।"

সোণা ভাবিতে লাগিল—রূপো চিলের মত ছোঁ মারিয়া নিশাকরের হাত হইতে টাকা লইয়া উপরে সংবাদ দিতে গেল।

গৃহটি বেষ্টন করিয়া যে পুষ্পোদ্যান আছে, তাহা অতি মনোরম। নিশাকর সোণাকে বলিলেন, "আমি এ ফুলবাগানে বেড়াইতেছি—আপত্তি করিও না—যখন সংবাদ আসিবে, তখন আমাকে ঐখান হইতে ডাকিয়া আনিও।" এই বলিয়া নিশাকর সোণার হাতে আর একটি টাকা দিলেন।

রূপো যখন বাবুর কাছে গেল, তখন বাবু কোন কার্য্যবশতঃ অনবসর ছিলেন, ভৃত্য তাঁহাকে নিশাকরের সংবাদ কিছুই বলিতে পারিল না। এ দিকে উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে নিশাকর একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, এক পরমা সুন্দরী জানেলায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছে।

রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া ভাবিতেছিল, "এ কে? দেখিয়াই বোধ হইতেছে যে, এ দেশের লোক নয়। বেশভূষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা যাইতেছে যে, বড় মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নয়। গোবিন্দলালের রঙ ফরশা—কিন্তু এর মুখ চোখ ভাল। বিশেষ চোখ—আ মরি! কি চোখ! এ কোথা থেকে এলো? হলুদগাঁয়ের লোক ত নয়—সেখানকার সবাইকে চিনি। ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাই না? ক্ষতি কি—আমি ত কখনও গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।"

রোহিণী এইরূপ ভাবিতেছিল, এমত সময়ে নিশাকর উন্নতমুখে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করাতে চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল। চক্ষে চক্ষে কোন কথাবার্ত্তা হইল কি না, তাহা আমরা জানি না—জানিলেও বলিতে ইচ্ছা করি না—কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, এমত কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে।

এমত সময়ে রূপো বাবুর অবকাশ পাইয়া বাবুকে জানাইল যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিয়াছে?"

রূপো। তাহা জানি না।

বাবু। তা না জিজ্ঞাসা করে খবর দিতে আসিয়াছিস্ কেন?

রূপো দেখিল, বোকা বনিয়া যাই। উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বলিল, "তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, বাবুর কাছেই বলিব।"

বাবু বলিলেন, "তবে বল গিয়া, সাক্ষাৎ হইবে না।"

এদিকে নিশাকর বিলম্ব দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, বুঝি গোবিন্দলাল সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু দুষ্কৃতকারীর সঙ্গে ভদ্রতা কেনই করি? আমি কেন আপনিই উপরে চলিয়া যাই না?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভৃত্যের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা না করিয়াই নিশাকর গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সোণা রূপো কেহই নীচে নাই। তখন তিনি নিরুদ্বেগে সিঁড়িতে উঠিয়া, যেখানে গোবিন্দলাল, রোহিণী এবং দানেশ খাঁ গায়ক, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রূপো তাঁহাকে দেখিয়া দেখাইয়া দিল যে, এই বাবু সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছিলেন।

গোবিন্দলাল বড় রুষ্ট হইলেন। কিন্তু দেখিলেন, ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

নি। আমার নাম রাসবিহারী দে।

গো। নিবাস?

নি। বরাহনগর।

নিশাকর জাঁকিয়া বসিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে, গোবিন্দলাল বসিতে বলিবেন না।

গো। আপনি কাকে খুঁজেন?

নি। আপনাকে।

গো। আপনি আমার ঘরের ভিতর জোর করিয়া প্রবেশ না করিয়া যদি একটু অপেক্ষা করিতেন, তবে চাকরের মুখে শুনিতেন যে, আমার সাক্ষাতের অবকাশ নাই।

নি। বিলক্ষণ অবকাশ দেখিতেছি। ধমকে চমকে উঠিয়া যাইব, যদি আমি সে প্রকৃতির লোক হইতাম, তবে আপনার কাছে আসিতাম না। যখন আমি আসিয়াছি, তখন আমার কথা কয়টা শুনিলেই আপদ্ চুকিয়া যায়।

গো। না শুনি, ইহাই আমার ইচ্ছা। তবে যদি দুই কথায় বলিয়া শেষ করিতে পারেন, তবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করুন।

নি। দুই কথাতেই বলিব। আপনার ভার্য্যা ভ্রমর দাসী তাঁহার বিষয়গুলি পত্তনী বিলি করিবেন।

দানেশ খাঁ গায়ক তখন তম্বুরায় নূতন তার চড়াইতেছিল। সে এক হাতে তার চড়াইতে লাগিল, এক হাতে আঙ্গুল ধরিয়া বলিল, "এক বাত হুয়া।"

নি। আমি তাহা পত্তনী লইব।

দানেশ আঙ্গুল গণিয়া বলিল, "দো বাত হুয়া।"

নি। আমি সে জন্য আপনাদিগের হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে গিয়াছিলাম।

দানেশ খাঁ বলিল, "দো বাত ছোড়্‌কে তিন বাত হুয়া।"

নি। ওস্তাদজী শুয়ার গুণচো না কি ?

ওস্তাদজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন, "বাবু সাহাব, ইয়ে বেতমিজ আদমিকো বিদা দিজিয়ে।"

কিন্তু বাবু সাহেব, তখন অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, কথা কহিলেন না।

নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "আপনার ভার্য্যা আমাকে বিষয়গুলি পত্তনী দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার অনুমতিসাপেক্ষ। তিনি আপনার ঠিকানাও জানেন না; পত্রাদি লিখিতেও ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং আপনার অভিপ্রায় জানিবার ভার আমার উপরেই পড়িল। আমি অনেক সন্ধানে আপনার ঠিকানা জানিয়া, আপনার অনুমতি লইতে আসিয়াছি।"

গোবিন্দলাল কোন উত্তর করিলেন না—বড় অন্যমনস্ক। অনেক দিনের পর ভ্রমরের কথা শুনিলেন—তাঁহার সেই ভ্রমর!! প্রায় দুই বৎসর হইল।

নিশাকর কতক কতক বুঝিলেন। পুনরপি বলিলেন, "আপনার যদি মত হয়, তবে এক ছত্র লিখিয়া দিন যে, আপনার কোন আপত্তি নাই। তাহা হইলেই আমি উঠিয়া যাই।"

গোবিন্দলাল কিছুই উত্তর করিলেন না। নিশাকর বুঝিলেন, আবার বলিতে হইল। আবার সকল কথাগুলি বুঝাইয়া বলিলেন। গোবিন্দলাল এবার চিত্ত সংযত করিয়া কথা সকল শুনিলেন। নিশাকরের সকল কথাই যে মিথ্যা, তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা কিছুই বুঝেন নাই। পূর্ব্বকার উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার অনুমতি লওয়া অনাবশ্যক। বিষয় আমার স্ত্রীর, আমার নহে, বোধ হয় তাহা জানেন। তাঁহার যাহাকে ইচ্ছা পত্তনী দিবেন, আমার বিধি নিষেধ নাই। আমিও কিছু লিখিব না। বোধ হয় এখন আপনি আমাকে অব্যাহতি দিবেন।"

কাজে কাজেই নিশাকরকে উঠিতে হইল। তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। নিশাকর গেলে, গোবিন্দলাল দানেশ খাঁকে বলিলেন, "কিছু গাও।"

দানেশ খাঁ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, আবার তম্বুরায় সুর বাঁধিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গাইব?"

"যা খুসি।" বলিয়া গোবিন্দলাল তবলা লইলেন। গোবিন্দলাল পূর্ব্বেই কিছু কিছু বাজাইতে জানিতেন, এক্ষণে উত্তম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন; কিন্তু আজি দানেশ খাঁর সঙ্গে তাঁহার সঙ্গত হইল না, সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল। দানেশ খাঁ

বিরক্ত হইয়া তম্বুরা ফেলিয়া গীত বন্ধ করিয়া বলিল, "আজ আমি ক্লান্ত হইয়াছি।" তখন গোবিন্দলাল একটা সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গৎ সব ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেতার ফেলিয়া নবেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাহা পড়িতেছিলেন, তাহার অর্থবোধ হইল না। তখন বহি ফেলিয়া গোবিন্দলাল শয়নগৃহমধ্যে গেলেন। রোহিণীকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু সোণা চাকর নিকটে ছিল। দ্বার হইতে গোবিন্দলাল, সোণাকে বলিলেন, "আমি এখন একটু ঘুমাইব, আমি আপনি না উঠিলে আমাকে কেহ যেন উঠায় না।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল শয়নঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল ত ঘুমাইল না। খাটে বসিয়া, দুই হাত মুখে দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কেন যে কাঁদিল, তাহা জানি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিল, কি নিজের জন্য কাঁদিল, তা বলিতে পারি না। বোধ হয় দুইই।

আমরা ত কান্না বৈ গোবিন্দলালের অন্য উপায় দেখি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিবার পথ আছে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় নাই। হরিদ্রাগ্রামে আর মুখ দেখাইবার কথা নাই। হরিদ্রাগ্রামের পথে কাঁটা পড়িয়াছে। কান্না বৈ ত আর উপায় নাই!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যখন নিশাকর আসিয়া বড় হলে বসিল, রোহিণীকে সুতরাং পাশের কামরায় প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নয়নের অন্তরাল হইল মাত্র—শ্রবণের নহে। কথোপকথন যাহা হইল—সকলই কাণ পাতিয়া শুনিল। বরং দ্বারের পরদাটি একটু সরাইয়া, নিশাকরকে দেখিতে লাগিল। নিশাকরও দেখিল যে, পরদার পাশ হইতে একটি পটলচেরা চোক তাঁকে দেখিতেছে।

রোহিণী শুনিল যে, নিশাকর অথবা রাসবিহারী হরিদ্রাগ্রাম হইতে আসিয়াছে। রূপো চাকরও রোহিণীর মত সকল কথা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। নিশাকর উঠিয়া গেলেই

রোহিণী পরদার পাশ হইতে মুখ বাহির করিয়া আঙ্গুলের ইষারায় রূপোকে ডাকিল। রূপো কাছে আসিলে, তাহাকে কাণে কাণে বলিল, "যা বলি, তা পারবি? বাবুকে সকল কথা লুকাইতে হইবে। যাহা করিবি, তাহা যদি বাবু কিছু না জানিতে পারেন, তবে তোকে পাঁচ টাকা বখ্‌শিষ দিব।"

রূপো মনে ভাবিল—আজ না জানি, উঠিয়া কার মুখ দেখিয়াছিলাম—আজ ত দেখ্‌চি টাকা রোজকারের দিন। গরিব মানুষের দুই পয়সা এলেই ভাল। প্রকাশ্যে বলিল, "যা বলিবেন, তাই পারিব। কি, আজ্ঞা করুন।"

রো। ঐ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া যা। উনি আমার বাপের বাড়ীর দেশ থেকে এসেছেন। সেখানকার কোন সংবাদ আমি কখনও পাই না—তার জন্য কত কাঁদি। যদি দেশ থেকে একটি লোক এসেছে, তাকে একবার আপনার জনের দুটো খবর জিজ্ঞাসা করবো। বাবু ত রেগে ওকে উঠিয়ে দিলেন। তুই গিয়ে তাকে বসা। এমন জায়গায় বসা, যেন বাবু নীচে গেলে না দেখতে পান। আর কেহ না দেখিতে পায়। আমি একটু নিরিবিলি পেলেই যাব। যদি বস্‌তে না চায়, তবে কাকুতি মিনতি করিস্‌।

রূপো বখ্‌সিসের গন্ধ পাইয়াছে—যে আজ্ঞা বলিয়া ছুটিল।

নিশাকর কি অভিপ্রায়ে গোবিন্দলালকে ছলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি নীচেয় আসিয়া যেরূপ আচরণ করিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধিমানে দেখিলে তাঁহাকে বড় অবিশ্বাস করিত। তিনি গৃহপ্রবেশদ্বারের কবাট, খিল, কব্জা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। এমত সময়ে রূপো খানসামা আসিয়া উপস্থিত হইল।

রূপো বলিল, "তামাকু ইচ্ছা করিবেন কি?"

নিশা। বাবু ত দিলেন না, চাকরের কাছে খাব কি?

রূপো। আজ্ঞে তা নয়—একটা নিরিবিলি কথা আছে। একটু নিরিবিলিতে আসুন।

রূপো নিশাকরকে সঙ্গে করিয়া আপনার নির্জ্জন ঘরে লইয়া গেল। নিশাকরও বিনা ওজর আপত্তিতে গেলেন। সেখানে নিশাকরকে বসিতে দিয়া, যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, রূপচাঁদ তাহা বলিল।

নিশাকর আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির অতি সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "বাপু, তোমার মুনিব ত আমায় তাড়িয়ে দিয়াছেন, আমি তাঁর বাড়ীতে লুকাইয়া থাকি কি প্রকারে?"

রূপো। আজ্ঞে তিনি কিছু জানিতে পারিবেন না। এ ঘরে তিনি কখনও আসেন না।

নিশা। না আসুন, কিন্তু যখন তোমার মা ঠাকুরাণী নীচে আসিবেন, তখন যদি তোমার বাবু ভাবেন, কোথায় গেল দেখি? যদি তাই ভাবিয়া পিছু পিছু আসেন, কি কোন রকমে যদি আমার কাছে তোমার মা ঠাকুরাণীকে দেখেন, তবে আমার দশাটা কি হবে বল দেখি?

রূপচাঁদ চুপ করিয়া রহিল। নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "এই মাঠের মাঝখানে, ঘরে পুরিয়া আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পুঁতিয়া রাখিলেও আমার মা বল্‌তে নাই, বাপ বল্‌তেও নাই। তখন তুমিই আমাকে দু ঘা লাঠি মারিবে।—অতএব এমন কাজে আমি নই। তোমার মাকে বুঝাইয়া বলিও যে, আমি ইহা পারিব না। আর একটি কথা বলিও। তাঁহার খুড়া আমাকে কতকগুলি অতি ভারি কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছিল। আমি তোমার মা ঠাকুরাণীকে সে কথা বলিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু তোমার বাবু আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমার বলা হইল না, আমি চলিলাম।"

রূপো দেখিল, পাঁচ টাকা হাতছাড়া হয়। বলিল, "আচ্ছা, তা এখানে না বসেন, বাহিরে একটু তফাতে বসিতে পারেন না?"

নিশা। আমিও সেই কথা ভাবিতেছিলাম। আসিবার সময় তোমাদের কুঠির নিকটেই নদীর ধারে, একটা বাঁধা ঘাট, তাহার কাছে দুইটা বকুল গাছ দেখিয়া আসিয়াছি। চেন সে জায়গা?

রূপো। চিনি।

নিশা। আমি গিয়া সেইখানে বসিয়া থাকি। সন্ধ্যা হইয়াছে—রাত্রি হইলে, সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না। তোমার মা ঠাকুরাণী যদি সেইখানে আসিতে পারেন, তবেই সকল সংবাদ পাইবেন। তেমন তেমন দেখিলে, আমি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। ঘরে পুরিয়া যে আমাকে কুকুর-মারা করিবে, আমি তাহাতে বড় রাজি নহি।

অগত্যা রূপো চাকর, রোহিণীর কাছে গিয়া নিশাকর যেমন যেমন বলিল, তাহা নিবেদন করিল। এখন রোহিণীর মনের ভাব কি, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন মানুষে নিজে নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারে না—আমরা কেমন করিয়া বলিব যে,

রোহিণীর মনের ভাব এই ? রোহিণী যে ব্রহ্মানন্দকে এত ভালবাসিত যে, তাহার সংবাদ লইবার জন্য দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্যা হইবে, এমন খবর আমরা রাখি না। বুঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি, আঁচাআঁচি হইয়াছিল। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, নিশাকর রূপবান্—পটলচেরা চোক। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, মনুষ্যমধ্যে নিশাকর এক জন মনুষ্যত্বে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না। কিন্তু বিশ্বাসহানি এক কথা—আর এ আর এক কথা। বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, "অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?" ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে? বাঘ গোরু মারে,—সকল গোরু খায় না। স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে—কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য। অনেকে মাছ ধরে—কেবল মাছ ধরিবার জন্য, মাছ খায় না, বিলাইয়া দেয়। অনেকে পাখী মারে, কেবল মারিবার জন্য—মারিয়া ফেলিয়া দেয়। শিকার কেবল শিকারের জন্য—খাইবার জন্য নহে। জানি না, তাহাতে কি রস আছে। রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর-কাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই। জানি না, এই পাপীয়সীর পাপচিত্তে কি উদয় হইয়াছিল—কিন্তু রোহিণী স্বীকৃত হইল যে, প্রদোষকালে অবকাশ পাইলেই, গোপনে চিত্রার বাঁধাঘাটে একাকিনী সে নিশাকরের নিকট গিয়া খুল্লতাতের সংবাদ শুনিবে।

রূপচাঁদ আসিয়া সে কথা নিশাকরের কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়া, ধীরে ধীরে আসিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে গাত্রোত্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রূপো সরিয়া গেলে নিশাকর সোণাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাবুর কাছে কত দিন আছ?"

সোণা। এই—যতদিন এখানে এসেছেন, ততদিন আছি।

নিশা। তবে অল্পদিনই? পাও কি?

সোণা। তিন টাকা মাহিয়ানা, খোরাক পোষাক।

নিশা। এত অল্প বেতনে তোমাদের মত খানসামার পোষায় কি?

কথাটা শুনিয়া সোণা খানসামা গলিয়া গেল। বলিল, "কি করি, এখানে আর কোথায় চাকরি যোটে?"

নিশা। চাকরির ভাবনা কি? আমাদের দেশে গেলে তোমাদের লুপে নেয়। পাঁচ, সাত, দশ টাকা অনায়াসেই মাসে পাও।

সোণা। অনুগ্রহ করিয়া যদি সঙ্গে লইয়া যান।

নিশা। নিয়ে যাব কি, অমন মুনিবের চাকরি ছাড়্‌বে?

সোণা। মুনিব মন্দ নয়, কিন্তু মুনিব ঠাক্‌রুণ বড় হারামজাদা।

নিশা। হাতে হাতে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমার সঙ্গে তোমার যাওয়াই স্থির ত?

সোণা। স্থির বৈ কি।

নিশা। তবে যাবার সময় তোমার মুনিবের একটি উপকার করিয়া যাও। কিন্তু বড় সাবধানের কাজ। পার্‌বে কি?

সোণা। ভাল কাজ হয় ত পার্‌ব না কেন?

নিশা। তোমার মুনিবের পক্ষে ভাল, মুনিবনীর পক্ষে বড় মন্দ।

সোণা। তবে এখনই বলুন, বিলম্বে কাজ নাই। তাতে আমি বড় রাজি।

নিশা। ঠাক্‌রুণটি আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, চিত্রার বাঁধাঘাটে বসিয়া থাকিতে, রাত্রে আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিবেন। বুঝেছ? আমিও স্বীকার হইয়াছি। আমার অভিপ্রায় যে, তোমার মুনিবের চোখ ফুটায়ে দিই। তুমি আস্তে আস্তে কথাটি তোমার মুনিবকে জানিয়ে আসিতে পার?

সোণা। এখনি—ও পাপ মলেই বাঁচি।

নিশা। এখন নয়, এখন আমি ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকি। তুমি সতর্ক থেকো। যখন দেখ্‌বে, ঠাক্‌রুণটি ঘাটের দিকে চলিলেন, তখনি গিয়া তোমার মুনিবকে বলিয়া দিও। রূপো কিছু জানিতে না পারে। তার পর আমার সঙ্গে যুটো।

"যে আজ্ঞে" বলিয়া সোণা নিশাকরের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল। তখন নিশাকর হেলিতে দুলিতে গজেন্দ্রগমনে চিত্রাতীরশোভী সোপানাবলীর উপর গিয়া বসিলেন। অন্ধকারে নক্ষত্রচ্ছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। চারি দিকে শৃগালকুক্কুরাদি বহুবিধ রব করিতেছে। কোথাও দূরবর্ত্তী নৌকার উপর বসিয়া ধীবর উচ্চৈঃস্বরে শ্যামাবিষয় গায়িতেছে। তদ্ভিন্ন সেই বিজন প্রান্তর মধ্যে কোন শব্দ শোনা যাইতেছে না। নিশাকর

সেই গীত শুনিতেছেন এবং গোবিন্দলালের বাসগৃহের দ্বিতল কক্ষের বাতায়ননিঃসৃত উজ্জ্বল দীপালোক দর্শন করিতেছেন। এবং মনে মনে ভাবিতেছেন, "আমি কি নৃশংস। এক জন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি। অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য। যখন বন্ধুর কন্যাব জীবনরক্ষার্থ এ কার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপস্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে। আর পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার পাপ পুণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয় ত তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি,

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, রাত্রি প্রহরাতীত হইল। তখন নিশাকর দেখিলেন, নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে রোহিণী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য নিশাকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা?"

রোহিণীও নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য বলিল, "তুমি কে?"

নিশাকর বলিল, "আমি রাসবিহারী।"

রোহিণী বলিল, "আমি রোহিণী।"

নিশা। এত রাত্রি হলো কেন?

রোহিণী। একটু না দেখে শুনে ত আস্‌তে পারি নে। কি জানি, কে কোথা দিয়ে দেখতে পাবে। তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে।

নিশা। কষ্ট হোক্ না হোক্, মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে।

রোহিণী। আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে আমার দশা এমন হইবে কেন? এক জনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।

এই কথা বলিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া পিছন হইতে রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। রোহিণী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে?"

গম্ভীর স্বরে কে উত্তর করিল, "তোমার যম।"

রোহিণী চিনিল যে, গোবিন্দলাল। তখন আসন্ন বিপদ্ বুঝিয়া চারি দিক্ অন্ধকার দেখিয়া রোহিণী ভীতিবিকম্পিতস্বরে বলিল, "ছাড়! ছাড়! আমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। আমি যে জন্য আসিয়াছি, এই বাবুকে না হয় জিজ্ঞাসা কর।"

এই বলিয়া রোহিণী যেখানে নিশাকর বসিয়াছিল, সেই স্থান অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিল, কেহ সেখানে নাই। নিশাকর গোবিন্দলালকে দেখিয়া পলকের মধ্যে কোথায় সরিয়া গিয়াছে। রোহিণী বিস্মিতা হইয়া বলিল, "কৈ, কেহ কোথাও নাই যে!"

গোবিন্দলাল বলিল, "এখানে কেহ নাই। আমার সঙ্গে ঘরে এস।"

রোহিণী বিষণ্ণচিত্তে ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভৃত্যবর্গকে নিষেধ করিলেন, "কেহ উপরে আসিও না।"

ওস্তাদজি বাসায় গিয়াছিল।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া নিভৃতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। রোহিণী, সম্মুখে নদীস্রোতোবিকম্পিতা বেতসীর ন্যায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। গোবিন্দলাল মৃদুস্বরে বলিল, "রোহিণী!"

রোহিণী বলিল, "কেন?"

গো। তোমার সঙ্গে গোটাকত কথা আছে।

রো। কি?

গো। তুমি আমার কে?

রো। কেহ নহি, যত দিন পায়ে রাখেন, তত দিন দাসী। নহিলে কেহ নই।

গো। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রাখিয়াছিলাম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ্, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি। তুমি কি রোহিণি, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলাম? তুমি কি রোহিণি, যে তোমার জন্য ভ্রমর,—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর—তাহা পরিত্যাগ করিলাম?

এই বলিয়া গোবিন্দলাল আর দুঃখ ক্রোধের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া রোহিণীকে পদাঘাত করিলেন।

রোহিণী বসিয়া পড়িল। কিছু বলিল না, কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু চক্ষের জল গোবিন্দলাল দেখিতে পাইলেন না।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "রোহিণী, দাঁড়াও।"

রোহিণী দাঁড়াইল।

গো। তুমি একবার মরিতে গিয়াছিলে। আবার মরিতে সাহস আছে কি?

রোহিণী তখন মরিবার ইচ্ছা করিতেছিল। অতি কাতর স্বরে বলিল, "এখন আর না মরিতে চাহিব কেন? কপালে যা ছিল, তা হলো।"

গো। তবে দাঁড়াও। নড়িও না।

রোহিণী দাঁড়াইয়া রহিল।

গোবিন্দলাল পিস্তলের বাক্স খুলিলেন, পিস্তল বাহির করিলেন। পিস্তল ভরা ছিল। ভরাই থাকিত।

পিস্তল আনিয়া রোহিণীর সম্মুখে ধরিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "কেমন, মরিতে পারিবে?"

রোহিণী ভাবিতে লাগিল। যে দিন অনায়াসে, অক্লেশে, বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, আজি সে দিন রোহিণী ভুলিল। সে দুঃখ নাই, সুতরাং সে সাহসও নাই। ভাবিল, "মরিব কেন? না হয় ইনি ত্যাগ করেন, করুন। ইঁহাকে কখনও ভুলিব না, কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন? ইঁহাকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইঁহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের সুখরাশি যে মনে করিব, সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা। মরিব কেন?"

রোহিণী বলিল, "মরিব না, মারিও না। চরণে না রাখ, বিদায় দেও।"

গো। দিই।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল পিস্তল উঠাইয়া রোহিণীর ললাটে লক্ষ্য করিলেন।

রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না!"

গোবিন্দলালের পিস্তলে খট্ করিয়া শব্দ হইল। তার পর বড় শব্দ, তার পর সব অন্ধকার! রোহিণী গতপ্রাণা হইয়া ভূপতিতা হইল।

গোবিন্দলাল পিস্তল ভূমে নিক্ষেপ করিয়া অতি দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

পিস্তলের শব্দ শুনিয়া রূপা প্রভৃতি ভৃত্যবর্গ দেখিতে আসিল। দেখিল, বালক-নখরবিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে। গোবিন্দলাল কোথাও নাই!

দশম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় বৎসর

সেই রাত্রেই চৌকিদার থানায় গিয়া সংবাদ দিল যে, প্রসাদপুরের কুঠিতে খুন হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ থানা সে স্থান হইতে ছয় ক্রোশ ব্যবধান। দারগা আসিতে পরদিন বেলা প্রহরেক হইল। আসিয়া তিনি খুনের তদারকে প্রবৃত্ত হইলেন। রীতিমত সুরতহাল ও লাস তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন। পরে রোহিণীর মৃতদেহ বান্ধিয়া ছাঁদিয়া গোরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া, চৌকিদারের সঙ্গে ডাক্তারখানায় পাঠাইলেন। পরে স্নান করিয়া আহারাদি করিলেন। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া অপরাধীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথায় অপরাধী? গোবিন্দলাল রোহিণীকে আহত করিয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, আর প্রবেশ করেন নাই। এক রাত্রি এক দিন অবকাশ পাইয়া গোবিন্দলাল কোথায় কত দূর গিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। কোন্ দিকে পলাইয়াছেন, কেহ জানে না। তাঁহার নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। গোবিন্দলাল প্রসাদপুরে কখনও নিজ নাম ধাম প্রকাশ করেন নাই; সেখানে চুনিলাল দত্ত নাম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা ভৃত্যেরা পর্য্যন্তও জানিত না। দারগা কিছু দিন ধরিয়া একে ওকে ধরিয়া জোবানবন্দী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে তিনি আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমা রিপোর্ট দাখিল করিলেন।

তখন যশোহর হইতে ফিচেল খাঁ নামে এক জন সুদক্ষ ডিটেক্টিব্ ইন্স্পেক্টর প্রেরিত হইল। ফিচেল খাঁর অনুসন্ধানপ্রণালী আমাদিগের সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন

নাই। কতকগুলি চিঠিপত্র তিনি বাড়ী তল্লাসিতে পাইলেন। তদ্দ্বারা তিনি গোবিন্দলালের প্রকৃত নাম ধাম অবধারিত করিলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি কষ্টস্বীকার করিয়া ছদ্মবেশে হরিদ্রাগ্রাম পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কিন্তু গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে যান নাই, সুতরাং ফিচেল খাঁ সেখানে গোবিন্দলালকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এ দিকে নিশাকর দাস সে করাল কালসমান রজনীতে বিপন্না রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদপুরের বাজারে আপনার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মাধবীনাথ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের নিকট সুপরিচিত বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করেন নাই; এক্ষণে নিশাকর আসিয়া তাঁহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন। শুনিয়া মাধবীনাথ বলিলেন, "কাজ ভাল হয় নাই। একটা খুনোখুনী হইতে পারে।" ইহার পরিণাম কি ঘটে, জানিবার জন্য উভয়ে প্রসাদপুরের বাজারে প্রচ্ছন্নভাবে অতি সাবধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রভাতেই শুনিলেন যে, চুনিলাল দত্ত আপন স্ত্রীকে খুন করিয়া পলাইয়াছে। তাঁহারা বিশেষ ভীত ও শোকাকুল হইলেন; ভয় গোবিন্দলালের জন্য; কিন্তু পরিশেষে দেখিলেন, দারগা কিছু করিতে পারিলেন না। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান নাই। তখন তাঁহারা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া, তথাচ অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় বৎসর

ভ্রমর মরে নাই। কেন মরিল না, তাহা জানি না। এ সংসারে বিশেষ দুঃখ এই যে, মরিবার উপযুক্ত সময়ে কেহ মরে না। অসময়ে সবাই মরে। ভ্রমর যে মরিল না, বুঝি ইহাই তাহার কারণ। যাহাই হউক, ভ্রমর উৎকট রোগ হইতে কিয়দংশে মুক্তি পাইয়াছে। ভ্রমর আবার পিত্রালয়ে। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের যে সংবাদ আনিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী অতি সঙ্গোপনে তাহা জ্যেষ্ঠা কন্যা ভ্রমরের ভগিনীর নিকট বলিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি গোপনে তাহা ভ্রমরের নিকট বলিয়াছিল। এক্ষণে ভ্রমরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনী বলিতেছিল, "এখন তিনি কেন হলুদগাঁয়ের বাড়ীতে আসিয়া বাস করুন না? তা হলে বোধ হয় কোন আপদ্ থাকিবে না।"

ভ্র। আপদ্ থাকিবে না কিসে ?

যামিনী। তিনি প্রসাদপুরে নাম ভাঁড়াইয়া বাস করিতেন। তিনিই যে গোবিন্দলাল বাবু, তাহা ত কেহ জানে না।

ভ্রমর। শুন নাই কি যে, হলুদগাঁয়েও পুলিষের লোক তাঁহার সন্ধানে আসিয়াছিল ? তবে আর জানে না কি প্রকারে ?

যামিনী। তা না হয় জানিল।—তবু এখানে আসিয়া আপনার বিষয় দখল করিয়া বসিলে টাকা হাতে হইবে। বাবা বলেন, পুলিষ টাকার বশ।

ভ্রমর কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "সে পরামর্শ তাঁহাকে কে দেয় ? কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব যে, সে পরামর্শ দিব। বাবা একবার তাঁর সন্ধান করিয়া ঠিকানা করিয়াছিলেন—আর একবার সন্ধান করিতে পারেন কি ?"

যামিনী। পুলিষের লোক কত সন্ধানী—তাহারাই অহরহ সন্ধান করিয়া যখন ঠিকানা পাইতেছে না, তখন বাবা কি প্রকারে সন্ধান পাইবেন ? কিন্তু আমার বোধ হয়, গোবিন্দলাল বাবু আপনিই হলুদগাঁয়ে আসিয়া বসিবেন। প্রসাদপুরের সেই ঘটনার পরেই তিনি যদি হদলুগাঁয়ে দেখা দিতেন, তাহা হইলে তিনিই যে সেই প্রসাদপুরের বাবু, এ কথায় লোকের বড় বিশ্বাস হইত। এই জন্য বোধ হয়, এত দিন তিনি আইসেন নাই। এখন আসিবেন, এমন ভরসা করা যায়।

ভ্র। আমার কোন ভরসা নাই।

যা। যদি আসেন।

ভ্র। যদি এখানে আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে দেবতার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আসুন। যদি না আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজন্মে তাঁহার হরিদ্রাগ্রামে না আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদ্ থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।

যা। আমার বিবেচনায়, ভগিনি। তোমার সেইখানেই থাকা কর্ত্তব্য। কি জানি, তিনি কোন্ দিন অর্থের অভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়েন ? যদি আমলাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন ? তোমাকে না দেখিলে তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন।

ভ্র। আমার এই রোগ। কবে মরি, কবে বাঁচি—আমি সেখানে কার আশ্রয়ে থাকিব ?

যা। বল যদি, না হয়, আমরা কেহ গিয়া থাকিব—তথাপি তোমার সেইখানেই থাকা কর্ত্তব্য।

ভ্রমর ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি হলুদগাঁয়ে যাইব। মাকে বলিও, কালই আমাকে পাঠাইয়া দেন। এখন তোমাদের কাহাকে যাইতে হইবে না। কিন্তু আমার বিপদের দিন তোমরা দেখা দিও।"

যা। কি বিপদ্ ভ্রমর ?

ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যদি তিনি আসেন ?"

যা। সে আবার বিপদ্ কি ভ্রমর ? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে, তাহার চেয়ে —আহ্লাদের কথা আর কি আছে ?

ভ্র। আহ্লাদ দিদি! আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে!

ভ্রমর আর কথা কহিল না। তাহার মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমরের মর্ম্মান্তিক রোদন, যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমর মানস চক্ষে, ধূমময় চিত্রবৎ, ঐ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে, তাহা দেখিতে পাইল। যামিনী কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী বুঝিল না যে, গোবিন্দলাল হত্যাকারী, ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম বৎসর

ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেল। যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী ত আসিল না। দিন গেল, মাস গেল—স্বামী ত আসিল না। কোন সংবাদও আসিল না। এইরূপে তৃতীয় বৎসরও কাটিয়া গেল। গোবিন্দলাল আসিল না। তার পর চতুর্থ বৎসরও কাটিয়া গেল, গোবিন্দলাল আসিল না। এ দিকে ভ্রমরেরও পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হাঁপানী কাশী রোগ—নিত্য শরীরক্ষয়—যম অগ্রসর—বুঝি আর ইহজন্মে দেখা হইল না।

তার পর পঞ্চম বৎসর প্রবৃত্ত হইল। পঞ্চম বৎসরে একটা বড় ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রামে সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছে। সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিল—সেইখান হইতে পুলিষ ধরিয়া যশোহরে আনিয়াছে। যশোহরে তাঁহার বিচার হইবে।

জনরবে এই সংবাদ ভ্রমর শুনিলেন। জনরবের সূত্র এই। গোবিন্দলাল, ভ্রমরের দেওয়ানজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি জেলে চলিলাম—আমার পৈতৃক বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা যদি তোমাদিগের অভিপ্রায়সম্মত হয়, তবে এই সময়। আমি তাহার যোগ্য নহি। আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। তবে ফাঁসি যাইতে না হয়, এই ভিক্ষা। জনরবে এ কথা বাড়ীতে জানাইও, আমি পত্র লিখিয়াছি, এ কথা প্রকাশ করিও না।" দেওয়ানজী পত্রের কথা প্রকাশ করিলেন না—জনরব বলিয়া অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইলেন।

ভ্রমর শুনিয়াই পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। শুনিবামাত্র মাধবীনাথ কন্যার নিকট আসিলেন। ভ্রমর, তাঁহাকে নোটে কাগজে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিয়া সজলনয়নে বলিলেন, "বাবা, এখন যা করিতে হয় কর।—দেখিও—আমি আত্মহত্যা না করি।"

মাধবীনাথও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা! নিশ্চিন্ত থাকিও—আমি আজই যশোহরে যাত্রা করিলাম। কোন চিন্তা করিও না। গোবিন্দলাল যে খুন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে, তোমার আটচল্লিশ হাজার টাকা বাঁচাইয়া আনিব—আর আমার জামাইকে দেশে আনিব।"

মাধবীনাথ তখন যশোহরে যাত্রা করিলেন। শুনিলেন যে, প্রমাণের অবস্থা অতি ভয়ানক। ইন্‌স্পেক্টর ফিচেল খাঁ মোকদ্দমা তদারক করিয়া সাক্ষী চালান দিয়াছিলেন। তিনি রূপো সোণা প্রভৃতি যে সকল সাক্ষীরা প্রকৃত অবস্থা জানিত, তাহাদিগের কাহারও সন্ধান পান নাই। সোণা নিশাকরের কাছে ছিল—রূপা কোন্ দেশে গিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। প্রমাণের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া নগদ কিছু দিয়া ফিচেল খাঁ তিনটি সাক্ষী তৈয়ার করিয়াছিল। সাক্ষীরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে বলিল যে, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলাল স্বহস্তে পিস্তল মারিয়া রোহিণীকে খুন করিয়াছেন—আমরা তখন সেখানে গান শুনিতে গিয়াছিলাম। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আহেলা বিলাতী—সুশাসন জন্য সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া থাকেন—তিনি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দলালকে সেশনের বিচারে অর্পণ করিলেন। যখন মাধবীনাথ যশোহরে পৌঁছিলেন, তখন গোবিন্দলাল জেলে পচিতেছিলেন। মাধবীনাথ পৌঁছিয়া, সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন।

তিনি সাক্ষীদিগের নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের বাড়ী গেলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, "বাপু! মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যা বলিয়াছ, তা বলিয়াছ। এখন জজ

সাহেবের কাছে ভিন্ন প্রকার বলিতে হইবে। বলিতে হইবে যে, আমরা কিছু জানি না। এই পাঁচ পাঁচ শত টাকা নগদ লও। আসামী খালাস হইলে আর পাঁচ পাঁচ শত দিব।"

সাক্ষীরা বলিল, "খেলাপ হলফের দায়ে মারা যাইব যে।"

মাধবীনাথ বলিলেন, "ভয় নাই। আমি টাকা খরচ করিয়া সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করাইব যে, ফিচেল খাঁ তোমাদিগের মারপিট করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছে।"

সাক্ষীরা চতুর্দ্দশ পুরুষ মধ্যে কখনও হাজার টাকা একত্রে দেখে নাই। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

সেশনে বিচারের দিন উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল কাটগড়ার ভিতর। প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়া হলফ পড়িল। উকীল সরকার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলালকে চেন?"

সাক্ষী। কই—না—মনে ত হয় না।

উকীল। কখনও দেখিয়াছ?

সাক্ষী। না।

উকীল। রোহিণীকে চিনিতে?

সাক্ষী। কোন্ রোহিণী?

উকীল। প্রসাদপুরের কুঠিতে যে ছিল?

সাক্ষী। আমার বাপের পুরুষে কখনও প্রসাদপুরের কুঠিতে যাই নাই।

উকীল। রোহিণী কি প্রকারে মরিয়াছে?

সাক্ষী। শুনিতেছি, আত্মহত্যা হইয়াছে।

উকীল। খুনের বিষয় কিছু জান?

সাক্ষী। কিছু না।

উকীল তখন, সাক্ষী, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যে জোবানবন্দী দিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া সাক্ষীকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে এই সকল কথা বলিয়াছিলে?"

সাক্ষী। হাঁ, বলিয়াছিলাম।

উকীল। যদি কিছু জান না, তবে কেন বলিয়াছিলে?

সাক্ষী। মারের চোটে। ফিচেল খাঁ মারিয়া আমাদের শরীরে আর কিছু রাখে নাই।

এই বলিয়া সাক্ষী একটু কাঁদিল। দুই চারি দিন পূর্ব্বে সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে জমী লইয়া কাজিয়া করিয়া মারামারি করিয়াছিল; তাহার দাগ ছিল। সাক্ষী অম্লানমুখে সেই দাগগুলি ফিচেল খাঁর মারপিটের দাগ বলিয়া জজ সাহেবকে দেখাইল।

উকীল সরকার অপ্রতিভ হইয়া দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষীও ঐরূপ বলিল। সে পিঠে রাঙ্গচিত্রের আটা দিয়া ঘা করিয়া আসিয়াছিল—হাজার টাকার জন্য সব পারা যায়—তাহা জজ সাহেবকে দেখাইল।

তৃতীয় সাক্ষীও ঐরূপ গুজরাইল। তখন জজ সাহেব প্রমাণাভাব দেখিয়া আসামীকে খালাস দিলেন। এবং ফিচেল খাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার আচরণ সম্বন্ধে তদারক করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে উপদেশ করিলেন।

বিচারকালে সাক্ষীদিগের এইরূপ সপক্ষতা দেখিয়া গোবিন্দলাল বিস্মিত হইতেছিলেন। পরে যখন ভিড়ের ভিতর মাধবীনাথকে দেখিলেন, তখনই সকল বুঝিতে পারিলেন। খালাস হইয়াও তাঁহাকে আর একবার জেলে যাইতে হইল—সেখানে জেলর পরওয়ানা পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি যখন জেলে ফিরিয়া যান, তখন মাধবীনাথ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কাণে কাণে বলিলেন, "জেল হইতে খালাস পাইয়া, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমার বাসা অমুক স্থানে।"

কিন্তু গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস পাইয়া, মাধবীনাথের কাছে গেলেন না। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না। মাধবীনাথ চারি পাঁচ দিন তাঁহার সন্ধান করিলেন। কোন সন্ধান পাইলেন না।

অগত্যা শেষে একাই হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ বৎসর

মাধবীনাথ আসিয়া ভ্রমরকে সংবাদ দিলেন, গোবিন্দলাল খালাস হইয়াছে, কিন্তু বাড়ী আসিল না, কোথায় চলিয়া গেল, সন্ধান পাওয়া গেল না। মাধবীনাথ সরিয়া গেলে ভ্রমর অনেক কাঁদিল, কিন্তু কি জন্য কাঁদিল, তাহা বলিতে পারি না।

এ দিকে গোবিন্দলাল খালাস পাইয়াই প্রসাদপুরে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, প্রসাদপুরের গৃহে কিছু নাই, কেহ নাই। গিয়া শুনিলেন যে, অট্টালিকায় তাঁহার যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ছিল, তাহা কতক পাঁচ জনে লুঠিয়া লইয়া গিয়াছিল—অবশিষ্ট লাওয়ারেশ বলিয়া বিক্রয় হইয়াছিল। কেবল বাড়ীটি পড়িয়া আছে—তাহারও কবাট চৌকাট পর্য্যন্ত বার ভূতে লইয়া গিয়াছে। প্রসাদপুরের বাজারে দুই এক দিন বাস করিয়া গোবিন্দলাল, বাড়ীর অবশিষ্ট ইট কাঠ জলের দামে এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইলেন, তাহা লইয়া কলিকাতায় গেলেন।

কলিকাতায় অতি গোপনে সামান্য অবস্থায় গোবিন্দলাল দিনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রসাদপুর হইতে অতি অল্প টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহা এক বৎসরে ফুরাইয়া গেল। আর দিনপাতের সম্ভাবনা নাই। তখন, ছয় বৎসরের পর, গোবিন্দলাল মনে ভাবিলেন, ভ্রমরকে একখানি পত্র লিখিব।

গোবিন্দলাল কালি, কলম, কাগজ লইয়া, ভ্রমরকে পত্র লিখিব বলিয়া বসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব—গোবিন্দলাল পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতে গিয়া কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, ভ্রমর যে আজিও বাঁচিয়া আছে, তাহারই বা ঠিকানা কি? কাহাকে পত্র লিখিব? তার পর ভাবিলেন, একবার লিখিয়াই দেখি। না হয়, আমার পত্র ফিরিয়া আসিবে। তাহা হইলেই জানিব যে, ভ্রমর নাই।

কি লিখিব, এ কথা গোবিন্দলাল কতক্ষণ ভাবিলেন, তাহা বলা যায় না। তার পর, শেষ ভাবিলেন, যাহাকে বিনাদোষে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি, তাহাকে যা হয়, তাই লিখিলেই বা অধিক কি ক্ষতি হইবে? গোবিন্দলাল লিখিলেন,

"ভ্রমর।

ছয় বৎসরের পর এ পামর আবার তোমায় পত্র লিখিতেছে। প্রবৃত্তি হয় পড়িও; না প্রবৃত্তি হয়, না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিও।

"আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, বোধ হয় সকলই তুমি শুনিয়াছ। যদি বলি, সে আমার কর্ম্মফল, তুমি মনে করিতে পার, আমি তোমার মনরাখা কথা বলিতেছি। কেন না, আজি আমি তোমার কাছে ভিখারী।

"আমি এখন নিঃস্ব। তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিয়াছি। তীর্থস্থানে ছিলাম, তীর্থস্থানে ভিক্ষা মিলিত। এখানে ভিক্ষা মিলে না—সুতরাং আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি।

"আমার যাইবার এক স্থান ছিল—কাশীতে মাতৃক্রোড়ে। মার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে—বোধ হয় তাহা তুমি জান। সুতরাং আমার আর স্থান নাই—অন্ন নাই।

"তাই, আমি মনে করিয়াছি, আবার হরিদ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব—নহিলে খাইতে পাই না। যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, পরদারনিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত করিল, তাহার আবার লজ্জা কি? যে অন্নহীন, তাহার আবার লজ্জা কি? আমি এ কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিণী—বাড়ী তোমার—আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি—আমায় তুমি স্থান দিবে কি?

"পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?"

পত্র লিখিয়া সাত পাঁচ আবার ভাবিয়া গোবিন্দলাল পত্র ডাকে দিলেন। যথাকালে পত্র ভ্রমরের হস্তে পৌছিল।

পত্র পাইয়াই, ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল। পত্র খুলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, ভ্রমর শয়নগৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তখন ভ্রমর, বিরলে বসিয়া, নয়নের সহস্র ধারা মুছিতে মুছিতে, সেই পত্র পড়িল। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িল। সে দিন ভ্রমর আর দ্বার খুলিল না। যাহারা আহারের জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল, তাহাদিগকে বলিল, "আমার জ্বর হইয়াছে—আহার করিব না।" ভ্রমরের সর্ব্বদা জ্বর হয়; সকলে বিশ্বাস করিল।

পরদিন নিদ্রাশূন্য শয্যা হইতে যখন ভ্রমর গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাঁহার যথার্থই জ্বর হইয়াছে। কিন্তু তখন চিত্ত স্থির—বিকারশূন্য। পত্রের উত্তর যাহা লিখিবেন, তাহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। ভ্রমর তাহা সহস্র সহস্রবার ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এখন আর ভাবিতে হইল না। পাঠ পর্য্যন্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

"সেবিকা" পাঠ লিখিলেন না। কিন্তু স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণম্য; অতএব লিখিলেন,

"প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ"

তার পর লিখিলেন, "আপনার পত্র পাইয়াছি। বিষয় আপনার। আমার হইলেও আমি উহা দান করিয়াছি। যাইবার সময় আপনি সে দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু রেজিষ্ট্রি অপিসে তাহার নকল আছে। আমি যে দান করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ। তাহা এখনও বলবৎ।

"অতএব আপনি নির্ব্বিঘ্নে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া আপনার নিজসম্পত্তি দখল করিতে পারেন। বাড়ী আপনার।

"আর এই পাঁচ বৎসরে আমি অনেক টাকা জমাইয়াছি। তাহাও আপনার। আসিয়া গ্রহণ করিবেন।

"ঐ টাকার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আমি যাচ্ঞা করি। আট হাজার টাকা আমি উহা হইতে লইলাম। তিন হাজার টাকায় গঙ্গাতীরে আমার একটি বাড়ী প্রস্তুত করিব; পাঁচ হাজার টাকায় আমার জীবন নির্ব্বাহ হইবে।

"আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট,—আপনিও যে সন্তুষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

"আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম।"

যথাকালে পত্র গোবিন্দলালের হস্তগত হইল—কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু কোমলতাও নাই। গোবিন্দলালও লিখিয়াছিলেন, ছয় বৎসরের পর লিখিতেছি, কিন্তু ভ্রমরের পত্রে সে রকমের কথাও একটা নাই। সেই ভ্রমর!

গোবিন্দলাল পত্র পড়িয়া উত্তর লিখিলেন, "আমি হরিদ্রাগ্রামে যাইব না। যাহাতে এখানে আমার দিনপাত হয়, এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে পাঠাইয়া দিও।"

ভ্রমর উত্তর করিলেন, "মাস মাস আপনাকে পাঁচ শত টাকা পাঠাইব। আরও অধিক পাঠাইতে পারি, কিন্তু অধিক টাকা পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা। আর আমার একটি নিবেদন—বৎসর বৎসর যে উপস্বত্ব জমিতেছে—আপনি এখানে আসিয়া ভোগ করিলে ভাল হয়। আমার জন্য দেশত্যাগ করিবেন না—আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।"

গোবিন্দলাল কলিকাতাতেই রহিলেন। উভয়েই বুঝিলেন, সেই ভাল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সপ্তম বৎসর

বাস্তবিক ভ্রমরের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। অনেক দিন হইতে ভ্রমরের সাংঘাতিক পীড়া চিকিৎসায় উপশমিত ছিল। কিন্তু রোগ আর বড় চিকিৎসা মানিল না। এখন ভ্রমর দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে ভ্রমর শয্যাশায়িনী হইলেন, আর শয্যাত্যাগ করিয়া উঠেন না। মাধবীনাথ স্বয়ং আসিয়া নিকটে থাকিয়া নিষ্ফল চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। যামিনী হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে আসিয়া ভগিনীর শেষ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রোগ চিকিৎসা মানিল না। পৌষ মাস এইরূপে গেল। মাঘ মাসে ভ্রমর ঔষধ-ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। ঔষধসেবন এখন বৃথা। যামিনীকে বলিলেন, "আর ঔষধ খাওয়া হইবে না দিদি—সম্মুখে ফাল্গুন মাস—ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার রাত্রে যেন মরি। দেখিস্ দিদি—যেন ফাল্গুনের পূর্ণিমার রাত্রি পলাইয়া যায় না। যদি দেখিস্ যে, পূর্ণিমার রাত্রি পার হই—তবে আমায় একটা অন্তরটিপনি দিতে ভুলিস্ না। রোগে হউক্, অন্তরটিপনিতে হউক্—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাত্রে মরিতে হইবে। মনে থাকে যেন দিদি!"

যামিনী কাঁদিল, কিন্তু ভ্রমর আর ঔষধ খাইল না। ঔষধ খায় না, রোগের শান্তি নাই—কিন্তু ভ্রমর দিন দিন প্রফুল্লচিত্ত হইতে লাগিল।

এত দিনের পর ভ্রমর আবার হাসি তামাসা আরম্ভ করিল—ছয় বৎসরের পর এই প্রথম হাসি তামাসা। নিবিবার আগে প্রদীপ হাসিল।

যত দিন যাইতে লাগিল—অন্তিম কাল দিনে দিনে যত নিকট হইতে লাগিল—ভ্রমর তত স্থির, প্রফুল্ল, হাস্যমূর্ত্তি। শেষে সেই ভয়ঙ্কর শেষ দিন উপস্থিত হইল। ভ্রমর পৌরজনের চাঞ্চল্য এবং যামিনীর কান্না দেখিয়া বুঝিলেন, আজ বুঝি দিন ফুরাইল। শরীরের যন্ত্রণায়ও সেইরূপ অনুভূত করিলেন। তখন ভ্রমর যামিনীকে বলিলেন, "আজ শেষ দিন।"

যামিনী কাঁদিল। ভ্রমর বলিল, "দিদি—আজ শেষ দিন—আমার কিছু ভিক্ষা আছে—কথা রাখিও।"

যামিনী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না।

ভ্রমর বলিল, "আমার এক ভিক্ষা ; আজ কাঁদিও না।—আমি মরিলে পর কাঁদিও—আমি বারণ করিতে আসিব না—কিন্তু আজ তোমাদের সঙ্গে যে কয়েকটা কথা কইতে পারি, নির্ব্বিঘ্নে কহিয়া মরিব, সাধ করিতেছে।"

যামিনী চক্ষের জল মুছিয়া কাছে বসিল—কিন্তু অবরুদ্ধ বাষ্পে আর কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর বলিতে লাগিল, "আর একটি ভিক্ষা—তুমি ছাড়া আর কেহ এখানে না আসে। সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব—কিন্তু এখন আর কেহ না আসে। তোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পাব না।"

যামিনী আর কতক্ষণ কান্না রাখিবে ?

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল। ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, রাত্রি কি জ্যোৎস্না ?"

যামিনী জানেলা খুলিয়া দেখিয়া বলিল, "দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।"

ভ্র। তবে জানেলাগুলি সব খুলিয়া দাও—আমি জ্যোৎস্না দেখিয়া মরি। দেখ দেখি, ঐ জানেলার নীচে যে ফুলবাগান, উহাতে ফুল ফুটিয়াছে কি না ?

সেই জানেলায় দাঁড়াইয়া প্রভাতকালে ভ্রমর, গোবিন্দলালের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। আজি সাত বৎসর ভ্রমর সে জানেলার দিকে যান নাই—সে জানেলা খোলেন নাই।

যামিনী কষ্টে সেই জানেলা খুলিয়া বলিল, "কই, এখানে ত ফুলবাগান নাই—এখানে কেবল খড়বন—আর দুই একটা মরা মরা গাছ আছে—তাতে ফুল পাতা কিছুই নাই।"

ভ্রমর বলিল, "সাত বৎসর হইল, ওখানে ফুলবাগান ছিল। বেমেরামতে গিয়াছে। আমি সাত বৎসর দেখি নাই।"

অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া রহিলেন। তার পর ভ্রমর বলিলেন, "যেখান হইতে পার দিদি, আজ আমায় ফুল আনাইয়া দিতে হইবে। দেখিতেছ না, আজি আবার আমার ফুলশয্যা ?"

যামিনীর আজ্ঞা পাইয়া দাস দাসী রাশীকৃত ফুল আনিয়া দিল। ভ্রমর বলিল, "ফুল আমার বিছানায় ছড়াইয়া দাও—আজ আমার ফুলশয্যা।"

যামিনী তাহাই করিল। তখন ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। যামিনী বলিল, "কাঁদিতেছ কেন দিদি ?"

ভ্রমর বলিল, "দিদি, একটি বড় দুঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, সেই দিন যোড়হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, এক দিন যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম, আমি যদি সতী হই, তবে আবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে। কই, আর ত দেখা হইল না! আজিকার দিন—মরিবার দিনে, দিদি, যদি একবার দেখিতে পাইতাম! এক দিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম!"

যামিনী বলিল, "দেখিবে?" ভ্রমর যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—বলিল, "কার কথা বলিতেছ?"

যামিনী স্থিরভাবে বলিল, "গোবিন্দলালের কথা। তিনি এখানে আছেন—বাবা তোমার পীড়ার সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। শুনিয়া তোমাকে একবার দেখিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। আজ পৌঁছিয়াছেন। তোমার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে পারি নাই—তিনিও সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই।"

ভ্রমর কাঁদিয়া বলিল, "একবার দেখা দিদি! ইহজন্মে আর একবার দেখি! এই সময়ে আর একবার দেখা!"

যামিনী উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল—সাত বৎসরের পর নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দুজনেই কাঁদিতেছিল। এক জনও কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর, স্বামীকে কাছে আসিয়া বিছানায় বসিতে ইঙ্গিত করিল।—গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিল। ভ্রমর তাঁহাকে আরও কাছে আসিতে বলিল,—গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল। তখন ভ্রমর আপন করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

গোবিন্দলাল কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত, আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাত রহিল। অনেকক্ষণ রহিল। ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর মরিয়া গেল। যথারীতি তাহার সৎকার হইল। সৎকার করিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল গৃহে বসিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবধি, তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন নাই।

আবার রজনী পোহাইল। ভ্রমরের মৃত্যুর পরদিন, যেমন সূর্য্য প্রত্যহ উঠিয়া থাকে, তেমনি উঠিল। গাছের পাতা ছায়ালোকে উজ্জ্বল হইল।—সরোবরে কৃষ্ণবারি ক্ষুদ্র বীচি বিক্ষেপ করিয়া জ্বলিতে লাগিল; আকাশের কালো মেঘ শাদা হইল—ভ্রমর যেন মরে নাই। গোবিন্দলাল বাহির হইলেন।

গোবিন্দলাল দুই জন স্ত্রীলোককে ভাল বাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল—ভ্রমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়সাগর, মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত, সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদগীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্ব্বপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়সুধা—স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্ত-পুষ্টিকর, সর্ব্বরোগের ঔষধ স্বরূপ, দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা,—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।

যদি তখন গোবিন্দলাল, রোহিণীর যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া, স্নেহময়ী ভ্রমরের কাছে যুক্তকরে আসিয়া দাঁড়াইত, বলিত, "আমায় ক্ষমা কর—আমায় আবার হৃদয়প্রান্তে স্থান দাও।" যদি বলিত, "আমার এমন গুণ নাই, যাহাতে আমায় তুমি ক্ষমা করিতে পার, কিন্তু তোমার ত অনেক গুণ আছে, তুমি নিজগুণে আমায় ক্ষমা কর," বুঝি তাহা

হইলে, ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিত। কেন না, রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী,—রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টি মাত্র। স্ত্রী আলোক; পুরুষ ছায়া। আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারিত?

গোবিন্দলাল তাহা পারিল না। কতকটা অহঙ্কার—পুরুষ অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। কতকটা লজ্জা—দুষ্কৃতকারীর লজ্জাই দণ্ড। কতকটা ভয়—পাপ, সহজে পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারে না। ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার পথ নাই। গোবিন্দলাল আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহার পর গোবিন্দলাল হত্যাকারী। তখন গোবিন্দলালের আশা ভরসা ফুরাইল। অন্ধকার আলোকের সম্মুখীন হইল না।

কিন্তু তবু, সেই পুনঃপ্রজ্বলিত, দুর্ব্বার, দাহকারী ভ্রমরদর্শনের লালসা বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, গোবিন্দলালকে দাহ করিতে লাগিল। কে এমন পাইয়াছিল? কে এমন হারাইয়াছে? ভ্রমরও দুঃখ পাইয়াছিল, গোবিন্দলালও দুঃখ পাইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী। গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য।—ভ্রমরের সহায় ছিল—যম সহায়। গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।

আবার রজনী পোহাইল—আবার সূর্য্যালোকে জগৎ হাসিল। গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।—রোহিণীকে গোবিন্দলাল স্বহস্তে বধ করিয়াছেন—ভ্রমরকেও প্রায় স্বহস্তে বধ করিয়াছেন। তাই ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইলেন।

আমরা জানি না যে, সে রাত্রি গোবিন্দলাল কি প্রকারে কাটাইয়াছিলেন। বোধ হয় রাত্রি বড় ভয়ানকই গিয়াছিল। দ্বার খুলিয়াই মাধবীনাথের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মাধবীনাথ তাঁহাকে দেখিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিলেন—মুখে মনুষ্যের সাধ্যাতীত রোগের ছায়া।

মাধবীনাথ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলেন না—মাধবীনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহজন্মে আর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা কহিবেন না। বিনাবাক্যে মাধবীনাথ চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভ্রমরের শয্যাগৃহতলস্থ সেই পুষ্পোদ্যানে গেলেন। যামিনী যথার্থই বলিয়াছেন, সেখানে আর পুষ্পোদ্যান নাই। সকলই ঘাস খড় ও জঙ্গলে পূরিয়া গিয়াছে—দুই একটি অমর পুষ্পবৃক্ষ সেই জঙ্গলের মধ্যে অর্দ্ধমৃতবৎ আছে—কিন্তু তাহাতে আর ফুল ফুটে না। গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেই খড়বনের

মধ্যে বেড়াইলেন। অনেক বেলা হইল—রৌদ্রের অত্যন্ত তেজঃ হইল—গোবিন্দলাল বেড়াইয়া বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া শেষে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তথা হইতে গোবিন্দলাল কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া, কাহারও মুখপানে না চাহিয়া বারুণী-পুষ্করিণী-তটে গেলেন। বেলা দেড় প্রহর হইয়াছে। তীব্র রৌদ্রের তেজে বারুণীর গভীর কৃষ্ণোজ্জ্বল বারিরাশি জ্বলিতেছিল—স্ত্রী পুরুষ বহুসংখ্যক লোক ঘাটে স্নান করিতেছিল—ছেলেরা কালো জলে স্ফাটিক চূর্ণ করিতে করিতে সাঁতার দিতেছিল। গোবিন্দলালের তত লোকসমাগম ভাল লাগিল না। ঘাট হইতে যেখানে বারুণীতীরে, তাঁহার সেই নানাপুষ্পরঞ্জিত নন্দনতুল্য পুষ্পোদ্যান ছিল, গোবিন্দলাল সেই দিকে গেলেন। প্রথমেই দেখিলেন, রেলিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—সেই লৌহনির্ম্মিত বিচিত্র দ্বারের পরিবর্ত্তে কঞ্চির বেড়া। ভ্রমর গোবিন্দলালের জন্য সকল সম্পত্তি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ উদ্যানের প্রতি কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই। একদিন যামিনী সে বাগানের কথা বলিয়াছিলেন—ভ্রমর বলিয়াছিল, "আমি যমের বাড়ী চলিলাম—আমার সে নন্দনকাননও ধ্বংস হউক। দিদি, পৃথিবীতে যা আমার স্বর্গ ছিল—তা আর কাহাকে দিয়া যাইব ?"

গোবিন্দলাল দেখিলেন, ফটক নাই—রেলিং পড়িয়া গিয়াছে। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—ফুলগাছ নাই—কেবল উলুবন, আর কচুগাছ, ঘেঁটু ফুলের গাছ, কালকাসন্দা গাছে বাগান পরিপূর্ণ। লতামণ্ডপ সকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে—প্রস্তরমূর্ত্তি সকল দুই তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে—তাহার উপর লতা সকল ব্যাপিয়াছে, কোনটা বা ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। প্রমোদভবনের ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ঝিলমিল সাশি কে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে—মর্ম্মরপ্রস্তর সকল কে হর্ম্ম্যতল হইতে খুলিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। সে বাগানে আর ফুল ফুটে না—ফল ফলে না—বুঝি সুবাতাসও আর বয় না।

একটা ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল, গোবিন্দলাল সেইখানে বসিয়া রহিলেন। প্রচণ্ড সূর্য্যতেজে তাঁহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুই অনুভব করিলেন না। তাঁহার প্রাণ যায়। রাত্রি অবধি কেবল ভ্রমর ও রোহিণী ভাবিতেছিলেন। একবার ভ্রমর, তার পর রোহিণী, আবার ভ্রমর, আবার রোহিণী। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে রোহিণীকে দেখিতে লাগিলেন। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইয়া উঠিল। সেই উদ্যানে

বসিয়া প্রত্যেক বৃক্ষকে ভ্রমর বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল—প্রত্যেক বৃক্ষচ্ছায়ায় রোহিণী বসিয়া আছে দেখিতে লাগিলেন। এই ভ্রমর দাঁড়াইয়াছিল—আর নাই—এই রোহিণী আসিল, আবার কোথায় গেল? প্রতি শব্দে ভ্রমর বা রোহিণীর কণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। ঘাটে স্নানকারীরা কথা কহিতেছে, তাহাতে কখনও বোধ হইল, ভ্রমর কথা কহিতেছে—কখনও বোধ হইতে লাগিল, রোহিণী কথা কহিতেছে—কখনও বোধ হইল, তাহারা দুই জনে কথোপকথন করিতেছে। শুষ্ক পত্র নড়িতেছে—বোধ হইল, ভ্রমর আসিতেছে। বনমধ্যে বন্য কীটপতঙ্গ নড়িতেছে—বোধ হইল, রোহিণী পলাইতেছে। বাতাসে শাখা দুলিতেছে—বোধ হইল, ভ্রমর নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে—দয়েল ডাকিলে বোধ হইল, রোহিণী গান করিতেছে। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইল।

বেলা দুই প্রহর—আড়াই প্রহর হইল—গোবিন্দলাল সেইখানে—সেই ভগ্নপুত্তল-পদতলে—সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে। বেলা তিন প্রহর, সার্দ্ধ তিন প্রহর হইল—অস্নাত অনাহারী গোবিন্দলাল সেইখানে, সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে—ভ্রমর-রোহিণীময় অনলকুণ্ডে। সন্ধ্যা হইল, তথাপি গোবিন্দলালের উত্থান নাই—চৈতন্য নাই। তাঁহার পৌরজনে তাঁহাকে সমস্ত দিন না দেখিয়া মনে করিয়াছিল, তিনি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অধিক সন্ধান করে নাই। সেইখানে সন্ধ্যা হইল, কাননে অন্ধকার হইল। আকাশে নক্ষত্র ফুটিল। পৃথিবী নীরব হইল। গোবিন্দলাল সেইখানে।

অকস্মাৎ সেই অন্ধকার, স্তব্ধ বিজন মধ্যে গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে রোহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন। রোহিণী উচ্চৈঃস্বরে যেন বলিতেছে—

"এইখানে!"

গোবিন্দলালের তখন আর স্মরণ ছিল না যে, রোহিণী মরিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইখানে—কি?"

যেন শুনিলেন, রোহিণী বলিতেছে—

"এমনি সময়ে!"

গোবিন্দলাল কলে বলিলেন, "এইখানে, এমনি সময়ে, কি রোহিণি?"

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলাল শুনিলেন, আবার রোহিণী উত্তর করিল, "এইখানে, এমনি সময়ে, ঐ জলে,

"আমি ডুবিয়াছিলাম!"

গোবিন্দলাল, আপন মানসোদ্ভূত এই বাণী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ডুবিব ?"

আবার ব্যাধিজনিত উত্তর শুনিতে পাইলেন, "হাঁ, আইস। ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইতেছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। **প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।**"

গোবিন্দলাল চক্ষু বুজিলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ন, বেপমান হইল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া সোপানশিলার উপরে পতিত হইলেন।

মুগ্ধাবস্থায়, মানস চক্ষে দেখিলেন, সহসা রোহিণীমূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। তখন দিগন্ত ক্রমশঃ প্রভাসিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি সম্মুখে উদিত হইল।

ভ্রমরমূর্ত্তি বলিল, "মরিবে কেন ? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।"

গোবিন্দলাল সে রাত্রে মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন। প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাঁহার লোকজন তাঁহাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। দুই তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন যে তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না। এক রাত্রি তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কেহ আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না।

সাত বৎসরের পর, তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল।

পরিশিষ্ট

গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাঁহার ভাগিনেয় শচীকান্ত প্রাপ্ত হইল। শচীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত।

শচীকান্ত প্রত্যহ সেই ভ্রষ্টশোভ কাননে—যেখানে আগে গোবিন্দলালের প্রমোদোদ্যান ছিল—এখন নিবিড় জঙ্গল—সেইখানে বেড়াইতে আসিত।

শচীকান্ত সেই দুঃখময়ী কাহিনী সবিস্তারে শুনিয়াছিল।—প্রত্যহ সেইখানে বেড়াইতে আসিত, এবং সেইখানে বসিয়া সেই কথা ভাবিত। ভাবিয়া ভাবিয়া আবার সেইখানে সে উদ্যান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। আবার বিচিত্র রেলিং প্রস্তুত করিল—পুষ্করিণীতে নামিবার মনোহর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী গঠিত করিল। আবার কেয়ারি করিয়া মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সকল পুঁতিল। কিন্তু আর রঙ্গিল ফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে বকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস্ ও উইলো।—প্রমোদভবনের পরিবর্ত্তে একটি মন্দির প্রস্তুত করিল। মন্দিরমধ্যে কোন দেব-দেবী স্থাপন করিল না। বহুল অর্থব্যয় করিয়া ভ্রমরের একটি প্রতিমূর্ত্তি সুবর্ণে গঠিত করিয়া, সেই মন্দিরমধ্যে স্থাপন করিল। স্বর্ণপ্রতিমার পদতলে অক্ষর খোদিত করিয়া লিখিল,

"যে, সুখে দুঃখে, দোষে গুণে, ভ্রমরের সমান
হইবে, আমি তাহাকে এই স্বর্ণপ্রতিমা
দান করিব।"

ভ্রমরের মৃত্যুর বার বৎসর পরে সেই মন্দিরদ্বারে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। শচীকান্ত সেইখানেই ছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন, "এই মন্দিরে কি আছে দেখিব।"

শচীকান্ত দ্বার মোচন করিয়া সুবর্ণময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি দেখাইল। সন্ন্যাসী বলিল, "এই ভ্রমর আমার ছিল। আমি গোবিন্দলাল রায়।"

শচীকান্ত বিস্মিত, স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু পরে বিস্ময় দূর হইল, তিনি গোবিন্দলালের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য যত্ন করিলেন। গোবিন্দলাল অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "আজ আমার

দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইল। অজ্ঞাতবাস সমাপনপূর্ব্বক তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করা হইল। এখন ফিরিয়া যাইব।"

শচীকান্ত যুক্তকরে বলিল, "বিষয় আপনার, আপনি উপভোগ করুন।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে আমার কাজ নাই, তুমিই ইহা ভোগ করিতে থাক।"

শচীকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়?"

গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, "কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার এ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনি আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না।

সমাপ্ত

পাঠভেদ

'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১২৮২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' আরম্ভ হয়। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুনে নবম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়। চৈত্র সংখ্যা বাহির করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র স্বসম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। অসম্পূর্ণ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নবম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়া থাকে। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পুনরায় বাহির হইতে থাকে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বৈশাখ হইতে আবার আরম্ভ হইয়া (দশম পরিচ্ছেদ হইতে) মাঘ সংখ্যায় শেষ হয়। মোট ৪৬ ও পরিশিষ্ট—এই ৪৭ পরিচ্ছেদে উপন্যাস সমাপ্ত হয়। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পুস্তকাকারে বাহির হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭০। পুস্তক দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রথম খণ্ডে ৩১ ও দ্বিতীয় খণ্ডে ১৫ ও পরিশিষ্ট, মোট ৪৭ পরিচ্ছেদই থাকে। দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭১। চতুর্থ সংস্করণই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালের শেষ সংস্করণ, ইহা ১৮৯২ সালে বাহির হয়, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯৬। বর্ত্তমান সংস্করণ এই চতুর্থ সংস্করণ অনুযায়ীই মুদ্রিত হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণের একখানি আখ্যাপত্রহীন বই দেখিয়াছি, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭২। 'বঙ্গদর্শন' হইতে প্রথম সংস্করণ পুস্তকে পরিবর্ত্তন অত্যন্ত বেশী, প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পার্থক্যও কম নয়।* ঐ দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংস্করণেও কিছু তফাৎ ঘটিয়াছে। আমরা প্রথম ও চতুর্থ সংস্করণের পাঠভেদ দিলাম।

পৃ. ৫, পংক্তি ১২, "কৃষ্ণকান্তকে জেঠা মহাশয় বলিতেন।" কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে একটু দূর সম্বন্ধ ছিল, এ জন্য ব্রহ্মানন্দ

পৃ. ১০, পংক্তি ১৮ হইতে পৃষ্ঠা ১৩, তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ পর্য্যন্ত অংশটুকুর পরিবর্ত্তে ছিল—

---

* "...কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা গুরুতর দোষ ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক কতক সংশোধন করা হইয়াছে। পুস্তকের অর্দ্ধেকমাত্র সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইলে, আমাকে কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে অতি দূরে যাইতে হইয়াছিল। অতএব অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত না হইয়াই ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকিতে পারে।...১১ই জ্যৈষ্ঠ [১২৯৩] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ।"—'বঙ্কিমচন্দ্র'-লেখক গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট লিখিত পত্র।

এই কথার পর হরলাল বিদায় হইলেন। তিনি গৃহের বাহির হইলে পর একটি স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরলাল তাঁহাকে অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও?"

স্ত্রীলোকটি দুই হস্তে অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, "আমি রোহিণী।"

রোহিণী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্কন্যা। তাহার যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পান খাইত, নির্জ্জল একাদশী করিত না। পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে, সে মাছও খাইত। যখন পাড়ায় বিধবাবিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি।

পক্ষান্তরে তাহার অনেক গুণও ছিল। রন্ধনে সে দ্রৌপদী বিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা, ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলপানা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনা রহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। পল্লীর মেয়েরা যেখানে লুকিয়ে চুরিয়ে গানের মজলিষ করিত, রোহিণী সেখানে আখড়াধারী—টপ্পা, শ্যামাবিষয়, কীর্ত্তন, পাঁচালি, কবি, রোহিণীর কণ্ঠাগ্রে। শুনা গিয়াছে, রোহিণী "ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র" অনেক জানিত। সুতরাং মেয়েমহলে রোহিণীর পশারের সীমা ছিল না। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত। ব্রহ্মানন্দের গৃহ শূন্য; রোহিণী তাঁহার ঘরের গৃহিণী ছিল।

দুই চারিটি মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কাকার কাছে যে জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার কি হইল?"

হরলাল বিস্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি জন্য আসিয়াছিলাম?"

রোহিণী মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, "সব শুনেছি। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া দিব।"

হরলাল বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "সে কি রোহিণি?" পরে কহিলেন, "আশ্চর্য্যই বা কি? তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তা তুমি কি প্রকারে উইল বদলাইবে?"

রো। সে কথাটা আপনার সাক্ষাতে নাই বা বলিলাম। না পারি আপনার টাকা আপনি ফেরং লইবেন।

হর। ফেরং? তবে কি টাকা আগামী দিতে হবে নাকি?

রো। সব।

হর। কেন, এত অবিশ্বাস কেন?

রো। আপনিই বা আমায় অবিশ্বাস করেন কেন?

হর। কবে এটা পারবে?

রো। আজিকেই। রাত্র তৃতীয় প্রহরে এইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

হরলাল বলিলেন, "ভাল," এই বলিয়া তিনি রোহিণীর হাতে হাজার টাকার নোট গণিয়া দিলেন।

পৃ. ১৫, পংক্তি ৬, "আমি কি বুড় হইয়া বিহ্বল হইয়াছি ?" কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল, "আমি কি এতই বুড় হইয়াছি ?"

পৃ. ১৫, পংক্তি ৯, "রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের" কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

রোহিণীর যে অভিপ্রায় তাহা সিদ্ধ হইল। কৃষ্ণকান্তের উইল কোথায় আছে, তাহা জানিয়া গেল।

পৃ. ১৬, ১ম পংক্তির পূর্ব্বে ছিল—

হরি তখন মতি গোয়ালিনীর গৃহে সেই বহুবিলাসিনী সুন্দরীকে কেবল হরিমাত্র পরায়ণা মনে করিয়া তাহার সতীত্বের প্রশংসা করিতেছিলেন। সেও রোহিণীর কৌশল! নহিলে দ্বার খোলা থাকে না' এদিকে

পৃ. ১৬ হইতে পৃ. ১৭ পঞ্চম পরিচ্ছেদটি নিম্নলিখিত মত ছিল—

সুপ্তা সুন্দরীর প্রথম নিদ্রাভঙ্গে নয়নোন্মীলনবৎ, পৃথিবীমণ্ডলে প্রভাতোদয় হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মানন্দ ঘোষের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠতলে রোহিণীর সহিত হরলাল কথোপকথন করিতেছিল—যেন পাতালমার্গে, অন্ধকার বিবরমধ্যে সর্প দম্পতী গরল উদ্গীর্ণ করিতেছিল। কৃষ্ণকান্তের যথার্থ উইল রোহিণীর হস্তে।

হরলাল বলিল, "তারপর, আমাকে উইলখানি দাও না।"

রোহিণী। সে কথা ত বলিয়াছি, উইলখানি আমার নিকট থাকিবে।

হরলাল তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তোমার পুরস্কার তোমাকে দিয়াছি। এখন ও উইল আমার।"

রো। আপনারই রহিল, কিন্তু আমার কাছে থাকুক না কেন? ইহা আর কাহারও হস্তে যাইবে না বা আর কেহ দেখিতে পাইবে না।

হর। তুমি স্ত্রীলোক—কোথায় রাখিবে কাহার হাতে পড়িবে, উভয়েই মারা যাইব।

রো। আমি উইল এমত স্থানে রাখিব যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমি না দিলে আপনিও সন্ধান পাইবেন না।

হর। তোমার ইচ্ছা যে, তুমি ইহার দ্বারা আমাকে হস্তগত রাখ—না, কি গোবিন্দলালের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ কর।

রো। গোবিন্দলালের মুখে আগুন! আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না।

হর। আর যদি কোন প্রকারে আমি কর্ত্তাকে জানাই যে, রোহিণী তাঁহার ঘরে চুরি করিয়াছে।

রো। আমি তাহা হইলে কর্ত্তার নিকট এই উইলখানি ফিরাইয়া দিব। আর বলিব যে, আমি এই উইল ব্যতীত কিছুই চুরি করি নাই। তাও বড় বাবুর কথায় করিয়াছি। তাহাতে বড় বাবুর উপকার কি অপকার হইবে তাহা আপনিই বিবেচনা করুন। স্মরণ করিয়া দেখুন আসল উইলে আপনার শূন্য ভাগ; আমাকে থানায় যাইতে হয় আমি মহৎ সঙ্গে যাইব।

হরলাল ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া রোহিণীর হস্তধারণ করিলেন। এবং বলে উইলখানি কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। রোহিণী তখন উইল তাঁহার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা হয় আপনি উইল লইয়া যাউন। আমি কর্ত্তার নিকট সম্বাদ দিই যে, তাঁহার উইল চুরি গিয়াছে—তিনি নূতন উইল করুন।"

হরলাল পরাস্ত হইলেন। তিনি ক্রোধে উইল দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, "তবে অধঃপাতে যাও।" এই বলিয়া হরলাল সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রোহিণী উইল লইয়া নিজালয়ে প্রবেশ করিল।

পৃ. ১৯, পংক্তি ১৬, "বকুলের" কথাটির স্থলে "নিম্বের" ছিল।

পৃ. ২১, পংক্তি ২৪, "রোহিণীর অনেক দোষ" এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

রোহিণী লোভী, রোহিণী চোর, তা বলিয়াছি—হরলালের টাকা লইয়া উইল চুরি করিল। রোহিণী ব্যাপিকা, তাও বলিয়াছি, হরলালের সঙ্গে অতি ইতরের ন্যায় কথা বার্ত্তা কহিয়াছিল।

পৃ. ২২, পংক্তি ৭, "এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে" এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

এখন, রোহিণী বড় মুখরা বলিয়া বিখ্যাত। খ্যাতিটি অযোগ্য নহে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। ব্যাপিকা হইলেই আর এক অখ্যাতি, সত্য হউক মিথ্যা হউক, সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জোটে। রোহিণীর সে গুরুতর অখ্যাতিও ছিল। সুতরাং কোন ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে কথা কহিত না। গোবিন্দলাল কুষ্ঠগ্রস্তবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু

পৃ. ২২, পংক্তি ১৮, "মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল" এই কথা কয়টির পরিবর্ত্তে ছিল—

অতি ঘৃণাযোগ্য মুখরার ন্যায় অনর্গল কথোপকথন করিয়াছিল—কত হাসিয়াছিল, কত ঠাট্টা করিয়াছিল, কত অর্থপ্রিয়তা প্রকাশ করিয়াছিল

পৃ. ২৩, পংক্তি ১, এই পংক্তির পূর্ব্বে ছিল—

কি কথা রোহিণি? উইল চুরি করিয়া যে গোবিন্দলালের সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তাহার সঙ্গে আবার তোমার কি কথা?

পৃ. ২৪, পংক্তি ১-২, এই দুই পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল—

কুমতি। হাজার টাকা দেয় কে? টাকায় কত উপকার!

সু। তা, গোবিন্দলালের কাছেও টাকা পাওয়া যায়। তার কাছে ঐ হাজার টাকা লইয়া কেন উইল ফিরাইয়া দাও না?

(N. B.—এই কথাটা সুমতি বলিয়াছিল কি কুমতি বলিয়াছিল, তাহা লেখক ঠিক বলিতে পারেন না।)

কু। টাকা চায় কে? আর গোবিন্দলাল উইল বদল হইয়াছে জানিতে পারিলে, টাকাই বা দিবে কেন? উইল যে বদল হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলেই তাহার কার্য্যোদ্ধার হইবে। তখনই সে কৃষ্ণকান্তকে বলিবে, মহাশয়ের উইল বদল হইয়াছে—নূতন উইল করুন। সে টাকা দিবে কেন?

সু। ভাল, টাকাই কি এত পরম পদার্থ? কি হইবে টাকায়? তোমার এত দিন হাজার টাকা ছিল না, তাতেই বা কি ক্ষতি হইয়াছিল—হাজার টাকা কতদিন যাইবে? হরলালের টাকা হরলালকে ফিরাইয়া দাও। আর কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।

পৃ. ২৬, পংক্তি ৯, "জাল উইল চালান হইবে না।" এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

হরলালের বশীভূত হইয়া গোবিন্দলালকে দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরলালকে দেওয়া হইতে পারে না—

পৃ. ২৬, পংক্তি ১৯, "হরলালের লোভে" কথা দুইটির স্থলে "অর্থলোভে" ছিল।

পৃ. ২৬, পংক্তি ২৩, এই পংক্তির শেষে ছিল—

এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া, রোহিণী প্রথমতঃ হরি খানসামাকে হস্তগত করিল।

হরি যথাকালে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিয়া যথেপ্সিত স্থানে সুখানুসন্ধানে গমন করিল।

পৃ. ২৭, পংক্তি ২-৩, "পুরী সুরক্ষিত···রুদ্ধ হইত না।" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—

হরির কৃপায় পথ সর্ব্বত্র মুক্ত।

পৃ. ২৭, পংক্তি ২০-২১, "পাইলেন না।···তখন কৃষ্ণকান্ত" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে "না পাইয়া" কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ২৯, পংক্তি ১১, "মন্দ কর্ম্ম করিতে" কথা কয়টির স্থলে "মন্দ অভিপ্রায়ে" ছিল।

পৃ. ৩৬, পংক্তি ১৭, "বিশেষ" কথাটির স্থলে "বিশ্বাস" ছিল।

পৃ. ৩৭, পংক্তি ৪, "নহিলে আমি তোমার জন্যে মরিতে বসিব কেন?" এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

বুঝি বিধাতা তোমাকে এত গুণেই গুণবান্ করিয়াছেন।

পৃ. ৩৮, পংক্তি ১২, এই পংক্তির পর ছিল—

গোবিন্দলাল, অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া ভ্রূকুটী করিলেন। দেখিয়া, রোহিণী বলিল, "তাহা নহে। এই কার্য্যের জন্য তিনি আমাকে এক হাজার টাকা দিয়াছেন। নোট আজিও আমার ঘরে আছে। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আনিয়া দেখাইতেছি।"

পৃ. ৩৮, পংক্তি ১৭, "কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে?" এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

আমি ত তোমায় কোন টাকা দিই নাই—তবে

পৃ. ৩৮, পংক্তি ১৭-১৮, "আমি ত কোন অনুরোধ করি নাই।" এই কথাগুলি ছিল না।

পৃ. ৩৮, পংক্তি ১৯-২০, "অনুরোধ করেন নাই" কথাগুলির স্থলে "টাকা দেন নাই" ছিল।

পৃ. ৩৮, পংক্তি ২৫, "আর কিছু বলিবেন না।" এই কথাগুলির পূর্ব্বে "মেজ বাবু—" কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৩৮, পংক্তি ২৮, "একবার ছাড়িয়া দিন, কাঁদিয়া আসি।" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—

আমায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিন।

পৃ. ৩৯, পংক্তি ৫, "সমুদ্রবৎ সে হৃদয়" কথা কয়টির পূর্ব্বে ছিল—

তাঁহার হৃদয় সমুদ্র—

পৃ. ৩৯, পংক্তি ৭, "আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন?" এই কথাগুলির পরে ছিল—

আমার কথা শুন—আগে বড় বাবুর সে টাকাগুলি আনিয়া দাও—সে টাকা তোমার রাখা উচিত নহে। আমি সে টাকা তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিব। তার পর—

পৃ. ৩৯, পংক্তি ৯, "তোমাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।" এই কথাগুলির পূর্ব্বে "তার পর," কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৩৯, পংক্তি ২৮, "ছাড়িবেন কেন?" কথা দুইটির পূর্ব্বে "সহজে" কথাটি ছিল।

পৃ. ৪২, পংক্তি ১০-১১, "খুড়ার সঙ্গে···বলিয়া, ঘরের" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—

হরলালের দত্ত নোট বাহির করিয়া লইতে আসিল। ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সিন্দুক হইতে নোট বাহির করিল। ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে আসিতেছিল—কিন্তু গেল না।

পৃ. ৪২, পংক্তি ১১, "মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া," এই কথা কয়টির পরে ছিল—
নোটগুলির উপর পা রাখিয়া,

পৃ. ৪২, পংক্তি ২২, "কালামুখী রোহিণী উঠিয়া" এই কথা কয়টির পরে ছিল—
নোট গুটাইয়া লইয়া,

পৃ. ৪৩, পংক্তি ৯-১০, "পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল।" এই কথা কয়টির স্থলে ছিল—
নোট ফিরাইয়া দিল।

পৃ. ৪৫, পংক্তি ১১, "কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম—" এই কথাগুলির পরে ছিল—
আমাকে আর দেখিতে না পায়।

পৃ. ৪৬, পংক্তি ১৫, এই পংক্তির পূর্ব্বে ছিল—
গোবিন্দলাল, হরলালের হাজার টাকা ডাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। লিখিয়া দিলেন, আপনি যে জন্য রোহিণীকে টাকা দিয়াছিলেন তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, রোহিণী টাকা ফিরাইয়া দিতেছে।

পৃ. ৪৬, পংক্তি ২৫, "পাতার গাছের শ্রেণী" কথা কয়টির স্থলে "পুষ্পবৃক্ষশ্রেণী" ছিল।

পৃ. ৪৮, পংক্তি ১৮, এই পংক্তির পরে ছিল—
আজি গোবিন্দলালের পরীক্ষার দিন। আজ গোবিন্দলাল পিত্তল কি সোণা বুঝা যাইবে।

পৃ. ৪৮, পংক্তি ২৩, "গোবিন্দলাল জানিতেন," কথা দুইটির পরে ছিল—
যাহাকে ডাক্তারেরা Sylvester's Method বলেন তদ্দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করান যাইতে পারে।

পৃ. ৪৯, পংক্তি ৮-৯, "সেহি পারিব না মুনিমা!" কথা কয়টির স্থলে ছিল—
তা হেবে না অবধড়!

পৃ. ৪৯, পংক্তি ১০-১১, "শালগ্রামশিলা···করিতে পারিত" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—
শালগ্রামের উপর পা দিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে দিলে দিতে পারিত

পৃ. ৪৯, পংক্তি ১১, "কট্‌কি" কথাটির স্থলে "জগন্নেথে" ছিল।

পংক্তি ১৭, "ভদরক" কথাটি "ভদরক-অ" এইরূপ ছিল।

পৃ. ৫১, পংক্তি ৮, "তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!" এই কথা কয়টির পরে ছিল—
আমার হৃদয় অবশ হইয়াছে—আমার প্রাণ গেল! রোহিণীর পাপরূপে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে

পৃ. ৫৭, পংক্তি ৪, "রটনাকৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকণ্ঠা" কথা দুইটির স্থলে "রটনা-কৌশলপরকলঙ্ককলিতকণ্ঠ" ছিল।

পৃ. ৫৯, পংক্তি ২৫, "আমাদের পাঠিকারা" কথা দুইটির স্থলে "আমরা" ছিল; সুতরাং ২৬ পংক্তিতে "করিতেন" কথাটির স্থলে "করিতাম" ছিল।

পৃ. ৬২, পংক্তি ১৯, "আমার বড় পীড়া হইয়াছে।" এই কথা কয়টির পরে ছিল—

শ্বশুর শাশুড়ী আমার পীড়ার কথায় মনোযোগ করেন না। কোন চিকিৎসা পত্র করেন না—পীড়ার কথা স্বীকারই করেন না।

পৃ. ৬২, পংক্তি ২২, "পীড়ার কথা বলিও না" এই কথাগুলির পরে ছিল—

তাহা হইলে আমাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে

পৃ. ৬৩, পংক্তি ১০, "এত অবিশ্বাস!" কথা দুইটির স্থলে ছিল—

আমি কেবল ভ্রমরের জন্য এ তৃষায় দগ্ধ হইতেছি, নিবারণ করি না। তবু ভ্রমরের এই ব্যবহার?—এই অবিশ্বাস!

পৃ. ৬৩, পংক্তি ১৫, এই পংক্তির পরে ছিল—

গোবিন্দলালের প্রধান ভ্রম যাহা, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস, সৎপথে থাকা ভ্রমরের জন্য, তাঁহার আপনার জন্য নহে। ধর্ম্ম পরের সুখের জন্য, আপনার চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন জন্য নহে; ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মের জন্য নহে, ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। যে পবিত্রতার জন্য পবিত্র হইতে চাহে না, অন্য কোন কারণে পবিত্র, সে বস্তুতঃ পবিত্র নহে। তাহাতে এবং পাপিষ্ঠে বড় অধিক তফাৎ নহে। এই ভ্রমেই গোবিন্দলালের অধঃপতন হইল।

পৃ. ৬৫, পংক্তি ১৩, "বুঝিয়া" কথাটির স্থলে "গোবিন্দলালের মুখে শুনিয়া" ছিল।

পংক্তি ২০, "পুণ্যাত্মাও" কথাটির স্থলে "পাপিষ্ঠ" ছিল।

পৃ. ৬৬, পংক্তি ১৮, "তাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন।—" কথা কয়টির পরে ছিল—

মনে মনে স্থির সংকল্প অদ্য কৃষ্ণকান্তকে সংহার করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন।

পৃ. ৬৯, পংক্তি ১৫, "ভোঁ ভোঁ," কথাটি ছিল না।

পংক্তি ২১, "সে" কথাটির পরিবর্ত্তে ছিল—

যে কথা অর্দ্ধেক মাত্র বলিতে হইত, আর অর্দ্ধেক না বলিতেই বুঝা যাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। যে

পৃ. ৭২, পংক্তি ৫, "ইচ্ছামত" কথাটির স্থলে "যথেচ্ছা" ছিল।

পৃ. ৭২, পংক্তি ৭, "ক্ষমা কর!" কথা দুইটির পর পুনরায় "ক্ষমা কর!" কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৭২, পংক্তি ১৪-১৫, "চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—

দ্বারদেশে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

পৃ. ৭৮, পংক্তি ৫, "দেবতা সাক্ষী" কথা দুইটির পূর্ব্বে ছিল—

একদিন তুমি বলিবে—আবার দেখিব, ভ্রমর কোথায়?

পৃ. ৮৪, পংক্তি ২৭, "নির্ব্বোধ" কথাটির স্থলে "হনুমান" ছিল।

পৃ. ৮৫, পংক্তি ৩, "অবতার" কথাটির স্থলে "বাঙ্গাল" ছিল।

পৃ. ৮৯, পংক্তি ৭-৮, এই পংক্তি দুইটির স্থলে ছিল—

মা। জিলা—জশ—শ—শর—
নি। জশ্—শরে কেন?

পৃ. ৯০, পংক্তি ২০, "গায়কের" কথাটির স্থলে "বৃদ্ধের" ছিল।

পৃ. ১০৪, পংক্তি ২২, "তাঁহার পত্নী অতি সঙ্গোপনে" কথা কয়টির পূর্ব্বে ছিল—

তিনি তাহা আপনপত্নীর নিকট গোপনে বলিয়াছিলেন।

পৃ. ১১৬, পংক্তি ৭, "কালো মেঘ শাদা হইল—" কথাগুলির পরে ছিল—

পৃথিবী আলোকের হর্ষে হাসিয়া উঠিল—যেন কিছুই হয় নাই

পৃ. ১২০ পংক্তি ৭-২০, এই পংক্তি কয়টির স্থলে ছিল—

গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া, স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।

পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।

পৃ. ১২১, পংক্তি ২, "ভাগিনেয় শচীকান্ত" কথা দুইটির পূর্ব্বে "অপ্রাপ্তবয়ঃ" কথাটি ছিল।

পৃ. ১২১, পংক্তি ২-৩, "শচীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত।" এই কথা কয়টির স্থলে ছিল—
কয়েক বৎসর পরে শচীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন।

পৃ. ১২১, পংক্তি ৪, "প্রত্যহ সেই ভ্রষ্টশোভ" কথা কয়টির পূর্ব্বে ছিল—
যখন মানুষ হইল, তখন সে

পৃ. ১২১, পংক্তি ১৮ হইতে পৃ. ১২২, শেষ পংক্তি পর্য্যন্ত ছিল না।
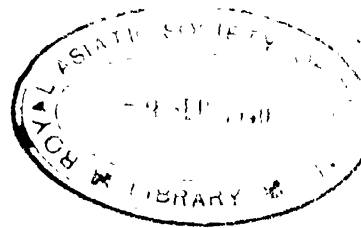
বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

রাজসিংহ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১২৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, অপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্মথমোহন বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

শ্রাবণ, ১৩৪৭

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

ভূমিকা

'রাজসিংহ'-রচনায় বঙ্কিমের উদ্দেশ্য

বঙ্কিমচন্দ্র কি উদ্দেশ্যে 'রাজসিংহ' লেখেন, তাহা তিনি নিজেই এই কথাগুলিতে বলিয়া দিয়াছেন, "ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরাজ-সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ-স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।...যখন বাহুবলমাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।"

'রাজসিংহে'র আরম্ভেই গ্রন্থকার বলিতেছেন, "আমি পূর্ব্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।" বঙ্কিম ঐতিহাসিক উপন্যাসকে যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাতে যদি 'সীতারাম' বাদ যায়, তবে 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'কেও বাদ দিতে হইবে।

আবার বঙ্কিম নিজেই এই পার্থক্যের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই শ্রেণীর উপন্যাসে মূল ঘটনা এবং অধিকাংশ ব্যক্তিগণ (নাম বদলাইয়া বা না বদলাইয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাতে আসে যায় না) এবং অনেক কথাবার্ত্তা ও চরিত্রের গুণ দোষগুলি নিছক জ্ঞাত ইতিহাস হইতে লওয়া ; এবং সেই সত্য ভিত্তি বা কাঠামোর উপর গ্রন্থকার নিজ কল্পনার বলে কতকগুলি কথাবার্ত্তা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা (যাহাকে episodes বলা যায়) এবং নায়ক-নায়িকা ও গার্হস্থ্যজীবনের সাধারণ দৈনন্দিন দৃশ্যগুলি অতিরিক্ত সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

বঙ্কিম বলিতেছেন, "সে কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে...রাজসিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপন্যাসভুক্ত করিতে হয়।...স্থূল ঘটনা অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, উদিপুরী, ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেমন আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে ইহাদের সম্বন্ধে যে

সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।"

'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' হইতে 'রাজসিংহে'র এইটি প্রথম পার্থক্য, এবং ইহা গ্রন্থকার-কর্তৃক স্বীকৃত। দ্বিতীয় পার্থক্য যে কি, তাহা এই সংস্করণের 'আনন্দ-মঠে'র আমার রচিত ভূমিকায় দেখাইয়াছি—"'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে'র মধ্যে যে অমৃতরস আছে, তাহা···সত্য ঐতিহাসিক কোন উপন্যাসে পাওয়া যায় না।··· এই গ্রন্থগুলিতে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন যে, আত্মসংযম ও ধর্ম্ম-অনুশীলনের ফলে মানব-চিত্ত ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর নৈতিক সোপানে উঠিতে থাকে, অবশেষে এই সব কর্ম্মযোগীরা আর পার্থিব রক্তমাংসের নরনারী থাকে না, নরদেহে দেবতা বা বোধিসত্ত্বে পরিণত হইয়া যায়।"

অতএব 'রাজসিংহে' ইতিহাসের সত্যের উপরই প্রধানতঃ জোর দিতে হইবে, ইহা বঙ্কিমের অভিপ্রায় ছিল। দেখা যাউক, ইহাতে তিনি কত দূর সফল হইয়াছেন। তিনি যখন 'রাজসিংহ' রচনা করেন, তখন "রাজসিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল", তাহার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা অসম্ভব ছিল। এজন্য ইতিহাস-প্রিয় বঙ্কিম দুঃখ করিয়াছেন—"রাজপুতগণের বীর্য্য [মহারাষ্ট্রীয়দিগের অপেক্ষা] অধিকতর হইলেও, এদেশে তেমন সুপরিচিত নহে।···প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কি, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা অত্যন্ত স্বজাতিপক্ষপাতী; হিন্দুদ্বেষক।···রাজপুত ইতিহাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না—স্বজাতিপক্ষপাত নাই, এমন নহে। মনুষী নামে একজন বিনিসীয় চিকিৎসক মোগলদিগের সময়ে ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। তিনিও মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; কত্রু নামা এক জন পাদ্রি তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তিন জাতীয় ইতিহাসে পরস্পরের সহিত অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহার কথা সত্য, কাহার কথা মিথ্যা, তাহার মীমাংসা দুঃসাধ্য। অন্ততঃ এ কার্য্য বিশেষ পরিশ্রমসাপেক্ষ।"

আওরংজীবের রাজপুত-যুদ্ধের ঐতিহাসিক উপকরণ উদ্ধার

কিন্তু আজ এরূপ দুঃখ করিবার কারণ নাই। বঙ্কিমের পর এই অর্দ্ধ শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে যে সব ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ফলে এই রাজপুত-মুঘল

সংঘর্ষের ইতিহাস একমাত্র সমসাময়িক বর্ণনা হইতে যেমন বিস্তৃত ও বিশুদ্ধ ভাবে রচনা করা যায়, এমন আর কোন যুগের ভারত-ইতিহাসে সম্ভব নহে। এখন এই সব নূতন উপাদান ও তাহার মূল্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার পর, আমি এই মহাযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, বঙ্কিম কল্পনার বেগে সত্যকে অতিক্রম করেন নাই, সত্যকে জীবন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র।

বঙ্কিম জানিতেন, শুধু টডের 'রাজস্থান' (যাহার ভিত্তি ততোধিক ভীষণ কল্পনাপ্রিয় ডাউ সাহেবের মুঘল ইতিহাস), ফারসীজ্ঞানহীন অর্ম্ম এবং মানুচী, এই তিন লেখক হইতেই তাঁহার ইতিহাস লওয়া, আর বর্ণনার জন্য বর্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত। ইহার মধ্যে অর্ম্ম আবার "বেশির ভাগ কথা মানুচী হইতে লইয়াছি" (*Hist. Fragments*, ed. of 1805, p. 169) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু ঐ যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার পক্ষে বিবিধ শ্রেণীর বিবরণ বিবিধ ভাষায় আজ পাওয়া যায়। ইহার সবগুলিই প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী, অর্থাৎ প্রত্যক্ষদ্রষ্টার কাহিনী এবং সরকারী রিপোর্ট ও চিঠিপত্র এবং ইহাদের সংখ্যাও অগণ্য।

প্রথম, আওরংজীবের পুত্র মুহম্মদ আকবরের লিখিত সমস্ত ফারসী চিঠি; এগুলিতে ঐ মহাযুদ্ধের প্রধান অংশটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। 'আদাব্-ই-আলমগীরী' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে এগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

স্বয়ং আওরংজীব রাজসিংহকে যে সব ফারসী পত্র লেখেন, তাহার মধ্যে যেগুলি এখনও উদয়পুরে রক্ষিত আছে, তাহা কবিরাজ শ্যামলদাসকৃত 'বীরবিনোদ' নামক হিন্দী গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ছাপা হইয়াছে।

দ্বিতীয়, হাতে লেখা দৈনিক সংবাদপত্র, নাম "আখ্বারাৎ-ই-দর্বার-ই-মুয়াল্লা" (ফারসী)। প্রত্যহ বাদশাহী দরবারে কি কি ঘটনা ঘটিল, শহর প্রদেশ বা অভিযান হইতে যে সব রিপোর্ট বাদশাহের নিকট পৌঁছিল, তাহার মধ্যে যেগুলি প্রকাশ্য দরবারে পড়া হইল—তাহা, বাদশাহের উক্তি, এবং অন্যান্য সরকারী হুকুম (ঠিক আমাদের গভর্ণমেণ্ট গেজেটের মত), এ সব শুনিয়া করদ রাজাদের নিযুক্ত লেখকগণ (নাম ওয়াকেয়ানবিস) তাহা তৎক্ষণাৎ লিখিয়া সাত দিন বা পনের দিন পরে পরে সেগুলি নিজ প্রভুব নিকট পাঠাইত। জয়পুরের রাজশেরেস্তায় এই সব আখ্বারাৎ রক্ষিত হইয়াছে, এই যুদ্ধের তিন বৎসরের কাগজ প্রায় হাজার পাতা হইবে। এগুলি হইতে অত্যন্ত খাঁটি, সমসাময়িক এবং এত কাল পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত সংবাদ পাওয়া যায়।

তৃতীয়, আওরংজীবের সরকারী ইতিহাস, নাম "মা'সির-ই-আলমগীরী", ঐ বাদশাহের প্রিয় শিষ্য এবং সেক্রেটারী (মুরীদ্-ই-খাস্, মুন্সী) ইনায়েৎউল্লা খাঁর আদেশে এবং সরকারী দপ্তরখানার সব কাগজপত্র (বিশেষতঃ ওয়াকেয়া বা রিপোর্ট) দেখিয়া, বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী সাকী মুস্তাদ খাঁ কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে আওরংজীবের কার্য্য, চরিত্র ও উক্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শত্রুর উক্তি বা বাজার গুজব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, তাঁহার স্বীকৃত রাজনীতি ও মত বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে।

চতুর্থ, ঈশ্বরদাস নাগর নামক একজন গুজরাতী ব্রাহ্মণ (বিখ্যাত প্রাচীন রাজধানী আনহিলওয়ারা পট্টননিবাসী) ঠিক এই সময় মাড়োয়ারে মুঘলদের অধীনে আমলার কাজ করিতেন; তাঁহার ফারসী ভাষায় রচিত ইতিহাস, হিন্দুর লেখা বলিয়া অপূর্ব্ব মূল্যবান্।

পঞ্চম, ভিনিশীয় ভ্রমণকারী নিকোলো মানুচীর সুদীর্ঘ বিবরণ, নাম *Storia do Mogor* অর্থাৎ 'মুঘলদের ইতিহাস' (ইতালীয়, পোর্তুগীজ ও ফরাসী ভাষায় লিখিত)। ইহার হস্তলিপি হইতে কত্রু (Catrou) নামক এক জন জেসুয়িট্ পাদ্রী চুরি করিয়া, ফরাসী ভাষায় সংক্ষিপ্ত অথচ অন্য উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত এক ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন (১৭০৫ এবং ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে, দুই খণ্ডে)। ইহাই অর্ম্মের, টডের এবং বঙ্কিমের একমাত্র অবলম্বন ছিল। কিন্তু আসল গ্রন্থের বিশুদ্ধ ও অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা-সম্বলিত ইংরাজী অনুবাদ, উইলিয়ম আর্ভিন সাহেব ১৯০৭ এবং ১৯০৮ সালে চারি ভলুমে ছাপিয়াছেন।

রাজস্থানী হিন্দী অর্থাৎ ডিঙ্গল ভাষায় 'রাজবিলাস' নামক কাব্য (মান-কবিকৃত) মহারাণা রাজসিংহের প্রশস্তি মাত্র। তেমনই, রাজসমুদ্র নামক কৃত্রিম হ্রদের তীরে ২৫ খানা বৃহৎ প্রস্তরফলকে খোদা "রাজপ্রশস্তি মহাকাব্য" (সংস্কৃতে) এই মহারাণার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ফলতঃ রাজস্থানী ভাষায় এই মহাযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস একখানাও পাওয়া যায় নাই। বঙ্কিম রাজপুত কবিদের বিবরণ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার ন্যায়বিচার-শক্তিরই প্রমাণ দিয়াছেন।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক ভুল

এই সকল উপাদান হইতে বিচারপূর্ব্বক তথ্য লইয়া 'রাজসিংহে' বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাটির প্রকৃত ইতিহাস পরে দিতেছি। তাহার পূর্ব্বে এই গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি

ঐতিহাসিক ভুল দেখাইয়া দিব, যদিও এগুলি উপন্যাসের পক্ষে মারাত্মক নহে; কারণ, বঙ্কিম নিজেই বলিয়াছেন যে, "উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।"

(১) ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ। "আওরংজীবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম—যোধপুররাজকন্যা"। এই বাদশাহ কোন যোধপুর-রাজকন্যাকে বিবাহ করেন নাই; তাঁহার একমাত্র হিন্দু পত্নীর নাম "নবাব-বাঈ", কাশ্মীর প্রদেশের রাজাউর্ শহরের ক্ষুদ্র রাজার কন্যা। ইহারই পুত্র শাহ আলম পরে বাহাদুর শাহ নাম লইয়া দিল্লীর সম্রাট্ হন। নবাব-বাঈকে মুসলমান করিয়া তাহার পর আওরংজীবের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। আকবরের পর বাদশাহী মহলে কোন হিন্দু মহিষী হিন্দু আচার-ব্যবহার রক্ষা করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের মুসলমান হইয়া থাকিতে এবং মৃত্যুর পর কবরে আশ্রয় পাইতে হইত। এমন কি, যখন আওরংজীবের পুত্র আজম শাহের সঙ্গে বিবাহের জন্য বিজাপুরী রাজকন্যা শহরবাণু বেগমকে আনয়ন করা হইল, তাঁহাকে ছয় মাস ধরিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া, শিয়া হইতে সুন্নী করিয়া, তাহার পর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

(২) ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ। "পিসী-ভাইঝি (অর্থাৎ রৌশনারা এবং জেব-উন্নিসা) উভয়ে অনেক স্থলেই মদনমন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন।" কিন্তু যে মানুচী হইতে এই সংবাদ লওয়া হইয়াছে, তাহার গ্রন্থে জেব-উন্নিসার চরিত্রে কোন কলঙ্কপাত করা হয় নাই, তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী ফখর-উন্নিসার উপর এই দুর্নাম দেওয়া হইয়াছে। (*Storia do Mogor*, Irvine's trans., ii. 35.)

(৩) ৮ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ এবং ৭ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ,—আওরংজীব মহারাণার সৈন্য কর্ত্তৃক ঘেরাও হইয়া এক দিন অনাহারে কাটাইলেন, উদিপুরী বেগম বন্দিনী হইবার পর রাণা তাঁহাকে মুক্তি দিলেন।

টডের এই বিবরণ সত্য নহে, এবং জ্ঞাত ইতিহাসের অন্যান্য ঘটনা হইতে অসম্ভব প্রমাণ হয়। বাদশাহী সৈন্যদল মেবারে অনেক বার ঘেরাও হয় এবং আহারের অভাবে এবং রাজপুতদের ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থাকে—এ কথা সত্য, এবং ফারসী ইতিহাস হইতে প্রমাণ হইয়াছে, কিন্তু স্বয়ং বাদশাহ নহে। তবে কুচ করিবার সময় কখন কখন তাঁহার নিজ রক্ষীদলের মধ্যেও রসদ আনা রাজপুতেরা বন্ধ করিয়া দেয়। ফলতঃ টড, হসন আলি খাঁর বিযুক্ত দলের (detachment) এবং শাহজাদা আকবরের নিজ সৈন্যবিভাগের বিপদ্ ও ভয়ভীতিকে বাদশাহের নিজদলের উপর চাপাইয়াছেন। আমার *History of Aurangzib*, vol iii. pp. 340, 379তে এই বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে।

ঐতিহাসিক সত্যের অন্যান্য কয়েকটি ছোট খাট ব্যতিক্রম এই গ্রন্থে আছে, তাহা এখানে উল্লেখ করিব না। আর, সেই যুগের এবং দেশের পক্ষে অসম্ভব কয়েকটি ঘটনাও আছে—রবীন্দ্রনাথ যাহাকে "রীতিমত নভেল" নাম দিয়া উপহাস করিয়াছেন, সেই শ্রেণীর বর্ণনা; তাহার আলোচনা করিবার এ স্থান নহে।

রূপনগরের সত্য রাজকুমারী

পূর্ব্বে জয়পুর-রাজ্য, পশ্চিমে যোধপুর, এবং দক্ষিণে বাদশাহী আজমীর সুবা, এই তিনটিতে ঘেরা একটি ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্য আছে, তাহার নাম কৃষ্ণগড়, এবং ইহার বর্ত্তমান রাজধানীও "কিষণগড়" শহর। এই রাজ্যের উত্তর ভাগে রূপনগর নামে একটি নগর আছে, সুতরাং "রূপনগরের রাজকুমারী" বলিতে কিষণগড়ের রাজকন্যাই বুঝায়। এই দেশের রাজা রূপসিংহ রাঠোর দারা শুকোর পক্ষে সামুগড়ের যুদ্ধক্ষেত্রে (২৯ মে ১৬৫৮) প্রাণত্যাগ করিলে,* তাঁহার পুত্র মানসিংহ রাজা হন, এবং চিরজীবন মুঘলদের বাধ্য থাকেন। ঐ যুদ্ধে বিজয়ী আওরংজীব রূপসিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যা চারুমতীকে বিবাহ করিবার জন্য দাবি করিলেন, যাহাতে মৃত শত্রুর বংশ যথেষ্ট লজ্জিত ও অপমানিত হয়। কিন্তু মানিনী চারুমতী কুলপুরোহিতের হাত দিয়া মহারাণা রাজসিংহের নিকট নিজ বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন, এবং রাজসিংহও সদলবলে প্রকাণ্ড "বরাৎ" অর্থাৎ বরযাত্রীদের শোভাযাত্রা সঙ্গে লইয়া কিষণগড়ে গিয়া চারুমতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। আওরংজীব প্রতিশোধের ইচ্ছা আপাততঃ চাপিয়া রাখিয়া, মহারাণার দুইটি পরগণা কাড়িয়া লইয়া হরিসিংহ দেবলিয়াকে তাহা দান করিলেন। এই হুকুমের বিরুদ্ধে রাজসিংহ বাদশাহকে যে দরখাস্ত করেন, তাহাতে তিনি বলেন, "আমি যে বাদশাহের অনুমতি না লইয়া বিবাহের জন্য কিষণগড় গিয়াছিলাম, তাহাতে বাদশাহের প্রতি উদ্ধতা দেখানো হইয়াছে, এরূপ আপনি লিখিয়াছেন। কিন্তু রাজপুতের সঙ্গে রাজপুতের সম্বন্ধ বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে,

---

* এই যুদ্ধে রূপসিংহ ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, উন্মুক্ত তরবারির জোরে পথ পরিষ্কার করিয়া আওরংজীবের হাতীর কাছে আসিয়া হাওদার দড়ি কাটিবার চেষ্টা করিলেন, যেন হাওদাসুদ্ধ আওরংজীব মাটিতে পড়িয়া যান। শেষে হাতীর পায়ে কোপ মারিতে লাগিলেন। শাহজাদার রক্ষিগণ তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিল, যদিও আওরংজীব চেঁচাইতে লাগিলেন, "এমন সাহসী বীরকে জীবন্ত বন্দী কর, প্রাণে মারিও না।"

ইহাতে যে কোন মানা হইবে, এরূপ আমি কল্পনা করি নাই।...এজন্য আমি বাদশাহের অনুমতির অপেক্ষা করি নাই, এবং বাদশাহী রাজ্যে (অর্থাৎ বরাৎ যাতায়াতের পথে আজমীর সুবাতে) কোন প্রকার উপদ্রব করি নাই।" ইত্যাদি (মূল ফারসী পত্র, 'বীরবিনোদ,' ২য় খণ্ড, ৪৪০-৪৪১ পৃষ্ঠা)। রূপসিংহের মৃত্যুর প্রায় চারি বৎসর পরে তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার সহিত আওরংজীবের পুত্র মুয়জ্জম ওরফে শাহ আলমের বিবাহ হয় (২৬ জানুয়ারি ১৬৬২)।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের বিষয় যে বড় ঘটনাটি, তাহার প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ এইরূপ—

মাড়োয়ারে আগুন জ্বলিল

যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহ আওরংজীবের সর্ব্বপ্রধান হিন্দু সেনাপতি ছিলেন এবং বড় প্রদেশের সুবাদারীও করেন। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর আফঘানিস্থানের জমরুদ গিরি-সঙ্কটের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত থাকিবার সময় তাঁহার মৃত্যু হইল। অপর সর্ব্বোচ্চ হিন্দু মনসবদার, আম্বেরের রাজা জয়সিংহ, ইহার এগারো বৎসর আগে মারা গিয়াছিলেন, সুতরাং এখন হিন্দুস্থান একেবারে হিন্দুনেতা-শূন্য হইল। যশোবন্তের মৃত্যু-সংবাদ দিল্লীতে পাইবামাত্র আওরংজীব মাড়োয়ার রাজ্য খাস করিয়া মুঘল-শাসনে আনিলেন, মুসলমান ফৌজদার, কিলাদার, কোতোয়াল ও আমিন পাঠাইয়া যোধপুর শহর দখল করিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে (৯ জানুয়ারি ১৬৭৯) স্বয়ং বাদশাহ আজমীর রওনা হইলেন, যেন মাড়োয়ারের সীমানায় বসিয়া সেখানকার রাজপুতদের ভীত ও নিশ্চল করিয়া রাখিতে পারেন। মাড়োয়ারের রাঠোরেরা সদ্য রাজাকে হারাইয়াছে, তাহাদের রাজ-পরিবার, সৈন্যদল এবং স্বজাতীয় নেতারা তখনও আফঘানিস্থান হইতে ফেরে নাই, সেখানে মুঘল-শক্তি দ্বারা ঘেরা ছিল। সুতরাং রাঠোরেরা কোনই বাধা দিতে পারিল না; আওরংজীবের হুকুম অনুসারে এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল খাঁ জহান বাহাদুরের নেতৃত্বে (৭ ফেব্রুয়ারি) মাড়োয়ারে ঢুকিয়া, সব মন্দির ধ্বংস করিয়া, রাজধানীর তোষাখানা খুলিয়া এবং দুর্গের মাটি খুঁড়িয়া যশোবন্তের সমস্ত সম্পত্তি লুঠ করিতে লাগিল। (ইহা আওরংজীবের সরকারী ঐতিহাসিক মুস্তাদ খাঁর কথা; মাসির, ফারসী মূল, ১৭২ পৃষ্ঠা)।

যশোবন্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পাঁচ জন রাণী তাঁহার চিতায় সহমরণ করেন। অপর দুই জন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তাঁহারা দেশে ফিরিবার পথে লাহোর পৌঁছিয়া, প্রত্যেকে এক

একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন (১০ ফেব্রুয়ারি ১৬৭৯), তাহাদের নাম অজিত সিংহ ও দলমন্থন। এই দ্বিতীয় শিশুটি কয়েক দিন পরে মারা গেল। কিন্তু আওরংজীব অজিতকে তাঁহার শত শত বর্ষব্যাপী পিতৃপুরুষদের অর্জ্জিত রাজ্য দিলেন না, এবং যখন অজিত মাতা সহ দিল্লী পৌঁছিলেন, তখন বাদশাহ হুকুম দিলেন যে, শিশু রাঠোর-রাজকুমারকে নিজ হারেম মহলে আনিয়া রাখিতে হইবে এবং বড় হইবার পর তাঁহাকে মনসব ও রাজপদ দেওয়া যাইবে। অজিত যদি মুসলমান হন, তবে তিনি মাড়োয়ার রাজ্য পাইতে পারেন, এরূপও বলা হইল (নুস্খা-ই-দিলকষা, হস্তলিপি, পৃ. ১৬৪)।

রাঠোর-প্রধানগণ এই প্রস্তাব শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের নেতা দুর্গাদাস (এবং তাঁহার যোগ্য সহকারী সোনঙ্গ) অসাধারণ বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত শিশু রাষ্ট্রপতিকে শত্রুর রাজধানীর মধ্যে শত্রুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া মাড়োয়ারে লইয়া গেলেন। ১৫ই জুলাই আওরংজীব দিল্লীর কোতোয়ালের অধীনে বাদশাহী গার্ড সৈন্যদল পাঠাইয়া অজিত ও রাণীদের বন্দী করিবার চেষ্টা করিলেন। রাঠোরদের রণকৌশল এইরূপ হইল—বাদশাহী সৈন্য রাণীদের শিবির ঘেরাও করিলে, রঘুনাথ ভাটি নামক যোধপুরী সামন্ত এক শত যোদ্ধা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া তাহাদের আক্রমণ করিলেন, আর যেই সম্মুখের মুঘল সৈন্য পিছু হটিল, সেই অবসরে দুর্গাদাস, রাণী দুই জনকে পুরুষ-বেশ পরাইয়া ঘোড়ায় চড়াইয়া অজিতকে লইয়া অবশিষ্ট রাঠোর সৈন্যসহ যোধপুরের পথে ছুটিলেন। রঘুনাথ ও তাঁহার সঙ্গিগণ দেড় ঘণ্টাকাল মুঘলদের রোখ্ করিয়া রাখিয়া সকলে নিহত হইলেন। কিন্তু ততক্ষণে দুর্গাদাসের দল পাঁচ ক্রোশ পথ আগাইয়াছে। আবার যখন মুঘলেরা পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে কাছে আসিয়া পৌঁছিল, তখন রণছোড়দাস যোধা তাহাদের দেড় ঘণ্টা ঠেকাইয়া রাখিয়া প্রাণ দিলেন। তিনবার এইরূপ রাঠোর-আত্মবিসর্জ্জন ঘটিল। অবশেষে মুঘল-সৈন্য ক্লান্ত হইয়া এই বৃথা ও মারাত্মক পশ্চাদ্ধাবন ছাড়িয়া দিয়া দিল্লীতে ফিরিল, অজিত ও রাণীসহ দুর্গাদাস মাড়োয়ারে পৌঁছিলেন (২৩ জুলাই)। আওরংজীবের অপচেষ্টা পণ্ড হইল ; আবার রাজা ও নেতাকে দেশে পাইয়া রাঠোরেরা মাথা খাড়া করিল, রাজপুতানার স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হইল, এই আগুন ত্রিশ বৎসর জ্বলিয়া দিল্লীর বাদশাহী ধ্বংস করিল, আওরংজীবের মৃত্যুর পর অজিত সিংহ পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া তৎপুত্র বাহাদুর শাহ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইলেন (১৭০৯)।

ইতিমধ্যে প্রথমে রাঠোর জাতিকে অসহায়, নিশ্চল এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া আওরংজীব আজমীর হইতে দিল্লী ফিরিয়াছিলেন (২ এপ্রিল ১৬৭৯) এবং সেই দিনই

অমুসলমানদের উপর জিজিয়া কর আবার চাপাইয়া দিলেন। উদার-চরিত্র বাদশাহ আকবর শত বৎসর পূর্ব্বে এই কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন। মাড়োয়ার হইতে মন্দির ভাঙ্গিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তি গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া দিল্লী আনা হইল, এবং বাদশাহের হুকুমে তাহা দিল্লী-দুর্গের প্রাঙ্গণে এবং শহরের জমা মসজিদের সিঁড়ির নীচে ফেলিয়া রাখা হইল, "যে সকলে তাহা পদদলিত করিতে থাকিবে" (মাসির, ফারসী মূল, ১৭৫ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু অজিত সিংহের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের ফলে রাজনৈতিক চিত্রপট একেবারে উল্টাইয়া গেল। রাষ্ট্রনেতা পাইয়া মাড়োয়ার জাগিয়াছে জানিয়া, বাদশাহ তৎক্ষণাৎ (১৭ আগষ্ট) এক প্রবল সৈন্যদল সেই দেশে পাঠাইলেন এবং তাহার দুই সপ্তাহ পরে স্বয়ং দিল্লী ছাড়িয়া আজমীরে গেলেন। চারি দিক্ হইতে ভিন্ন ভিন্ন নিজ সৈন্যদল ডাকিয়া আনিয়া, আজমীরকে নিজের হেডকোয়ার্টার্স করিয়া, আওরংজীব যুদ্ধ লুঠ হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড মাড়োয়ারের উপর ঢালিয়া দিলেন। পুষ্করহ্রদের নিকট এক মহাযুদ্ধে রাজপুত দেশরক্ষিগণ তিন দিন যুঝিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল। "যেমন মেঘ পৃথিবীর উপর জলধারা ঢালিয়া দেয়, তেমনই আওরংজীব এই দেশের উপর বর্ব্বর সৈন্য বর্ষণ করিলেন···মাড়োয়ারের সব বড় শহর লুট হইল, মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার স্থানে মসজিদ গড়া হইল।" মাড়োয়ার দেশকে ঠিক মুঘল-সাম্রাজ্যের এক সুবার মত ঘোষণা করিয়া, কয়েকটি ফৌজদারীতে (অর্থাৎ সব্-ডিভিশনে) বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেকটির উপর এক-এক জন মুঘল শাসনকর্ত্তা রাখা হইল।

আগুন মেবারে ছড়াইয়া পড়িল

যখন এইরূপে মাড়োয়ার রসাতলে গেল, তখন আওরংজীব মেবারের বিরুদ্ধে লাগিলেন। মহারাণা রাজসিংহের রাজ্য হইতে জিজিয়া করের দাবি করিয়া পাঠানো হইল। আর অজিত সিংহের মাতা, মহারাণার ভাইঝি, অজিতকে রক্ষা করিবার জন্য রাজসিংহের শরণ লইলেন। রাণা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন।

আজমীর হইতে পুর ও মণ্ডল পরগণা হইয়া সোজা দক্ষিণে চিতোর দুর্গ পর্য্যন্ত প্রায় সমতলভূমির উপর দিয়া পথ। আর, চিতোর হইতে পশ্চিমে উদয়পুরে যাইতে হইলে মধ্যে দেবারী গিরিসঙ্কট পড়ে। ফলতঃ মেবারের কেন্দ্রস্থলটা প্রায় গোলাকার, কতকগুলি গিরিশ্রেণীর দ্বারা চারি দিকে ঘেরা। এই কেন্দ্রের মধ্যস্থলে উদয়পুর, গিরিপ্রাচীর ভেদ

করিয়া পূর্ব্বদ্বার দেবারী, উত্তরদ্বার রাজসমুদ্র হ্রদ, এবং পশ্চিমদ্বার দেবসুরী-ঝিলওয়ারা গিরিসঙ্কট, যাহার নিকটে রাণাদের শেষ আশ্রয় গোগুণ্ডা এবং কমলমীর (বিশুদ্ধ নাম "কুম্ভালগড়") অবস্থিত। এই পশ্চিম দিকের সীমানায় আরাবলী পর্ব্বত উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর লম্বা হইয়া বিস্তৃত, যাহার পূর্ব্বদিকে মেবার, পশ্চিম দিকে মাড়োয়ার রাজ্য।

আওরংজীবের অগণ্য সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য এবং ফিরিঙ্গী গোলন্দাজের চালিত অতি উৎকৃষ্ট নবীন কামানগুলির সামনে সমতল ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার মত শক্তি রাজপুতদের ছিল না। সেজন্য রাজসিংহ লোহার বড় বড় দরজা ও কাঠের খুঁটা দ্বারা দেবারী গিরিরন্ধ্র বন্ধ করিলেন, সমস্ত প্রজাদের সমতল দেশ হইতে উঠাইয়া লইয়া পাহাড়ে আশ্রয় দিলেন, এমন কি, রাজধানী উদয়পুর পর্য্যন্ত জনমানবশূন্য করিয়া রাখিয়া গেলেন।

আওরংজীব স্বয়ং প্রথম আক্রমণ করিলেন; নবেম্বর ১৬৭৯-এর শেষদিন আজমীর ত্যাগ করিয়া উদয়পুরের দিকে অভিযান চালাইলেন; ৪ জানুয়ারি ১৬৮০ মুঘল সৈন্য জনশূন্য দেবারী-গিরিসঙ্কট দখল করিল, এবং তাহার কয়েক দিন পরে নির্ব্বিবাদে উদয়পুরে প্রবেশ করিল। মহারাণা তখন সসৈন্যে উদয়পুরের উত্তর-পশ্চিমে আরাবলী পর্ব্বতক্রোড়ে গোগুণ্ডা-কমলমীর প্রদেশে লুক্কায়িত। উদয়পুর হইতে বাদশাহ, সৈয়দ হসন আলি খাঁকে একদল সৈন্যসহ এই পর্ব্বতমধ্যে পাঠাইলেন, এবং তিনি অতি দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত এই আহার্য্যশূন্য অজ্ঞাত শত্রু অঞ্চলে নিজকে বাঁচাইয়া এক যুদ্ধে মহারাণাকে হারাইয়া তাঁহার শিবির ও পথে রসদ লুঠ করিলেন। এই বিজয়কালে উদয়পুরে ১৭৩টি ও চিতোরে ৬৩টি মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। তাহার পর মেবার-পতন সুসম্পন্ন ভাবিয়া বাদশাহ আজমীরে ফিরিয়া গেলেন, পুত্র আকবরকে চিতোরে ঘাটি করিয়া সৈন্য সহিত মেবার-দমনের জন্য রাখিয়া গেলেন; উদয়পুরে মুঘল থানা রহিল না (মার্চ্চ মাসের শেষ।)

ইহাই রাজসিংহের রণকৌশল দেখাইবার সুযোগ হইল। কেন্দ্রস্থানীয় আরাবলী পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে তিনি ইচ্ছামত পূর্ব্ব দিকে নামিয়া অতি সহজে মেবারের মুঘল থানা ও রসদ লুঠিতেন, অথবা পশ্চিমে নামিয়া মাড়োয়ারে বিক্ষিপ্ত বাদশাহী ফৌজ আক্রমণ করিতেন। অথচ বাদশাহের পক্ষে মেবার হইতে মাড়োয়ারে সহায়ক সৈন্য পাঠাইতে হইলে এক ত্রিকোণের দুই দিক্ ঘুরিয়া যাইতে হইত, তাহাতে অনেক সময় লাগিত। তাহার উপর সমস্ত দেশবাসিগণ মুঘলদের শত্রু, গোপনে মহারাণার লোকদের সাহায্য করিত, শত্রুর সংবাদ দিত, রসদ জোগাইত। আকবর ২২ বৎসর বয়স্ক যুবক, বিলাসী রাজপুত্র, যুদ্ধে অকর্ম্মণ্য, আর তাঁহার অধীনে মাত্র বারো হাজার সেনা, তাহা দিয়া অতবড়

প্রকাণ্ড দেশ রক্ষা করা অসম্ভব। বিক্ষিপ্ত মুঘল থানা(অর্থাৎ ঘাটি)গুলির ক্ষুদ্র রক্ষীদল রাজপুত আক্রমণে উদ্‌ব্যস্ত, কখন কখন পলায়িত, এবং সর্ব্বদা ভীত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িত। বাদশাহ আজমীরে ফিরিয়া যাইবার পর হইতেই এপ্রিল মাসে রাজপুতদেব আক্রমণ দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হইল এবং খুব সফলতা লাভ করিল। বাদশাহী সৈন্যমধ্যে এমন ভয় সঞ্চার করিল যে, কোন সেনানায়ক থানার ভার লইতে সম্মত হয় না, সকলেই সদরে থাকিয়া প্রাণ বাঁচাইতে চায়; সৈন্যগণ কোন গিরিসঙ্কটের মুখে পৌছিয়া ভিতরে ঢুকিতে সাহস করে না, সমতল স্থানে বসিয়া থাকে, কেন্দ্র হইতে যে সৈন্যদল বিযুক্ত (ডিটাচমেণ্ট) করিয়া পাঠানো হইল, তাহারা কিছু দূর কুচ করিয়া গিয়া আর অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিতে লাগিল। (শাহজাদা আকবর, পিতাকে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে এ সব কথা লওয়া)।

রাজপুতদের হাতে মুঘল সৈন্যের লাঞ্ছনা

এর পর স্বয়ং আকবরের পালা আসিল। মে মাসের মাঝামাঝি এক রাত্রিতে মহারাণার সৈন্যদল ফাঁকি দিয়া চিতোর দুর্গের নীচে আকবরের শিবিরে ঢুকিয়া কতকগুলি মুঘলকে হতাহত করিল, দ্রব্যসামগ্রী লুঠ করিল। মহারাণা নিজে পর্ব্বত হইতে নামিয়া বেদনোর জেলা আক্রমণ করিয়া, আকবরের আজমীরে পলাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। আর ঐ মাসের শেষে মহারাণা আকবরকে অতর্কিত আক্রমণ করিয়া প্রভূত লোকহানি করিলেন। তাহার কিছু দিন পরে রাজপুতেরা দশ হাজার শস্যবাহী বলদ সহ এক বঞ্জারার দলকে শাহজাদার শিবিরে রসদ আনিবার পথে বন্দী করিয়া সব লুঠিয়া লইল। রাজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীমসিংহ আর এক দল সৈন্য লইয়া দেশময় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, যেখানে শত্রু দুর্ব্বল দেখেন, সেখানেই পড়িয়া তাহাদের কাটিয়া ফেলেন। রাণার দেওয়ান দয়ালদাস, বাণিয়া হইলেও, সৈন্য লইয়া অপর অপর অঞ্চলে মুঘল-ধ্বংসকাজে লাগিয়া রহিলেন। আকবর লজ্জায় অবনত ও হতভম্ব হইয়া পিতাকে লিখিলেন—

"ঘৃণিত কাফিরদের আশ্চর্য্যজনক পরিশ্রম ও কার্য্যতৎপরতার ফলে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তজ্জন্য আমি যে লজ্জা ও মনঃকষ্ট পাইতেছি, তাহার অণুমাত্র আমার বাক্য ও জ্ঞানের অল্পতাবশতঃ প্রকাশ করা যায়। আমি কার্য্যক্ষেত্রে মাত্র 'এক দুই তিন' পাঠ করিতেছি এবং বিষয়বুদ্ধির বিদ্যালয়ে আমার শুধু অক্ষর পরিচয় হইতেছে। আমি সর্ব্ববিধ-অজ্ঞ (হেচ্‌ মদান্‌); এই সমস্ত দোষ আমার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ও অনভিজ্ঞতার ফলে

ঘটিয়াছে।...ইন্‌শাল্লাতালা, ভবিষ্যতে আপনার নির্দ্দেশ অনুযায়ী সাবধানতা ও সতর্কতা হইতে লেশমাত্র অন্যথা করিব না। ঈশ্বরেচ্ছায় ও আপনার অনুগ্রহে হতভাগ্য শত্রু নিজ কর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি পাইবে।" [আদাব-ই-আলমগীরী, আমার হস্তলিপি, ২৭০খ পৃষ্ঠা]

আওরংজীব রাগে আকবরকে ভৎ‍্সনা করিয়া চিতোর জেলা হইতে মাড়োয়ারে বদলি করিয়া পাঠাইলেন, চিতোরের ভার দ্বিতীয় পুত্র আজম্ শাহকে (বঙ্কিমের "আজীম" নামটা ভুল) দিলেন। আজম্ ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন, পিতার আহ্বানে সেখান হইতে দ্রুতবেগে রাজপুতানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন; জ্যেষ্ঠ পুত্র মুয়াজ্জম্ (অর্থাৎ শাহ আলম), আমাদের পরিচিত নিকোলো মানুচী-সহ দাক্ষিণাত্য হইতে পিতার নিকট পৌঁছেন, তিনি উত্তর দিক্ হইতে মেবার আক্রমণে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই দুই ভাইয়ের চেষ্টাই বিফল হইল।

কনিষ্ঠ শাহজাদা আকবরের মাড়োয়ার অভিযানও বাদশাহের পক্ষে ততোধিক হানিজনক হইল। তিনি কোনক্রমে আরাবলী পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চিম দিকে গোদোবার জেলায় পৌঁছিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, দেবসুরী গিরিরন্ধ্র দিয়া মেবার আক্রমণের কোন চেষ্টাই করিলেন না। ইহার গুপ্ত কারণ তিন মাস পরে প্রকাশ হয়। দুর্গাদাস রাঠোর ও মহারাণা রাজসিংহ গোপনে দূত পাঠাইয়া শাহজাদাকে বলিলেন,—"আপনার পিতা মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে দৃঢ়সংকল্প। রাজপুতদের সাহায্যে আপনার পূর্ব্বপিতৃগণ এই সাম্রাজ্য গড়িয়াছিলেন। আপনি যদি নিজ বংশপরম্পরার সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান, তবে রাঠোর এবং শিশোদিয়া, এই দুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু জাতির সমস্ত বীরগণ আপনাকে সমর্থন করিবে, তাহাদের নেতা হইয়া যুদ্ধ করিয়া আওরংজীবের রাজমুকুট কাড়িয়া লইয়া অতি সহজেই আপনি নিজে বাদশাহ হইতে পারিবেন।" এই ষড়্‌যন্ত্র চলিতে লাগিল, ইতিমধ্যে ২২ অক্টোবর ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজসিংহ রোগে মারা গেলেন, এবং বারো দিবস অশৌচের পর তাঁহার পুত্র জয়সিংহ মহারাণার সিংহাসনে বসিলেন। তখন ষড়্‌যন্ত্রটি পাকা করা হইল। অবশেষে ১ জানুয়ারি ১৬৮১ সালে আকবর নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করিয়া শিবিরে সিংহাসন অধিরোহণ করিলেন, এবং আওরংজীবকে আক্রমণ করিবার জন্য মাড়োয়ার হইতে আজমীর রওনা হইলেন। তাঁহার এই চেষ্টা কিরূপে বিফল হইল এবং হতভাগ্য শাহজাদাকে মহারাষ্ট্র দেশে ও পরে পারস্যে জীবনের সমস্ত অবশিষ্ট অংশ কাটাইতে হইল, তাহা আমার "হিস্ট্রি অব আওরংজীবে" বর্ণনা করিয়াছি; সে সব ঘটনা 'রাজসিংহ' উপন্যাসের সময়-সীমার বাহিরে।

এইরূপে আওরংজীবের রাজপুতানা-আক্রমণ ব্যর্থ হইল, এবং এই রাজনৈতিক দুষ্কর্ম্ম ও ধর্ম্মান্ধতার ফলে পরবর্ত্তী শতাব্দীতে "সোনার দিল্লী" সাম্রাজ্যও ধ্বংস হইল।

আওরংজীবের প্রকৃত চরিত্র

এখন দেখা যাউক, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার এই উপন্যাসখানিতে নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বী আওরংজীবের চরিত্র অঙ্কনে ঐতিহাসিক সত্যের ব্যতিক্রম করিয়াছেন কি? আওরংজীব যে গোঁড়া সুন্নী এবং ধর্ম্মের নামে হিন্দু ও শিয়াদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া লাগিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহারই সরকারী ফারসী ইতিহাস ও সংবাদ-চিঠি হইতে তারিখ ও পৃষ্ঠাসহ উদ্ধৃত করিয়া আমার ইংরাজী ইতিহাস গ্রন্থে দিয়াছি। সেই যুগের মুসলমান-জগৎ তাঁহার কার্য্যকলাপ কি ভাবে দেখিত, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) পারস্যের রাজা দ্বিতীয় শাহ আব্বাস তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান (১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে)—

"আঁ খিলাফৎ-মাব্ পেদর্-গীরীরা আলমগীরী নাম্ নেহাদা—ও আজ্ কুশতনে বিরাদরান্...খাতির্জমা কর্দা...ইত্যাদি"—অর্থাৎ

তুমি নিজকে আলমগীর (জগৎ-জয়ী) নাম দিয়াছ, কিন্তু শুধু নিজ পিতাকে পরাজয় করিয়াছ (পেদর্-গীর্), এবং পৈতৃক জমি ও ধনের ন্যায্য অংশীদার নিজ ভ্রাতাদের খুন করিয়া মনের শান্তি লাভ করিয়াছ। রাজার কর্ত্তব্য প্রজারঞ্জন, ন্যায়বিচার এবং দানশীলতা ত্যাগ করিয়া তুমি সেই সব [শঠ] লোকের সঙ্গ লইয়া লিপ্ত থাক, যাহারা মন্ত্রপড়া ও শয়তানী জাদুগরীকে ঈশ্বর-জ্ঞান এবং সত্যের ব্যাখ্যা বলিয়া নাম দেয়। অতএব তুমি প্রত্যেক কাজেই মনুষ্যত্ব হারাইয়া কেবল চালাকি ও ফাঁকির জোরে বাজি জিতিয়াছ। তোমার রাজ্যে দুরন্ত লোকদের (বিশেষতঃ শিবাজীর) দমন করা তোমার সাধ্যের অতীত। অর্থাভাবে ও সেনাদের পরাজয়ে তুমি অসহায় হইয়া পড়িয়াছ। খোদা ও ইমামগণের আশীর্ব্বাদে, পীড়িতকে উদ্ধার করাই আমার প্রকৃতি; আমার পিতৃপুরুষগণ জগতের রাজাদের শরণের স্থল ছিলেন, যেমন হুমায়ুন বাদশাহের। তুমি হুমায়ুনের উত্তরাধিকারী, তুমি বিপদে পড়িয়াছ, এখন আমার অভিপ্রায় যে, আমি প্রকাণ্ড সৈন্যদল লইয়া হিন্দুস্থানে যাইব এবং আমার তরবারির তেজে তোমার রাজ্যের গোলযোগ থামাইয়া দিব" !!! (মূল ফারসী পত্র ফয়াজ্-উল্-কাওয়াণীন্, হস্তলিপি, ৪৯৬-৪৯৯ পৃষ্ঠা)।

(২) খাইবর-পাসের উত্তর দিকে খটক্-বংশের সর্দ্দার খুষ্হাল্ খাঁ পষ্তু ভাষায় পদ্যে আওরংজীবকে ধিক্কার দিয়া গাহিয়াছিলেন—

"সে নিজ পিতার ঘরে এমন দুঃখ আনিয়া দিয়াছে যে, আরব্য ও পারস্য তাহার কার্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত। আদমের বংশধরদের মধ্যে কে এমন দুষ্কর্ম্মের কথা শুনিয়াছে?" (*Afghan Poetry in the 17th century*, tr. by Biddulph, p. 54.)

পিতা-পুত্রে

(৩) আর সবচেয়ে বেশী মারাত্মক আওরংজীবের প্রিয় পুত্র আকবরের উক্তি। বিদ্রোহের পর এই শাহজাদা পিতাকে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মক্কায় গিয়া স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের অনুতাপ করিয়া শেষ জীবন কাটাইতে আহ্বান করিয়া লিখিতেছেন—

"সত্য সত্যই আমার এই (পিতৃদ্রোহের) পথে পথপ্রদর্শক ও গুরু (মুর্শিদ ব হাদী) আপনিই। এ পথকে কিরূপে দুর্ভাগ্যপ্রদ বলিয়াছেন (অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বে আমাকে যে উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে)?...

"আজ তিন বৎসর ধরিয়া হিন্দুস্থানের বাদশাহ স্বয়ং, তাঁহার সম্ভ্রান্ত পুত্রগণ, নামজাদা উজীরগণ, এবং উচ্চ ওমরাহগণ রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া হতভম্ব হইয়াছে, এখনও কোন ফল লাভ করে নাই। আর, কেনই বা এমন না হইবে? যেহেতু আপনার রাজত্বকালে মন্ত্রীদের হাতে ক্ষমতা নাই, ওমরাহদের উপর বিশ্বাস নাই, সৈন্যগণ দরিদ্র, লেখকশ্রেণী বেকার, বণিকেরা পুঁজিহীন, এবং রায়ৎগণ পদদলিত। দাক্ষিণাত্যের মত প্রশস্ত এবং ভূতলে স্বর্গস্বরূপ দেশ পাহাড় ও মরুভূমির মত বিনষ্ট ও উজাড় হইয়া গিয়াছে।... হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর দুই বিপদ্ পড়িয়াছে,—শহরে শহরে জিজিয়া আদায় আর মাঠে মাঠে শত্রুদের প্রাধান্য।...আপনার সমস্ত সাম্রাজ্যের শাসনভার এবং রাজনৈতিক পরামর্শ-দানের কাজ কাহার হাতে দিয়াছেন? শ্রমিক লোক, নীচ লোক, পাজি, জোলা, তাঁতী, সাবান-ফেরীওয়ালা, দর্জি—এই শ্রেণীর সব কর্ম্মচারী হইয়াছে। তাহারা প্রতারণার চোগা বগলে করিয়া, শয়তানের ফাঁস অর্থাৎ জপের মালা হাতে লইয়া, কতকগুলি কোরাণী প্রচলিত বাণী ও নীতি উপদেশ (রওরায়েৎ ব মসায়েল্) জিহ্বাতে আওড়াইতে থাকে; আর আপনি এই সব লোককে জেব্রিল ও আস্রাফিলের মত সহচর বন্ধু ও উপদেষ্টা বলিয়া মনে করিয়া নিজকে সম্পূর্ণরূপে ইহাদের হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন। এই সব জুয়াচোরেরা এই সুযোগে

নমুনা দেখায়, গম আর মাল দিবার সময় দেয় যব, পর্ব্বতকে বলে ঘাস আর ঘাসকে দেখায় পাহাড় বলিয়া। (পদ্য)

বা-দৌর্-ই-শাহ আলমগীর ঘাজী।
শুদা সাবুন্-ফরোশান্ সদর্ ব কাজী॥
বুদ্ জোলাহা ব বাফিন্দারা নাজ্।
কে দর্ই বজম্ মালিক্ গর্দিদ্ হম্‌রাজ॥
আরাজিল্‌রা শুদা আঁ দস্ত্‌গাহী।
কে ফাজিল্ বর্ দরশ জুয়েদ্ পনাহী॥ ইত্যাদি অর্থাৎ
রাজা মোদের শাহ আলমগীর ঘাজী।
তাঁর রাজ্যে হয়েছে সাবান-ওয়ালারা সদর আর কাজী॥
জোলা আর তাঁতির হ'ল কি গরবের চোট।
যে এই ভোজে প্রভু হলেন মোদের একজোট॥
ছোট লোক পেয়েছে এমন শক্তি ও বিষয়।
যে তাদের দ্বারে পণ্ডিতও খোঁজে আশ্রয়॥
এমন ভীষণ রাজ্য হ'তে মোদের বাঁচান খোদা।
যেখানে আরবী ঘোড়াকে লাথি মারে গাধা॥ * * *

"যখন আমি এই সব দুরবস্থা দেখিলাম এবং আপনার চরিত্র সংশোধন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিলাম, তখন রাজকীয় আত্মসম্মান আমাকে বাধ্য করিল যে, আমি নিজেই হিন্দুস্থানের মুলুককে অত্যাচার ও অশান্তির খড়কাটা হইতে সাফ করিয়া দিই। [অতএব আমার এই বিদ্রোহী অভিযান !!!]···আহা, কি সুখের বিষয় হইবে, যদি ভগবান্ আপনাকে এমন সুবুদ্ধি দেন যে, আপনি রাজ্যভার আপনার এই অধমতম পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া এবং স্বয়ং পুণ্য তীর্থ দুইটির (অর্থাৎ মক্কা ও মদিনার) যাত্রী হইয়া, এই ব্যবহার দ্বারা জগৎকে নিজ গুণগান করিতে ইচ্ছুক করেন।

"আপনি এপর্য্যন্ত সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন রাজ্য ও দুনিয়ার বস্তু লাভ করিতে, যাহা স্বপ্ন অপেক্ষাও অধিক অবিশ্বাসনীয় এবং ছায়া অপেক্ষাও অধিক অস্থায়ী। এখন সময় আসিয়াছে আপনার পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্য; আপনি যৌবনকালে এই নশ্বর ইহজগতের প্রলোভনে নিজ পিতা ও ভ্রাতাগণের সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করুন। (পদ্য)

বয়স হল আশীর উপর, ঘুমাচ্ছ এখনও।
এই ক'টা দিনের বেশী আর পাবে না কো॥

"আপনার পত্রে আমাকে [পিতৃভক্তি সম্বন্ধে] অনেক উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু মাফ করিবেন, যদি বলি—(পদ্য)

বাপকে তুমি করেছিলে কত ভাল কাজ
যে ছেলের কাছে চাচ্ছ সেবা আজ ?
ওহে সাধু, উপদেশ দিচ্ছ অত মানবকে
নিজকে শিখাও যাহা তুমি বলছ অপরকে।"

[মূল ফারসী হস্তলিপি, লণ্ডনস্থ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারের MS. No. 71, কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির হস্তলিপি F. 56, এবং লিথো "জহুর-উল্-ইন্‌শা"।]

কি দুঃখের বিষয় যে, পুত্রবরের এই সব রসাল পত্র বঙ্কিমের পরে আবিষ্কার হইয়াছে, নচেৎ তিনি "রাজসিংহ"কে কত নবীন রঙ্গে উদ্ভাসিত করিয়া যাইতেন। দীনবন্ধু এগুলি পাইলে আরও একখানি অমর নাটক লিখিতেন। ধীরভাবে সেই যুগের সত্য ঐতিহাসিক উপাদান আলোচনা করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আওরংজীবের কতকগুলি গুণ ছিল বটে, কিন্তু দোষগুলি ততোধিক এবং দেশের পক্ষে, মানবের পক্ষে, স্বজাতির পক্ষে মারাত্মক। ঠিক এইরূপ একজন ধর্ম্মান্ধ ওম্মায়াদ খলিফার চরিত্র ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এক কথায় আঁকিয়াছেন, আওরংজীবের পক্ষে সে কথা অক্ষরে অক্ষরে খাটে ঃ—"The throne of an active and able prince was degraded by the *useless and pernicious virtues* of a bigot." (Gibbon's *Decline and Fall*, ch. 52.) 'রাজসিংহে' বঙ্কিমচন্দ্র এই চিরসত্যই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, তিনি এই গ্রন্থে প্রকৃত ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেন নাই, অন্ধ ধর্ম্মান্ধতা দ্বারা লেশমাত্রও প্রণোদিত হন নাই।

শ্রীযদুনাথ সরকার

ভূমিকা

(সম্পাদকীয়)

১২৮১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

> ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবর্ষীয় জড়প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্যুজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি জন্মে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস।···এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত; পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকীর্ত্তিই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যকীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবতানুগৃহীত; সেখানে দৈবের সংকীর্ত্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কীর্ত্তিবর্ণনে প্রয়োজন নাই।···
>
> —'বিবিধ প্রবন্ধ', পরিষৎ সংস্করণ, পৃ. ৩০৯

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় চরিত্রের এই কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য উপন্যাসে এবং প্রবন্ধে মানুষের কীর্ত্তিকেই বড় করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; 'বঙ্গদর্শনে'র এই প্রবন্ধের পর হইতেই তাঁহাকে এই কার্য্যে সমধিক যত্নবান্ দেখি। ইহার পূর্ব্বে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী' এবং 'চন্দ্রশেখরে' এই উদ্দেশ্যে অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহার করিয়া থাকিলেও ঐতিহাসিক মানুষকে সর্ব্বপ্রথম জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা 'রাজসিংহে'ই প্রকাশ পায়। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা হইতে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ছয় সংখ্যা ধরিয়া ইহা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়; কিন্তু গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই। সম্পূর্ণ উপন্যাস ১২৮৮ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় (কলিকাতার জনসন প্রেস, প্রকাশক—রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৮৩, উনবিংশ পরিচ্ছেদ)।

বঙ্কিমচন্দ্র উপরোক্ত মনোবৃত্তি হইতে শুধু যে মানুষ রাজসিংহেরই জয় ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা নয়, তিনি সমগ্র হিন্দুসমাজের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণেরও মানবীয় মহিমা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে', এই কারণে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের গোঁড়া ভক্তদের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁহার মতবাদ বর্জ্জন বা পরিবর্ত্তন করেন নাই।

'কৃষ্ণচরিত্র' বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতবাদের চরম পরিণতি ; তিনি শ্রীকৃষ্ণকেও ইতিহাসের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছেন। প্রারম্ভে সত্যকারের ইতিহাসের আশ্রয় তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই গ্রহণ করিতে হইয়াছে ; রাজসিংহকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। তিনি প্রথমে এই রাজপুত-মোগল সঙ্ঘর্ষের একটি সামান্য ঘটনা মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে চতুর্থ সংস্করণে (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, পৃ. ৪৩৪) ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চতুর্থ সংস্করণের "বিজ্ঞাপনে" তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন—

> ·· পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে যে ক্ষুদ্র ঘটনাটি অবলম্বন করা গিযাছিল, তদ্দারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। রাজসিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপন্যাসভুক্ত করিতে হয়, তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি···
>
> পরিশেষে বক্তব্য যে, আমি পূর্ব্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।···

এবং ইহাই শেষ। মতবাদের কথা বলিলাম। ইতিহাসের দিক্ দিয়া তিনি কতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহার বিচার সার্ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার তাঁহার ভূমিকায় করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'রাজসিংহ' লইয়া সবিশেষ আলোচনা হয় নাই। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল বঙ্কিমের মৃত্যু হয়, 'রাজসিংহে'র পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয় ১৮৯৩ সনের আগষ্ট মাসে, তৎপূর্ব্বে ইহা "ক্ষুদ্র কথা" বা ছোট গল্প মাত্র ছিল, বিশেষ আলোচনার বস্তু ছিল না। 'বঙ্গদর্শনে', প্রথম সংস্করণে, দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৯২, পৃ. ৯০) এবং তৃতীয় সংস্করণে 'রাজসিংহ' ক্ষুদ্রাবয়ব ছিল ; কোনও চরিত্রই বিকাশলাভ করে নাই। পরবর্ত্তী কালেও 'রাজসিংহ' লইয়া খুব বেশী সাহিত্যিক আলোচনা হয় নাই। যাহা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৩০০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার (বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-মাস) 'সাধনা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "রাজসিংহ" (পৃ. ৪০২-৪১৬) প্রবন্ধটিই উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশে অনেক আলোচনা হইয়াছে, সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের মধ্যে 'রাজসিংহে'র সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়। তাঁহার "বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ" ১৩০১ সালের 'সাধনা'য় (শ্রাবণ, পৃ. ২৩৩-২৫২) প্রকাশিত হয়। তাহার এক স্থলে আছে (পৃ. ২৩৫)—

> ···কলিকাতায় প্রায় দুই বৎসর পরে [১২৮৫-১২৮৮ সাল] বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাঁর বাসা বহুবাজারে। আমি প্রিয় সুহৃৎ বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে

যাইতাম। "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম"প্রণেতা বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক দিন গিয়াছিলাম। "রাজসিংহ" তাহার কিছু দিন আগে বঙ্গদর্শনে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রশেখর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করা হইতেছে না কেন? বঙ্কিম বাবু তাঁর কোন বন্ধুর নাম করিয়া বলিলেন, "এঁরা বলেন, আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলে পুলে মাটি হইতেছে। তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না।"... চন্দ্রশেখর বাবুতে এবং আমাতে একযোগে বলিলাম, মাণিকলালের মত ২।১টা ডাকাতের চিত্র দেশের সম্মুখে ধরিলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। এই কথায় বঙ্কিম বাবু কি ভাবিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার অল্প দিন পরে রাজসিংহের প্রথম সংস্করণ বাহির হইল।

রবীন্দ্রনাথ 'রাজসিংহে'র ক্ষুদ্র সংস্করণ পড়েন নাই, একেবারেই পরিণত বয়সে পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ পড়িয়াছিলেন; পড়িয়া তাঁহার যাহা মনে হইয়াছিল, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ক্ষেত্রে তাহা অক্ষয় হইয়া আছে। 'সাধনা'য় প্রথম প্রকাশিত সেই প্রবন্ধ তাঁহার 'আধুনিক-সাহিত্য' পুস্তকে কিছু পরিবর্জ্জিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। সেই বর্জ্জিত অংশ হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি—

রাজসিংহের মধ্যে...অপরূপ রহস্য অবশ্যই কিছু আছে, তাহার সন্ধানের ভার আমি বিজ্ঞ সমালোচকদের উপর রাখিয়া দিলাম। আমি কেবল এইটুক বলিতে চাহি, আমার হৃদয়ে যে সাহিত্যরস-পিপাসা আছে, এ গ্রন্থ পাঠে তাহার কতটা পরিতৃপ্তি হইল।...

আমি নিজেকে জেরা করিয়া অবশেষে একটা নূতন উপমা প্রাপ্ত হইয়াছি।...সাহিত্যরণরঙ্গভূমে কোন মহারথী ভীমের মত গদাযুদ্ধ করেন, আবার কেহ বা সব্যসাচী অর্জ্জুনের মত কোদণ্ডে ক্ষিপ্রহস্ত। কেহ বা প্রকাণ্ড ভার লইয়া পাঠকের মস্তকের উপর নিপাতিত করেন, কেহ বা মুহূর্ত্তের মধ্যে পুচ্ছবান্ অসংখ্য লঘু শরসমূহে উক্ত নিরুপায় নিঃসহায় ব্যক্তির একেবারে মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া ফেলেন।

সাহিত্য-কুরুক্ষেত্রে বঙ্কিম বাবু সেই মহাবীর অর্জ্জুন। তাঁহার বিদ্যুদ্‌গামী শরজাল দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ছুটিতেছে—তাহারা অত্যন্ত লঘু, কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব করে না।

রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক-সাহিত্য' হইতেই 'রাজসিংহ' সম্পর্কে তাঁহার মূল প্রশস্তি-অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

পর্ব্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্ঝরগুলা পাগলের মত ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন মনে হয়, তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে—মনে হয় না তাহারা কোনো কাজের। পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। কিছু দূর তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায়, নির্ঝরগুলা নদী হইতেছে—ক্রমেই গভীরতর হইয়া ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া পর্ব্বত ভাঙিয়া পথ

কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া মহাবলে অগ্রসর হইতেছে—সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।

রাজসিংহেও তাই। তাহার এক একটি খণ্ড এক একটি নির্ঝরের মত দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিঝিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি —তাহার পর ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি, ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি, কতক বা নদীর স্রোত, কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জ্জন, কতক বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পরবর্ত্তী কালে শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৩২৭) পুস্তকে (পৃ. ২৯৮-৩০৭) ও শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (১৯৩৯) পুস্তকে (পৃ. ১৪২-১৫২) 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য।

'রাজসিংহে'র কোনও ভাষায় কোনও অনুবাদ হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।
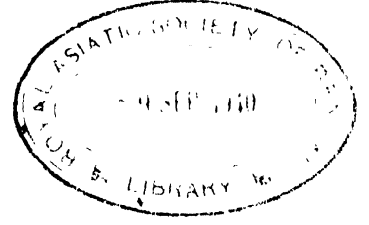
রাজসিংহ

পুনঃপ্রণীত

[১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত চতুর্থ সংস্করণ হইতে]

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

রাজসিংহের পূর্ব্ব তিন সংস্করণে যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা একটা অতি গুরুতর ঐতিহাসিক ঘটনার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান কথা, হিন্দুদিগের সঙ্গে মোগলের বিবাদ। মোগলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের কথা সকলেই জানে। রাজপুতগণের বীর্য্য অধিকতর হইলেও, এদেশে তেমন সুপরিচিত নহে। তাহা সুপরিচিত করিবার যথার্থ উপায়, ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস লিখিবার পক্ষে অনেক বিঘ্ন। প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কি, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা অত্যন্ত স্বজাতিপক্ষপাতী; হিন্দুদ্বেষক। হিন্দুদিগের গৌরবের কথা প্রায় লুকাইয়া থাকেন—বিশেষতঃ মুসলমানদিগের চিরশত্রু রাজপুতদিগের কথা। রাজপুত ইতিহাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না—স্বজাতিপক্ষপাত নাই, এমন নহে। মনুষী নামে একজন বিনিসীয় চিকিৎসক মোগল-দিগের সময়ে ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। তিনিও মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; কক্র নামা এক জন পাদ্রি তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তিন জাতীয় ইতিহাসে পরস্পরের সহিত অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহার কথা সত্য, কাহার কথা মিথ্যা, তাহার মীমাংসা দুঃসাধ্য। অন্ততঃ এ কার্য্য বিশেষ পরিশ্রমসাপেক্ষ।

ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাসলেখক, সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত, অভীষ্টসিদ্ধি জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে, সকল স্থানে উপন্যাস, ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না। কিন্তু এই গ্রন্থে আমার যে উদ্দেশ্য, তাহাতে এই নিষেধবাক্য খাটে না। এক্ষণে বুঝাইতেছি, এই উদ্দেশ্য কি।

"ভারতকলঙ্ক" নামক প্রবন্ধে আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ কি কি। হিন্দুদিগের বাহুবলের অভাব সে সকল কারণের মধ্যে নহে। এই উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি। মহারাষ্ট্রীয়

অপেক্ষাও রাজপুত বাহুবলে বলবান্ ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে রাজকীয় অন্যান্য গুণে তাঁহারা নিকৃষ্ট ছিলেন।

যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। উপন্যাসে সে কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে, রাজসিংহের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে যে ক্ষুদ্র ঘটনাটি অবলম্বন করা গিয়াছিল, তদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। রাজসিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপন্যাসভুক্ত করিতে হয়। তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বলিয়া গ্রন্থের কলেবর এত বাড়িয়াছে। বিশেষতঃ উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনাপ্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।

স্থূল ঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব্-উন্নিসা, উদিপুরী, ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।

ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার পক্ষে বিচার আবশ্যক। আমি সে বিচার বড় করি নাই। দুই একটা উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে। রূপনগরের রাজকন্যা সম্বন্ধে যে স্থূল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহা টডের গ্রন্থে আছে, কিন্তু অর্মে'র গ্রন্থে নাই। আর উদিপুরী সম্বন্ধে যে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহা অর্মে'র গ্রন্থে আছে, কিন্তু টডের গ্রন্থে নাই। আমি উভয় ঘটনাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। রন্ধ্রমধ্যে ঔরঙ্গজেব যে অবস্থায় পতিত হওয়ার কথা লিখিয়াছি, অর্ম ঐরূপ লেখেন। কিন্তু টডের গ্রন্থে শাহজাদা সম্বন্ধে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি এখানে অর্মে'র অনুবর্ত্তী হইয়াছি। এইরূপ অনেক আছে।

কথিত আছে, নৃত্যগীত কেহ না করিতে পারে, এমন আদেশ ঔরঙ্গজেব প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের অন্তঃপুরেই সে আদেশের অবমাননা ঘটিয়াছিল, এ উপন্যাসে এইরূপ লিখিয়াছি। আমার স্থির বিশ্বাস, ঐতিহাসিক সত্য আমার দিকে।

ঔরঙ্গজেব নিজে মদ্যপান করিতেন না, কিন্তু ইঁহার পিতা ও পিতামহ, খুল্লতাত এবং সহোদর প্রভৃতি অতিশয় মদ্যপ ছিলেন। তাঁহার পৌরাঙ্গনাগণও যে মদ্যপায়িনী ছিল,

তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কেহ যদি এ বিষয়ে সন্দেহ করেন, তবে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছি।

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমি পূর্ব্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশ-নন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এপর্য্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসপ্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

ভাষা সম্বন্ধেও একটা কথা বলা প্রয়োজনীয়। এখন লেখকেরা বা ভাষাসমালোচকেরা দুই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের মত যে, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সর্ব্বত্র সংস্কৃতানুযায়ী হওয়া উচিত। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত—যে, যাহা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সংস্কৃতব্যাকরণবিরুদ্ধ হইলেও চলিতে পারে। আমি নিজে এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতের পক্ষপাতী, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এবং সকল স্থানে তাঁহাদের অনুমোদনে প্রস্তুত নহি। আমি যদিও ইতিপূর্ব্বে সম্বোধনে "ভগবন্" "প্রভো" "স্বামিন্" "রাজকুমারি" "পিতঃ" প্রভৃতি লিখিয়াছি, এক্ষণে এ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি "তথা" এবং "তথায়," উভয় রূপই ব্যবহার করিয়াছি। "সসৈন্যে" এবং "সসৈন্য" দুই-ই লিখিয়াছি—একটু অর্থ প্রভেদে। কিন্তু "গোপিনী" "সশরীরে উপস্থিত," এরূপ প্রয়োগ পরিত্যাগ করিয়াছি। কারণনির্দ্দেশের এ স্থান নহে। সময়ান্তরে তাহা করিব ইচ্ছা আছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
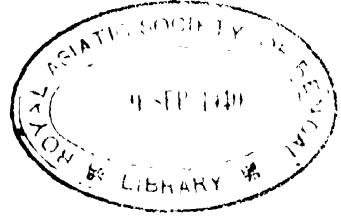
প্রথম খণ্ড

চিত্রে চরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

তস্বীরওয়ালী

রাজস্থানের পার্ব্বত্যপ্রদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রাজ্য ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তার একটা রাজা থাকিবে। রূপনগরেরও রাজা ছিল। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই—রূপনগরের রাজার নাম বিক্রমসিংহ। বিক্রমসিংহের আরও সবিশেষ পরিচয় পশ্চাৎ দিতে হইবে।

সম্প্রতি তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা। ক্ষুদ্র রাজ্য; ক্ষুদ্র রাজধানী; ক্ষুদ্র পুরী। তন্মধ্যে একটি ঘর বড় সুশোভিত। গালিচার অনুকরণে শ্বেত-কৃষ্ণপ্রস্তররঞ্জিত হর্ম্ম্যতল; শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত নানা বর্ণের রত্নরাজিতে রঞ্জিত কক্ষপ্রাচীর; তখন তাজমহল ও ময়ূরতক্তের অনুকরণই প্রসিদ্ধ, সেই অনুকরণে ঘরের দেওয়ালে সাদা পাতরের অসম্ভব পক্ষী সকল, অসম্ভব রকমে, অসম্ভব লতার উপর বসিয়া, অসম্ভব জাতির ফুলের উপর পুচ্ছ রাখিয়া, অসম্ভব জাতীয় ফল ভোজন করিতেছে। বড় পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর এক পাল স্ত্রীলোক, দশ জন কি পনর জন। নানা রঙের বস্ত্রের বাহার; নানাবিধ রত্নের অলঙ্কারের বাহার; নানাবিধ উজ্জ্বল কোমল বর্ণের কমনীয় দেহরাজি,—কেহ মল্লিকাবর্ণ, কেহ পদ্মরক্ত, কেহ চম্পকাঙ্গী, কেহ নবদূর্ব্বাদলশ্যামা,—খনিজ রত্নরাশিকে উপহসিত করিতেছে। কেহ তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছে, কেহ আলবোলাতে তামাকু টানিতেছে—কেহ বা নাকের বড় বড় মতিদার নথ দুলাইয়া ভীমসিংহের পদ্মিনী রাণীর উপাখ্যান বলিতেছেন, কেহ বা কাণের হীরকজড়িত কর্ণভূষা দুলাইয়া পরনিন্দায় মজলিষ

জাঁকাইতেছেন। অধিকাংশই যুবতী; হাসি টিটকারির কিছু ঘটা পড়িয়া গিয়াছে—একটু রঙ্গ জমিয়া গিয়াছে।

যুবতীগণের হাসিবার কারণ, এক প্রাচীনা, কতকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়া তাঁহাদিগের হাতে পড়িয়াছিল। হস্তিদন্তনির্ম্মিত ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ব্ব চিত্রগুলি; প্রাচীনা বিক্রয়াভিলাষে এক একখানি চিত্র বস্ত্রাবরণমধ্য হইতে বাহির করিতেছিল; যুবতীগণ চিত্রিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

প্রাচীনা প্রথম চিত্রখানি বাহির করিলে, এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার তস্‌বীর আয়ি?"

প্রাচীনা বলিল, "এ শাহজাঁহা বাদশাহের তস্‌বীর।"

যুবতী বলিল, "দূর মাগি, এ দাড়ি যে আমি চিনি। এ আমার ঠাকুর দাদার দাড়ি।"

আর এক জন বলিল, "সে কি লো? ঠাকুর দাদার নাম দিয়া ঢাকিস্ কেন? ও যে তোর বরের দাড়ি।" পরে আর সকলের দিকে ফিরিয়া রসবতী বলিল, "ঐ দাড়িতে একদিন একটা বিছা লুকাইয়াছিল—সই আমার ঝাড়ু দিয়া সেই বিছাটা মারিল।"

তখন হাসির বড় একটা গোল পড়িয়া গেল। চিত্রবিক্রেত্রী তখন আর একখানা ছবি দেখাইল। বলিল, "এখানা জাহাঁগীর বাদশাহের ছবি।"

দেখিয়া রসিকা যুবতী বলিল, "ইহার দাম কত?"

প্রাচীনা বড় দাম হাঁকিল।

রসিকা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "এ ত গেল ছবির দাম। আসল মানুষটা নুরজাঁহা বেগম কতকে কিনিয়াছিল?"

তখন প্রাচীনাও একটু রসিকতা করিল; বলিল, "বিনামূল্যে।"

রসিকা বলিল, "যদি আসলটার এই দশা, তবে নকলটা ঘরের কড়ি কিছু দিয়া আমাদিগকে দিয়া যাও।"

আবার একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল। প্রাচীনা বিরক্ত হইয়া চিত্রগুলি ঢাকিল। বলিল, "হাসিতে মা, তস্‌বীর কেনা যায় না। রাজকুমারী আসুন, তবে আমি তস্‌বীর দেখাইব। আর তাঁরই জন্য এ সকল আনিয়াছি।"

তখন সাত জন সাত দিক্ হইতে বলিল, "ওগো, আমি রাজকুমারী! ও আয়ি বুড়ী, আমি রাজকুমারী।" বৃদ্ধা ফাঁপরে পড়িয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল, আবার আর একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল।

অকস্মাৎ হাসির ধূম কম পড়িয়া গেল—গোলমাল একটু থামিল—কেবল তাকাতাকি, আঁচাআঁচি এবং বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত ওষ্ঠপ্রান্তে একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাসি। চিত্রস্বামিনী ইহার কারণ সন্ধান করিবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিছনে কে একখানি দেবীপ্রতিমা দাঁড় করাইয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধা অনিমেষলোচনে সেই সর্ব্বশোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনির্ম্মিতপ্রায় প্রতিমা পানে চাহিয়া রহিল—কি সুন্দর! বুড়ী বয়োদোষে একটু চোখে খাট, তত পরিষ্কার দেখিতে পায় না—তাহা না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ ত প্রস্তরের বর্ণ নহে; নির্জ্জীবের এমন সুন্দর বর্ণ হয় না। পাতর দূরে থাকুক, কুসুমেও এ চারুবর্ণ পাওয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা দেখিল যে, প্রতিমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। পুতুল কি হাসে! বুড়ী তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এ বুঝি পুতুল নয়—ঐ অতিদীর্ঘ কৃষ্ণতার, চঞ্চল, সজল, বৃহচ্চক্ষুর্দ্বয় তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

বুড়ী অবাক্ হইল—এর ওর তার মুখপানে চাহিতে লাগিল—কিছু ভাবিয়া ঠিক পাইল না। বিকলচিত্ত রসিকা রমণীমণ্ডলীর মুখপানে চাহিয়া বৃদ্ধা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "হাঁ গা, তোমরা বল না গা?"

এক সুন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না—রসের উৎস উছলিয়া উঠিল—হাসির ফোয়ারার মুখ আপনি ছুটিয়া গেল—যুবতী হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বলা বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন সেই প্রতিমা কথা কহিল। অতি মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, কাঁদিস্ কেন গো?"

তখন বুড়ী বুঝিল যে, এটা গড়া পুতুল নহে। আদত মানুষ—রাজমহিষী বা রাজকুমারী হইবে। বুড়ী তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম রাজকুলকে নহে—এ প্রণাম সৌন্দর্য্যকে। বুড়ী যে সৌন্দর্য্য দেখিল, তাহা দেখিয়া প্রণত হইতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চিত্রদলন

এই ভুবনমোহিনী সুন্দরী, যারে দেখিয়া চিত্রবিক্রেত্রী প্রণত হইল, রূপনগরের রাজার কন্যা চঞ্চলকুমারী। যাহারা এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিল, তাহারা

তাঁহার সখীজন এবং দাসী। চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, সেই রঙ্গ দেখিয়া নীরবে হাস্য করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রাচীনাকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?"

সখীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল। "উনি তস্‌বীর বেচিতে আসিয়াছেন।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "তা তোমরা এত হাসিতেছিলে কেন?"

কেহ কেহ কিছু কিছু অপ্রতিভ হইল। যিনি সহচরীকে ঝাড়ুদারি রসিকতাটা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আমাদের দোষ কি? আয়ি বুড়ী যত সেকেলে বাদশাহের তস্‌বীর আনিয়া দেখাইতেছিল—তাই আমরা হাসিতেছিলাম—আমাদের রাজা রাজড়ার ঘরে শাহজাঁহা বাদশাহ, কি জাহাঁগীর বাদশাহের তস্‌বীর কি নাই?"

বৃদ্ধা কহিল, "থাক্‌বে না কেন মা? একখানা থাকিলে কি আর একখানা নিতে নাই? আপনারা নিবেন না, তবে আমরা কাঙ্গাল গরীব প্রতিপালন হইব কি প্রকারে?"

রাজকুমারী তখন প্রাচীনার তস্‌বীর সকল দেখিতে চাহিলেন। প্রাচীনা একে একে তস্‌বীরগুলি রাজকুমারীকে দেখাইতে লাগিল। আক্‌বর বাদশাহ, জাহাঁগীর, শাহজহাঁ, নুরজহাঁ, নুরমহালের চিত্র দেখাইল। রাজকুমারী হাসিয়া হাসিয়া সকলগুলি ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "ইহারা আমাদের কুটুম্ব, ঘরে ঢের তস্‌বীর আছে। হিন্দুরাজার তস্‌বীর আছে?"

"অভাব কি?" বলিয়া প্রাচীনা, রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুত্রী তাহাও ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "এও লইব না। এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর।"

প্রাচীনা তখন হাসিয়া বলিল, "মা, কে কার চাকর, তা আমি ত জানি না। আমার যা আছে, দেখাই, পসন্দ করিয়া লও।"

প্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল। রাজকুমারী পসন্দ করিয়া রাণা প্রতাপ, রাণা অমরসিংহ, রাণা কর্ণ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি কয়খানি চিত্র ক্রয় করিলেন। একখানি বৃদ্ধা ঢাকিয়া রাখিল—দেখাইল না।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানি ঢাকিয়া রাখিলে যে?" বৃদ্ধা কথা কহে না। রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা ভীতা হইয়া করযোড়ে কহিল, "আমার অপরাধ লইবেন না—অসাবধানে ঘটিয়াছে—অন্য তস্‌বীরের সঙ্গে আসিয়াছে।"

রাজকুমারী বলিলেন, "অত ভয় পাইতেছ কেন ? এমন কাহার তস্‌বীর যে, দেখাইতে ভয় পাইতেছ ?"

বুড়ী। দেখিয়া কাজ নাই। আপনার ঘরের দুষ্‌মনের ছবি।

রাজকুমারী। কার তস্‌বীর ?

বুড়ী। (সভয়ে) রাণা রাজসিংহের।

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "বীরপুরুষ স্ত্রীজাতির কখনও শত্রু নহে। আমি ও তস্‌বীর লইব।"

তখন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাঁহার হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল ; লোচন বিস্ফারিত হইল। এক জন সখী, তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল—রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, "দেখ। দেখিবার যোগ্য বটে।"

সখীগণের হাতে হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল। রাজসিংহ যুবা পুরুষ নহে—তথাপি তাঁহার চিত্র দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা সুযোগ পাইয়া এই চিত্রখানিতে দ্বিগুণ মুনাফা করিল। তার পর লোভ পাইয়া বলিল, "ঠাকুরাণি ! যদি বীরের তস্‌বীর লইতে হয়, তবে আর একখানি দিতেছি। ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে ?"

এই বলিয়া বৃদ্ধা আর একখানি চিত্র বাহির করিয়া রাজপুত্রীর হাতে দিল।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার চেহারা ?"

বৃদ্ধা। বাদশাহ আলম্‌গীরের।

রাজকুমারী। কিনিব।

এই বলিয়া এক জন পরিচারিকাকে রাজপুত্রী ক্রীত চিত্রগুলির মূল্য আনিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারিকা মূল্য আনিতে গেল, ইত্যবসরে রাজপুত্রী সখীগণকে বলিলেন, "এসো, একটু আমোদ করা যাক্।"

রঙ্গপ্রিয়া বয়স্যাগণ বলিল, "কি আমোদ বল ! বল !"

রাজপুত্রী বলিলেন. "আমি এই আলম্‌গীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি। সবাই উহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি।"

ভয়ে সখীগণের মুখ শুকাইয়া গেল। এক জন বলিল, "অমন কথা মুখে আনিও না, কুমারীজী! কাক পক্ষীতে শুনিলেও, রূপনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না।"

হাসিয়া রাজপুত্রী চিত্রখানি মাটিতে রাখিলেন, "কে নাতি মারিবি মার্।"

কেহ অগ্রসর হইল না। নির্ম্মল নাম্নী এক জন বয়স্যা আসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "অমন কথা আর বলিও না।"

চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত বাম চরণখানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন—চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন—মড় মড় শব্দ হইল—ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুতকুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।

"কি সর্ব্বনাশ! কি করিলে!" বলিয়া সখীগণ শিহরিল।

রাজপুতকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "যেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনই মোগল বাদশাহের মুখে নাতি মারার সাধ মিটাইলাম।" তার পর নির্ম্মলের মুখ চাহিয়া বলিলেন, "সখি নির্ম্মল! ছেলেদের সাধ মিটে; সময়ে তাহাদের সত্যের ঘর সংসার হয়। আমার কি সাধ মিটিবে না? আমি কি কখন জীবন্ত ঔরঙ্গজেবের মুখে এইরূপ—"

নির্ম্মল, রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন, কথাটা সমাপ্ত হইল না—কিন্তু সকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীনার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল—এমন প্রাণসংহারক কথাবার্ত্তা যেখানে হয়, সেখান হইতে কতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইবে! এই সময়ে তাহার বিক্রীত তসবীরের মূল্য আসিয়া পৌঁছিল। প্রাপ্তিমাত্র প্রাচীনা উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সে ঘরের বাহিরে আসিলে, নির্ম্মল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিল। আসিয়া তাহার হাতে একটি আশরফি দিয়া বলিল, "আয়ি বুড়ী, দেখিও, যাহা শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে মুখে আনিও না। রাজকুমারীর মুখের আটক নাই—এখনও উঁহার ছেলে বয়স।"

বুড়ী আশরফিটি লইয়া বলিল, "তা এ কি আর বল্‌তে হয় মা! আমি তোমাদের দাসী—আমি কি আর এ সকল কথা মুখে আনি?"

নির্ম্মল সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চিত্রবিচারণ

পরদিন চঞ্চলকুমারী ক্রীত চিত্রগুলি একা বসিয়া মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলেন। নির্ম্মলকুমারী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া চঞ্চল বলিল, "নির্ম্মল! ইহার মধ্যে কাহাকেও তোমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে?"

নির্ম্মল বলিল, "যাহাকে আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার চিত্র ত তুমি পা দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ।"

চঞ্চল। ঔরঙ্গজেবকে!

নির্ম্মল। আশ্চর্য্য হইলে যে?

চঞ্চল। বদ্‌জাতের ধাড়ি যে? অমন পাষণ্ড যে আর পৃথিবীতে জন্মে নাই?

নির্ম্মল। বদ্‌জাতকে বশ করিতেই আমার আনন্দ। তোমার মনে নাই, আমি বাঘ পুষিতাম? আমি একদিন না একদিন ঔরঙ্গজেবকে বিবাহ করিব ইচ্ছা আছে।

চঞ্চল। মুসলমান যে?

নির্ম্মল। আমার হাতে পড়িলে ঔরঙ্গজেবও হিন্দু হবে।

চঞ্চল। তুমি মর।

নির্ম্মল। কিছুমাত্র আপত্তি নাই—কিন্তু ঐ একখানা কার ছবি তুমি পাঁচ বার করিয়া দেখিতেছ, সে খবরটা লইয়া তবে মরিব।

চঞ্চলকুমারী তখন আর পাঁচখানা চিত্রের মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে করস্থ চিত্রখানি মিশাইয়া দিয়া বলিল, "কোন্ ছবি আবার পাঁচ বার করিয়া দেখিতেছিলাম? মানুষে মানুষের একটা কলঙ্ক দিতে পারিলেই কি হয়? কোন্ ছবিখানা পাঁচ বার করিয়া দেখিতেছিলাম?"

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, "একখানা তস্‌বীর দেখিতেছিলে, তার আর কলঙ্ক কি? রাজকুমারি, তুমি রাগ করিলে বলিয়া আমার কাছে ধরা পড়িলে। কার এমন কপাল প্রসন্ন, তস্‌বীরগুলা দেখিলে আমি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি।"

চঞ্চলকুমারী। আকব্বর শাহের।

নির্ম্মল। আকব্বরের নামে রাজপুতনী ঝাড়ু মারে। তা ত নহেই।

এই বলিয়া নির্ম্মলকুমারী তস্‌বীরের গোছা হাতে লইয়া খুঁজিতে লাগিল। বলিল, "তুমি যেখানি দেখিতেছিলে, তাহার উল্‌টা পিঠে একটা কালো দাগ আছে দেখিয়াছি।"

সেই চিহ্ন ধরিয়া, নির্ম্মলকুমারী একখানা ছবি বাহির করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিল, বলিল, "এইখানি।"

চঞ্চলকুমারী রাগ করিয়া ছবিখানা ফেলিয়া দিল। বলিল, "তোর আর কিছু কাজ নেই, তাই তুই লোককে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করেছিস্। তুই দূর হ।"

নির্ম্মল। দূর হব না। তা, রাজকুঁওার! এ বুড়ার ছবিতে দেখিবার তুমি এত কি পেয়েছ?

চঞ্চল। বুড়ো! তোর কি চোখ গিয়েছে না কি?

নির্ম্মল চঞ্চলকে জ্বালাইতেছিল, চঞ্চলের রাগ দেখিয়া টিপি টিপি হাসিতে লাগিল। নির্ম্মল বড় সুন্দরী, মধুর সরস হাসিতে তাহার সৌন্দর্য্য বড় খুলিল। নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, "তা ছবিতে বুড়া না দেখাক্—লোকে বলে, মহারাণা রাজসিংহের বয়স অনেক হয়েছে। তাঁর তুই পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে।"

চঞ্চল। ও কি রাজসিংহের ছবি? তা অত কে জানে সখি?

নির্ম্মল। কাল কিনেছ—আজ কিছু জান না সখি? তা মানুষটার বয়সও হয়েছে, এমন যে খুব সুপুরুষ, তাও নয়। তবে দেখিতেছিলে কি?

চঞ্চল।

গৌরী সম্ঝে ভসমভোর,
পিয়ারী সম্ঝে কালা।
শচী সম্ঝে সহস্রলোচন,
বীর সম্ঝে বীরবালা॥

গঙ্গাগর্জ্জন শম্ভুজটপর,
ধরণী বৈঠত বাসুকীফণমে।
পবন হোয়ত অগুন-সখা,
বীর ভজত যুবতী মন্‌মে॥

নির্ম্মল। এখন, তুমি দেখিতেছি, আপনি মরিবার জন্য ফাঁদ পাতিলে। রাজসিংহকে ভজিলে, রাজসিংহকে কি কখন পাইতে পারিবে?

চঞ্চল। পাইবার জন্য কি ভজে? তুমি কি পাইবার জন্য ঔরঙ্গজেব বাদশাহকে ভজিয়াছ?

নির্ম্মল। আমি ঔরঙ্গজেবকে ভজিয়াছি, যেমন বেড়াল ইন্দুর ভজে। আমি যদি ঔরঙ্গজেবকে না পাই, তা নয় আমার বেড়ালখেলাটা এ জন্মের মত রহিয়া গেল। তোমারও কি তাই ?

চঞ্চল। আমারও না হয়, সংসারের খেলাটা এ জন্মের মত রহিয়া গেল।

নির্ম্মল। বল কি রাজকুমার ? ছবি দেখিয়া কি এত হয় ?

চঞ্চল। কিসে কি হয়, তা তুমি আমি কি জানি ? কি হইয়াছে, তাই কি জানি ?

আমরাও তাই বলি। চঞ্চলকুমারীর কি হইয়াছে, তা ত বলিতে পারি না। শুধু ছবি দেখিয়া কি হয়, তা ত জানি না। অনুরাগ ত মানুষে মানুষে—ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি ? পারে, যদি তুমি ছবিছাড়াটুকু আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার। পারে, যদি আগে হইতে মনে মনে তুমি কিছু গড়িয়া রাখিয়া থাক, তার পর ছবিখানাকে (বা স্বপ্নটাকে) সেই মনগড়া জিনিসের ছবি বা স্বপ্ন মনে কর। চঞ্চলকুমারীর কি তাই কিছু হইয়াছিল ? তা আঠার বছরের মেয়ের মন আমি কেমন করিয়া বুঝিব বা বুঝাইব ?

চঞ্চলকুমারীর মন যাই হোক্, মনের আগুনে এখন ফুঁ দিয়া সে ভাল করে নাই। কেন না, সম্মুখে বড় বিপদ্। কিন্তু সে সকল বিপদের কথা বলিতে আমাদের এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বুড়ী বড় সতর্ক

যে বুড়ী ছবি বেচিয়াছিল, সে ফিরিয়া বাড়ী আসিল। তাহার বাড়ী আগ্রা। সে চিত্রগুলি দেশে বিদেশে বিক্রয় করে। বুড়ী রূপনগর হইতে আগ্রা গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, তাহার পুত্র আসিয়াছে। তাহার পুত্র দিল্লীতে দোকান করে।

কুক্ষণে বুড়ী রূপনগরে চিত্র বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। চঞ্চলকুমারীর সাহসের কাণ্ড যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা কাহারও কাছে বলিতে না পাইয়া, বুড়ীর মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। যদি নির্ম্মলকুমারী তাহাকে পুরস্কার দিয়া কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া না দিত, তবে বোধ হয়, বুড়ীর মন এত ব্যস্ত না হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু যখন সে কথা প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ নিষেধ হইয়াছে, তখন বুড়ীর মন কাজে কাজেই কথাটি

বলিবার জন্য বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। বুড়ী কি করে, একে সত্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে হাত পাতিয়া মোহর লইয়া নিমক খাইয়াছে, কথা প্রকাশ পাইলেও দুরন্ত বাদশাহের হস্তে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাও বুঝিতেছে। হঠাৎ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিতে পারিল না। কিন্তু বুড়ীর আর দিবসে আহার হয় না—রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। শেষ আপনা আপনি শপথ করিল যে, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। তাহার পরেই তাহার পুত্র আহার করিতে বসিল—বুড়ী ছেলের সান্‌কির উপর একটু রসাল কাবাব তুলিয়া দিয়া বলিল, "খা! বাবাজান! খা খা লেও। য়ৈসা কাবাব রূপনগরসে আনেকে বক্‌ত এক রোজ বানা থা—ঔর কভী নেহিন্‌ বনা।"

ছেলে খাইতে খাইতে বলিল, "আম্মাজী! রূপনগরকা যো কেস্‌সা আপ্‌ ফরমায়েঙ্গে বোলী থী।"

মা বলিল, "চুপ্‌! বহ বাত্‌ মুহ্‌মে মৎ লও বাপ্‌জান্‌। মেয়্‌নে কিয়া বোলী থী? খেয়াল্‌মে বোলী থী শায়েদ্‌!"

বুড়ী এখন ভুলিয়া গিয়াছিল যে, পূর্ব্বে এক সময়ে চঞ্চলকুমারীর কথাটা তাহার উদরমধ্যে অত্যন্ত দংশন আরম্ভ করায়, তিনি পুত্রের সাক্ষাতে একটু উঃ আঃ করিয়াছিলেন। এবারকার উত্তর শুনিয়া ছেলে বলিল, "চুপ রহেঙ্গে কাহে মাজী? য়ৈসা কিয়া বাত্‌ হোগী?"

মা। শুন্‌নেকা মাফিক বাত্‌ নেহিন্‌ বাপ্‌জান্‌!

ছেলে। তব্‌ রহনে দিজিয়ে।

মা। ঔর কুছ্‌ নেহিন্‌, রূপনগরওয়ালী কুমারীন্‌কি বাত্‌।

ছেলে। বহ কুমারীন্‌ বড়া খুব্‌ সুরত? য়েহ য়ৈসা পুষিদা বাত্‌?

মা। সো নেহিন্‌—বাঁদীকি বড়া দেমাগ। ইয়া আল্লা! মেয়নে কিয়া বোল্‌ চুকা!

ছেলে। কাঁহা রূপনগর গড়, কাঁহা ওঁহাকা রাজকুমারীন্‌কি দেমাগ—ইয়ে বাত্‌ আপ্‌কা বোলনাই কিয়া জরুর্‌—হামারা শুননাই কিয়া জরুর?

মা। স্রেফ্‌ দেমাগ বাপ্‌জান্‌! লৌণ্ডীনে বাদ্‌শাহে আলম্‌কো নেহিন্‌ মান্‌তী!

ছেলে। বাদ্‌শাহে আলম্‌কো গালি দিই হোগী?

মা। গালি—বাপ্‌জান্‌! উস্‌সে ভী জবর কুছ!

ছেলে। উস্‌সে ভী জবর! কিয়া হো সক্‌তা? বাদশাহ আলম্‌কো ঔর মার সক্‌তা নাই!

মা। উস্‌সে ভী জবর।

ছেলে। মার্ সে ভী জবর ?

মা। বাপ্‌জান্—ঔর পুছিও মৎ—মেয়্‌নে উস্‌কী নিমক্ খাইন্।

ছেলে। নিমক্ খায়ে হো ! কিস্‌তরে মা ?

মা। আশরফি দিন্।

ছেলে। কাহে মাজী ?

মা। উস্‌কী গুনাহ্‌কে বাত কিসিকা পাস্ বোল্‌না মনাসেব নেহিন্, এস্ লিয়ে।

ছেলে। আচ্ছা বাত হৈ। মুঝ্‌কো একঠো আশরফি বখ্‌শিশ্ ফর্‌মাইয়ে।

মা। কাহে রে বেটা ?

ছেলে। নেহিন্ ত মুঝ্‌কো বোল দিজিয়ে বাত্‌ঠো কিয়া হৈ ?

মা। বাত্ ঔর কিয়া, বাদশাহকা তস্‌বীর—তোবা ! তোবা ! বাত্‌ঠো আব্‌ভী নিক্‌লী থী !

ছেলে। তস্‌বীর ভাঙ্গ্‌ডালা ?

মা। আরে বেটা, লাথ্‌সে ভাঙ্গ্‌ডালা ! তোবা ! মেয়্‌নে নিমকহারামী কর্ চুকা !

ছেলে। নিমকহারামী কিয়া হৈ ইস্‌মে,—তোম্ মা, মেয়্‌নে বেটা ! হামরা বোল্‌নেসে নিমকহারামী কিয়া হৈ ?

মা। দেখিও বাপ্‌জান্, কিস্‌ইকো বলিও মৎ।

ছেলে। আপ্ খাতেরজমা রহিয়ে—কিস্‌ইকা পাস্ নেহিন্ বোলেঙ্গে।

তখন বুড়ী বিলক্ষণ রসরঞ্জিত করিয়া চিত্রদলনের ব্যাপারটা সমস্ত বলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দরিয়া বিবি

বুড়ীর পুত্রের নাম খিজির সেখ। সে তস্‌বীর আঁকিত। দিল্লীতে তাহার দোকান। মার কাছে দুই দিন থাকিয়া, সে দিল্লী গেল। দিল্লীতে তাহার এক বিবি ছিল। সেই দোকানেই থাকিত। বিবির নাম ফতেমা। খিজির, মার কাছে রূপনগরের কথা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা সমস্তই ফতেমার কাছে বলিল। সমস্ত কথা বলিয়া, খিজির ফতেমাকে বলিল যে, "তুমি এখনই দরিয়া বিবির কাছে যাও। এই সংবাদ বেগম সাহেবাকে বেচিয়া আসিতে বলিও। কিছু পাওয়া যাইবে।"

দরিয়া বিবি, পাশের বাড়ীতেই বাস করে। ঘরের পিছন দিয়া যাওয়া যায়। অতএব ফতেমা বিবি, বেপরদা না হইয়াও, দরিয়া বিবির গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

খিজির বা ফতেমার বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু দরিয়া বিবির বিশেষ পরিচয় চাহি। দরিয়া বিবির আসল নাম, দরীর-উন্নিসা কি এমনই একটা কিছু, কিন্তু সে নাম ধরিয়া কেহ ডাকিত না—দরিয়া বিবি বলিয়াই ডাকিত। তার বাপ মা ছিল না, কেবল জ্যেষ্ঠা ভগিনী আর একটা বুড়ী ফুফু, কি খালা, কি এমনই একটা কি ছিল। বাড়ীতে পুরুষমানুষ কেহ বাস করিত না। দরিয়া বিবির বয়স সতের বৎসরের বেশী নহে—তাহাতে আবার কিছু খর্ব্বাকার, পনের বছরের বেশী দেখাইত না। দরিয়া বিবি বড় সুন্দরী, ফুটন্ত ফুলের মত, সর্ব্বদা প্রফুল্ল।

দরিয়া বিবির ভগিনী অতি উত্তম সুর্‌মা ও আতর প্রস্তুত করিতে পারিত। তাহাই বিক্রয় করিয়া তাহাদের দিনপাত হইত। আপনারা এক্কা বা দোলা করিয়া বড়মানুষের বাড়ী গিয়া বেচিয়া আসিত। দুঃখী মানুষ, রাত্রি হইলে পদব্রজেও যাইত। বাদশাহের অন্তঃপুরে কাহারও যাইবার অধিকার ছিল না—বাহিরের স্ত্রীলোকেরও না—কিন্তু দরিয়া বিবির সেখানে যাইবারও উপায় ছিল। তাহা পরে বলিতেছি।

ফতেমা আসিয়া দরিয়া বিবিকে চঞ্চলকুমারীর সংবাদ বলিল, এবং বলিয়া দিল যে, ঐ সংবাদ বিক্রয় করিয়া অর্থ আনিতে হইবে।

দরিয়া বিবি বলিল, "রঙ্‌মহালের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে—পরওয়ানাখানা কোথায়?"

ফতেমা বলিল, "তোমারই কাছে আছে।" দরিয়া বিবি তখন পেটারা খুলিয়া একখানা কাগজ বাহির করিল। তাহা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, "এইখানা বটে!"

দরিয়া বিবি তখন কিছু সুর্‌মা লইয়া ও পরওয়ানা লইয়া বাহির হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

নন্দনে নরক

প্রথম পরিচ্ছেদ

অদৃষ্টগণনা

জ্যোৎস্নালোকে, শ্বেত সৈকত-পুলিন-মধ্যবাহিনী নীলসলিলা যমুনার উপকূলে নগরী-গণপ্রধানা মহানগরী দিল্লী, প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে—সহস্র সহস্র মর্ম্মরাদিপ্রস্তরনির্ম্মিত মিনার গুম্বজ বুরুজ, উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে। অতিদূরে কুতবমিনারের বৃহচ্চূড়া, ধূমময় উচ্চস্তম্ভবৎ দেখা যাইতেছিল, নিকটে জুম্মা মস্‌জীদের চারি মিনার নীলাকাশ ভেদ করিয়া চন্দ্রলোকে উঠিয়াছে। রাজপথে রাজপথে পণ্যবীথিকা; বিপণিতে শত শত দীপমালা, পুষ্পবিক্রেতার পুষ্পরাশির গন্ধ, নাগরিকজন-পরিহিত পুষ্পরাজির গন্ধ, আতর গোলাবের সুগন্ধ, গৃহে গৃহে সঙ্গীতধ্বনি, বহুজাতীয় বাদ্যের নিক্কণ, নাগরীগণের কখন উচ্চ, কখন মধুর হাসি, অলঙ্কারশিঞ্জিত,—এই সমস্ত একত্রিত হইয়া, নরকে নন্দনকাননের ছায়ার ন্যায় অদ্ভুত প্রকার মোহ জন্মাইতেছে। ফুলেব ছড়াছড়ি, আতর গোলাবের ছড়াছড়ি,—নর্ত্তকীর নূপুরনিক্কণ, গায়িকার কণ্ঠে সপ্তসুরের আরোহণ অবরোহণ, বাদ্যের ঘটা, কমনীয়কামিনীকরতলকলিত তালের চটচটা; মদ্যের প্রবাহ, বিলোল কটাক্ষবহ্নিপ্রবাহ; খিচড়ী পোলাওয়ের রাশি রাশি; বিকট, কপট, মধুর, চতুর, চতুর্ব্বিধ হাসি; পথে পথে অশ্বের পদধ্বনি, দোলার বাহকের বীভৎস ধ্বনি, হস্তীর গলঘণ্টার ধ্বনি, এক্কার ঝন্‌ঝনি—শকটের ঘ্যান্‌ঘ্যানানি।

নগরের মধ্যে বড় গুল্‌জার, চাঁদনী চৌক। সেখানে রাজপুত বা তুর্কী অশ্বারূঢ় হইয়া স্থানে স্থানে পাহারা দিতেছে। জগতে যাহা কিছু মূল্যবান্, তাহা দোকান সকলে থরে থরে সাজান আছে। কোথাও নর্ত্তকী রাস্তায় লোক জমাইয়া, সারঙ্গের সুরে নাচিতেছে গায়িতেছে; কোথাও বাজিকর বাজি করিতেছে, প্রত্যেকের নিকট শত শত দর্শক ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছে। সকলের অপেক্ষা জনতা "জ্যোতিষী"দিগের কাছে। মোগল

বাদশাহদিগের সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের যেরূপ আদর ছিল, এমন বোধ হয়, আর কখনও হয় নাই। হিন্দু মুসলমানে তাঁহাদের তুল্য আদর করিতেন। মোগল বাদশাহেরা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অতিশয় বশীভূত ছিলেন; তাঁহাদিগের গণনা না জানিয়া অনেক সময়ে অতি গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। যে সকল ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে ঔরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র আকব্বর রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন। পঞ্চাশ হাজার রাজপুত সেনা তাঁহার সহায় ছিল; ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে অল্প সেনাই ছিল, কিন্তু জোতির্ব্বিদের গণনার উপর নির্ভর করিয়া আকব্বর সৈন্যযাত্রায় বিলম্ব করিলেন, ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব কৌশল করিয়া তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল করিলেন।

দিল্লীর চাঁদনী চৌকে, জ্যোতিষিগণ রাজপথে আসন পাতিয়া, পুথি পাঁজি লইয়া, মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিয়া বসিয়া আছেন—শত শত স্ত্রীপুরুষ আপন আপন অদৃষ্ট গণাইবার জন্য তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিয়া আছে; পরদানিশীন বিবিরাও মুড়ী সুড়ী দিয়া যাইতে সঙ্কোচ করেন নাই। এক জন জ্যোতিষীর আসনের চারি পাশে বড় জনতা। তাহার বাহিরে এক জন অবগুণ্ঠনবতী যুবতী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জ্যোতিষীর কাছে যাইবার ইচ্ছা, কিন্তু সাহস করিয়া জনতা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—ইতস্ততঃ দেখিতেছে। এমন সময়ে সেই স্থান দিয়া, এক জন অশ্বারোহী পুরুষ যাইতেছিল।

অশ্বারোহী যুবা পুরুষ। দেখিয়া আহেলে বিলায়ত মোগল বলিয়া বোধ হয়। তিনি অত্যন্ত সুশ্রী, মোগলের ভিতরও এরূপ সুশ্রী পুরুষ দুর্ল‍ভ। তাঁহার বেশভূষার অতিশয় পারিপাট্য। দেখিয়া এক জন বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বোধ হয়। অশ্বও সম্ভ্রান্তবংশীয়।

জনতার জন্য অশ্বারোহী অতি মন্দভাবে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। যে যুবতী ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছিল, সে তাঁহাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই, নিকটে আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থামাইল। বলিল, "খাঁ সাহেব—মবারক সাহেব—মবারক!"

মবারক—অশ্বারোহীর ঐ নাম—জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

যুবতী বলিল, "ইয়া আল্লা! আর কি চিনিতেও পার না?"

মবারক বলিল, "দরিয়া?"

দরিয়া বলিল, "জী।"

মবা। তুমি এখানে কেন?

দরিয়া। কেন, আমি ত সকল জায়গায় যাই। তোমার ত নিষেধ নাই। তুমি বারণ কর কি?

মবা। আমি কেন বারণ করিব? তুমি আমার কে?

তার পর মৃদুতর স্বরে মবারক বলিল, "কিছু চাই কি?"

দরিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া বলিল, "তোবা! তোমার টাকা আমার হারাম! আমরা আতর করিতে জানি।"

মবা। তবে আমাকে পাকড়া করিলে কেন?

দরিয়া। নাম, তবে বলিব।

মবারক ঘোড়া হইতে নামিল। বলিল, "এখন বল।"

দরিয়া বলিল, "এই ভিড়ের ভিতর এক জন জ্যোতিষী বসিয়া আছেন। ইনি নূতন আসিয়াছেন। ইহার মত জ্যোতির্ব্বিদ্ কখন নাকি আসে নাই। ইহার কাছে তোমাকে তোমার কেস্‌মৎ গণাইতে হইবে।"

মবা। আমার কেস্‌মৎ জানিয়া তোমার কি হইবে? তোমার গণাও।

দরিয়া। আমার কেস্‌মৎ আমি জানিতে চাহি না। না গণাইয়াই তাহা জানিতে পারিয়াছি। তোমার কেস্‌মৎ জানাই আমার দরকার।

এই বলিয়া দরিয়া, মবারকের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। মবারক বলিল, "আমার ঘোড়া ধরে কে?"

গোটাকত ছেলে রাজপথে দাঁড়াইয়া লাড্ডু খাইতেছিল। মবারক বলিল, "তোমরা কেহ এক লহমা আমার ঘোড়াটা ধরিয়া রাখ। আমি আসিয়া, তোমাদের আরও লাড্ডু দিব।"

এই বলিবামাত্র দুই তিনটা ছেলে আসিয়া ঘোড়া ধরিল। একটা প্রায় নগ্ন—সে ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিল। মবারক তাহাকে মারিতে গেলেন। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না—ঘোড়া একবার পিছনের পা উঁচু করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল। তাহাকে ভূমিশয্যাগত দেখিয়া, অপর বালকেরা তাহার হাতের লাড্ডু কাড়িয়া লইয়া ভোজন করিল। তখন মবারক নিশ্চিন্ত হইয়া অদৃষ্ট গণাইতে গেলেন।

মবারককে দেখিয়া অপর লোক সকল পথ ছাড়িয়া দিল। দরিয়া বিবি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। জ্যোতিষীর কাছে মবারক হাত পাতিয়া দিলেন। জ্যোতিষী অনেক দেখিয়া শুনিয়া বলিল, "আপনি গিয়া বিবাহ করুন।" পশ্চাৎ হইতে, ভিড়ের ভিতর লুকাইয়া দরিয়া বিবি বলিল, "করিয়াছে।"

জ্যোতিষী বলিল, "কে ও কথা বলিল?"

মবারক বলিলেন, "ও একটা পাগলী। আপনি বলিতে পারেন, আমার কি রকম বিবাহ হইবে ?"

জ্যোতিষী বলিল, "আপনি কোন রাজপুত্রীকে বিবাহ করুন।"

মবারক বলিল, "তাহা হইলে কি হইবে ?"

জ্যোতিষী উত্তর করিল, "তাহা হইলে, আপনার খুব পদবৃদ্ধি হইবে।"

ভিড়ের ভিতর হইতে দরিয়া বিবি বলিল, "আর মৃত্যু।"

জ্যোতিষী বলিল, "কে ও ?"

মবা। সেই পাগলী।

জ্যোতিষী। পাগলী নয়। ও বোধ হয় মনুষ্য নয়। আমি আর আপনার হাত দেখিব না।

মবারক কিছু বুঝিতে পারিলেন না। জ্যোতিষীকে কিছু দিয়া, ভিড়ের ভিতর দরিয়ার অন্বেষণ করিলেন। কিছুতেই আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন কিছু বিষণ্ণভাবে, অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক, দুর্গাভিমুখে চলিলেন। বলা বাহুল্য, বালকেরা কিছু লাড্ডু পাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জেব-উন্নিসা

দরিয়ার সংবাদবিক্রয়ের কি হইল ? সংবাদবিক্রয় আবার কি ? কাহাকেই বা বিক্রয় করিবে ? সে কথাটা বুঝাইবার জন্য, মোগলসম্রাটের অবরোধের কিছু পরিচয় দিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় মহিলারা রাজ্যশাসনে সুদক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। পশ্চিমে, কদাচিৎ একটা জেনোবিয়া, ইসাবেলা, এলিজাবেথ বা কাথারাইন পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক রাজকুলজারাই রাজ্যশাসনে সুদক্ষ। মোগলসম্রাট্‌দিগের কন্যাগণ এ বিষয়ে বড় বিখ্যাত। কিন্তু যে পরিমাণে তাহারা রাজনীতিবিশারদ, সেই পরিমাণে তাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ ও ভোগবিলাসপরায়ণ ছিল। ঔরঙ্গজেবের দুই ভগিনী, জাঁহানারা ও রৌশন্বারা। জাঁহানারা শাহজাঁহার বাদশাহীর প্রধান সহায়। শাহজাঁহা তাঁহার

পরামর্শ ব্যতীত কোন রাজকার্য্য করিতেন না ; তাঁহার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে সফল ও যশস্বী হইতেন। তিনি পিতার বিশেষ হিতৈষিণী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে এ সকল গুণবিশিষ্টা ছিলেন, ততোঽধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়পরায়ণা ছিলেন। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগৃহীত পাত্র ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে ইউরোপীয় পর্য্যটকেরা এমন ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না।

রৌশন্আরা পিতৃদ্বেষিণী, ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনিও জাঁহানারার মত রাজনীতিবিশারদ এবং সুদক্ষ ছিলেন, এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জাঁহানারার ন্যায় বিচারশূন্য, বাধাশূন্য এবং তৃপ্তিশূন্য ছিলেন। যখন পিতাকে পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ করিয়া, তাঁহার রাজ্য অপহরণে ঔরঙ্গজেব প্রবৃত্ত, তখন রৌশন্আরা তাঁহার প্রধান সহায়। ঔরঙ্গজেবও রৌশন্আরার বড় বাধ্য ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের বাদশাহীতে রৌশন্আরা দ্বিতীয় বাদশাহ ছিলেন।

কিন্তু রৌশন্আরার দুরদৃষ্টক্রমে তাঁহার একজন মহাশক্তিশালিনী প্রতিদ্বন্দ্বিনী তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিল। ঔরঙ্গজেবের তিন কন্যা। কনিষ্ঠা দুইটির সঙ্গে বন্দী ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের তিনি বিবাহ দিলেন। জ্যেষ্ঠা জেব-উন্নিসা * বিবাহ করিলেন না। পিতৃষ্বসাদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মত পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পিসী ভাইঝি উভয়ে অনেক স্থলেই, মদনমন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন। সুতরাং ভাইঝি পিসীকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পিসীর মহিমা তিনি পিতৃসমীপে বিবৃত করিতে লাগিলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে, রৌশন্আরা পৃথিবী হইতে অদৃশ্যা হইলেন, জেব-উন্নিসা তাঁহার পদমর্যাদা ও তাঁহার পদানতগণকে পাইলেন।

পদমর্য্যাদার কথা বলিলাম, তাহার একটু তাৎপর্য্য আছে। বাদশাহের অন্তঃপুরে খোজা ভিন্ন কোন পুরুষ প্রবেশ করিত না, অন্ততঃ করিবার নিয়ম ছিল না। অন্তঃপুরে পাহারার কাজের জন্য একটা স্ত্রীসেনা নিযুক্ত ছিল। যেমন হিন্দুরাজগণ যবনীগণকে প্রতিহারে নিযুক্ত করিতেন, মোগল বাদশাহেরাও তাই করিতেন। তাতারজাতীয়া সুন্দরীগণ মোগলসম্রাটের অবরোধে প্রহরিণী ছিলেন। এই স্ত্রীসৈন্যের একজন নায়িকা ছিলেন। তিনি সেনাপতির স্থানীয়া। তাঁহার পদ উচ্চ পদ বলিয়া গণ্য, এবং বেতন ও সম্মান তদনুযায়ী। এই পদে রৌশান্আরা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সহসা অপার্থিব অন্ধকারে অন্তর্হিত

* মুসলমান ইতিহাসে ইনি জেব-উন্নিসা বা জয়েব্-উন্নিসা নামে পরিচিতা। পাদ্রি কক্র বলেন, ইঁহার নাম কখর-উন্নিসা।

হইলে জেব-উন্নিসা তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যিনি এই পদে নিযুক্ত হইতেন, তিনি রাজান্তঃপুরের সর্ব্ববিষয়ের কর্ত্রী হইতেন। সুতরাং জেব-উন্নিসা রঙ্‌মহালের* সর্ব্বকর্ত্রী ছিলেন। সকলেই তাঁহার অধীন, প্রতিহারিগণ, খোজারা, বাঁদীরা, দৌবারিকগণ, বাহকগণ, পাচকগণ, সকলেই তাঁর অধীন। অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে মহাল মধ্যে আসিতে দিতে পারিতেন।

দুই শ্রেণীর লোক, তাঁহার কৃপায় অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিত; এক প্রণয়ভাজন ব্যক্তিগণ—অপর, যাহারা তাঁহার কাছে সংবাদ বেচিত।

বলিয়াছি, জেব-উন্নিসা একজন প্রধান politician। মোগলসাম্রাজ্যরূপ জাহাজের হাল, এক প্রকার তাঁর হাতে। তিনি মোগলসাম্রাজ্যের "নিয়ামক নক্ষত্র" বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। জানা আছে, "politician" সম্প্রদায়ের একটা বড় প্রয়োজন—সংবাদ। কোথায় কি হইতেছে, গোপনে সব জানা চাই। দুর্ম্মুখের মুনিব রামচন্দ্র হইতে বিস্‌মার্ক পর্য্যন্ত সকলেই ইহার প্রমাণ। জেব-উন্নিসা এ কথাটা বিলক্ষণ বুঝিতেন। চারি দিক্ হইতে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁর কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে তস্‌বীরওয়ালা খিজির একজন। তার মা, নানা দেশে তস্‌বীর বেচিতে যাইত। খিজির তাহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। দরিয়া বিবির ভগিনীও আতর ও সুর্‌মা বিক্রয়ের উপলক্ষে দিল্লীর ভিতর ভ্রমণ করিয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিত। এই সকল সংবাদ দরিয়া জেব-উন্নিসার কাছে দিয়া আসিত। জেব-উন্নিসা প্রতিবার কিছু কিছু পুরস্কার দিতেন। ইহাই সংবাদবিক্রয়। সংবাদবিক্রয়ার্থ দরিয়া মহাল মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা না পান, তজ্জন্য জেব-উন্নিসা তাঁহাকে একটা পরওয়ানা দিয়াছিলেন। পরওয়ানার মর্ম্ম এই, "দরিয়া বিবি সুর্‌মা বিক্রয়ের জন্য রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিতে পারে।"

কিন্তু দরিয়া বিবি রঙ্‌মহালে প্রবেশকালে হঠাৎ বিঘ্ন প্রাপ্ত হইল। দেখিল—মবারক খাঁ রঙ্‌মহাল মধ্যে প্রবেশ করিল। দরিয়া তখন প্রবেশ করিল না—একটু বিলম্ব করিয়া প্রবেশ করিল।

দরিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিল, যেখানে জেব-উন্নিসার বিলাসগৃহ, মবারক সেইখানে গেল। দরিয়া একটা বৃক্ষবাটিকার ছায়ার মধ্যে লুকাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

---

* বাদশাহের অন্তঃপুরকে রঙ্‌মহাল বা মহাল বলিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঐশ্বর্য্য নরক

দিল্লী মহানগরীর সারভূত দিল্লীর দুর্গ ; দুর্গের সারভূত রাজপ্রাসাদমালা। এই রাজপ্রাসাদমালার ভিতর, অল্প ভূমি মধ্যে যত ধনরাশি, রত্নরাশি, রূপরাশি, এবং পাপরাশি ছিল, সমস্ত ভারতবর্ষে তাহা ছিল না। রাজপ্রাসাদমালার সারভূত অন্তঃপুর বা রঙ্মহাল। ইহা কুবের ও কন্দর্পের রাজ্য,—চন্দ্র সূর্য্য তথা প্রবেশ করেন না ; যম গোপনে ভিন্ন তথায় যান না ; বায়ুরও গতিরোধ। তথায় গৃহ সকল বিচিত্র ; গৃহসজ্জা বিচিত্র ; অন্তঃপুরবাসিনী সকল বিচিত্র। এমন রত্নখচিত, ধবলপ্রস্তরনির্ম্মিত কক্ষরাজি কোথাও নাই ; এমন নন্দনকাননিন্দিনী উদ্যানমালা আর কোথাও নাই—এমন উর্ব্বশী মেনকা রম্ভার গর্ব্বখর্ব্বকারিণী সুন্দরীর সারি আর কোথাও নাই, এত ভোগবিলাস জগতে আর কোথাও নাই। এত মহাপাপ আর কোথাও নাই।

ইহার মধ্যে জেব-উন্নিসার বিলাসগৃহ আমাদের উদ্দেশ্য।

অতি মনোহর বিলাসগৃহ। শ্বেতকৃষ্ণ প্রস্তরের হর্ম্ম্যতল। শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত কক্ষ-প্রাচীর ; পাতরে রত্নের লতা, রত্নের পাতা, রত্নের ফুল, রত্নের ফল, রত্নের পাখি, রত্নের ভ্রমর। কিয়দ্দূর উর্দ্ধে সর্ব্বত্র দর্পণমণ্ডিত। তাহার ধারে ধারে সোনার কামদার বাঁট। উর্দ্ধে রূপার তারের চন্দ্রাতপ, তাহাতে মতির ছোট ঝালর ; এবং সদ্যোনিচিত পুষ্পরাশির বড় ঝালর। হর্ম্ম্যতলে নববর্ষাসমাগমোদ্গত কোমল তৃণরাজি অপেক্ষাও সুকোমল গালিচা পাতা ; তাহার উপর গজদন্তনির্ম্মিত রত্নালঙ্কৃত পালঙ্ক। তাহার উপর জরির কামদার বিছানায় জরির কামদার মখমলের বালিশ। শয্যার উপর বিবিধ পাত্রে রাশি রাশি সুগন্ধি পুষ্প, পাত্রে পাত্রে আতর গোলাপ ; সুগন্ধি, যত্নপ্রস্তুত তাম্বূলের রাশি। আর পৃথক্ সুবর্ণপাত্রে সুপেয় মদ্য। সকলের মধ্যে, পুষ্পরাশিকে, রত্নরাশিকে ম্লান করিয়া, প্রৌঢ়া সুন্দরী জেব-উন্নিসা, পানপাত্র হস্তে, বাতায়নপথে, নিশীথ নক্ষত্রশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, মৃদু পবনে পুষ্পমণ্ডিত মস্তক শীতল করিতেছিলেন, এমন সময়ে মবারক খাঁ তথায় উপস্থিত।

মবারক জেব-উন্নিসার নিকট গিয়া বসিলেন, এবং তাম্বূলাদি প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইলেন।

জেব-উন্নিসা বলিল, "না খুঁজিতে যে আসে, সেই ভাল বাসে।"

মবারক বলিল, "না ডাকিতে আসিয়াছি, বেআদবী হইয়াছে। কিন্তু ভিক্ষুক, না ডাকিতেই আসিয়া থাকে।"

জেব-উন্নিসা। তোমার কি ভিক্ষা প্রাণাধিক!

মবারক। ভিক্ষা এই যে, যেন মোল্লার হুকুমে ঐ শব্দে আমার অধিকার হয়।

জেব-উন্নিসা হাসিয়া বলিল, "ঐ সেই পুরাতন কথা! বাদশাহজাদীরা কখন বিবাহ করে?"

মবা। তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীগণ ত বিবাহ করিয়াছে।

জেব। তাহারা শাহজাদা বিবাহ করিয়াছে। বাদশাহজাদীরা শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ করে না। বাদশাহজাদী দুইশতী মন্‌সব্‌দার্‌কে কি বিবাহ করিতে পারে?

মবা। তুমি মালেকে মুলুক। তুমি বাদশাহকে যাহা বলিবে, তিনি তাহাই করিবেন, ইহা সর্ব্বলোকে জানে।

জেব। যাহা অনুচিত, তাহাতে আমি বাদশাহকে অনুরোধ করিব না।

মবা। আর এই কি উচিত, শাহজাদী?

জেব। এই কি?

মবা। এই মহাপাপ।

জেব। কে মহাপাপ করিতেছে?

মবারক মাথা হেঁট করিল। শেষ বলিল, "তুমি কি বুঝিতেছ না?"

জেব-উন্নিসা। যদি ইহা পাপ বলিয়া বোধ হয়, আর আসিও না।

মবারক সকাতরে বলিল, "আমার যদি সে সাধ্য থাকিত, তবে আমি আর আসিতাম না। কিন্তু আমি ঐ রূপরাশিতে বিক্রীত।"

জেব। যদি বিক্রীত—যদি তুমি আমার কেনা—তবে যা বলি, তাই কর। চুপ করিয়া থাক।

মবা। যদি আমি একাই এ পাপের দায়ী হইতাম, না হয় চুপ করিয়া থাকিতাম। কিন্তু আমি তোমাকে আপনার অধিক ভাল বাসি।

জেব-উন্নিসা উচ্চ হাসি হাসিল। বলিল, "বাদশাহজাদীর পাপ!"

মবারক বলিল, "পাপপুণ্য আল্লার হুকুম।"

জেব। আল্লা এ সকল হুকুম ছোটলোকের জন্য করিয়াছেন—কাফেরের জন্য। আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া, চিরকাল

দাসীত্ব করিয়া, শেষ আগুনে পুড়িয়া মরিব? আল্লা যদি আমার জন্য সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাহজাদী করিতেন না।"

মবারক একেবারে আকাশ হইতে পড়িল—এরূপ কদর্য্য কথা সে কখনও শুনে নাই। সেই পাপস্রোতোময়ী দিল্লীতেও কখনও শুনে নাই। অন্য কেহ এ কথা তাহার সম্মুখে বলিলে, সে বলিত, "তুমি বজ্রাহত হইয়া মর।" কিন্তু জেব-উন্নিসার রূপের সমুদ্রে সে ডুবিয়া গিয়াছিল—তাহার আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। সে কেবল বিস্মিত হইয়া রহিল।

জেব-উন্নিসা বলিতে লাগিল, "ও কথা যাক্। অন্য কথা আছে। ও কথা যেন আর কখনও না শুনি। শুনি যদি—"

মবারক। আমাকে ভয় দেখাইবার কি প্রয়োজন? আমি জানি, তুমি যাহার উপর অপ্রসন্ন হইবে, একদণ্ড তাহার কাঁধে মাথা থাকিবে না। কিন্তু ইহাও বোধ হয় তুমি জান যে, মবারক মৃত্যুকে ভয় করে না।

জেব-উন্নিসা। মরণের অপেক্ষা আর কি দণ্ড নাই?

মবা। আছে—তোমার বিচ্ছেদ।

জেব-উন্নিসা। বার বার অসঙ্গত কথা বলিলে তাহাই ঘটিতে পারে।

মবারক বুঝিলেন যে, একটা ঘটিলে দুইটাই ঘটিবে। তিনি যদি পাপিষ্ঠা বলিয়া জেব-উন্নিসাকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহাকে নিশ্চিত নিহত হইতে হইবে। জেব-উন্নিসা মোগল রাজ্যে সর্ব্বে সর্ব্বা। খোদ ঔরঙ্গজেব তাঁহার আজ্ঞাকারী। কিন্তু সে জন্য মবারক দুঃখিত নহেন। তাঁহার দুঃখ এই যে, তিনি বাদশাহজাদীর রূপে মুগ্ধ, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার কিছুমাত্র সাধ্য নাই; এই পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইবার তাঁহার শক্তি নাই।

অতএব মবারক বিনীত ভাবে বলিল, "আপনি ইচ্ছাক্রমে যতটুকু দয়া করিবেন, তাহাতেই আমার জীবন পবিত্র। আমি যে আরও দুরাকাঙ্ক্ষা রাখি,—তাহা দরিদ্রের ধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। কোন্ দরিদ্র না দুনিয়ার বাদশাহী কামনা করে?"

তখন প্রসন্ন হইয়া শাহজাদী মবারককে আসব পুরস্কার করিলেন। মধুর প্রণয়-সম্ভাষণের পর তাহাকে আতর ও পান দিয়া বিদায় করিলেন।

মবারক রংমহাল হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই, দরিয়া বিবি আসিয়া তাহাকে ধৃত করিল। অন্যের অশ্রাব্য স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হইল?"

মবারক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?"

দরিয়া। সেই দরিয়া!

মবা। দুষ্‌মন্‌! সয়তান্‌! তুই এখানে কেন?

দরিয়া। জান না, আমি সংবাদ বেচি?

মবারক শিহরিল। দরিয়া বিবি বলিল, "রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহ কি হইবে?"

মবা। রাজপুত্রী কে?

দরিয়া। শাহজাদী জেব-উন্নিসা বেগম সাহেবা। শাহজাদী কি রাজপুত্রী নহে?

মবা। আমি তোকে এইখানে খুন করিব।

দরিয়া। তবে আমি হাল্লা করি।

মবা। আচ্ছা, না হয়, খুন নাই করিলাম। তুই কার কাছে খবর বেচিতে আসিয়াছিস্‌ বল্‌।

দরিয়া। বলিব বলিয়াই দাঁড়াইয়া আছি। হজ্‌রৎ জেব-উন্নিসা বেগমের কাছে।

মবা। কি খবর বেচিবি?

দরিয়া। যে আজ তুমি বাজারে জ্যোতিষীর কাছে, আপনার কেস্‌মৎ জানিতে গিয়াছিলে। তাতে জ্যোতিষী তোমাকে শাহজাদী বিবাহ করিতে বলিয়াছে। তাহা হইলে তোমার তরক্কী হইবে।

মবা। দরিয়া বিবি! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমার উপর এই দৌরাত্ম্য করিতে প্রস্তুত?

দরিয়া। কি করিয়াছ? তুমি আমার কি না করিয়াছ? তুমি যাহা করিয়াছ, তার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অনিষ্ট কি আছে?

মবা। কেন পিয়ারি! আমার মত কত আছে।

দরিয়া। এমন পাপিষ্ঠ আর নাই।

মবা। আমি পাপিষ্ঠ নই। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া এত কথা চলিতে পারে না। স্থানান্তরে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমি সব বুঝাইয়া দিব।

এই বলিয়া মবারক আবার জেব-উন্নিসার কাছে ফিরিয়া গেল। জেব-উন্নিসাকে বলিল, "আমি পুনর্ব্বার আসিয়াছি, এ বেআদবী মাফ্‌ করিতে হইতেছে। বলিতে আসিয়াছি যে, দরিয়া বিবি হাজির আছে—এখনই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। সে পাগল। সে আপনার কাছে, আমার কোন নিন্দাবাদ করিলে আমার উত্তর না লইয়া আমার প্রতি আপনি কোপ করিবেন না।"

জেব-উন্নিসা বলিলেন, "তোমার উপর কোপ করিবার আমার সাধ্য নাই। যদি তোমার উপর কখন রাগ করি, তবে আমিই দুঃখ পাইব। তোমার নিন্দা আমি কাণে শুনি না।"

"এ দাসের উপর এইরূপ অনুগ্রহ চিরকাল রাখিবেন" এই বলিয়া মবারক পুনর্ব্বার বিদায় গ্রহণ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সংবাদবিক্রয়

যে তাতারী যুবতী, অসিচর্ম্ম হস্তে লইয়া, জেব-উন্নিসার গৃহের দ্বারে প্রহরায় নিযুক্ত, সে দরিয়াকে দেখিয়া বলিল, "এত রাত্রে কেন?"

দরিয়া বিবি বলিল, "তা কি পাহারাওয়ালীকে বলিব? তুই খবর দে।"

তাতারী বলিল, "তুই বেরো—আমি খবর দিব না।"

দরিয়া বলিল, "রাগ কর কেন, দোস্ত? তোমার নজরের লজ্জতেই কাবুল পঞ্জাব ফতে হয়, তার উপর আবার, হাতে ঢাল তরবার—তুমি রাগিলে কি আর চলে?—এই আমার পরওয়ানা দেখ—আর এত্তেলা কর।"

প্রহরিণী, রক্তাধরে একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমাকেও চিনি, তোমার পর্‌ওয়ানাও চিনি। তা এত রাত্রিতে কি আর হজ্‌রৎ বেগম সাহেবা সুর্‌মা কিনিবে? তুমি কাল সকালে এসো। এখন খসম থাকে, খসমের কাছে যাও—আর না থাকে যদি—"

দরিয়া। তুই জাহান্নামে যা। তোর ঢাল তরবার জাহান্নামে যাক্—তোর ওড়্‌না পায়জামা জাহান্নামে যাক্—তুই কি মনে করিস্, আমি রাত দুপুরের কাজ না থাকিলে, রাত দুপুরে এয়েছি?

তখন তাতারী চুপি চুপি বলিল, "হজরৎ বেগম সাহেবা এস্ বক্ত কুচ মজেমে হোয়েঙ্গী।"

দরিয়া বলিল, "আরে বাঁদী, তা কি আমি জানি না? তুই মজা করিবি? হাঁ কর্।"

তখন দরিয়া, ওড়্নার ভিতর হইতে এক সিসি সরাব বাহির করিল। প্রহরিণী হাঁ করিল—দরিয়া সিসি ভোর তার মুখে ঢালিয়া দিল—তাতারী শুষ্ক নদীর মত, এক নিশ্বাসে তাহা শুষিয়া লইল। বলিল, "বিস্‌মেল্লা! তৌফা শরবৎ! আচ্ছা, তুমি খাড়া থাক, আমি এত্তেলা করিতেছি।"

প্রহরিণী কক্ষের ভিতর গিয়া দেখিল, জেব-উন্নিসা হাসিতে হাসিতে ফুলের একটা কুকুর গড়িতেছেন,—মবারকের মত তার মুখটা হইয়াছে—আর বাদশাহদিগের সেরপেঁচ কলগার মত তার লেজটা হইয়াছে। জেব-উন্নিসা প্রহরিণীকে দেখিয়া বলিল, "নাচ্‌নেওয়ালী লোগ্‌কো বোলাও।"

রঙ্‌মহালের সকল বেগমদিগের আমোদের জন্য এক এক সম্প্রদায় নর্ত্তকী নিযুক্ত ছিল। ঘরে ঘরে নৃত্যগীত হইত। জেব-উন্নিসার প্রমোদার্থ একদল নর্ত্তকী ছিল।

প্রহরিণী পুনশ্চ কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "যো হুকুম্। দরিয়া বিবি হাজির, আমি তাড়াইয়া দিয়াছিলাম—মানা শুনিতেছে না।"

জেব। কিছু বখ্‌শিশও দিয়াছে?

প্রহরিণী সুন্দরী লজ্জিতা হইয়া ওড়্নায় আকর্ণ মুখ ঢাকিল। তখন জেব-উন্নিসা বলিল, "আচ্ছা, নাচ্‌নেওয়ালী থাক্—দরিয়াকে পাঠাইয়া দে।"

দরিয়া আসিয়া কুর্ণিশ করিল। তার পর ফুলের কুকুরটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিয়া বেগম সাহেবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হয়েছে দরিয়া?"

দরিয়া ফের কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "ঠিক মনসব্‌দার মবারক খাঁ সাহেবের মত হইয়াছে।"

জেব। ঠিক্! তুই নিবি?

দরিয়া। কোন্‌টা দিবেন? কুকুরটা, না মানুষটা?

জেব-উন্নিসা ভ্রূভঙ্গ করিল। পরে রাগ সামলাইয়া হাসিয়া বলিল, "যেটা তোর খুসী।"

দরিয়া। তবে কুকুরটা হজরৎ বেগম সাহেবার থাক্—আমি মানুষটা নিব।

জেব। কুকুরটা এখন হাতে আছে—মানুষটা এখন হাতে নাই। এখন কুকুরটাই নে।

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা আসবসেবনপ্রফুল্লচিত্তে যে ফুলে কুকুর গড়িয়াছিল, সেই ফুলগুলা দরিয়াকে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। দরিয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া ওড়্নায় তুলিল—নহিলে বেআদবী হইবে। তার পর সে বলিল, "আমি হুজুরের কৃপায় কুকুর মানুষ দুই পাইলাম।"

জেব। কিসে?

দ। মানুষটা আমার।

জেব। কিসে?

দ। আমার সঙ্গে সাদি হয়েছে।

জেব। নেকাল্ হিঁয়াসে।

জেব-উন্নিসা কতকগুলা ফুল ফেলিয়া সবলে দরিয়াকে প্রহার করিল।

দরিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, "মোল্লা গোওয়া সব জীবিত আছে। না হয় তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান।"

জেব-উন্নিসা ভ্রূভঙ্গ করিয়া বলিল, "আমার হুকুমে তাহারা শূলে যাইবে।"

দরিয়া কাঁপিল। এই ব্যাঘ্রী তুল্যা মোগল-কুমারীরা সব পারে, তা সে জানিত। বলিল, "শাহজাদী! আমি দুঃখী মানুষ, খবর বেচিতে আসিয়াছি—আমার সে সব কথার প্রয়োজন নাই।"

জেব। কি খবর—বল্।

দরিয়া। দুইটা আছে। একটা এই মবারক খাঁ সম্বন্ধে। আজ্ঞা না পাইলে বলিতে সাহস হয় না।

জেব। বল্।

দরিয়া। ইনি আজ রাত্রে চৌকে গণেশ জ্যোতিষীর কাছে আপনার কেস্‌মৎ গণাইতে গিয়াছিলেন।

জেব। জ্যোতিষী কি বলিল?

দরিয়া। শাহজাদী বিবাহ কর। তাহা হইলে তোমার তরক্কী হইবে।

জেব। মিছা কথা। মনসব্‌দার কখন্ জ্যোতিষীর কাছে গেল?

দরিয়া। এখানে আসিবার আগেই।

জেব। কে এখানে আসিয়াছিল?

দরিয়া একটু ভয় খাইল। কিন্তু তখনই আবার সাহস করিয়া তস্‌লীম্ দিয়া বলিল, "মবারক খাঁ সাহেব।"

জেব। তুই কেমন করিয়া জানিলি?

দরিয়া। আমি আসিতে দেখিয়াছি।

জেব। যে এ সকল কথা বলে, আমি তাহাকে শূলে দিই।

দরিয়া শিহরিল। বলিল, "বেগম সাহেবার হুজুরে ভিন্ন এ সকল কথা আমি মুখে আনি না।"

জেব। আনিলে, জল্লাদের হাতে তোমার জিব কাটাইয়া ফেলিব। তোর দোস্‌রা খবর কি বল্‌?

দরিয়া। দোস্‌রা খবর রূপনগরের।

দরিয়া তখন চঞ্চলকুমারীর তস্‌বীর ভাঙ্গার কাহিনীটা আদ্যোপান্ত শুনাইল। শুনিয়া জেবউন্নিসা বলিলেন, "এ খবর আচ্ছা। কিছু বখ্‌শিশ পাইবি।"

তখন রঙ্‌মহালের খাজনাখানার উপর বখ্‌শিশের পরওয়ানা হইল। পাইয়া দরিয়া পলাইল।

তাতারী প্রতিহারী তাহাকে ধরিল। তরবারিখানা দরিয়ার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল, "পালাও কোথা সখি?"

দ। কাজ হইয়াছে—ঘর যাইব।

প্রতিহারী। টাকা পাইয়াছ—আমায় কিছু দিবে না?

দ। আমার টাকার বড় দরকার, একটা গীত শুনাইয়া যাই। সারেঙ্গ আন।

প্রতিহারীর সারেঙ্গ ছিল—মধ্যে মধ্যে বাজাইত। রঙ্‌মহালে গীতবাদ্যের বড় ধূম। সকল বেগমের এক এক সম্প্রদায় নর্ত্তকী ছিল; যে অপরিণীতা গণিকাদিগের ছিল না, তাহারা আপনা আপনি সে কার্য্য সম্পন্ন করিত। রঙ্‌মহালে রাত্রিতে সুর লাগিয়াই ছিল। দরিয়া তাতারীর সারেঙ্গ লইয়া গান করিতে বসিল। সে অতিশয় সুকণ্ঠ; সঙ্গীতে বড় পটু। অতি মধুর গায়িল। জেব-উন্নিসা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গায়?"

প্রতিহারী বলিল, "দরিয়া বিবি।"

হুকুম হইল, "উহাকে পাঠাইয়া দাও।"

দরিয়া আবার জেব-উন্নিসার নিকট গিয়া কুর্ণিশ করিল। জেব-উন্নিসা বলিলেন, "গা। ঐ বীণ আছে।"

বীণ লইয়া দরিয়া গায়িল। গায়িল অতি মধুর। শাহজাদী অনেক অপ্সরোনিন্দিত, সঙ্গীতবিদ্যাপটু, গায়কগায়িকার গান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এমন গান কখন শুনেন নাই। দরিয়ার গীত সমাপ্ত হইলে, জেব-উন্নিসা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মবারকের কাছে কখন গায়িয়াছিলে?"

দরিয়া। আমার গীত শুনিয়াই তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

জেব-উন্নিসা একটা ফুলের তোর্‌রা ফেলিয়া দরিয়াকে এমন জোরে মারিলেন যে, দরিয়ার কর্ণভূষায় লাগিয়া, কাণ কাটিয়া রক্ত পড়িল। তখন জেব-উন্নিসা তাহাকে আরও কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। বলিলেন, "আর আসিস্ না।"

দরিয়া তস্‌লীম দিয়া বিদায় হইল। মনে মনে বলিল, "আবার আসিব—আবার জ্বালাইব—আবার মার খাইব—আবার টাকা নিব। তোমার সর্ব্বনাশ করিব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উদিপুরী বেগম

ঔরঙ্গজেব জগৎপ্রথিত বাদশাহ। তিনি জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। নিজেও বুদ্ধিমান্, কর্ম্মদক্ষ, পরিশ্রমী এবং অন্যান্য রাজগুণে গুণবান্ ছিলেন। এই সকল অসাধারণ গুণ থাকিতেও সেই জগৎপ্রথিতনামা রাজাধিরাজ, আপনার জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্য একপ্রকার ধ্বংস করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

ইহার একমাত্র কারণ, ঔরঙ্গজেব মহাপাপিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধূর্ত্ত, কপটাচারী, পাপে সঙ্কোচশূন্য, স্বার্থপর, পরপীড়ক, প্রজাপীড়ক দুই একজন মাত্র পাওয়া যায়। এই কপটাচারী সম্রাট্ জিতেন্দ্রিয়তার ভাণ করিতেন—কিন্তু অন্তঃপুর অসংখ্য সুন্দরীরাজিতে মধুমক্ষিকাপরিপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় দিবারাত্র আনন্দধ্বনিতে ধ্বনিত হইত।

তাঁহার মহিষীও অসংখ্য—আর সরার বিধানের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্যা বেতনভাগিনী বিলাসিনীও অসংখ্য। এই পাপিষ্ঠাদিগের সঙ্গে এই গ্রন্থের সম্বন্ধ বড় অল্প। কিন্তু কোন কোন মহিষীর সঙ্গে এই উপাখ্যানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

মোগল বাদশাহেরা যাঁহাকে প্রথম বিবাহ করিতেন, তিনিই প্রধানা মহিষী হইতেন। হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের দুর্ভাগ্যক্রমে একজন হিন্দুকন্যা তাঁহার প্রধানা মহিষী। আক্‌ব্বর বাদশাহ রাজপুত রাজগণের কন্যা বিবাহ করার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম অনুসারে, সকল বাদশাহেরই হিন্দুমহিষী ছিল। ঔরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম।

যোধপুরী বেগম প্রধানা মহিষী হইলেও প্রেয়সী মহিষী ছিলেন না। যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সী, সে একজন খ্রিষ্টিয়ানী; উদিপুরী নামে ইতিহাসে পরিচিতা। উদয়পুরের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া ইহার নাম উদিপুরী নহে। আসিয়া খণ্ডের দূরপশ্চিমপ্রান্তস্থিত যে জর্জ্জিয়া এখন রুষিয়া রাজ্যভুক্ত, তাহাই ইহার জন্মভূমি। বাল্যকালে একজন

দাসব্যবসায়ী ইহাকে বিক্রয়ার্থে ভারতবর্ষে আনে, ঔরঙ্গজেবের অগ্রজ দারা ইহাকে ক্রয় করেন। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অদ্বিতীয় রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠিল। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া দারা তাহার অত্যন্ত বশীভূত হইলেন। বলিয়াছি, উদিপুরী মুসলমান ছিল না, খ্রিষ্টিয়ান। প্রবাদ আছে যে, দারাও শেষে খ্রিষ্টিয়ান হইয়াছিলেন।

দারাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তবে ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে বসিতে পাইয়াছিলেন। দারাকে পরাস্ত করিয়া, ঔরঙ্গজেব প্রথমে তাহাকে বন্দী করিয়া, পরে বধ করেন। দারাকে বধ করিয়া নরাধম ঔরঙ্গজেব এক আশ্চর্য্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল। উড়িয়াদিগের কলঙ্ক আছে যে, বড় ভাই মরিলে ছোট ভাই বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করিয়া তাহার শোকাপনোদন করে। এই শ্রেণীর একজন উড়িয়াকে আমি একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোমরা এমন দুষ্কর্ম্ম কেন কর ?" সে ঝটিতি উত্তর করিল, "আজ্ঞে, ঘরের বৌ কি পরকে দিব ?" ভারতেশ্বর ঔরঙ্গজেবও বোধ হয়, সেইরূপ বিচার করিলেন। তিনি কোরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ইস্‌লাম্ ধর্ম্মানুসারে তিনি অগ্রজপত্নী বিবাহ করিতে বাধ্য। অতএব দারার দুইটি প্রাধান্য মহিষীকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী হইতে আহুত করিলেন। একটি রাজপুতকন্যা; আর একজন এই উদিপুরী মহাশয়া। রাজপুতকন্যা এই আজ্ঞা পাইয়া যাহা করিল, হিন্দুকন্যা মাত্রেই সেই অবস্থায় তাহা করিবে, কিন্তু আর কোন জাতীয়া কন্যা তাহা পারিবে না ;—সে বিষ খাইয়া মরিল। খ্রিষ্টিয়ানীটা সানন্দে ঔরঙ্গজেবের কণ্ঠলগ্না হইল। ইতিহাস এই গণিকার নাম কীর্ত্তিত করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন, আর যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য বিষ পান করিল, তাহার নাম লিখিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছেন। ইতিহাসের মূল্য এই।

উদিপুরীর যেমন অতুল্য রূপ, তেমনি অতুল্য মদ্যাসক্তি। দিল্লীর বাদশাহেরা মুসলমান হইয়াও অত্যন্ত মদ্যাসক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের পৌরবর্গ এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুগামী হইতেন। রঙ্‌মহালেও এ রঙ্গের ছড়াছড়ি! এই নরক মধ্যেও উদিপুরী নাম জাহির করিয়া তুলিয়াছিল।

জেব-উন্নিসা হঠাৎ উদিপুরীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না। কেন না, ভারতেশ্বরের প্রিয়তমা মহিষী মদ্যপানে প্রায় বিলুপ্তচেতনা ; বসনভূষণ কিছু বিপর্য্যস্ত, বাঁদীরা সজ্জা পুনর্বিন্যস্ত করিল, ডাকিয়া সচেতন ও সাবধান করিয়া দিল। জেব-উন্নিসা আসিয়া দেখিল, উদিপুরীর বাম হাতে সট্‌কা, নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত, অধরবান্ধুলীর উপর মাছি উড়িতেছে ; ঝটিকাবিচ্ছিন্ন ভূপতিত বৃষ্টিনিষিক্ত পুষ্পরাশির মত উদিপুরী বিছানায় পড়িয়া আছে।

জেব-উন্নিসা আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "মা! আপনার মেজাজ উত্তম ত?"

উদিপুরী অর্দ্ধজাগ্রতের স্বরে, রসনার জড়তার সহিত বলিল, "এত রাত্রে কেন?"

জে। একটা বড় খবর আছে।

উ। কি? মারহাট্টা ডাকু মরেছে?

জে। তারও অপেক্ষা খোশ খবর।

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা গুছাইয়া বাড়াইয়া রঙ ঢালিয়া দিয়া, চঞ্চলকুমারীর সেই তস্বীর ভাঙ্গার গল্পটা করিলেন। উদিপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "এ আর খোশ খবর কি?"

জেব-উন্নিসা বলিল, "এই মহিষের মত বাঁদীগুলা হজরতের তামাকু সাজে, আমি তাহা দেখিতে পারি না। রূপনগরের সেই সুন্দরী রাজকুমারী আসিয়া হজরতের তামাকু সাজিবে। বাদশাহের কাছে এই ভিক্ষা চাহিও।"

উদিপুরী না বুঝিয়া, নেশার ঝোঁকে বলিল, "বহৎ আচ্ছা।"

ইহার কিছু পরে রাজকার্য্যপরিশ্রমক্লান্ত বাদশাহ শ্রমাপনয়ন জন্য উদিপুরীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। উদিপুরী নেশার ঝোঁকে চঞ্চলকুমারীর কথা, জেব-উন্নিসার কাছে যেমন শুনিয়াছিল, তেমনই বলিল। "সে আসিয়া আমার তামাকু সাজিবে," এ প্রার্থনাও জানাইল। বলিবামাত্র ঔরঙ্গজেব শপথ করিয়া স্বীকার করিলেন। কেন না, ক্রোধে অস্থির হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যোধপুরী বেগম

পরদিন রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রূপনগরের ক্ষুদ্র রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি হইল। যে অদ্বিতীয় কুটিলতা-ভয়ে জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও আজিম শাহ প্রভৃতি শাহজাদাগণ সর্ব্বদা শশব্যস্ত—যে অভেদ্য কুটিলতাজালে বদ্ধ হইয়া চতুরাগ্রগণ্য শিবজীও দিল্লীতে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন—এই আজ্ঞাপত্র সেই কুটিলতাপ্রসূত। তাহাতে লিখিত হইল যে, "বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবৃত্তান্ত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রূপনগরের রাওসাহেবের সৎস্বভাব ও রাজভক্তিতে বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন। অতএব বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন। রাজা কন্যাকে দিল্লীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে থাকুন; শীঘ্র রাজসৈন্য আসিয়া কন্যাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবে।"

এই সংবাদ রূপনগরে আসিবামাত্র মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। রূপনগরে আর আনন্দের সীমা রহিল না। যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত রাজগণ মোগল বাদশাহকে কন্যা দান করা অতি গুরুতর সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সে স্থলে রূপনগরের ক্ষুদ্রজীবী রাজার অদৃষ্টে এই শুভ ফল বড়ই আনন্দের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হইল। বাদশাহের বাদশাহ—যাঁহার সমকক্ষ মনুষ্যলোকে কেহ নাই—তিনি জামাতা হইবেন,—চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন—ইহার অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? রাজা, রাজরাণী, পৌরজন, রূপনগরের প্রজাবর্গ আনন্দে মাতিয়া উঠিল। রাণী দেবমন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দিলেন; রাজা এই সুযোগে কোন্ ভূম্যধিকারীর কোন্ কোন্ গ্রাম কাড়িয়া লইবেন, তাহার ফর্দ্দ করিতে লাগিলেন।

কেবল চঞ্চলকুমারীর সখীজন নিরানন্দ। তাহারা জানিত যে, এ সম্বন্ধে মোগলদ্বেষিণী চঞ্চলকুমারীর সুখ নাই।

সংবাদটা অবশ্য দিল্লীতেও প্রচার পাইল। বাদশাহী রঙ্‌মহালে প্রচারিত হইল। যোধপুরী বেগম শুনিয়া বড় নিরানন্দ হইলেন। তিনি হিন্দুর মেয়ে, মুসলমানের ঘরে পড়িয়া ভারতেশ্বরী হইয়াও তাঁহার সুখ ছিল না। তিনি ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যেও আপনার হিন্দুয়ানি রাখিতেন। হিন্দুপরিচারিকা দ্বারা তিনি সেবিতা হইতেন; হিন্দুর পাক ভিন্ন ভোজন করিতেন না—এমন কি, ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যে হিন্দু দেবতার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। বিখ্যাত দেবদ্বেষী ঔরঙ্গজেব যে এতটা সহ্য করিতেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকেও একটু অনুগ্রহ করিতেন।

যোধপুরী বেগম এ সংবাদ শুনিলেন। বাদশাহের সাক্ষাৎ পাইলে, বিনীতভাবে বলিলেন, "জাঁহাপনা! যাহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজরাজেশ্বরগণ রাজ্যচ্যুত হইতেছে—এক সামান্যা বালিকা কি তাহার ক্রোধের যোগ্য?"

রাজেন্দ্র হাসিলেন—কিন্তু কিছু বলিলেন না। সেখানে কিছুই হইল না।

তখন যোধপুর-রাজকন্যা মনে মনে বলিলেন, "হে ভগবান্! আমাকে বিধবা কর! এ রাক্ষস আর অধিক দিন বাঁচিলে হিন্দুনাম লোপ হইবে।"

দেবী নামে তাঁহার একজন পরিচারিকা ছিল। সে যোধপুর হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন দেশছাড়া, এখন অধিক বয়সে, আর সে মুসলমানের পুরীর মধ্যে থাকিতে চাহে না। অনেক দিন হইতে সে বিদায় চাহিতেছিল, কিন্তু সে বড় বিশ্বাসী বলিয়া যোধপুরী তাহাকে ছাড়েন নাই। যোধপুরী আজ তাহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া

বলিলেন, "তুমি অনেক দিন হইতে যাইতে চাহিতেছ, আজ তোমাকে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু তোমাকে আমার একটি কাজ করিতে হইবে। কাজটি বড় শক্ত, বড় পরিশ্রমের কাজ, বড় সাহসের কাজ, আর বড় বিশ্বাসের কাজ। তাহার খরচ পত্র দিব, বখ্‌শিশ দিব, আর চিরকালের জন্য মুক্তি দিব। করিবে?"

দেবী বলিল, "আজ্ঞা করুন।"

যোধপুরী বলিলেন, "রূপনগরের রাজকুমারীর সংবাদ শুনিয়াছ। তাঁর কাছে যাইতে হইবে। চিঠি পত্র দিব না, যাহা বলিবে, আমার নাম করিয়া বলিবে, আর আমার এই পাঞ্জা দেখাইবে, তিনি বিশ্বাস করিবেন। ঘোড়ায় চড়িতে পার, ঘোড়ায় যাইবে। ঘোড়া কিনিবার খরচ দিতেছি।"

দেবী। কি বলিতে হইবে?

বেগম। রাজকুমারীকে বলিবে, হিন্দুর কন্যা হইয়া মুসলমানের ঘরে না আসেন। আমরা আসিয়া, নিত্য মরণ কামনা করিতেছি। বলিবে যে, তস্‌বীর ভাঙ্গার কথাটা বাদশাহ শুনিয়াছেন, তাঁকে সাজা দিবার জন্যই আনিতেছেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, রূপনগরওয়ালীকে দিয়া উদিপুরীর তামাকু সাজাইবেন। বলিও, বরং বিষ খাইও, তথাপি দিল্লীতে আসিও না।

"আরও বলিও, ভয় নাই। দিল্লীর সিংহাসন টলিতেছে। দক্ষিণে মারহাট্টা মোগলের হাড় ভাঙ্গিয়া দিতেছে। রাজপুতেরা একত্রিত হইতেছে। জেজিয়ার জ্বালায় সমস্ত রাজপুতানা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাজপুতানায় গোহত্যা হইতেছে। কোন্ রাজপুত ইহা সহিবে? সব রাজপুত একত্রিত হইতেছে। উদয়পুরের রাণা, বীর পুরুষ। মোগল তাতারের মধ্যে তাঁর মত কেহ নাই। তিনি যদি রাজপুতগণের অধিনায়ক হইয়া অস্ত্রধারণ করেন—যদি এক দিকে শিবজী, আর দিকে রাজসিংহ অস্ত্র ধরেন, তবে দিল্লীর সিংহাসন কয় দিন টিকিবে?"

দেবী। এমন কথা বলিও না, মা। দিল্লীর তক্ত, তোমার ছেলের জন্য আছে। আপনার ছেলের সিংহাসন ভাঙ্গিবার পরামর্শ আপনি দিতেছ?

বেগম। আমি এমন ভরসা করি না যে, আমার ছেলে এ তক্তে বসিবে। যত দিন রাক্ষসী জেব-উন্নিসা আর ডাকিনী উদিপুরী বাঁচিবে, তত দিন সে ভরসা করি না। একবার সে ভরসা করিয়া, রৌশন্‌আরার কাছে বড় মার খাইয়াছিলাম।* আজিও মুখে চোখে সে দাগ জখমের চিহ্ন আছে।

* কথাটা ঐতিহাসিক। রৌশন্‌আরা যোধপুরীর নাকমুখ ছিঁড়িয়া দিয়াছিল।

এইটুকু বলিয়া যোধপুরকুমারী একটু কাঁদিলেন। তার পর বলিলেন, "সে সব কথায় কাজ নাই। তুমি আমার সকল মতলব বুঝিবে না—বুঝিয়াই বা কি হইবে? যাহা বলি, তাই করিও। রাজকুমারীকে রাজসিংহের শরণ লইতে বলিও। রাজসিংহ রাজকুমারীকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। বলিও, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তিনি রাণার মহিষী হউন। মহিষী হইলে যেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, উদিপুরী তাঁর তামাকু সাজিবে—রৌশন্বারা তাঁকে পাখার বাতাস করিবে।"

দেবী। এও কি হয় মা?

বেগম। সে কথার বিচার তুমি করিও না। আমি যা বলিলাম, তা পারিবে কি না?

দেবী। আমি সব পারি।

বেগম তখন দেবীকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও পুরস্কার এবং পাঞ্জা দিয়া বিদায় করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খোদা শাহজাদী গড়েন কেন?

আবার জেব-উন্নিসার বিলাসমন্দিরে, মবারক রাত্রিকালে উপস্থিত। এবার মবারক, গালিচার উপর, জানু পাতিয়া উপবিষ্ট—যুক্তকর, ঊর্দ্ধমুখ। জেব-উন্নিসা সেই রত্নখচিত পালঙ্কে, মুক্তাপ্রবালের ঝালরযুক্ত শয্যায় জরির কামদার বালিশের উপর হেলিয়া, সুবর্ণের আলবোলায়, রত্নখচিত নলে, তামাকু সেবন করিতেছিল। পাশ্চাত্য মহাত্মগণের কৃপায়, তামাকু তখন ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

জেব-উন্নিসা বলিতেছেন, "সব ঠিক বলিবে?"

মবারক যুক্তকরে বলিল, "আজ্ঞা করিলেই বলিব।"

জেব। তুমি দরিয়াকে বিবাহ করিয়াছ?

মবা। যখন স্বদেশে থাকিতাম, তখন করিয়াছিলাম।

জেব। তাই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নেকা করিতে চাহিয়াছিলে?

মবা। আমি অনেক দিন হইল, উহাকে তাল্লাক্ দিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি।

জেব। কেন পরিত্যাগ করিয়াছ?

মবা। সে পাগল। অবশ্য তাহা আপনি বুঝিয়া থাকিবেন।

জেব। পাগল বলিয়া ত আমার কখনও বোধ হয় নাই।

মবা। সে আপনার কার্য্যসিদ্ধির জন্য হুজুরে হাজির হয়। কাজের সময়ে আমিও তাহাকে কখন পাগল দেখি নাই। কিন্তু অন্য সময়ে সে পাগল। আপনি তাহাকে খান্‌খা কোন দিন আনাইয়া দেখিবেন।

জেব। তুমি তাহাকে পাঠাইয়া দিতে পারিবে ? বলিও যে, আমার কিছু ভাল সুর্‌মার প্রয়োজন আছে।

মবা। আমি কাল প্রভাতে এখান হইতে দূরদেশে কিছু দিনের জন্য যাইব।

জেব। দূরদেশে যাইবে ? কৈ, সে কথা ত আমাকে কিছু বল নাই !

মবা। আজ সে কথা নিবেদন করিব ইচ্ছা ছিল।

জেব। কোথায় যাইবে ?

মবা। রাজপুতানায় রূপনগর নামে গড় আছে। সেখানকার রাও সাহেবের কন্যাকে মহিষী করিবার অভিপ্রায় শাহান্‌ শাহের মর্‌জি মবারকে হইয়াছে। কাল তাঁহাকে আনিবার জন্য রূপনগরে ফৌজ যাইবে। আমাকে ফৌজের সঙ্গে যাইতে হইবে।

জেব। সে বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে। কিন্তু আগে আর একটা কথার উত্তর দাও। তুমি গণেশ জ্যোতিষীর কাছে ভাগ্য গণাইতে গিয়াছিলে ?

মবা। গিয়াছিলাম।

জেব। কেন গিয়াছিলে ?

মবা। সবাই যায়, এইজন্য গিয়াছিলাম, এ কথা বলিলেই সঙ্গত উত্তর হয় ; কিন্তু তা ছাড়া আরও কারণ ছিল। দরিয়া আমাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

জেব। হুঁ !

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা কিছু কাল পুষ্পরাশি লইয়া ক্রীড়া করিল। তার পর বলিল, "তুমি গেলে কেন ?"

মবারক ঘটনাটা যথাযথ বিবৃত করিলেন। জেব-উন্নিসা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যোতিষী কি বলিয়াছিল যে, তুমি শাহজাদী বিবাহ কর, তাহা হইলে তোমার শ্রীবৃদ্ধি হইবে ?"

মবা। হিন্দুরা শাহজাদী বলে না। জ্যোতিষী, রাজপুত্রী বলিয়াছিল।

জেব। শাহজাদী কি রাজপুত্রী নয় ?

মবা। নয় কেন ?

জেব। তাই কি তুমি সে দিন বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলে?

মবা। আমি কেবল ধর্ম্ম ভাবিয়া সে কথা বলিয়াছিলাম। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, আমি গণনার পূর্ব্ব হইতে এ কথা বলিতেছি।

জেব। কৈ, আমার ত স্মরণ হয় না। তা যাক্—সে সকল কথাতে আর কাজ নাই। তোমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাতে তুমি গোসা করিও না। তোমার গোসায় আমার বড় দুঃখ হইবে। তুমি আমার প্রাণাধিক,—তোমাকে যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণ আমি সুখে থাকি। তুমি পালঙ্কের উপর আসিয়া বসো—আমি তোমাকে আতর মাখাই।

জেব-উন্নিসা তখন মবারককে পালঙ্কের উপর বসাইয়া স্বহস্তে আতর মাখাইতে লাগিল। তার পর বলিল, "এখন সেই রূপনগরের কথাটা বলিব। জানি না, রূপনগরীর পিতা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে কি না। ছাড়িয়া না দেয়, তবে কাড়িয়া লইয়া আসিবে।"

মবারক বলিল, "এরূপ আদেশ ত বাদশাহের নিকট আমরা পাই নাই।"

জেব। এ স্থলে আমাকেই না হয় বাদশাহ মনে করিলে? যদি বাদশাহের এরূপ অভিপ্রায় না হইবে, তবে ফৌজ যাইতেছে কেন?

মবা। পথের বিঘ্ননিবারণ জন্য।

জেব। আল্‌মগীর বাদশাহের ফৌজ যে কাজে যাইবে, সে কাজে তাহারা নিষ্ফল হইবে? তোমরা যে প্রকারে পার, রূপনগরীকে লইয়া আসিবে। বাদশাহ যদি তাহাতে নাখোশ হন, তবে আমি আছি।

মবা। আমার পক্ষে সেই হুকুমই যথেষ্ট। তবে, আপনার এরূপ অভিপ্রায় কেন হইতেছে, জানিতে পারিলে আমার বাহুতে আরও বল হয়।

জেব-উন্নিসা বলিল, "সেই কথাটাই আমি বলিতে চাহিতেছিলাম। এই রূপনগর-ওয়ালীকে আমার কৌশলেই তলব হইয়াছে।"

মবা। মতলব কি?

জেব। মতলব এই যে, উদিপুরীর রূপের বড়াই আর সহ্য হয় না। শুনিলাম, রূপনগরওয়ালী আরও খুব্‌সুরৎ। যদি হয়, তবে উদিপুরীর বদলে সেই বাদশাহের উপর প্রভুত্ব করিবে। আমি তাহাকে আনিতেছি, ইহা জানিলে, রূপনগরওয়ালী আমার বশীভূত থাকিবে। তা হ'লেই আমার একাধিপত্যের যে একটু কণ্টক আছে, তাহা দূর হইবে। তা, তুমি যাইতেছ, ভালই হইতেছে। যদি দেখ যে, সে উদিপুরী অপেক্ষা সুন্দরী—

মবা। আমি হজরৎ বেগম সাহেবাকে কখনও দেখি নাই।

জেব। দেখ ত দেখাইতে পারি—এই পর্‌দার আড়ালে লুকাইতে হইবে।

মবা। ছি!

জেব-উন্নিসা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "দিল্লীতে তোমার মত কয়টা বানর আছে? তা যাক্—আমি তোমায় যা বলি, শুন। উদিপুরী না দেখ, আমি তাহার তস্‌বীর দেখাইতেছি। কিন্তু রূপনগরীকে দেখিও। যদি তাহাকে উদিপুরীর অপেক্ষা সুন্দর দেখ, তবে তাহাকে জানাইবে যে, আমারই অনুগ্রহে সে বাদশাহের বেগম হইতেছে। আর যদি দেখ, সেটা দেখিতে তেমন নয়—"

জেব-উন্নিসা একটু ভাবিল। মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "যদি দেখি, দেখিতে ভাল নহে, তবে কি করিব?"

জেব। তুমি বড় বিবাহ ভালবাস; তুমি আপনি বিবাহ করিও। বাদশাহ যাহাতে অনুমতি দেন, তাহা আমি করিব।

মবা। অধমের প্রতি কি আপনার একটু ভালবাসাও নাই?

জেব। বাদশাহজাদীদের আবার ভালবাসা!

মবা। আল্লা তবে বাদশাহজাদীদিগকে কি জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন?

জেব। সুখের জন্য! ভালবাসা দুঃখ মাত্র।

মবারক আর শুনিতে ইচ্ছা করিল না। কথা চাপা দিয়া কহিল, "যিনি বাদশাহের বেগম হইবেন, তাঁহাকে আমি দেখিব কি প্রকারে?"

জেব। কোন কল কৌশলে।

মবা। শুনিলে বাদশাহ কি বলিবেন?

জেব। সে দায় দোষ আমার।

মবা। আপনি যা বলিবেন, তাই করিব। কিন্তু এ গরীবকে একটু ভালবাসিতে হইবে।

জেব। বলিলাম না যে, তুমি আমার প্রাণাধিক?

মবা। ভালবাসিয়া বলিয়াছেন কি?

জেব। বলিয়াছি, ভালবাসা গরিব দুঃখীর দুঃখ। শাহজাদীরা সে দুঃখ স্বীকার করে না।

মর্ম্মাহত হইয়া মবারক বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড

বিবাহে বিকল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ

বক ও হংসীর কথা

নির্ম্মল, ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী একা বসিয়া কাঁদিতেছেন। সে দিন যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহার একখানি রাজকুমারীর হাতে দেখিলেন। নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রখানি উল্টাইয়া রাখিলেন—কাহার চিত্র, নির্ম্মলের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। নির্ম্মল কাছে গিয়া বসিয়া, বলিল, "এখন উপায় ?"

চঞ্চল। উপায় যাই হউক—আমি মোগলের দাসী কখনই হইব না।

নির্ম্মল। তোমার অমত, তা ত জানি, কিন্তু আলমগীর বাদশাহের হুকুম, রাজার কি সাধ্য যে, অন্যথা করেন ? উপায় নাই, সখি!—সুতরাং তোমাকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর স্বীকার করা ত সৌভাগ্যের বিষয়। যোধপুর বল, অম্বর বল; রাজা, বাদশাহ, ওমরাহ, নবাব, সুবা যাহা বল, পৃথিবীতে এত বড় লোক কে আছে যে, তাহার কন্যা দিল্লীর তক্তে বসিতে বাসনা করে না ? পৃথিবীশ্বরী হইতে তোমার এত অসাধ কেন ?

চঞ্চল রাগ করিয়া বলিল, "তুই এখান হইতে উঠিয়া যা।"

নির্ম্মল দেখিল, ও পথে কিছু হইবে না। তবে আর কোন পথে রাজকুমারীর কিছু উপকার যদি করিতে পারে, তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। বলিল, "আমি যেন উঠিয়া গেলাম—কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছি, আমাকে তাঁহার হিত খুঁজিতে হয়। তুমি যদি দিল্লী না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হইবে, তাহা কি একবার ভাবিয়াছ ?"

চঞ্চল। ভাবিয়াছি। আমি যদি না যাই, তবে আমার পিতার কাঁধে মাথা থাকিবে না—রূপনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না। তা ভাবিয়াছি—আমি পিতৃহত্যা করিব না। বাদশাহের ফৌজ আসিলেই আমি তাহাদিগের সঙ্গে দিল্লীযাত্রা করিব। ইহা স্থির করিয়াছি।

নির্ম্মল প্রসন্ন হইল। বলিল, "আমিও সেই পরামর্শ ই দিতেছিলাম।"

রাজকুমারী আবার ভ্রূভঙ্গী করিলেন—বলিলেন, "তুই কি মনে করেছিস্ যে, আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব? হংসী কি বকের সেবা করে?"

নির্ম্মল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি করিবে?"

চঞ্চলকুমারী হস্তের একটি অঙ্গুরীয় নির্ম্মলকে দেখাইল; বলিল, "দিল্লীর পথে বিষ খাইব।" নির্ম্মল জানিত, ঐ অঙ্গুরীয়তে বিষ আছে।

নির্ম্মল বলিল, "আর কি কোন উপায় নাই?"

চঞ্চল বলিল, "আর উপায় কি সখি? কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে, আমায় উদ্ধার করিয়া দিল্লীশ্বরের সহিত শত্রুতা করিবে? রাজপুতানার কুলাঙ্গার সকলই মোগলের দাস—আর কি সংগ্রাম আছে, না প্রতাপ আছে?"

নির্ম্মল। কি বল রাজকুমারি! সংগ্রাম, কি প্রতাপ যদি থাকিত, তবে তাহারাই বা তোমার জন্য সর্ব্বস্বপণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করিবে কেন? পরের জন্য কেহ সহজে সর্ব্বস্বপণ করে না। প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই, রাজসিংহ আছে—কিন্তু তোমার জন্য রাজসিংহ সর্ব্বস্বপণ করিবে কেন? বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরাণা।

চঞ্চল। সে কি? বাহুতে বল থাকিলে কোন্ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা করে নাই? আমি তাই ভাবিতেছিলাম নির্ম্মল! আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম, প্রতাপের বংশতিলকেরই শরণ লইব—তিনি কি আমায় রক্ষা করিবেন না?

বলিতে বলিতে চঞ্চলদেবী ঢাকা ছবিখানি উল্টাইলেন—নির্ম্মল দেখিল, সে রাজসিংহের মূর্ত্তি। চিত্র দেখিয়া রাজকুমারী বলিতে লাগিলেন, "দেখ সখি, এ রাজকান্তি দেখিয়া তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে, ইনি অগতির গতি, অনাথার রক্ষক? আমি যদি ইহার শরণ লই, ইনি কি রক্ষা করিবেন না?"

নির্ম্মলকুমারী অতি স্থিরবুদ্ধিশালিনী—চঞ্চলের সহোদরাধিকা। নির্ম্মল অনেক ভাবিল। শেষে চঞ্চলের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারি! যে বীর তোমাকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে?"

রাজকুমারী বুঝিলেন। কাতর অথচ অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "কি দিব সখি! আমার কি আর দিবার আছে? আমি যে অবলা!"

নির্ম্মল। তোমার তুমিই আছ।

চঞ্চল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দূর হ!"

নির্ম্মল। তা রাজার ঘরে এমন হইয়া থাকে। তুমি যদি রুক্মিণী হইতে পার, যদুপতি আসিয়া অবশ্য উদ্ধার করিতে পারেন।

চঞ্চলকুমারী মুখাবনত করিল। যেমন সূর্য্যোদয়কালে মেঘমালার উপর আলোর তরঙ্গের পর উজ্জ্বলতর তরঙ্গ আসিয়া পলকে পলকে নূতন সৌন্দর্য্য উন্মেষিত করে, চঞ্চলকুমারীর মুখে তেমনই পলকে পলকে সুখের, লজ্জার, সৌন্দর্য্যের নবনবোন্মেষ হইতে লাগিল। বলিল, "তাঁহাকে পাইব, আমি কি এমন ভাগ্য করিয়াছি? আমি বিকাইতে চাহিলে তিনি কি কিনিবেন?"

নির্ম্মল। সে কথার বিচারক তিনি—আমরা নই। রাজসিংহের বাহুতে শুনিয়াছি, বল আছে; তাঁর কাছে কি দূত পাঠান যায় না? গোপনে—কেহ না জানিতে পারে, এরূপ দূত কি তাঁহার কাছে যায় না?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "তুমি আমার গুরুদেবকে ডাকিতে পাঠাও। আমায় আর কে তেমন ভালবাসে? কিন্তু তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া আমার কাছে আনিও। সকল কথা বলিতে আমার লজ্জা করিবে।"

এমন সময়ে সখীজন সংবাদ লইয়া আসিল যে, একজন মতিওয়ালী মতি বেচিতে আসিয়াছে। রাজকুমারী বলিলেন, "এখন আমার মতি কিনিবার সময় নহে। ফিরাইয়া দাও।" পুরবাসিনী বলিল, "আমরা ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই ফিরিল না। বোধ হইল যেন, তার কি বিশেষ দরকার আছে।" তখন অগত্যা চঞ্চলকুমারী তাহাকে ডাকিলেন।

মতিওয়ালী আসিয়া কতকগুলা ঝুটা মতি দেখাইল। রাজকুমারী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই ঝুটা মতি দেখাইবার জন্য তুমি এত জিদ্ করিতেছিলে?"

মতিওয়ালী বলিল, "না। আমার আরও দেখাইবার জিনিস আছে। কিন্তু তাহা আপনি একটু পুষিদা না হইলে দেখাইতে পারি না।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "আমি একা তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিব না; কিন্তু একজন সখী থাকিবে। নির্ম্মল থাক, আর সকলে বাহিরে যাও।"

তখন আর সকলে বাহিরে গেল। দেবী—সে মতিওয়ালী দেবী ভিন্ন আর কেহ না—যোধপুরী বেগমের পাঞ্জা দেখাইল। দেখিয়া, পড়িয়া চঞ্চলকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পাঞ্জা তুমি কোথায় পাইলে ?"

দেবী। যোধপুরী বেগম আমাকে দিয়াছেন।

চঞ্চল। তুমি তাঁর কে ?

দেবী। আমি তাঁর বাঁদী।

চঞ্চল। কেনই বা এ পাঞ্জা লইয়া এখানে আসিয়াছ ?

দেবী তখন সকল কথা বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া নির্ম্মল ও চঞ্চল পরস্পরের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন।

চঞ্চল, দেবীকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন।

দেবী যাইবার সময়ে যোধপুরীর পাঞ্জাখানি লইয়া গেল না। ইচ্ছাপূর্ব্বক রাখিয়া গেল। মনে করিল, "কোথায় ফেলিয়া দিব,—কে কুড়াইয়া নিবে!" এই ভাবিয়া দেবী চঞ্চলকুমারীর নিকট পাঞ্জা ফেলিয়া গেল। সে গেলে পর চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "নির্ম্মল! উহাকে ডাক ; সে পাঞ্জাখানা ফেলিয়া গিয়াছে!"

নির্ম্মল। ফেলিয়া যায় নাই—বোধ হইল যেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক রাখিয়া গিয়াছে।

চঞ্চল। আমি নিয়া কি করিব ?

নির্ম্মল। এখন রাখ, কোন সময়ে না কোন সময়ে যোধপুরীকে ফেরৎ দিতে পারিবে।

চঞ্চল। তা যাই হোক, বেগমের কথায় আমার বড় সাহস বাড়িল। আমরা দুইটি বালিকায় কি পরামর্শ করিতেছিলাম—তা ভাল, কি মন্দ—ঘটিবে কি না ঘটিবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এখন সাহস হইয়াছে। রাজসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল।

নির্ম্মল। সে ত অনেক কাল জানি।

এই বলিয়া নির্ম্মল হাসিল। চঞ্চলও মাথা হেঁট করিয়া হাসিল।

নির্ম্মল উঠিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনে কিছুমাত্র ভরসা হইল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনন্ত মিশ্র

অনন্ত মিশ্র, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুলপুরোহিত। কন্যানির্ব্বিশেষে, চঞ্চলকুমারীকে ভালবাসিতেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত। চঞ্চলের নাম করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি অন্তঃপুরে আসিলেন—কুলপুরোহিতের অবারিতদ্বার। পথিমধ্যে নির্ম্মল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল এবং সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিভূতিচন্দনবিভূষিত, প্রশস্তললাট, দীর্ঘকায়, রুদ্রাক্ষশোভিত, হাস্যবদন, সেই ব্রাহ্মণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নির্ম্মল দেখিয়াছিল যে, চঞ্চল কাঁদিতেছে, কিন্তু আর কাহারও কাছে চঞ্চল কাঁদিবার মেয়ে নহে। গুরুদেব দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরমূর্ত্তি। বলিলেন, "মা লক্ষ্মী,—আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন?"

চঞ্চল। আমাকে বাঁচাইবার জন্য। আর কেহ নাই যে, আমায় বাঁচায়।

অনন্ত মিশ্র হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, রুক্মিণীর বিয়ে, তাই পুরোহিত বুড়াকেই দ্বারকায় যেতে হবে। তা দেখ দেখি মা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কিছু আছে কি না—পথখরচটা জুটিলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব।"

চঞ্চল একটি জরির থলি বাহির করিয়া দিল। তাহাতে আশরফি ভরা। পুরোহিত পাঁচটি আশরফি লইয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "পথে অন্নই খাইতে হইবে—আশরফি খাইতে পারিব না। একটি কথা বলি, পারিবে কি?"

চঞ্চল বলিলেন, "আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলেও, আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাও পারি। কি আজ্ঞা করুন।"

মিশ্র। রাণা রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "আমি বালিকা—পুরস্ত্রী; তাঁহার কাছে অপরিচিতা—কি প্রকারে পত্র লিখি? কিন্তু আমি তাঁহার কাছে যে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহাতে লজ্জারই বা স্থান কই? লিখিব।"

মিশ্র। আমি লিখাইয়া দিব, না আপনি লিখিবে?

চঞ্চল। আপনি বলিয়া দিন।

নির্ম্মল সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "তা হইবে না। এ বামুনে বুদ্ধির কাজ নয়—এ মেয়েলি বুদ্ধির কাজ। আমরা পত্র লিখিব। আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন।"

মিশ্রঠাকুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গৃহে গেলেন না। রাজা বিক্রমসিংহের নিকট দর্শন দিলেন। বলিলেন, "আমি দেশপর্য্যটনে গমন করিব, মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।" কি জন্য কোথায় যাইবেন, রাজা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তথাপি তিনি যে উদয়পুর পর্য্যন্ত যাইবেন, তাহা স্বীকার করিলেন এবং রাণার নিকট পরিচিত হইবার জন্য একখানি লিপির জন্য প্রার্থিত হইলেন। রাজাও পত্র দিলেন।

অনন্ত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া চঞ্চলকুমারীর নিকট পুনরাগমন করিলেন। ততক্ষণ চঞ্চল ও নির্ম্মল দুই জনে দুই বুদ্ধি একত্র করিয়া একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল। পত্র শেষ করিয়া রাজনন্দিনী একটি কৌটা হইতে অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট মুক্তাবলয় বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "রাণা পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ আপনি এই রাখি বাঁধিয়া দিবেন। রাজপুতকুলের যিনি চূড়া, তিনি কখন রাজপুতকন্যার প্রেরিত রাখি অগ্রাহ্য করিবেন না।"

মিশ্রঠাকুর স্বীকৃত হইলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, বিদায় করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিশ্র ঠাকুরের নারায়ণস্মরণ

পরিধেয় বস্ত্র, ছত্র, যষ্টি, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, অনন্তমিশ্র গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদয়পুর যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, "কেন যাইবে?" মিশ্র ঠাকুর বলিলেন, "রাণার কাছে কিছু বৃত্তি পাইব।" গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইলেন; বিরহযন্ত্রণা আর তাঁহাকে দাহ করিতে পারিল না, অর্থলাভের আশাস্বরূপ শীতলবারিপ্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি বার কত ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া নিবিয়া গেল। মিশ্রঠাকুর ভৃত্য সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মনে করিলে

অনেক লোক সঙ্গে লইতে পারিতেন, কিন্তু অধিক লোক থাকিলে কাণাকাণি হয়, এজন্য লইলেন না।

পথ অতি দুর্গম—বিশেষ পার্ব্বত্য পথ বন্ধুর, এবং অনেক স্থানে আশ্রয়শূন্য। একাহারী ব্রাহ্মণ যে দিন যেখানে আশ্রয় পাইতেন, সে দিন সেখানে আতিথ্য স্বীকার করিতেন; দিনমানে পথ অতিবাহন করিতেন। পথে কিছু দস্যুভয় ছিল—ব্রাহ্মণের নিকট রত্নবলয় আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কদাপি একাকী পথ চলিতেন না। সঙ্গী জুটিলে চলিতেন। সঙ্গী ছাড়া হইলেই আশ্রয় খুঁজিতেন। একদিন রাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া, পরদিন প্রভাতে গমনকালে, তাঁহাকে সঙ্গী খুঁজিতে হইল না। চারি জন বণিক্ ঐ দেবালয়ের অতিথিশালায় শয়ন করিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া তাহারাও পার্ব্বত্যপথে আরোহণ করিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া উহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইবে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি উদয়পুর যাইব।" বণিকেরা বলিল, "আমরাও উদয়পুর যাইব। ভাল হইয়াছে, একত্রে যাই চলুন।" ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গী হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদয়পুর আর কত দূর?" বণিকেরা বলিল, "নিকট। আজ সন্ধ্যার মধ্যে উদয়পুর পৌঁছিতে পারিব। এ সকল স্থান রাণার রাজ্য।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা চলিতেছিল। পার্ব্বত্য পথ, অতিশয় দুরারোহণীয় এবং দুরবরোহণীয়, সচরাচর বসতিশূন্য। কিন্তু এই দুর্গম পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল—এখন সমতল ভূমিতে অবরোহণ করিতে হইবে। পথিকেরা এক অনির্ব্বচনীয় শোভাময় অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। দুই পার্শ্বে অনতি-উচ্চ পর্ব্বতদ্বয়, হরিত-বৃক্ষাদি-শোভিত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়াছে, উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্রা প্রবাহিণী নীলকাচপ্রতিম সফেন জলপ্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া বনাসের অভিমুখে চলিতেছে। তটিনীর ধার দিয়া মনুষ্যগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে। সেখানে নামিলে, আর কোন দিক্ হইতে কেহ পথিককে দেখিতে পায় না; কেবল পর্ব্বতদ্বয়ের উপর হইতে দেখা যায়।

সেই নিভৃত স্থানে অবরোহণ করিয়া, একজন বণিক্ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ঠাঁই টাকা কড়ি কি আছে?"

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন, বুঝি এখানে দস্যুর বিশেষ ভয়, তাই সতর্ক করিবার জন্য বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে। দুর্ব্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি থাকিবে?"

বণিক্ বলিল, "যাহা কিছু থাকে, আমাদের নিকট দাও। নহিলে এখানে রাখিতে পারিবে না।"

ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, রত্নবলয় রক্ষার্থ বণিক্‌দিগকে দিই; আবার ভাবিলেন, ইহারা অপরিচিত, ইহাদিগকেই বা বিশ্বাস কি? এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক, আমার কাছে কি থাকিবে?"

বিপৎকালে যে ইতস্ততঃ করে, সেই মারা যায়। ব্রাহ্মণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ছদ্মবেশী বণিকেরা বুঝিল যে, অবশ্য ব্রাহ্মণের কাছে বিশেষ কিছু আছে। একজন তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকে আঁটু দিয়া বসিল—এবং তাহার মুখে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল। মিশ্রঠাকুরের ভৃত্যটি তৎক্ষণাৎ কোন্ দিকে পলায়ন করিল, কেহ দেখিতে পাইল না। মিশ্রঠাকুর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া নারায়ণস্মরণ করিতে লাগিলেন। আর একজন, তাঁহার গাঁটরি কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর হইতে চঞ্চলকুমারীপ্রেরিত বলয়, দুইখানি পত্র, এবং আশরফি পাওয়া গেল। দস্যু তাহা হস্তগত করিয়া সঙ্গীকে বলিল, "আর ব্রহ্মহত্যা করিয়া কাজ নাই। উহার যাহা ছিল, তাহা পাইয়াছি। এখন উহাকে ছাড়িয়া দে।"

আর একজন দস্যু বলিল, "ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। ব্রাহ্মণ তাহা হইলে এখনই একটা গোলযোগ করিবে। আজকাল রাণা রাজসিংহের বড় দৌরাত্ম্য—তাঁহার শাসনে বীরপুরুষে আর অন্ন করিয়া খাইতে পারে না। উহাকে এই গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া যাই।"

এই বলিয়া দস্যুগণ মিশ্রঠাকুরের হস্ত পদ এবং মুখ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে দৃঢ়তর বাঁধিয়া, পর্ব্বতের সানুদেশস্থিত একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বাঁধিল। পরে চঞ্চল-কুমারীদত্ত রত্নবলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয়া ক্ষুদ্র নদীর তীরবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইয়া একজন অশ্বারোহী তাহাদিগকে দেখিল। তাহারা, অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল না, পলায়নে ব্যস্ত।

দস্যুগণ পার্ব্বতীয়া প্রবাহিণীর তটবর্ত্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি দুর্গম ও মনুষ্য-সমাগমশূন্য পথে চলিল। এইরূপ কিছু দূর গিয়া, এক নিভৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করিল।

গুহার ভিতর খাদ্য দ্রব্য, শয্যা, পাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত ছিল। দেখিয়া বোধ হয়, দস্যুগণ কখন কখন এই গুহামধ্যে লুকাইয়া বাস করে। এমন কি, কলসীপূর্ণ জল পর্য্যন্ত ছিল। দস্যুগণ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে লাগিল

এবং একজন পাকের উদ্যোগ করিতে লাগিল। একজন বলিল, "মাণিকলাল, রসুই পরে হইবে। প্রথমে মালের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহার মীমাংসা করা যাউক।"

মাণিকলাল বলিল, "মালের কথাই আগে হউক।"

তখন আশরফি কয়টি কাটিয়া চারি ভাগ করিল। এক একজন এক এক ভাগ লইল। রত্নবলয় বিক্রয় না হইলে ভাগ হইতে পারে না—তাহা সম্প্রতি অবিভক্ত রহিল। পত্র দুইখানি কি করা যাইবে, তাহার মীমাংসা হইতে লাগিল। দলপতি বলিলেন, "কাগজে আর কি হইবে—উহা পোড়াইয়া ফেল।" এই বলিয়া পত্র দুইখানি সে মাণিকলালকে অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিবার জন্য দিল।

মাণিকলাল কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে জানিত। সে পত্র দুইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল। বলিল, "এ পত্র নষ্ট করা হইবে না। ইহাতে রোজগার হইতে পারে।"

"কি? কি?" বলিয়া আর তিন জন গোলযোগ করিয়া উঠিল। মাণিকলাল তখন চঞ্চলকুমারীর পত্রের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া চোরেরা বড় আনন্দিত হইল।

মাণিকলাল বলিল, "দেখ, এই পত্র রাণাকে দিলে কিছু পুরস্কার পাইব।"

দলপতি বলিল, "নির্ব্বোধ! রাণা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা এ পত্র কোথায় পাইলে, তখন কি উত্তর দিবে? তখন কি বলিবে যে, আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি? রাণার কাছে পুরস্কারের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে। তাহা নহে—এ পত্র লইয়া গিয়া বাদশাহকে দিব—বাদশাহের কাছে এরূপ সন্ধান দিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যায়, আমি জানি। আর ইহাতে—"

দলপতি কথা সমাপ্ত করিতে অবকাশ পাইলেন না। কথা মুখে থাকিতে থাকিতে তাঁহার মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাণিকলাল

অশ্বারোহী পর্ব্বতের উপর হইতে দেখিল, চারি জনে একজনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আগে কি হইয়াছে, তাহা সে দেখে নাই, তখন সে পৌঁছে নাই। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিল, উহারা কোন্ পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাঁক ফিরিয়া পর্ব্বান্তরালে অদৃশ্য হইল, তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিল। পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, "বিজয়! এখানে থাকিও—আমি আসিতেছি—কোন শব্দ করিও না।" অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার আরোহী পাদচারে অতি দ্রুতবেগে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। পর্ব্বত যে বড় উচ্চ নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অশ্বারোহী পদব্রজে মিশ্রঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, অল্প কথায় বলুন।" মিশ্র বলিলেন, "চারি জনের সঙ্গে আমি একত্র আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি না—পথের আলাপ; তাহারা বলে 'আমরা বণিক্।' এইখানে আসিয়া তাহারা মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল, কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি লইয়া গিয়াছে?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "একগাছি মুক্তার বালা, কয়টি আশরফি, দুইখানি পত্র।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "আপনি এইখানে থাকুন। উহারা কোন্ দিকে গেল, আমি দেখিয়া আসি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি প্রকারে? তাহারা চারিজন, আপনি একা।"

আগন্তুক বলিল, "দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক।"

অনন্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধব্যবসায়ী বটে। তাহার কোমরে তরবারি এবং পিস্তল, এবং হস্তে বর্শা। তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না।

রাজপুত, যে পথে দস্যুগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে, অতি সাবধানে তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, অথবা দস্যুদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন যে, দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, চারি জনে

যাইতেছে। সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায়। দেখিলেন, কিছু পরে উহারা একটা পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেল না। তখন রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উহারা হয় ঐখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে—বৃক্ষাদির জন্য দেখা যাইতেছে না; নয়, ঐ পর্ব্বততলে গুহা আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত, বৃক্ষাদি চিহ্ন দ্বারা সেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সেই সকল চিহ্নলক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্ব্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্ব্বততলে একটি গুহা আছে। গুহামধ্যে মনুষ্যের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন।

এই পর্য্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। উহারা চারি জন—তিনি একা; এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি না? যদি গুহাদ্বার রোধ করিয়া উহারা চারি জনে তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম করে, তবে তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ কথা রাজপুতের মনে বড় অধিকক্ষণ স্থান পাইল না—মৃত্যুভয় আবার ভয় কি? মৃত্যুভয়ে রাজপুত কোন কার্য্য হইতে বিরত হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহার হস্তে দুই একজন অবশ্য মরিবে, যদি উহারা সেই দস্যুদল না হয়? তবে নিরপরাধীর হত্যা হইবে।

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দস্যুরা তখন অপহৃত সম্পত্তির বিভাগের কথা কহিতেছিল। শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, উহারা দস্যু বটে। রাজপুত তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।

ধীরে ধীরে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন। পরে অসি নিষ্কোষিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়-মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বাম হস্তে পিস্তল লইলেন। দস্যুরা যখন চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিমুগ্ধ হইয়া অন্যমনস্ক ছিল, সেই সময়ে রাজপুত অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃঢ়মুষ্টিধৃত তরবারি দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল যে, এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই দ্বিতীয় একজন দস্যু, যে দলপতির কাছে বসিয়াছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মস্তকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন যে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে

পড়িল। রাজপুত, অন্য দুই জনের উপর দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন ; সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাণিকলাল, বেগতিক দেখিয়া, গুহাদ্বারপথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে, রাজপুত যে বর্শা বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল, তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত হউন, নহিলে এই বর্শায় বিদ্ধ করিব।"

রাজপুত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে বর্শা মারিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি উহা বাম হস্তে ধরিতাম। কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে না—এই দেখ।" এই কথা বলিতে না বলিতে রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিস্তল দস্যুর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন ; দারুণ প্রহারে তাহার হাতের বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়া, মাণিকলালের চুল ধরিলেন, এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন।

মাণিকলাল তখন কাতরস্বরে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! আমার জীবনদান করুন—রক্ষা করুন—আমি শরণাগত!"

রাজপুত তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন। বলিলেন, "তুই মরিতে এত ভীত কেন?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে ; সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই—কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে। আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।"

দস্যু কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজাধিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর কখনও দস্যুতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব। আর যদি জীবন থাকে, একদিন না একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।"

রাজপুত বলিলেন, “তুমি আমাকে চেন ?”

দস্যু বলিল. “মহারাণা রাজসিংহকে কে না চিনে ?”

তখন রাজসিংহ বলিলেন, “আমি তোমার জীবন দান করিলাম। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্ম্মে পতিত হইব।”

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, “মহারাজাধিরাজ! এ পাপে আমি নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘু দণ্ডেরই বিধান করুন। আমি আপনার সম্মুখেই শাস্তি লইতেছি।”

এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া, অবলীলাক্রমে আপনার তর্জ্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিয়া, অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া, ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া, আর একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্যু বলিল, “মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।”

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, “ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি ?”

দস্যু বলিল, “এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুতকুলের কলঙ্ক।”

রাজসিংহ বলিলেন, “মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, এক্ষণে তুমি অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইলে—তোমার কন্যা লইয়া উদয়পুরে যাও; তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও।”

মাণিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিতি করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহৃত মুক্তাবলয়, পত্র দুইখানি এবং আশরফি চারি ভাগ আনিয়া দিল। বলিল, “ব্রাহ্মণের যাহা আমরা কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। পত্র দুইখানি আপনারই জন্য। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।”

রাণা পত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই নামাঙ্কিত শিরোনামা। বলিলেন, “মাণিক-লাল—পত্র পড়িবার এ স্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস—তোমরা পথ জান, পথ দেখাও।”

মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাণা দেখিলেন যে, দস্যু একবারও তাহার ক্ষত ও আহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না বা তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলিতেছে না—

বা একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীঘ্রই বন হইতে বেগবতী ক্ষীণা তটিনীতীরে এক সুরম্য নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চঞ্চলকুমারীর পত্র

তথায়, উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীরব সঙ্গে সুমন্দ মধুর বায়ু, এবং স্বরলহরী-বিকীর্ণকারী কুঞ্জবিহঙ্গমগণধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে বন্য কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া, পার্ব্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে। তথায়, রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে, এবং মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে। এইখানে রাজসিংহ এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া পত্র দুইখানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম রাজা বিক্রমসিংহের পত্র পড়িলেন। পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—মনে করিলেন, ব্রাহ্মণকে কিছু দিলেই পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তার পর চঞ্চলকুমারীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্র এইরূপ ;—

"রাজন্—আপনি রাজপুত-কুলের চূড়া—হিন্দুর শিরোভূষণ। আমি অপরিচিতা হীনমতি বালিকা—নিতান্ত বিপন্না না হইলে কখনই আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করিতাম না। নিতান্ত বিপন্না বুঝিয়াই আমার এ দুঃসাহস মার্জ্জনা করিবেন।

"যিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমার গুরুদেব। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন—আমি রাজপুতকন্যা। রূপনগর অতি ক্ষুদ্র রাজ্য—তথাপি বিক্রমসিংহ সোলাঙ্কি রাজপুত—রাজকন্যা বলিয়া আমি মধ্যদেশাধিপতির কাছে গণ্যা না হই—রাজপুতকন্যা বলিয়া দয়ার পাত্রী। কেন না, আপনি রাজপুতপতি—রাজপুতকুল-তিলক।

"অনুগ্রহ করিয়া আমার বিপদ্ শ্রবণ করুন। আমার দুরদৃষ্টক্রমে, দিল্লীর বাদশাহ আমার পাণিগ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য, আমাকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্য আসিবে। আমি রাজপুতকন্যা, ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবা—কি প্রকারে তাহাদের দাসী হইব? রাজহংসী হইয়া কেমন করিয়া বকসহচরী হইব? হিমালয়নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পঙ্কিল তড়াগে মিশাইব? রাজকুমারী হইয়া কি প্রকারে তুরকী বর্ব্বরের

আজ্ঞাকারিণী হইব ? আমি স্থির করিয়াছি, এ বিবাহের অগ্রে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ করিব।

"মহারাজাধিরাজ ! আমাকে অহঙ্কৃতা মনে করিবেন না। আমি জানি যে, আমি ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর কন্যা—যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজাধিরাজগণও দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান করা কলঙ্ক মনে করেন না—কলঙ্ক মনে করা দূরে থাক, বরং গৌরব মনে করেন। আমি সে সব ঘরের কাছে কোন্ ছার ? আমার এ অহঙ্কার কেন, এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু মহারাজ ! সূর্য্যদেব অস্তে গেলে খদ্যোত কি জ্বলে না ? শিশিরভরে নলিনী মুদ্রিত হইলে, ক্ষুদ্র কুন্দকুসুম কি বিকশিত হয় না ? যোধপুর অম্বর কুলধ্বংস করিলে রূপনগরে কি কুলরক্ষা হইতে পারে না ? মহারাজ, ভাটমুখে শুনিয়াছি যে, বনবাসী রাণা প্রতাপের সহিত মহারাজ মানসিংহ ভোজন করিতে আসিলে, মহারাণা ভোজন করেন নাই ; বলিয়াছিলেন, "যে তুর্ককে ভগিনী দিয়াছে, তাহার সহিত ভোজন করিব না।" সেই মহাবীরের বংশধরকে কি আমায় বুঝাইতে হইবে যে, এই সম্বন্ধ রাজপুতকুলকামিনীর পক্ষে ইহলোক পরলোকে ঘৃণাস্পদ ? মহারাজ ! আজিও আপনার বংশে তুর্ক বিবাহ করিতে পারিল না কেন ? আপনারা বীর্য্যবান্ মহাবলাক্রান্ত বংশ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নহে। মহাবলপরাক্রান্ত রুমের বাদশাহ কিংবা পারস্যের শাহ দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান গৌরব মনে করেন। তবে উদয়পুরেশ্বর কেবল তাহাকে কন্যাদান করেন না কেন ? তিনি রাজপুত বলিয়া। আমিও সেই রাজপুত। মহারাজ ! প্রাণত্যাগ করিব, তবু কুল রাখিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

"প্রয়োজন হইলে প্রাণবিসর্জ্জন করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ; কিন্তু তথাপি এই অষ্টাদশ বৎসর বয়সে, এ অভিনব জীবন রাখিতে বাসনা হয়। কিন্তু কে এ বিপদে এ জীবন রক্ষা করিবে ? আমার পিতার ত কথাই নাই, তাঁহার এমন কি সাধ্য যে, আলম্গীরের সঙ্গে বিবাদ করেন ? আর যত রাজপুত রাজা ছোট হউন, বড় হউন, সকলেই বাদশাহের ভৃত্য—সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিতকলেবর। কেবল আপনি—রাজপুতকুলের একা প্রদীপ—কেবল আপনিই স্বাধীন—কেবল উদয়পুরেশ্বরই বাদশাহের সমকক্ষ। হিন্দুকুলে আর কেহ নাই যে,—এই বিপন্না বালিকাকে রক্ষা করে—আমি আপনার শরণ লইলাম—আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না ?

"কত বড় গুরুতর কার্য্যে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, তাহা আমি না জানি, এমত নহে। আমি কেবল বালিকাবুদ্ধির বশীভূতা হইয়া লিখিতেছি, এমত নহে।

দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ সহজ নহে জানি। এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই যে, তাহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিষ্ঠিতে পারে। কিন্তু মহারাজ! মনে করিয়া দেখুন, মহারাণা সংগ্রামসিংহ বাবরশাহকে প্রায় রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ আকবরশাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আপনি সেই সিংহাসনে আসীন—আপনি সেই সংগ্রামের, সেই প্রতাপের বংশধর—আপনি কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা হীনবল? শুনিয়াছি না কি, মহারাষ্ট্রে এক পার্ব্বতীয় দস্যু আলমগীরকে পরাভূত করিয়াছে—সে আলমগীর কি রাজস্থানের রাজেন্দ্রের কাছে গণ্য?

"আপনি বলিতে পারেন, 'আমার বাহুতে বল আছে—কিন্তু থাকিলেও আমি তোমার জন্য কেন এত কষ্ট করিব? আমি কেন অপরিচিতা মুখরা কামিনীর জন্য প্রাণিহত্যা করিব?—ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইব?' মহারাজ! সর্ব্বস্বপণ করিয়া শরণাগতকে রক্ষা করা কি রাজধর্ম্ম নহে? সর্ব্বস্বপণ করিয়া কুলকামিনীর রক্ষা কি রাজপুতের ধর্ম্ম নহে?"

এই পর্য্যন্ত পত্রখানি রাজকন্যার হাতের লেখা। বাকি যেটুকু, সেটুকু তাঁহার হাতের নহে। নির্ম্মলকুমারী লিখিয়া দিয়াছিল; রাজকন্যা তাহা জানিতেন কি না, আমরা বলিতে পারি না। সে কথা এই—

"মহারাজ! আর একটি কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিলেও নহে। আমি এই বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগলহস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজপুত হয়েন, আর যদি আমাকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করেন, তবে আমি তাঁহার দাসী হইব। হে বীরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে স্ত্রীলাভ বীরের ধর্ম্ম। সমগ্র ক্ষত্রকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পাণ্ডব দ্রৌপদীলাভ করিয়াছিলেন। কাশীরাজ্যে সমবেত রাজমণ্ডলীসমক্ষে আপন বীর্য্য প্রকাশ করিয়া ভীষ্মদেব রাজকন্যাগণকে লইয়া আসিয়াছিলেন। হে রাজন্! রুক্মিণীর বিবাহ মনে পড়ে না? আপনি এই পৃথিবীতে আজিও অদ্বিতীয় বীর—আপনি কি বীরধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইবেন?

"তবে, আমি যে আপনার মহিষী হইবার কামনা করি, ইহা দুরাকাঙ্ক্ষা বটে। যদি আমি আপনার গ্রহণযোগ্যা না হই, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে অন্যবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিবারও কি ভরসা করিতে পারি না? অন্ততঃ যাহাতে সেরূপ অনুগ্রহও আমার অপ্রাপ্য না হয়, এই অভিপ্রায় করিয়া গুরুদেবহস্তে রাখির বন্ধন পাঠাইলাম। তিনি রাখি বাঁধিয়া দিবেন—তার পর আপনার রাজধর্ম্ম আপনার হাতে। আমার প্রাণ আমার হাতে। যদি দিল্লী যাইতে হয়, দিল্লীর পথে বিষভোজন করিব।"

পত্র পাঠ করিয়া রাজসিংহ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন, পরে মাথা তুলিয় মাণিকলালকে বলিলেন, "মাণিকলাল, এ পত্রের কথা তুমি ছাড়া আর কে জানে?"

মাণিক। যাহারা জানিত, মহারাজ গুহামধ্যে তাহাদিগকে বধ করিয়া আসিয়াছেন।

রাজা। উত্তম। তুমি গৃহে যাও। উদয়পুরে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। এ পত্রের কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

এই বলিয়া রাজসিংহ, নিকটে যে কয়টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহা মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাতাজীকি জয়!

রাণা অনন্ত মিশ্রকে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, অনন্ত মিশ্রও তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহার চিত্ত স্থির ছিল না। অশ্বারোহীর যোদ্ধৃবেশ এবং তীব্রদৃষ্টিতে তিনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। একবার ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন—কিন্তু আর সব হারাইয়াছেন—চঞ্চলকুমারীর আশা-ভরসা হারাইয়াছেন—আর কি বলিয়া তাঁহার কাছে মুখ দেখাইবেন? ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন, পর্ব্বতের উপরে দুই তিন জন লোক দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন; মনে করিলেন, আবার নূতন দস্যুসম্প্রদায় আসিয়া উপস্থিত হইল নাকি? সেবার—নিকটে যাহা হয় কিছু ছিল, তাহা পাইয়া দস্যুরা তাঁহার প্রাণবধে বিরত হইয়াছিল—এবার যদি ইহারা তাঁহাকে ধরে, তবে কি দিয়া প্রাণ রাখিবেন? এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে, পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তিরা হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছে এবং পরস্পর কি বলিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র, ব্রাহ্মণের যে কিছু সাহস ছিল, তাহা গেল—ব্রাহ্মণ পলায়নের উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে পর্ব্বতবিহারীদিগের মধ্যে একজন পর্ব্বত অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল—দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তখন "ধর্ ধর্" করিয়া তিন চারি জন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল—ব্রাহ্মণও ছুটিল—অজ্ঞান, মুক্তকচ্ছ, তথাপি "নারায়ণ নারায়ণ" স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ তীরবৎ বেগে

পলাইল। যাহারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে শেষে আর না দেখিতে পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

তাহারা অপর কেহই নহে—মহারাণার ভৃত্যবর্গ। মহারাণার সহিত এ স্থলে কি প্রকারে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল, তাহা এক্ষণে বুঝাইতে হইতেছে। রাজপুতগণের শিকারে বড় আনন্দ। অদ্য মহারাণা শত অশ্বারোহী এবং ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা শিকারে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উদয়পুরাভিমুখে যাইতেছিলেন। রাজসিংহ সর্ব্বদা প্রহরিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন না। কখন কখন অনুচরবর্গকে দূরে রাখিয়া একাকী অশ্বারোহণ করিয়া ছদ্মবেশে প্রজাদিগের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। সেই জন্য তাঁহার রাজ্যে প্রজা অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিয়াছিল; স্বচক্ষে সকল দেখিতেন, স্বহস্তে সকল দুঃখ নিবারণ করিতেন।

অদ্য মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি অনুচরবর্গকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া দিয়া, বিজয়নামা দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় অনন্ত মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কথিত হইয়াছে। রাজা দস্যুকৃত অত্যাচার শুনিয়া স্বহস্তে ব্রহ্মস্ব উদ্ধারের জন্য ছুটিয়াছিলেন। যাহা দুঃসাধ্য এবং বিপৎপূর্ণ, তাহাতেই তাঁহার আমোদ ছিল।

এ দিকে অনেক বেলা হইল দেখিয়া কতিপয় রাজভৃত্য দ্রুতপদে তাঁহার অনুসন্ধানে চলিল। নীচে অবতরণকালে দেখিল, রাণার অশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—ইহাতে তাহারা বিস্মিত এবং চিন্তিত হইল। আশঙ্কা করিল যে, রাণার কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। নিম্নে শিলাখণ্ডোপরি অনন্ত ঠাকুর বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিল যে, এই ব্যক্তি অবশ্য কিছু জানিবে। সেই জন্য তাহারা হস্তপ্রসারণ করিয়া সে দিকে দেখাইয়া দিতেছিল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য তাহারা নামিতেছিল, এমন সময়ে ঠাকুরজী নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন তাহারা ভাবিল, তবে এই ব্যক্তি অপরাধী। এই ভাবিয়া তাহারা পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণ এক গহ্বরমধ্যে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

এ দিকে মহারাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রপাঠ সমাপ্ত ও মাণিকলালকে বিদায় করিয়া অনন্ত মিশ্রের তল্লাসে গেলেন। দেখিলেন, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই—তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার ভৃত্যবর্গ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহিগণ আসিয়া অধিত্যকার তলদেশ ব্যাপ্ত করিয়াছে। রাণাকে দেখিতে পাইয়া সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিজয়, প্রভুকে

দেখিতে পাইয়া, তিন লম্ফে অবতরণ করিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। রাণা তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বস্ত্র রুধিরাক্ত দেখিয়া সকলেই বুঝিল যে, একটা কিছু ক্ষুদ্র ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজপুতগণের ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার—কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

রাণা কহিলেন, "এইখানে এক ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল; সে কোথায় গেল—কেহ দেখিয়াছিলে?"

যাহারা উহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা বলিল, "মহারাজ, সে ব্যক্তি পলাইয়াছে।"

রাণা। শীঘ্র তাহার সন্ধান করিয়া লইয়া আইস।

ভৃত্যগণ তখন সবিশেষ কথা বুঝিয়া নিবেদন করিল যে, "আমরা অনেক সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু পাই নাই।"

অশ্বারোহিগণ মধ্যে রাণার পুত্রদ্বয়, তাঁহার জ্ঞাতি ও অমাত্যবর্গ প্রভৃতি ছিল। রাজা পুত্রদ্বয় ও অমাত্যবর্গকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া আর সকলকে বলিলেন, "প্রিয়জনবর্গ! আজি অধিক বেলা হইয়াছে; তোমাদিগের সকলের ক্ষুধাতৃষ্ণা পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ উদয়পুরে গিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করা আমাদিগের অদৃষ্টে নাই। এই পার্ব্বত্য পথে আবার আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। একটি ক্ষুদ্র লড়াই জুটিয়াছে—লড়াইয়ে যাহার সাধ থাকে, আমার সঙ্গে আইস—আমি, এই পর্ব্বত পুনরারোহণ করিব। যাহার সাধ না থাকে, উদয়পুরে ফিরিয়া যাও।"

এই বলিয়া রাণা পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন। অমনি "জয় মহারাণাকি জয়! জয় মাতাজীকি জয়!" বলিয়া সেই শত অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাতে পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইল। উপরে উঠিয়া "হর! হর!" শব্দে, রূপনগরের পথে ধাবিত হইল। অশ্বক্ষুরের আঘাতে অধিত্যকায় ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিরাশা

এদিকে অনন্ত মিশ্র রূপনগর হইতে যাত্রা করার পরেই রূপনগরে মহাধূম পড়িয়াছিল। মোগল বাদশাহের দুই সহস্র অশ্বারোহী সেনা রূপনগরের গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা চঞ্চলকুমারীকে লইতে আসিয়াছে।

নির্ম্মলের মুখ শুখাইল; দ্রুতবেগে সে চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, "কি হইবে সখি?"

চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিসের কি হইবে?"

নির্ম্মল। তোমাকে ত লইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই ত ঠাকুরজী উদয়পুর গিয়াছেন—এখনও তাঁর পৌঁছিবার বিলম্ব আছে। রাজসিংহের উত্তর আসিতে না আসিতেই তোমায় লইয়া যাইবে—কি হইবে সখি?

চঞ্চল। তার আর উপায় নাই—কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে। দিল্লীর পথে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ—সে বিষয়ে আমি চিত্ত স্থির করিয়াছি। সুতরাং আমার আর উদ্বেগ নাই। একবার কেবল আমি পিতাকে অনুরোধ করিব—যদি মোগলসেনাপতি সাত দিনের অবসর দেন।

চঞ্চলকুমারী সময়মত পিতৃপদে নিবেদন করিলেন যে, "আমি জন্মের মত রূপনগর হইতে চলিলাম। আমি আর কখন যে আপনাদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইব, আর কখন যে বাল্যসখীগণের সঙ্গে আমোদ করিতে পাইব, এমত সম্ভাবনা নাই। আমি আর সাত দিনের অবসর ভিক্ষা করি—সাত দিন মোগলসেনা এইখানে অবস্থিতি করুক। আর সাত দিন আমি আপনাদিগকে দেখিয়া শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হইব।"

রাজা একটু কাঁদিলেন। বলিলেন, "দেখি, সেনাপতিকে অনুরোধ করিব, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করিবেন কি না, বলিতে পারি না।"

রাজা অঙ্গীকারমত মোগলসেনাপতির কাছে নিবেদন জানাইলেন। সেনাপতি ভাবিয়া দেখিলেন, বাদশাহ কোন সময় নিরূপিত করিয়া দেন নাই—বলিয়া দেন নাই যে, এত দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সাত দিন বিলম্ব করিতে তাঁহার সাহস হইল না; ভবিষ্যৎ বেগমের অনুরোধ একেবারে অগ্রাহ্য করিতেও পারিলেন না। আর পাঁচ দিন অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন। চঞ্চলকুমারীর বড় একটা ভরসা জন্মিল না।

এদিকে উদয়পুর হইতে কোন সংবাদ আসিল না—মিশ্রঠাকুর ফিরিলেন না। তখন চঞ্চলকুমারী উর্দ্ধমুখে, যুক্তকরে বলিল, "হে অনাথনাথ দেবাদিদেব! অবলাকে বধ করিও না।"

রজনীতে নির্ম্মল আসিয়া তাঁহার কাছে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি দুই জনে দুই জনকে বক্ষে রাখিয়া রোদন করিয়া কাটাইল। নির্ম্মল বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" কয়দিন ধরিয়া সে এই কথাই বলিতেছিল। চঞ্চল বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে? আমি মরিতে যাইতেছি।" নির্ম্মল বলিল, "আমিও মরিব। তুমি আমায় ফেলিয়া গেলেই কি আমি বাঁচিব?" চঞ্চল বলিল, "ছি! অমন কথা বলিও না—আমার দুঃখের উপর কেন দুঃখ বাড়াও?" নির্ম্মল বলিল, "তুমি আমাকে লইয়া যাও বা না যাও, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাইব—কেহ রাখিতে পারিবে না।"

দুই জনে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মেহেরজান

যে কয়দিন, মোগল সৈনিকেরা রূপনগরে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিলেন, সে কয়দিন বড় আমোদ প্রমোদে কাটিল। মোগল সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীর দল ছুটিত; যখন যুদ্ধ না হইত, তখন তাম্বুর ভিতর নাচ গানের ধূম পড়িত। সৈনিকদিগের রূপনগরে আসা কেবল আনন্দ করিতে আসা। সুতরাং রাত্রিতে তাম্বুতে নৃত্য গীতের বড় ধূম।

নর্ত্তকীদিগের মধ্যে সহসা একজনের নাম অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিল। দিল্লীতে কেহ কখন মেহেরজানের নাম শুনে নাই—কিন্তু যাহাদের নাম প্রসিদ্ধ, তাহারাও রূপনগরে আসিয়া মেহেরজানের তুল্য যশস্বিনী হইতে পারিল না। মেহেরজান আবার নর্ত্তকী হইয়াও সচ্চরিত্রা, এজন্য সে আরও যশস্বিনী হইল।

মোগল সেনাপতি সৈয়দ হাসান আলি তাহার সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু মেহেরজান প্রথমে স্বীকৃত হইল না। বলিল, "আমি অনেক লোকের সাক্ষাতে নৃত্যগীত করিতে পারি না।" সৈয়দ হাসান আলি স্বীকার করিলেন যে, বন্ধুবর্গ কেহ উপস্থিত থাকিবে না। নর্ত্তকী আসিয়া তাঁহাকে নৃত্য গীত শুনাইল। তিনি অতিশয় প্রীত হইয়া

নর্ত্তকীকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কিন্তু নর্ত্তকী তাহা লইল না। বলিল, "আমি অর্থ চাহি না। যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি যে পুরস্কার চাই, তাহাই দিবেন। নহিলে কোন পুরস্কার চাহি না।"

সৈয়দ হাসান আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পুরস্কার চাও?"

মেহেরজান বলিল, "আমি আপনার অশ্বারোহিসৈন্যভুক্ত হইবার ইচ্ছা করি।"

হাসান আলি অবাক্—হতবুদ্ধি হইয়া মেহেরজানের সুন্দর সুহাস্য মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মেহেরজান তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল, "আমি ঘোড়া, হাতিয়ার, পোষাকের দাম দিব।"

হাসান আলি বলিল, "স্ত্রীলোক অশ্বারোহী সৈনিক?"

মেহেরজান বলিল, "ক্ষতি কি? যুদ্ধ ত হইবে না। যুদ্ধ হইলেও পলাইব না।"

হাসান আলি। লোকে কি বলিবে?

মেহেরজান। আপনি আর আমি জানিলাম, আর কেহ জানিবে না।

হাসান আলি। তুমি এ কামনা কেন কর?

মেহেরজান। যে জন্যই হৌক—বাদশাহের ইহাতে ক্ষতি নাই।

হাসান আলি প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু মেহেরজানও কিছুতেই ছাড়িল না। শেষে হাসান আলি স্বীকৃত হইল। মেহেরজানের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

মেহেরজান, সেই দরিয়া বিবি।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রভুভক্তি

এই সময়ে, একবার মাণিকলালের কথা পাড়িতে হইল। মাণিকলাল রাণার নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রথমে আবার সেই পর্ব্বতগুহায় ফিরিয়া গেল। আর সে দস্যুতা করিবে, এমন বাসনা ছিল না; কিন্তু পূর্ব্ববন্ধুগণ মরিল, কি বাঁচিল, তাহা দেখিবে না কেন? যদি কেহ একেবারে না মরিয়া থাকে, তবে তাহার শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইতে হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে মাণিকলাল গুহাপ্রবেশ করিল।

দেখিল, দুই জন মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যে কেবল মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, সে সংজ্ঞালাভ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মাণিকলাল তখন বিষণ্ণচিত্তে বন হইতে এক রাশি

কাঠ ভাঙ্গিয়া আনিল—তদ্দ্বারা দুইটি চিতা রচনা করিয়া, দুইটি মৃতদেহ তদুপরি স্থাপন করিল। গুহা হইতে প্রস্তর ও লৌহ বাহির করিয়া অগ্ন্যুৎপাদনপূর্ব্বক চিতায় আগুন দিল। এইরূপ সঙ্গীদিগের অন্তিম কার্য্য করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। পরে মনে করিল যে, যে ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিয়াছিলাম, তাহার কি অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া আসি। যেখানে অনন্ত মিশ্রকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই। দেখিল, স্বচ্ছসলিলা পার্ব্বত্যা নদীর জল একটু সমল হইয়াছে—এবং অনেক স্থানে বৃক্ষশাখা, লতা, গুল্ম, তৃণাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। এই সকল চিহ্নে মাণিকলাল মনে করিল যে, এখানে বোধ হয়, অনেক লোক আসিয়াছিল। তার পর দেখিল, পাহাড়ের প্রস্তরময় অঙ্গেও কতকগুলি অশ্বের পদচিহ্ন লক্ষ্য করা যায়—বিশেষ অশ্বের ক্ষুরে যেখানে লতাগুল্ম কাটিয়া গিয়াছে, সেখানে অর্দ্ধগোলাকৃত চিহ্নসকল স্পষ্ট। মাণিকলাল মনোযোগপূর্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল যে, এখানে অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল।

চতুর মাণিকলাল তাহার পর দেখিতে লাগিল, অশ্বারোহিগণ কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছে—কোন্ দিকে গিয়াছে। দেখিল, কতকগুলি চিহ্নের সম্মুখ দক্ষিণে—কতকগুলির সম্মুখ উত্তরে। কতক দূর মাত্র দক্ষিণ গিয়া চিহ্নসকল আবার উত্তরমুখ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিল, অশ্বারোহিগণ উত্তর হইতে এই পর্য্যন্ত আসিয়া, আবার উত্তরাংশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

এই সকল সিদ্ধান্ত করিয়া মাণিকলাল গৃহে গেল। সে স্থান হইতে মাণিকলালের গৃহ দুই তিন ক্রোশ। তথায় রন্ধন করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে, কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইল। তখন মাণিকলাল ঘরে চাবি দিয়া কন্যা ক্রোড়ে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মাণিকলালের কেহ ছিল না—কেবল এক পিসীর ননদের যায়ের খুল্লতাতপুত্রী ছিল। সৌজন্যবশতই হউক আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই হউক—মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিত।

মাণিকলাল কন্যা লইয়া সেই পিসীর বাড়ী গেল। ডাকিল, "পিসী গা ?"

পিসী বলিল, "কি বাছা মাণিকলাল ! কি মনে করিয়া ?"

মাণিকলাল বলিল, "আমার এই মেয়েটি রাখিতে পার পিসী ?"

পিসী। কতক্ষণের জন্য ?

মাণিক। এই দুমাস ছমাসের জন্য ?

পিসী। সে কি বাছা ! আমি গরীব মানুষ—মেয়েকে খাওয়াব কোথা হইতে ?

মাণিক। কেন পিসী মা, তুমি কিসের গরীব? তুমি কি নাতিনীকে ছুমাস খাওয়াতে পার না?

পিসী। সে কি কথা? ছুমাস একটা মেয়ে পুষিতে যে এক মোহর পড়ে।

মাণিক। আচ্ছা, আমি সে এক মোহর দিতেছি—তুমি মেয়েটিকে ছুমাস রাখ। আমি উদয়পুরে যাইব—সেখানে আমি রাজসরকারে বড় চাকরি পাইয়াছি।

এই বলিয়া মাণিকলাল, রাণার প্রদত্ত আশরফির মধ্যে একটা পিসীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল; এবং কন্যাকে তাহার কাছে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "যা! তোর দিদির কোলে গিয়া বস্।"

পিসীঠাকুরাণী কিছু লোভে পড়িলেন। মনে বিলক্ষণ জানিতেন যে, এক মোহরে ঐ শিশুর এক বৎসর গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে—মাণিকলাল কেবল ছুই মাসের করার করিতেছে। অতএব কিছু লাভের সম্ভাবনা। তার পর, মাণিক রাজদরবারে চাকরি স্বীকার করিয়াছে—চাহি কি, বড় মানুষ হইতে পারে, তা হইলে কি পিসীকে কখন কিছু দিবে না? মানুষটা হাতে থাকা ভাল।

পিসী তখন মোহরটি কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "তার আশ্চর্য্য কি বাছা—তোমার মেয়ে মানুষ করিব, সে কি বড় ভারি কাজ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আয় রে জান্ আয়!" বলিয়া পিসী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইল।

কন্যা সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে মাণিকলাল নিশ্চিন্তচিত্তে গ্রাম হইতে নির্গত হইল। কাহাকে কিছু না বলিয়া রূপনগরে যাইবার পার্ব্বত্য পথে আরোহণ করিল।

মাণিকলাল এইরূপ বিচার করিতেছিল,—"ঐ অধিত্যকায় অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল কেন? ঐখানে রাণাও একাকী ভ্রমিতেছিলেন—কিন্তু উদয়পুর হইতে এত দূর রাণা একাকী আসিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব উহারা রাণার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহী। তার পর দেখা গেল, উহারা উত্তর হইতে আসিয়াছে—উদয়পুর অভিমুখে যাইতেছিল—বোধ হয়, রাণা মৃগয়া বা বনবিহারে গিয়া থাকিবেন—উদয়পুর ফিরিয়া যাইতেছিলেন। তার পর দেখিলাম, উহারা উদয়পুর যায় নাই। উত্তরমুখেই ফিরিয়াছে কেন? উত্তরে ত রূপনগর বটে। বোধ হয়, চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া রাণা অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহার নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন। তাহা যদি না গিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রাজপুতপতি নাম মিথ্যা। আমি তাঁহার ভৃত্য—আমি তাঁহার কাছে যাইব—কিন্তু তাঁহারা অশ্বারোহণে গিয়াছেন—আমার পদব্রজে যাইতে অনেক বিলম্ব হইবে। তবে এক ভরসা, পার্ব্বত্য পথে

অশ্ব তত দ্রুত যায় না এবং মাণিকলাল পদব্রজে বড় দ্রুতগামী।” মাণিকলাল দিবারাত্র পথ চলিতে লাগিল। যথাকালে সে রূপনগরে পৌঁছিল। পৌঁছিয়া দেখিল যে, রূপনগরে দুই সহস্র মোগল অশ্বারোহী আসিয়া শিবির করিয়াছে, কিন্তু রাজপুত সেনার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। আরও শুনিল, পরদিন প্রভাতে মোগলেরা রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে।

মাণিকলাল বুদ্ধিতে একটি ক্ষুদ্র সেনাপতি। রাজপুতগণের কোন সন্ধান না পাইয়া, কিছুই দুঃখিত হইল না। মনে মনে বলিল, মোগল পারিবে না—কিন্তু আমি প্রভুর সন্ধান করিয়া লইব।

একজন নাগরিককে মাণিক বলিল, “আমাকে দিল্লী যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে পার? আমি কিছু বখ্‌শিশ দিব।” নাগরিক সম্মত হইয়া, কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলাল তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিল। পরে দিল্লীর পথে, চারি দিক্‌ ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিল। মাণিকলাল স্থির করিয়াছিল যে, রাজপুত অশ্বারোহিগণ অবশ্য দিল্লীর পথে কোথাও লুকাইয়া আছে। প্রথমতঃ কিছু দূর পর্য্যন্ত মাণিকলাল রাজপুতসেনার কোন চিহ্ন পাইল না। পরে এক স্থানে দেখিল, পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। দুই পার্শ্বে দুইটি পাহাড় উঠিয়া, প্রায় অর্দ্ধক্রোশ সমান্তরাল হইয়া চলিয়াছে—মধ্যে কেবল সঙ্কীর্ণ পথ। দক্ষিণ দিকের পর্ব্বত অতি উচ্চ—এবং দুরারোহণীয়—তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বাম দিকে পর্ব্বত, অতি ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। আরোহণের সুবিধা, এবং পর্ব্বতও অনুচ্চ। এক স্থানে ঐ বাম দিকে একটি রন্ধ্র বাহির হইয়াছে, তাহা দিয়া একটু সূক্ষ্ম পথ আছে।

নাপোলিয়ন্‌ প্রভৃতি অনেক দস্যু সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। রাজা হইলে লোকে আর দস্যু বলে না। মাণিকলাল রাজা নহে—সুতরাং আমরা তাহাকে দস্যু বলিতে বাধ্য। কিন্তু রাজদস্যুদিগের ন্যায় এই ক্ষুদ্র দস্যুরও সেনাপতির চক্ষু ছিল। পর্ব্বতনিরুদ্ধ সঙ্কীর্ণ পথ দেখিয়া সে মনে করিল, রাণা যদি আসিয়া থাকেন, তবে এইখানেই আছেন। যখন মোগল সৈন্য এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইবে—এই পর্ব্বতশিখর হইতে রাজপুত অশ্ব বজ্রের ন্যায় তাহাদিগের মস্তকে পড়িতে পারিবে। দক্ষিণ দিকের পর্ব্বত দুরারোহণীয়; অশ্বারোহিগণের আরোহণ ও অবতরণের অনুপযুক্ত, অতএব সেখানে রাজপুতসেনা থাকিবে না—কিন্তু বামের পর্ব্বত হইতে তাহাদিগের অবতরণের বড় সুখ। মাণিকলাল তদুপরি আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

উঠিয়া কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মনে করিল খুঁজিয়া দেখি, কিন্তু আবার ভাবিল, রাজা ভিন্ন আর কোন রাজপুত আমাকে চিনে না ; আমাকে মোগলের চর বলিয়া হঠাৎ কোন অদৃশ্য রাজপুত মারিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবিয়া সে আর অগ্রসর না হইয়া, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বলিল, "মহারাণার জয় হউক।"

এই শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র চারি পাঁচ জন শস্ত্রধারী রাজপুত অদৃশ্য স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইল এবং তরবারি হস্তে মাণিকলালকে কাটিতে আসিতে উদ্যত হইল।

একজন বলিল, "মারিও না।" মাণিকলাল দেখিল, স্বয়ং রাণা।

রাণা বলিলেন, "মারিও না। এ আমাদিগের স্বজন।" যোদ্ধৃগণ তখনই আবার লুক্কায়িত হইল।

রাণা মাণিককে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আসিল। এক নিভৃত স্থলে তাহাকে বসিতে বলিয়া স্বয়ং সেইখানে বসিলেন। রাজা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ ?"

মাণিকলাল বলিল, "প্রভু যেখানে, ভৃত্য সেইখানে যাইবে। বিশেষ যখন আপনি এরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যদি ভৃত্য কোনও কার্য্যে লাগে, এই ভরসায় আসিয়াছে। মোগলেরা দুই সহস্র—মহারাজের সঙ্গে এক শত। আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব ? আপনি আমাকে জীবন দান করিয়াছেন—একদিনেই কি তাহা ভুলিব ?"

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে এখানে আসিয়াছি, তুমি কি প্রকারে জানিলে ?"

মাণিকলাল তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। শুনিয়া রাণা সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ—আমি তোমার মত সুচতুর লোক একজন খুঁজিতে-ছিলাম। আমি যাহা বলি—পারিবে ?"

মাণিকলাল বলিল, "মনুষ্যের যাহা সাধ্য, তাহা করিব।"

রাণা বলিলেন, "আমরা এক শত যোদ্ধা মাত্র ; মোগলের সঙ্গে দুই হাজার—আমরা রণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জয়ী হইতে পারিব না। যুদ্ধ করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার করিতে পারিব না। রাজকন্যাকে আগে বাঁচাইয়া, পরে যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলে তিনি আহত হইতে পারেন। তাঁহার রক্ষা প্রথমে চাই।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি সে সকল কি প্রকারে বুঝিব, আমাকে কি করিতে হইবে, তাহাই আজ্ঞা করুন।"

রাণা বলিলেন, "তোমাকে মোগল অশ্বারোহীর বেশ ধরিয়া কল্য মোগলসেনার সঙ্গে আসিতে হইবে। রাজকুমারীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে থাকিতে হইবে। এবং যাহা যাহা বলিতেছি, তাহা করিতে হইবে।" রাণা তাহাকে সবিস্তার উপদেশ দিলেন। মাণিকলাল শুনিয়া বলিল, "মহারাজের জয় হউক! আমি কার্য্য সিদ্ধ করিব। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া একটি ঘোড়া বখ্‌শিশ করুন।"

রাণা। আমরা এক শত যোদ্ধা, এক শত ঘোড়া। আর ঘোড়া নাই যে, তোমায় দিই। অন্য কাহারও ঘোড়া দিতে পারিব না, আমার ঘোড়া লইতে পার।

মাণিক। তাহা প্রাণ থাকিতে লইব না। আমাকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দিন।

রাণা। কোথা পাইব? যাহা আছে, তাহাতে আমাদের কুলায় না। কাহাকে নিরস্ত্র করিয়া তোমাকে হাতিয়ার দিব? আমার হাতিয়ার লইতে পার।

মাণিক। তাহা হইতে পারে না। আমাকে পোষাক দিতে আজ্ঞা হউক।

রাণা। এখানে যাহা পরিয়া আসিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর পোষাক নাই। আমি কিছুই দিব না।

মাণিক। মহারাজ! তবে অনুমতি দিউন, আমি যে প্রকারে হউক, এ সকল সংগ্রহ করিয়া লই।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "চুরি করিবে?"

মাণিকলাল জিহ্বা কাটিল। "আমি শপথ করিয়াছি যে, আর সে কার্য্য করিব না।"

রাণা। তবে কি করিবে?

মাণিক। ঠকাইয়া লইব।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "যুদ্ধকালে সকলেই চোর—সকলেই বঞ্চক। আমিও বাদশাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি—চোরের মত লুকাইয়া আছি। তুমি যে প্রকারে পার, এ সকল সংগ্রহ করিও।"

মাণিকলাল প্রফুল্লচিত্তে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

রসিকা পানওয়ালী

মাণিকলাল তখনই রূপনগরে ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রূপনগরের বাজারে গিয়া মাণিকলাল দেখিল যে, বাজার অত্যন্ত শোভাময়! দোকানের শত শত প্রদীপের শোভায় বাজার আলোকময় হইয়াছে—নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য উজ্জ্বলবর্ণে রসনা আকুল করিতেছে—পুষ্প, পুষ্পমালা থরে থরে নয়ন রঞ্জিত, এবং ঘ্রাণে মন মুগ্ধ করিতেছে। মাণিকের উদ্দেশ্য—অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, কিন্তু তাই বলিয়া আপন উদরকে বঞ্চনা করা মাণিকলালের অভিপ্রায় ছিল না। মাণিক গিয়া কিছু মিঠাই কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সের পাঁচ ছয় ভোজন করিয়া মাণিক দেড় সের জল খাইল এবং দোকানদারকে উচিত মূল্য দান করিয়া তাম্বূলান্বেষণে গেল।

দেখিল, একটা পানের দোকানে বড় জাঁক। দেখিল, দোকানে বহুসংখ্যক দীপ বিচিত্র ফানুষমধ্য হইতে স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। দেওয়ালে নানা বর্ণের কাগজ মোড়া—নানা প্রকার বাহারের ছবি লট্‌কান—তবে চিত্রগুলি একটু বেশী মাত্রায় রঙ্গদার, আধুনিক ভাষায় "obscene", প্রাচীন ভাষায় "আদিরসাশ্রিত।" মধ্য স্থানে কোমল গালিচায় বসিয়া—দোকানের অধিকারিণী তাম্বূলবিক্রেত্রী—বয়সে ত্রিশের উপর, কিন্তু কুরূপা নহে। বর্ণ গৌর, চক্ষু বড় বড়, চাহনি বড় চঞ্চল, হাসি বড় রঙ্গদার—সে হাসি অনিন্দ্য দন্তশ্রেণীমধ্যে সর্ব্বদাই খেলিতেছে—হাসির সঙ্গে সর্ব্বালঙ্কার দুলিতেছে—অলঙ্কার কতক রূপা, কতক সোনা—কিন্তু সুগঠন ও সুশোভন। মাণিকলাল, দেখিয়া শুনিয়া, পান চাহিল।

পানওয়ালী স্বয়ং পান বেচে না—সম্মুখে একজন দাসীতে পান সাজিতেছে ও বেচিতেছে—পানওয়ালী কেবল পয়সা কুড়াইতেছে—এবং মিষ্ট হাসিতেছে।

দাসী একজন পান সাজিয়া দিল; মাণিকলাল ডবল দাম দিল। আবার পান চাহিল। যতক্ষণ পান সাজা হইতেছিল, ততক্ষণ মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া দুই একটা মিষ্ট কথা কহিতে লাগিল; পানওয়ালীর রূপের প্রশংসা করিলে পাছে সে কিছু মন্দ ভাবে, এজন্য প্রথমে তাহার দোকানসজ্জা ও অলঙ্কারগুলির প্রশংসা করিতে লাগিল। পানওয়ালীও একটু ভিজিল। পানওয়ালী মিঠে পানের সঙ্গে মিঠে কথা বেচিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল তখন দোকানে উঠিয়া বসিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর হুঁকা কাড়িয়া লইয়া, টানিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে মাণিকলাল পান খাইয়া দোকানের

মসলা ফুরাইয়া দিল। দাসী মসলা আনিতে অন্য দোকানে গেল। সেই অবসরে মাণিকলাল পানওয়ালীকে বলিল, "মহারাজিয়া! তুমি বড় চতুরা। আমি একটি চতুরা স্ত্রীলোক খুঁজিতেছিলাম; আমার একটি দুষমন্ আছে—তাহাকে একটু জব্দ করিব ইচ্ছা। কি করিতে হইবে, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। তুমি যদি আমার সহায়তা কর, তবে এক আশরফি পুরস্কার করিব।"

পান। কি করিতে হইবে?

মাণিক চুপি চুপি কি বলিল। পানওয়ালী বড় রঙ্গপ্রিয়া—তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। বলিল, "আশরফির প্রয়োজন নাই—রঙ্গই আমার পুরস্কার!"

মাণিকলাল তখন দোয়াত, কলম, কাগজ চাহিল। দাসী তাহা নিকটস্থ বেণিয়ার দোকান হইতে আনিয়া দিল। মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই পত্র লিখিল, "হে প্রাণনাথ! তুমি যখন নগরভ্রমণে আসিয়াছিলে, আমি তোমাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তোমার একবার দেখা না পাইলে আমার প্রাণ যাইবে। শুনিতেছি, তোমরা কাল চলিয়া যাইবে—অতএব আজ একবার অবশ্য অবশ্য আমায় দেখা দিবে। নহিলে আমি গলায় ছুরি দিব। যে পত্র লইয়া যাইতেছে—তাহার সঙ্গে আসিও—সে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে।"

পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল শিরোনামা দিল, "মহম্মদ খাঁ।"

পানওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও ব্যক্তি?"

মা। একজন মোগল সওয়ার।

বাস্তবিক, মাণিকলাল মোগলদিগের মধ্যে একজনকেও চিনিত না। কাহারও নাম জানে না। সে মনে ভাবিল, দুই হাজার মোগলের মধ্যে অবশ্য একজন মহম্মদ আছেই আছে—আর সকল মোগলই "খাঁ।" অতএব সাহস করিয়া "মহম্মদ খাঁ" লিখিল; লেখা হইলে মাণিকলাল বলিল, "তাহাকে এইখানে আনিব?"

পানওয়ালী বলিল, "এ ঘরে হইবে না। আর একটা ঘর ভাড়া লইতে হইবে।"

তখনই দুই জনে বাজারে গিয়া আর একটা ঘর লইল। পানওয়ালী মোগলের অভ্যর্থনাজন্য তাহা সজ্জিতকরণে প্রস্তুত হইল—মাণিকলাল পত্র লইয়া মুসলমানশিবিরে উপস্থিত হইল। শিবিরমধ্যে মহাগোলযোগ—কোন শৃঙ্খলা নাই—নিয়ম নাই। তাহার ভিতরে বাজার বসিয়া গিয়াছে—রঙ্গ তামাসা রোশনাইয়ের ধূম লাগিয়াছে। মাণিকলাল মোগল দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে, "মহম্মদ খাঁ কে মহাশয়? তাঁহার নামে পত্র আছে।"

কেহ উত্তর দেয় না—কেহ গালি দেয় ;—কেহ বলে, চিনি না—কেহ বলে, খুঁজিয়া লও। শেষ একজন মোগল বলিল, "মহম্মদ খাঁকে চিনি না, কিন্তু আমার নাম নুর মহম্মদ খাঁ। পত্র দেখি, দেখিলে বুঝিতে পারিব, পত্র আমার কি না।"

মাণিকলাল সানন্দচিত্তে তাহার হস্তে পত্র দিল—মনে জানে, মোগল যেই হউক, ফাঁদে পড়িবে। মোগলও ভাবিল—পত্র যারই হউক, আমি কেন এই সুবিধাতে বিবিটাকে দেখিয়া আসি না। প্রকাশ্যে বলিল, "হাঁ, পত্র আমারই বটে। চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" এই বলিয়া মোগল তাম্বুমধ্যে প্রবেশ করিয়া চুল আঁচড়াইয়া গন্ধদ্রব্য মাখিয়া পোষাক পরিয়া বাহির হইল। বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে ভৃত্য, সে স্থান কত দূর?"

মাণিকলাল যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর, অনেক দূর! ঘোড়ায় গেলে ভাল হইত।"

"বহত আচ্ছা" বলিয়া খাঁ সাহেব ঘোড়া বাহির করিয়া চড়িতে যান, এমন সময় মাণিকলাল আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর! বড় ঘরের কথা—হাতিয়ারবন্দ হইয়া গেলেই ভাল হয়।"

নূতন নাগর ভাবিলেন, সে ভাল কথা—জঙ্গী জোয়ান আমি; হাতিয়ার ছাড়া কেন যাইব? তখন অঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া মাণিকলাল বলিল, "এই স্থানে উতারিতে হইবে। আমি আপনার ঘোড়া ধরিতেছি, আপনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করুন।"

খাঁ সাহেব নামিলেন—মাণিকলাল ঘোড়া ধরিয়া রহিল। খাঁ বাহাদুর সশস্ত্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, পরে মনে পড়িল যে, হাতিয়ারবন্দ হইয়া রমণীসম্ভাষণে যাওয়া বড় ভাল দেখায় না। ফিরিয়া আসিয়া মাণিকলালের কাছে অস্ত্রগুলিও রাখিয়া গেলেন। মাণিকলালের আরও সুবিধা হইল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া খাঁ সাহেব দেখিলেন যে, তক্তপোষের উপর উত্তম শয্যা; তাহার উপর সুন্দরী বসিয়া আছে—আতর গোলাবের সৌগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়াছে, চারি দিকে ফুল বিকীর্ণ হইয়াছে, এবং সম্মুখে আলবোলায় সুগন্ধি তামাকু প্রস্তুত আছে। খাঁ সাহেব, জুতা খুলিয়া, তক্তপোষে বসিলেন, বিবিকে মিষ্টবচনে সম্ভাষণ করিলেন—পরে পোষাকটি খুলিয়া রাখিয়া, ফুলের পাখা হাতে লইয়া বাতাস খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং আলবোলার নল মুখে পুরিয়া সুখের আবেশে টান দিতে লাগিলেন। বিবিও তাঁহাকে দুই চারিটা গাঢ় প্রণয়ের কথা বলিয়া একেবারে মোহিত করিল।

তামাকু ধরিতে না ধরিতে মাণিকলাল আসিয়া দ্বারে ঘা মারিল। বিবি বলিল, "কে ও?"

মাণিকলাল বিকৃতস্বরে বলিল, "আমি।"

তখন চতুরা রমণী অতি ভীতকণ্ঠে খাঁ সাহেবকে বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে—আমার স্বামী আসিয়াছেন—মনে করিয়াছিলাম, তিনি আজ আর আসিবেন না। তুমি এই তক্তপোষের নীচে একবার লুকাও। আমি উঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

মোগল বলিল, "সে কি? মরদ হইয়া ভয়ে লুকাইব; যে হয় আসুক না; এখনই কোতল করিব।"

পানওয়ালী জিব কাটিয়া বলিল, "সে কি? সর্ব্বনাশ! আমার স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়া আমার অন্নবস্ত্রের পথ বন্ধ করিবে? এই কি তোমাকে ভালবাসার ফল? শীঘ্র তক্তপোষের নীচে যাও। আমি এখনই উহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

এদিকে মাণিকলাল পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাঘাত করিতেছিল, অগত্যা খাঁ সাহেব তক্তপোষের নীচে গেলেন। মোটা শরীর বড় সহজে প্রবেশ করে না, ছাল চামড়া দুই এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল—কি করে—প্রেমের জন্য অনেক সহিতে হয়। সে স্থূল মাংসপিণ্ড তক্তপোষতলে বিন্যস্ত হইলে পর পানওয়ালী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে পানওয়ালী পূর্ব্বশিক্ষামত বলিল, "তুমি আবার এলে যে? আজ আর আসিবে না বলিয়াছিলে যে?"

মাণিকলাল পূর্ব্বমত বিকৃতস্বরে বলিল, "চাবিটা ফেলিয়া গিয়াছি।"

পানওয়ালী চাবি খোঁজার ছল করিয়া, খাঁ সাহেবের পরিত্যক্ত পোষাকটি হস্তে লইল। পোষাক লইয়া দুই জনে বাহিরে চলিয়া আসিয়া, শিকল টানিয়া বাহির হইতে চাবি দিল। খাঁ সাহেব তখন তক্তপোষের নীচে মূষিকদিগের দংশনযন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন।

তাঁহাকে গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া, মাণিকলাল তাঁহার পোষাক পরিল। পরে তাঁহার হাতিয়ারে হাতিয়ারবন্দ হইয়া তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুসলমানশিবিরে তাঁহার স্থান লইতে চলিল।

চতুর্থ খণ্ড

রন্ধ্রে যুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

চঞ্চলের বিদায়

প্রভাতে মোগল সৈন্য সাজিল। রূপনগরের গড়ের সিংহদ্বার হইতে, উষ্ণীষকবচ-শোভিত, গুম্ফশ্মশ্রুসমন্বিত, অস্ত্রসজ্জাভীষণ অশ্বারোহিদল সারি দিল। পাঁচ পাঁচ জন অশ্বারোহী এক এক সারি, সারির পিছু সারি, তার পর আবার সারি, সারি সারি সারি অশ্বারোহীর সারি চলিতেছে; ভ্রমরশ্রেণীসমাকুল ফুল্লকমলতুল্য তাহাদের বদনমণ্ডল সকল শোভিতেছিল। তাহাদের অশ্বশ্রেণী গ্রীবাভঙ্গে সুন্দর, বল্গারোধে অধীর, মন্দগমনে ক্রীড়াশীল; অশ্বশ্রেণী শরীরভরে হেলিতেছে দুলিতেছে এবং নাচিয়া নাচিয়া চলিবার উপক্রম করিতেছে।

চঞ্চলকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইলেন। নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল; চঞ্চল বলিল, "ফুলের মালা পরাও সখি—আমি চিতারোহণে যাইতেছি।" প্রবলবেগে প্রবহমাণ অশ্রুজল চক্ষুঃমধ্যে ফেরৎ পাঠাইয়া নির্ম্মল বলিল, "রত্নালঙ্কার পরাই সখি, তুমি উদয়পুরেশ্বরী হইতে যাইতেছ।" চঞ্চল বলিল, "পরাও! পরাও! নির্ম্মল! কুৎসিত হইয়া কেন মরিব? রাজার মেয়ে আমি; রাজার মেয়ের মত সুন্দর হইয়া মরিব। সৌন্দর্য্যের মত কোন্ রাজ্য? রাজত্ব কি বিনা সৌন্দর্য্যে শোভা পায়? পরা।" নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল; সে কুসুমিততরুবিনিন্দিত কান্তি দেখিয়া কাঁদিল। কিছু বলিল না। চঞ্চল তখন নির্ম্মলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চল তার পর বলিল, "নির্ম্মল! আর তোমায় দেখিব না! কেন বিধাতা এমন বিড়ম্বনা করিলেন! দেখ, ক্ষুদ্র কাঁটার গাছ যেখানে জন্মে, সেইখানে থাকে; আমি কেন রূপনগরে থাকিতে পাইলাম না!"

নির্ম্মল বলিল, "আমায় আবার দেখিবে। তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। আমায় না দেখিলে তোমার মরা হইবে না ; তোমায় না দেখিলে আমার মরা হইবে না।"

চঞ্চল। আমি দিল্লীর পথে মরিব।

নির্ম্মল। দিল্লীর পথে তবে আমায় দেখিবে।

চঞ্চল। সে কি নির্ম্মল ? কি প্রকারে তুমি যাইবে ?

নির্ম্মল কিছু বলিল না। চঞ্চলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চলকুমারী বেশভূষা সমাপন করিয়া মহাদেবের মন্দিরে গেলেন। নিত্যব্রত শিবপূজা ভক্তিভাবে করিলেন। পূজান্তে বলিলেন, "দেবদেব মহাদেব! মরিতে চলিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বালিকার মরণে তোমার এত তুষ্টি কেন ? প্রভু! আমি বাঁচিলে কি তোমার সৃষ্টি চলিত না ? যদি এতই মনে ছিল, কেন আমাকে রাজার মেয়ে করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলে ?"

মহাদেবের বন্দনা করিয়া চঞ্চলকুমারী মাতৃচরণ বন্দনা করিতে গেলেন। মাতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল। পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিল। পিতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল! তার পর একে একে সখীজনের কাছে, চঞ্চল বিদায় গ্রহণ করিল। সকলে কাঁদিয়া গণ্ডগোল করিল। চঞ্চল কাহাকে অলঙ্কার, কাহাকে খেলানা, কাহাকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না—আমি আবার আসিব।" কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না—দেখিতেছ না, আমি পৃথিবীশ্বরী হইতে যাইতেছি ?" কাহাকেও বলিলেন, "কাঁদিও না—কাঁদিলে যদি দুঃখ যাইত, তবে আমি কাঁদিয়া রূপনগরের পাহাড় ভাসাইতাম।"

সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া, চঞ্চলকুমারী দোলারোহণে চলিলেন। এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য দোলার অগ্রে স্থাপিত হইয়াছে ; এক সহস্র পশ্চাতে। রজতমণ্ডিত, রত্নখচিত সে শিবিকা, বিচিত্র স্বর্ণ-খচিত বস্ত্রে আবৃত হইয়াছে ; আশাসোঁটা লইয়া চোপদার বাগ্‌জালে গ্রাম্য দর্শকবর্গকে আনন্দিত করিতেছে। চঞ্চলকুমারী শিবিকায় আরোহণ করিলে, দুর্গমধ্য হইতে শঙ্খ নিনাদিত হইল ; কুসুম ও লাজাবলীতে শিবিকা পরিপূর্ণ হইল ; সেনাপতি চলিবার আজ্ঞা দিলেন ; তখন অকস্মাৎ মুক্তপথ তড়াগের জলের ন্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী প্রবাহিত হইল। বল্গা দংশিত করিয়া, নাচিতে নাচিতে, অশ্বশ্রেণী চলিল—অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রের ঝঞ্চনা বাজিল।

অশ্বারোহিগণ প্রভাতবায়ুপ্রফুল্ল হইয়া কেহ কেহ গান করিতেছিল। শিবিকার পশ্চাতেই যে অশ্বারোহিগণ ছিল, তাহার মধ্যে অগ্রবর্ত্তী একজন গায়িতেছিল—

শরম্ ভরম্‌সে পিয়ারী,
সোমরত বংশীধারী,
ঝুরত লোচনসে।
ন সম্‌ঝে গোপকুমারী,
যেহিন্ বৈঠত মুরারি,
বিহারত রাহ তুমারি॥

রাজকুমারীর কর্ণে সে গীত প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন, "হায়! যদি সওয়ারের গীত সত্য হইত!" রাজকুমারী তখন, রাজসিংহকে ভাবিতেছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল তাঁহার পশ্চাতে এই গীত গায়িতেছিল। মাণিকলাল, যত্ন করিয়া শিবিকার পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নির্ম্মলকুমারীর অগাধ জলে ঝাঁপ

এদিকে নির্ম্মলকুমারীর বড় গোলমাল বাধিল। চঞ্চল ত রত্নখচিত শিবিকারোহণে চলিয়া গেল—আগে পিছে দুই সহস্র কুমারপ্রতিম অশ্বারোহী আল্লার মহিমার শব্দে রূপনগরের পাহাড় ধ্বনিত করিয়া চলিল। কিন্তু নির্ম্মলের কান্না ত থামে না। একা—একা—একা—শত পৌরজনের মধ্যে চঞ্চল অভাবে নির্ম্মল বড়ই একা। নির্ম্মল উচ্চ গৃহচূড়ার উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল—দেখিতে লাগিল, পাদক্রোশ-পরিমিত অজগর সর্পের ন্যায় সেই অশ্বারোহী সৈনিকশ্রেণী পার্ব্বত্য পথে বিসর্পিত হইয়া উঠিতেছে, নামিতেছে—প্রভাতসূর্য্যকিরণে তাহাদিগের উর্দ্ধোত্থিত উজ্জ্বল বর্শাফলক সকল জ্বলিতেছে। কতক্ষণ নির্ম্মল চাহিয়া রহিল। চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তখন নির্ম্মল চক্ষু মুছিয়া, ছাদের উপর হইতে নামিল। নির্ম্মল একটা কিছু ভাবিয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়াছিল। নামিয়া প্রথমে অলঙ্কার সকল খুলিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিল, কেহ দেখিতে পাইল না। সঞ্চিত অর্থমধ্যে কতিপয় মুদ্রা নির্ম্মল গোপনে সংগ্রহ করিল। কেবল তাহাই লইয়া

নির্ম্মল একাকিনী রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। পরে দৃঢ়পদে অশ্বারোহী সেনা যে পথে গিয়াছে, সেই পথে একাকিনী তাহাদের অনুবর্ত্তিনী হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রণপণ্ডিত মবারক

বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় ফিরিতে ফিরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে সেই অশ্বারোহী সেনা পার্ব্বত্য পথে চলিল। যে রন্ধ্রপথের পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া মাণিকলাল রাজসিংহের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল, বিবরে প্রবিশ্যমান মহোরগের ন্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। অশ্বসকলের অসংখ্য পদবিক্ষেপধ্বনি পর্ব্বতের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এমন কি, সেই স্থির শব্দহীন বিজন প্রদেশে অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রের মৃদু শব্দ একত্র সমুত্থিত হইয়া রোমহর্ষণ প্রতিধ্বনির উৎপত্তির কারণ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে অশ্বগণের হ্রেষারব—আর সৈনিকের ডাক হাঁক। পর্ব্বততলে যে সকল লতা গুল্ম ছিল—শব্দাঘাতে তাহার পাতা সকল কাঁপিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বন্য পশু পক্ষী কীট যাহারা সে বিজন প্রদেশে নির্ভয়ে বাস করিত, তাহারা সকলে দ্রুত পলায়ন করিল। এইরূপে সমুদায় অশ্বারোহীর সারি সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। তখন হঠাৎ গুম্ করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। যেখানে শব্দ হইল, সে প্রদেশের অশ্বারোহীরা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, পর্ব্বতশিখরদেশ হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্ব্বতচ্যুত হইয়া সৈন্যমধ্যে পড়িয়াছে। চাপে একজন অশ্বারোহী মরিয়াছে, আর একজন আহত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে, ব্যাপার কি, তাহা কেহ বুঝিতে না বুঝিতে, আবার সৈন্যমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িল—এক, দুই, তিন, চারি, ক্রমে দশ, পঁচিশ—তখনই একেবারে শত শত ছোট বড় শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল—বহুসংখ্যক অশ্ব ও অশ্বারোহী কেহ হত, কেহ আহত হইয়া, পথের উপর পড়িয়া সঙ্কীর্ণ পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। অশ্ব সকল আরোহী লইয়া পলায়নের জন্য বেগবান্ হইল—কিন্তু অগ্রে পশ্চাতে পথ সৈনিকের ঠেলাঠেলিতে অবরুদ্ধ—অশ্বের উপর অশ্ব, আরোহীর উপর আরোহী চাপিয়া পড়িতে লাগিল—সৈনিকেরা পরস্পর

অস্ত্রাঘাত করিয়া পথ করিতে লাগিল—শৃঙ্খলা একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল, সৈন্যমধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

"কাহার লোগ্ হুঁসিয়ার ! বাঁ রাস্তা !" মাণিকলাল হাঁকিল। যেখানে রাজকুমারী শিবিকায়, এবং পশ্চাতে মাণিকলাল, তাহার সম্মুখেই এই গোলযোগ উপস্থিত। বাহকেরা আপনাদের প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত—অশ্ব সকল পাছু হটিয়া তাহাদের উপর চাপিয়া পড়িতেছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পার্ব্বত্য পথের বাম দিক্ দিয়া একটি অতি সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথ বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহাতে একেবারে একটিমাত্র অশ্বারোহী প্রবেশ করিতে পারে। তাহারই কাছে যখন সেনামধ্যস্থিত শিবিকা পৌছিয়াছিল, তখনই এই হুলস্থূল উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই রাজসিংহের বন্দোবস্ত। সুশিক্ষিত মাণিকলাল প্রাণভয়ে ভীত বাহকদিগকে ঐ পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলালের কথা শুনিবামাত্র বাহকেরা আপনাদিগের ও রাজকুমারীর প্রাণরক্ষার্থ ঝটিতি শিবিকা লইয়া সেই পথে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব লইয়া মাণিকলালও তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। নিকটস্থ সৈনিকেরা দেখিল যে, প্রাণ বাঁচাইবার এই এক পথ ; তখন আর একজন অশ্বারোহী মাণিকলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পথে প্রবেশ করিতে গেল। সেই সময়ে উপর হইতে একটা অতি বৃহৎ খিলাখণ্ড গড়াইতে গড়াইতে, শব্দে পার্ব্বত্য প্রদেশ কাঁপাইতে কাঁপাইতে, আসিয়া সেই রন্ধ্রমুখে পড়িয়া স্থিতিলাভ করিল। তাহার চাপে দ্বিতীয় অশ্বারোহী অশ্বসমেত চূর্ণ হইয়া গেল। রন্ধ্রমুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আর কেহ সে পথে প্রবেশ করিতে পারিল না। একা মাণিকলাল শিবিকাসঙ্গে যথেপ্সিত পথে চলিল।

সেনাপতি হাসান আলি খাঁ মন্‌সব্‌দার, তখন সৈন্যের সর্ব্বপশ্চাতে ছিলেন। প্রবেশ-পথমুখে স্বয়ং দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ণ দ্বারে সেনার প্রবেশের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। পরে সমুদয় সেনা প্রবিষ্ট হইলে স্বয়ং ধীরে ধীরে সর্ব্বপশ্চাতে আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সহসা সৈনিকশ্রেণী মহা গোলযোগ করিয়া পিছু হটিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু ভাল বুঝাইয়া বলিতে পারে না। তখন সৈনিকগণকে ভর্ৎসনা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন—এবং স্বয়ং সর্ব্বাগ্রগামী হইয়া ব্যাপার কি, দেখিতে চলিলেন।

কিন্তু ততক্ষণ সেনা থাকে না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই পর্ব্বতের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ পর্ব্বত অতি উচ্চ এবং দুরারোহণীয়—তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকার করিয়াছে। রাজপুতেরা তাহার প্রদেশান্তরে অনুসন্ধান করিয়া পথ

বাহির করিয়া, পঞ্চাশ জন তাহার উপর উঠিয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছিল। এক এক জন অপরের চাল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে স্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া, আপন আপন সম্মুখে একটি একটি ঢিপি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে পলকে পলকে পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ খণ্ড শিলা নিম্নস্থ অশ্বারোহীদিগের উপর বৃষ্টি করিতেছিল। এক একবারে পঞ্চাশটি অশ্ব বা আরোহী আহত বা নিহত হইতেছিল। কে মারিতেছিল, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলেও দুরারোহণীয় পর্ব্বতশিখরস্থ শত্রুগণের প্রতি কোনরূপেই আঘাত সম্ভব নহে—অতএব মোগলেরা পলায়ন ভিন্ন অন্য কোন চেষ্টাই করিতেছিল না। যে সহস্রসংখ্যক অশ্বারোহী শিবিকার অগ্রভাগে ছিল, তাহার মধ্যে হত ও আহতের অবশিষ্ট পলায়নপূর্ব্বক রন্ধ্রমুখে নির্গত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

পঞ্চাশ জন রাজপুত দক্ষিণ পার্শ্বের উচ্চ পর্ব্বত হইতে শিলাবৃষ্টি করিতেছিল—আর পঞ্চাশ জন স্বয়ং রাজসিংহের সহিত বাম দিকের অনুচ্চ পর্ব্বতশিখরে লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এতক্ষণ কিছুই করিতেছিল না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইল। যেখানে শিলাবৃষ্টিনিবন্ধন ঘোরতর বিপত্তি, সেখানে মবারক অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে সৈন্যগণকে সুশৃঙ্খলের সহিত পার্ব্বত্য পথ হইতে বহিষ্কৃত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, ক্ষুদ্রতর রন্ধ্রপথে রাজকুমারীর শিবিকা চলিয়া গেল, একজনমাত্র অশ্বারোহী তাহার সঙ্গে গেল, অমনি অর্গলের ন্যায় বৃহৎ শিলাখণ্ড সে পথ বন্ধ করিল—তখন তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, এ ব্যাপার আর কিছুই নহে—কোন দুরাত্মা রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার মানসে এই উদ্যম করিয়াছে। তখন তিনি ডাকিয়া নিকটস্থ সৈনিকদিগকে বলিলেন—"প্রাণ যায়, সেও স্বীকার! শত সওয়ার দোলার পিছু পিছু যাও। ঘোড়া ছাড়িয়া পাঁওদলে, এই পাথর টপকাইয়া যাও—চল, আমি যাইতেছি।" মবারক অগ্রে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পথরোধক শিলাখণ্ডের উপর উঠিলেন। এবং তাহার উপর হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া শত সওয়ার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।

রাজসিংহ পর্ব্বতশিখর হইতে এ সকল দেখিতে লাগিলেন। যতক্ষণ মোগলেরা ক্ষুদ্র পথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল, ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরে তাহারা রন্ধ্রপথমধ্যে নিবদ্ধ হইলে, পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী রাজপুত লইয়া বজ্রের ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে তাহাদের উপর পড়িয়া, তাহাদের নিহত করিতে লাগিলেন। সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইয়া মোগলেরা বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এই ভয়ঙ্কর রণে

প্রাণত্যাগ করিল। উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া অশ্ব সহিত মোগল সওয়ারগণের উপর পড়িল—নীচে যাহারা ছিল, তাহারা চাপেই মরিল। পাঁচ সাত দশ জন মাত্র এড়াইল। মবারক তাহাদের লইয়া ফিরিলেন। রাজপুতেরা তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল না।

মবারকের সঙ্গে মোগল সওয়ারের বেশধারী মাণিকলালও বাহির হইয়া আসিল। আসিয়াই একজন মৃত সওয়ারের অশ্বে আরোহণ করিয়া, সেই শৃঙ্খলাশূন্য মোগলসেনার মধ্যে কোথায় লুকাইল, কেহ তাহা দেখিতে পাইলেন না।

যে মুখে মোগলেরা সেই পার্ব্বত্য পথে প্রবেশ করিয়াছিল, মাণিকলাল সেই পথে নির্গত হইল। যাহারা তাহাকে দেখিল, তাহারা ভাবিল, সে পলাইতেছে। মাণিকলাল গলি হইতে বাহির হইয়া, তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগরের গড়ের দিকে চলিল।

মবারক প্রস্তরখণ্ড পুনরুল্লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, আজ্ঞা দিলেন, "এই পাহাড়ে চড়িতে কষ্ট নাই; সকলেই ঘোড়া লইয়া এই পাহাড়ের উপরে উঠ। দস্যু অল্পসংখ্যক। তাহাদের সমূলে নিপাত করিব।" তখন পাঁচ শত মোগল সেনা, "দীন্! দীন্!" শব্দ করিয়া অশ্ব সহিত বাম দিকের সেই পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। মবারক অধিনায়ক। মোগলদিগের সঙ্গে দুইটা তোপ ছিল। একটা ঠেলিয়া তুলিয়া পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর একটা ছোট তোপ—সেটাকে মোগলেরা টানিয়া, শিকলে বাঁধিয়া, হাতী লাগাইয়া, যে বৃহৎ শিলাখণ্ডের দ্বারা পার্ব্বত্য রন্ধ্র বন্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর উঠাইয়া স্থাপিত করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জয়শীলা চঞ্চলকুমারী

তখন "দীন্! দীন্!" শব্দে পঞ্চশত অশ্বারোহী কালান্তক যমের ন্যায় পর্ব্বতে আরোহণ করিল। পর্ব্বত অনুচ্চ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—শিখরদেশে উঠিতে তাহাদের বড় কালবিলম্ব হইল না। কিন্তু পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া দেখিল যে, কেহ ত পর্ব্বতোপরি নাই। যে রন্ধ্রপথমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজে পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এখন মবারক বুঝিলেন যে, সমুদায় দস্যু—মবারকের বিবেচনায় তাহারা

রাজপুত দস্যু ভিন্ন আর কিছুই নহে—সমুদায় দস্যু সেই রন্ধ্রপথে আছে। তাহার দ্বিতীয় মুখ রোধ করিয়া, তাহাদিগের বিনাশসাধন করিবেন, মবারক এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন। হাসান আলি অপর মুখে কামান পাতিয়া বসিয়া আছেন, এই ভাবিয়া, তিনি সেই রন্ধ্রের ধারে ধারে সৈন্য লইয়া চলিলেন। ক্রমে পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল; তখন মবারক পাহাড়ের ধারে আসিয়া দেখিলেন—চল্লিশ জনের অনধিক রাজপুত, শিবিকাসঙ্গে রুধিরাক্ত কলেবরে সেই পথে চলিতেছে। মবারক বুঝিলেন যে, অবশ্য ইহারা নির্গমপথ জানে; ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিলে, রন্ধ্রদ্বারে উপস্থিত হইব। তাহা হইলে যেরূপ পথে রাজপুতেরা পর্ব্বত হইতে নামিয়াছিল, সেইরূপ অন্য পথ দেখিতে পাইব। রাজপুতেরা যে আগে উপরে ছিল, পরে নামিয়াছে, তাহার সহস্র চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। মবারক রাজপুতদিগের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, পাহাড় ঢালু হইয়া আসিতেছে, সম্মুখে নির্গমের পথ। মবারক অশ্ব সকল তীরবেগে চালাইয়া পর্ব্বততলে নামিয়া রন্ধ্রমুখ বন্ধ করিলেন। রাজপুতেরা রন্ধ্রের বাঁক ফিরিয়া যাইতেছিল—সুতরাং তাহারা আগে রন্ধ্রমুখে পৌঁছিতে পারিল না। মোগলেরা পথরোধ করিয়া রন্ধ্রমুখে কামান বসাইল; এবং আগতপ্রায় রাজপুতগণকে উপহাস করিবার জন্য তাহার বজ্রনাদ একবার শুনাইল—"দীন্! দীন্!" শব্দের সঙ্গে পর্ব্বতে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। শুনিয়া উত্তরস্বরূপ রন্ধ্রের অপর মুখে হাসান আলিও কামানের আওয়াজ করিলেন; আবার পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি বিকট ডাক ডাকিল। রাজপুতগণ শিহরিল—তাহাদের কামান ছিল না।

রাজসিংহ দেখিলেন, আর কোন মতেই রক্ষা নাই। তাঁহার সৈন্যের বিশগুণ সেনা, পথের দুই মুখ বন্ধ করিয়াছে—পথান্তর নাই—কেবল যমমন্দিরের পথ খোলা। রাজসিংহ স্থির করিলেন, সেই পথে যাইবেন। তখন সৈনিকগণকে একত্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ভাই বন্ধু, যে কেহ সঙ্গে থাক, আজি সরলান্তঃকরণে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোষে এ বিপদ্ ঘটিয়াছে—পর্ব্বত হইতে নামিয়াই এ দোষ করিয়াছি। এখন এই গলির দুই মুখ বন্ধ—দুই মুখেই কামান শুনিতেছি! দুই মুখে আমাদের বিশগুণ মোগল দাঁড়াইয়া আছে—সন্দেহ নাই। অতএব আমাদিগের বাঁচিবার ভরসা নাই। নাই—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? রাজপুত হইয়া কে মরিতে কাতর? সকলেই মরিব—একজনও বাঁচিব না—কিন্তু মারিয়া মরিব। যে মরিবার আগে দুইজন মোগল না মারিয়া মরিবে—সে রাজপুত নহে। রাজপুতেরা শুন—এ পথে ঘোড়া ছুটে না—সবাই ঘোড়া ছাড়িয়া দাও।

এসো, আমরা তরবারি হাতে লাফাইয়া গিয়া তোপের উপর পড়ি। তোপ ত আমাদেরই হইবে—তার পর দেখা যাইবে, কত মোগল মারিয়া মরিতে পারি।"

তখন রাজপুতগণ, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, একত্র অসি নিষ্কোষিত করিয়া "মহারাণাকি জয়" বলিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখকান্তি দেখিয়া রাজসিংহ বুঝিলেন যে, প্রাণরক্ষা না হউক—একটি রাজপুতও হটিবে না। সন্তুষ্টচিত্তে রাণা আজ্ঞা দিলেন, "দুই দুই করিয়া সারি দাও।" অশ্বপৃষ্ঠে সবে একে একে যাইতেছিল—পদব্রজে দুইয়ে দুইয়ে রাজপুত চলিল—রাণা সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। আজ আসন্নমৃত্যু দেখিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্ত।

এমন সময়ে সহসা পর্ব্বতরন্ধ্র কম্পিত করিয়া, পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া, রাজপুতসেনা শব্দ করিল, "মাতাজীকি জয়! কালীমায়িকি জয়!"

অত্যন্ত হর্ষসূচক ঘোর রব শুনিয়া রাজসিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, ব্যাপার কি? দেখিলেন, দুই পার্শ্বে রাজপুতসেনা সারি দিয়াছে—মধ্যে বিশাললোচনা, সহাস্যবদনা কোন দেবী আসিতেছেন। হয় কোন দেবী মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন—নয় কোন মানবীকে বিধাতা দেবীর মূর্ত্তিতে গঠিয়াছেন—রাজপুতেরা মনে করিল, চিতোরাধিষ্ঠাত্রী রাজপুতকুল-রক্ষিণী ভগবতী এ সঙ্কটে রাজপুতকে রক্ষা করিতে স্বয়ং রণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই তাহারা জয়ধ্বনি করিতেছিল।

রাজসিংহ দেখিলেন—এ ত মানবী, কিন্তু সামান্যা মানবী নহে। ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, দোলা কোথায়?"

একজন পিছু হইতে বলিল, "দোলা এই দিকে আছে।"

রাণা বলিলেন, "দেখ, দোলা খালি কি না?"

সৈনিক বলিল, "দোলা খালি। কুমারীজী মহারাজের সামনে।"

চঞ্চলকুমারী তখন রাজসিংহকে প্রণাম করিলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারি—আপনি এখানে কেন?"

চঞ্চল বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। প্রণাম করিয়াছি—এখন একটি ভিক্ষা চাহি। আমি মুখরা—স্ত্রীলোকের শোভা যে লজ্জা, তাহা আমাতে নাই, ক্ষমা করিবেন। ভিক্ষা যাহা চাহি—তাহাতে নিরাশ করিবেন না।"

চঞ্চলকুমারী হাস্য ত্যাগ করিয়া, যোড়হাত করিয়া কাতর স্বরে এই কথা বলিলেন। রাজসিংহ বলিলেন, "তোমারই জন্য এত দূর আসিয়াছি—তোমাকে অদেয় কিছুই নাই—কি চাও, রূপনগরের কন্যে?"

চঞ্চলকুমারী আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, "আমি চঞ্চলমতি বালিকা বলিয়া আপনাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আমি নিজের মন আপনি বুঝিতে পারি নাই। আমি এখন মোগলসম্রাটের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া বড় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি অনুমতি করুন—আমি দিল্লী যাইব।"

রাজসিংহ বিস্মিত ও প্রীত হইলেন। বলিলেন, "তোমার দিল্লী যাইতে হয় যাও—আমার আপত্তি নাই—কিন্তু আপাততঃ তুমি যাইতে পাইবে না। যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিই, মোগল মনে করিবে যে, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আগে যুদ্ধ শেষ হউক—তার পর তুমি যাইও। আর তোমার মনের কথা যে বুঝি নাই, তাহা মনে করিও না। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে দিল্লী যাইতে হইবে না। যোওয়ান্ সব—আগে চল।"

তখন চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসিয়া মর্ম্মভেদী মৃদু কটাক্ষ করিয়া, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীয় বাম হস্তের অঙ্গুলিদ্বয়ের দ্বারা ফিরাইয়া রাজসিংহকে দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, "মহারাজ! এই আঙ্গ্‌টিতে বিষ আছে। দিল্লীতে না যাইতে দিলে, আমি বিষ খাইব।"

রাজসিংহ তখন হাসিলেন—বলিলেন, "অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি রাজকুমারী—রমণীকুলে তুমি ধন্যা। কিন্তু তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা হইবে না। আজ রাজপুতের বাঁচা হইবে না; আজ রাজপুতকে মরিতেই হইবে—নহিলে রাজপুতনামে বড় কলঙ্ক হইবে। আমরা যতক্ষণ না মরি—ততক্ষণ তুমি বন্দী। আমরা মরিলে তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইও।"

চঞ্চলকুমারী হাসিল—অতিশয় প্রণয়প্রফুল্ল, ভক্তিপ্রণোদিত, সাক্ষাৎ মহাদেবের অনিবার্য্য এক কটাক্ষবাণ রাজসিংহের উপর ত্যাগ করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, "বীরচূড়ামণি! আজি হইতে আমি তোমার দাসী হইলাম! যদি তোমার দাসী না হই—তবে চঞ্চল কখনই প্রাণ রাখিবে না।" প্রকাশ্যে বলিল, "মহারাজ! দিল্লীশ্বর যাহাকে মহিষী করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সে কাহারও বন্দী নহে। এই আমি মোগল সৈন্য-সম্মুখে চলিলাম—কাহার সাধ্য রাখে দেখি?"

এই বলিয়া চঞ্চলকুমারী—জীবন্ত দেবমূর্ত্তি, রাজসিংহকে পাশ করিয়া রন্ধ্রমুখে চলিল। তাঁহাকে স্পর্শ করে কাহার সাধ্য? এজন্য কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে, হেলিতে দুলিতে, সেই স্বর্ণমুক্তাময়ী প্রতিমা রন্ধ্রমুখে চলিয়া গেল।

একাকিনী চঞ্চলকুমারী সেই প্রজ্বলিত বহ্নিতুল্য রুষ্ট, সশস্ত্র পঞ্চ শত মোগল অশ্বারোহীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যেখানে সেই পথরোধকারী কামান—মনুষ্যনির্ম্মিত বজ্র, অগ্নি উদ্গীর্ণ করিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে—তাহার সম্মুখে, রত্নমণ্ডিতা লোকাতীত সুন্দরী দাঁড়াইল। দেখিয়া বিস্মিত মোগলসেনা মনে করিল—পর্ব্বতনিবাসিনী পরি আসিয়াছে।

মনুষ্যভাষায় কথা কহিয়া চঞ্চলকুমারী সে ভ্রম ভাঙ্গিল।—বলিল, "এ সেনার সেনাপতি কে?"

মবারক স্বয়ং রন্ধ্রমুখে রাজপুতগণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তিনি বলিলেন, "ইহারা এখন অধমের অধীন। আপনি কে?"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "আমি সামান্যা স্ত্রী। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা আছে—যদি অন্তরালে শুনেন, তবেই বলিতে পারি।"

মবারক বলিলেন, "তবে রন্ধ্রমধ্যে আগু হউন।" চঞ্চলকুমারী রন্ধ্রমধ্যে অগ্রসর হইলেন—মবারক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

যেখানে কথা অন্যে শুনিতে পায় না, এমন স্থানে আসিয়া চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "আমি রূপনগরের রাজকন্যা। বাদশাহ আমাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে আমাকে লইতে এই সেনা পাঠাইয়াছেন—এ কথা বিশ্বাস করেন কি?"

মবারক। আপনাকে দেখিয়াই সে বিশ্বাস হয়।

চঞ্চল। আমি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক—ধর্ম্মে পতিত হইব মনে করি। কিন্তু পিতা ক্ষীণবল—তিনি আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন।—তাঁহা হইতে কোন ভরসা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কাছে দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম—আমার কপালক্রমে তিনি পঞ্চাশ জন মাত্র শিপাহী লইয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের বলবীর্য্য ত দেখিলেন?

মবারক চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি—পঞ্চাশ জন শিপাহী এত মোগল মারিল?"

চঞ্চল। বিচিত্র নহে—হলদীঘাটে ঐ রকম কি একটা হইয়াছিল শুনিয়াছি। কিন্তু সে যাহাই হউক—রাজসিংহ এক্ষণে আপনার নিকট পরাস্ত। তাঁহাকে পরাস্ত দেখিয়াই আমি আসিয়া ধরা দিতেছি। আমাকে দিল্লী লইয়া চলুন—যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই।

মবারক বলিল, "বুঝিয়াছি, নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া আপনি রাজপুতের প্রাণরক্ষা করিতে চাহেন। তাঁহাদেরও কি সেই ইচ্ছা?"

চ। সেও কি সম্ভবে? আমাকে আপনারা লইয়া চলিলেও তাহারা যুদ্ধ ছাড়িবে না। আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে একমত হইয়া আপনি তাহাদের প্রাণরক্ষা করুন।

ম। তাহা পারি। কিন্তু দস্যুর দণ্ড অবশ্য দিতে হইবে। আমি তাঁহাদের বন্দী করিব।

চ। সব পারিবেন—সেইটি পারিবেন না। তাঁহাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিবেন, কিন্তু বাঁধিতে পারিবেন না। তাঁহারা সকলেই মরিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন—মরিবেন।

ম। তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি দিল্লী যাইবেন, ইহা স্থির?

চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাততঃ যাওয়াই স্থির। দিল্লী পর্য্যন্ত পৌঁছিব কি না, সন্দেহ।

ম। সে কি?

চ। আপনারা যুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি শুধু শুধু মরিতে জানি না?

ম। আমাদের শত্রু আছে, তাই মরি। ভুবনে কি আপনার শত্রু আছে?

চ। আমি নিজে—

ম। আমাদের শত্রুর অনেক প্রকার অস্ত্র আছে—আপনার?

চ। বিষ।

ম। কোথায় আছে?

বলিয়া মবারক চঞ্চলকুমারীর মুখপানে চাহিলেন। বুঝি অন্য কেহ হইলে তাহার মনে মনে হইত, নয়ন ছাড়া আর কোথাও বিষ আছে কি? কিন্তু মবারক সে ইতরপ্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন না। তিনি রাজসিংহের ন্যায় যথার্থ বীরপুরুষ। তিনি বলিলেন, "মা, আত্মঘাতিনী কেন হইবেন? আপনি যদি যাইতে না চাহেন, তবে আমাদের সাধ্য কি, আপনাকে লইয়া যাই? স্বয়ং দিল্লীশ্বর উপস্থিত থাকিলেও আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিতেন না—আমরা কোন্ ছার? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—কিন্তু এ রাজপুতেরা বাদশাহের সেনা আক্রমণ করিয়াছে—আমি মোগলসেনাপতি হইয়া কি প্রকারে উহাদের ক্ষমা করি?"

চ। ক্ষমা করিয়া কাজ নাই—যুদ্ধ করুন।

এই সময়ে রাজপুতগণ লইয়া রাজসিংহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন—তখন চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "যুদ্ধ করুন—রাজপুতের মেয়েরাও মরিতে জানে।"

মোগলসেনাপতির সঙ্গে লজ্জাহীনা চঞ্চল কি কথা কহিতেছে, শুনিবার জন্য রাজসিংহ এই সময়ে চঞ্চলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চঞ্চল তখন তাঁহার কাছে হাত পাতিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! আপনার কোমরে যে তরবারি ঝুলিতেছে, রাজপ্রসাদ-স্বরূপ দাসীকে উহা দিতে আজ্ঞা হউক।"

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি সত্য সত্যই ভৈরবী।" এই বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অসি নির্ম্মুক্ত করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিলেন।

দেখিয়া মোগল ঈষৎ হাসিল। চঞ্চলকুমারীর কথার কোন উত্তর করিল না। কেবল রাজসিংহের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "উদয়পুরের বীরেরা কত দিন হইতে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত?"

রাজসিংহের দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "যত দিন হইতে মোগল বাদশাহ অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তত দিন হইতে রাজপুতকন্যাদিগের বাহুতে বল হইয়াছে।" তখন রাজসিংহ সিংহের ন্যায় গ্রীবাভঙ্গের সহিত, স্বজনবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রাজপুতেরা বাগ্‌যুদ্ধে অপটু। ক্ষুদ্র সৈনিক-দিগের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধের আমার সময়ও নাই। বৃথা কালহরণে প্রয়োজন নাই—পিপীলিকার মত এই মোগলদিগকে মারিয়া ফেল।"

এতক্ষণ বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় উভয় সৈন্য স্তম্ভিত হইয়াছিল—প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত কেহই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছিল না। এক্ষণে রাণার আজ্ঞা পাইয়া "মাতাজীকি জয়!" শব্দে রাজপুতেরা জলপ্রবাহবৎ মোগল সেনার উপরে পড়িল। এদিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া, মোগলেরা "আল্লা—হো—আক্‌বর!" শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সহসা উভয় সেনাই নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল। সেই রণক্ষেত্রে উভয় সেনার মধ্যে অসি উত্তোলন করিয়া—স্থিরমূর্ত্তি চঞ্চলকুমারী দাঁড়াইয়া—সরিতেছে না।

চঞ্চলকুমারী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যতক্ষণ না এক পক্ষ নিবৃত্ত হয়—ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না। অগ্রে আমাকে না মারিয়া কেহ অস্ত্রচালনা করিতে পারিবে না।"

রাজসিংহ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমার এ অকর্ত্তব্য। স্বহস্তে তুমি রাজপুতকুলে কলঙ্ক লেপিতেছ কেন? লোকে বলিবে, আজ স্ত্রীলোকের সাহায্যে রাজসিংহ প্রাণরক্ষা করিল।"

চ। মহারাজ! আপনাকে মরিতে কে নিষেধ করিতেছে? আমি কেবল আগে মরিতে চাহিতেছি। যে অনর্থের মূল—তাহার আগে মরিবার অধিকার আছে।

চঞ্চল নড়িল না—মোগলেরা বন্দুক উঠাইয়াছিল—নামাইল। মবারক চঞ্চলকুমারীর কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন উভয় সেনাসমক্ষে মবারক ডাকিয়া বলিলেন, "মোগল বাদশাহ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করেন না—অতএব বলি, আমরা এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া যাই। রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মীমাংসা, ভরসা করি, ক্ষেত্রান্তরে হইবে। আমি রাণাকে অনুরোধ করিয়া যাইতেছি যে, সেবার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া না আইসেন।"

চঞ্চলকুমারী মবারকের জন্য চিন্তিত হইলেন। মবারক তখন তাঁহার নিকটে—অশ্বে আরোহণ করিতেছেন মাত্র। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে বলিলেন, "সাহেব! আমাকে ফেলিয়া যাইতেছেন কেন? আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আপনাদের দিল্লীশ্বর পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাকে যদি লইয়া না যান, তবে বাদশাহ কি বলিবেন?"

মবারক বলিল, "বাদশাহের বড় আর একজন আছেন। উত্তর তাঁহার কাছে দিব।"

চঞ্চল। সে ত পরলোকে, কিন্তু ইহলোকে?

মবারক। মবারক আলি, ইহলোকে কাহাকেও ভয় করে না। ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন—আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া মবারক অশ্বে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যকে ফিরিতে আদেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাতে একেবারে সহস্র বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। একেবারে শত মোগল যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। মবারক দেখিলেন, ঘোর বিপদ্!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হরণ ও অপহরণে দক্ষ মাণিকলাল

মাণিকলাল পার্ব্বত্য পথ হইতে নির্গত হইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে রূপনগরের গড়ে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রূপনগরের রাজার কিছু সিপাহী ছিল, তাহারা বেতনভোগী চাকর নহে; জমী করিত; ডাক হাঁক করিলে ঢাল, খাঁড়া, লাঠি, সোঁটা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত; এবং সকলেরই এক একটি ঘোড়া ছিল। মোগলসেনা আসিলে

রূপনগরের রাজা তাহাদিগকে ডাক হাঁক করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে তাহাদিগের ডাকিবার কারণ, মোগলসৈন্যের সম্মান ও খবরদারিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা। গোপন অভিপ্রায় —যদি মোগলসেনা হঠাৎ কোন উপদ্রব উপস্থিত করে, তবে তাহার নিবারণ। ডাকবামাত্র রাজপুতেরা ঢাল, খাঁড়া, ঘোড়া লইয়া গড়ে উপস্থিত হইল—রাজা তাহাদিগকে অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র দিয়া সাজাইলেন। তাহারা নানাবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া মোগল-সৈনিকদিগের সহিত হাস্য পরিহাস ও রঙ্গ রসে কয়দিবস কাটাইল। তাহার পর ঐ দিবস প্রভাতে মোগলসেনা শিবির ভঙ্গ করিয়া রাজকুমারীকে লইয়া যাওয়াতে, রূপনগরের সৈনিকেরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা পাইল। তখন তাহারা অশ্ব সজ্জিত করিল এবং অস্ত্র সকল রাজার অস্ত্রাগারে ফিরাইয়া দিবার জন্য লইয়া আসিল। রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া স্নেহসূচক বাক্যে বিদায় দিতেছিলেন, এমত সময়ে আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল ঘর্ম্মাক্তকলেবরে অশ্ব সহিত সেখানে উপস্থিত হইল।

মাণিকলালের সেই মোগলসৈনিকের বেশ। একজন মোগলসৈনিক অতি ব্যস্ত হইয়া গড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ ?"

মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ, বড় গণ্ডগোল বাধিয়াছে, পাঁচ হাজার দস্যু আসিয়া রাজকুমারীকে ঘিরিয়াছে। জুনাব্ হাসান আলি খাঁ বাহাদুর, আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন—তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু আর কিছু সৈন্য ব্যতীত রক্ষা পাইতে পারিবেন না। আপনার নিকট সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছেন।"

রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আমার সৈন্য সজ্জিতই আছে।" সৈনিকগণকে বলিলেন, "তোমাদের ঘোড়া তৈয়ার, হাতিয়ার হাতে তোমরা সওয়ার হইয়া এখনই যুদ্ধে চল। আমি স্বয়ং তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি।"

মাণিকলাল বলিল, "যদি এ দাসের অপরাধ মাপ হয়, তবে আমি নিবেদন করি যে, ইহাদিগকে লইয়া আমি অগ্রসর হই। মহারাজ আর কিছু সেনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসুন। দস্যুরা সংখ্যায় প্রায় পাঁচ হাজার। আরও কিছু সেনাবল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

স্থূলবুদ্ধি রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহস্র সৈনিক লইয়া মাণিকলাল অগ্রসর হইল ; রাজা আরও সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টায় গড়ে রহিলেন। মাণিক সেই রূপনগরের সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিল।

পথে যাইতে যাইতে মাণিকলাল একটি ছোট রকম লাভ করিল। পথের ধারে একটি বৃক্ষের ছায়ায় একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে—বোধ হয় যেন পীড়িতা। অশ্বারোহী সৈন্য প্রধাবিত দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল—দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল—বোধ হয় পলাইবার ইচ্ছা, কিন্তু পারিল না। বল নাই, ইহা দেখিয়া মাণিকলাল ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার নিকটে গেল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি অতিশয় সুন্দরী। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা, এখানে এ প্রকারে পড়িয়া আছ ?"

যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কাহার ফৌজ ?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি রাণা রাজসিংহের ভৃত্য।"

যুবতী বলিল, "আমি রূপনগরের রাজকুমারীর দাসী।"

মাণিক। তবে এখানে এ অবস্থায় কেন ?

যুবতী। রাজকুমারীকে দিল্লী লইয়া যাইতেছে। আমি সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে রাজি হয়েন নাই। ফেলিয়া আসিয়াছেন। আমি তাই হাঁটিয়া তাঁহার কাছে যাইতেছিলাম।

মাণিকলাল বলিল, "তাই পথশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া আছ ?"

নির্ম্মলকুমারী বলিল, "অনেক পথ হাঁটিয়াছি—আর পারিতেছি না।"

পথ এমন বেশী নয়—তবে নির্ম্মল কখনও পথ হাঁটে নাই, তার পক্ষে অনেক বটে।

মাণিক। তবে এখন কি করিবে ?

নির্ম্মল। কি করিব—এইখানে মরিব।

মাণিক। ছি! মরিবে কেন ? রাজকুমারীর কাছে চল না কেন ?

নির্ম্মল। যাইব কি প্রকারে ? হাঁটিতে পারিতেছি না, দেখিতেছ না ?

মাণিক। কেন, ঘোড়ায় চল না ?

নির্ম্মল হাসিল, বলিল, "ঘোড়ায় ?"

মাণিক। ঘোড়ায়। ক্ষতি কি ?

নির্ম্মল। আমি কি সওয়ার ?

মাণিক। হও না।

নির্ম্মল। আপত্তি নাই। তবে একটা প্রতিবন্ধক আছে—ঘোড়ায় চড়িতে জানি না।

মাণিক। তার জন্য কি আটকায় ? আমার ঘোড়ায় চড় না ?

নির্ম্মল। তোমার ঘোড়া কলের? না মাটির?

মাণিক। আমি ধরিয়া থাকিব।

নির্ম্মল, লজ্জারহিতা হইয়া রসিকতা করিতেছিল—এবার মুখ ফিরাইল। তার পর ভ্রূকুটি করিল; রাগ করিয়া বলিল, "আপনি আপনার কাজে যান, আমি আমার গাছতলায় পড়িয়া থাকি। রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাতে আমার কাজ নাই।"

মাণিকলাল দেখিল, মেয়েটি বড় সুন্দরী। লোভ সামলাইতে পারিল না। বলিল, "হাঁ গা! তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

রহস্যপরায়ণা নির্ম্মল মাণিকলালের রকম দেখিয়া হাসিল, বলিল, "না।"

মাণিক। তুমি কি জাতি?

নির্ম্মল। আমি রাজপুতের মেয়ে।

মাণিক। আমিও রাজপুতের ছেলে। আমারও স্ত্রী নাই। আমার একটি ছোট মেয়ে আছে, তার একটি মা খুঁজি। তুমি তার মা হইবে? আমায় বিবাহ করিবে? তা হইলে আমার সঙ্গে একত্র ঘোড়ায় চড়ায় কোন আপত্তি হয় না।

নির্ম্মল। শপথ কর।

মাণিক। কি শপথ করিব?

নির্ম্মল। তরবার ছুঁইয়া শপথ কর যে, আমাকে বিবাহ করিবে।

মাণিকলাল তরবারি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে, "যদি আজিকার যুদ্ধে বাঁচি, তবে তোমাকে বিবাহ করিব।"

নির্ম্মল বলিল, "তবে চল, ঘোড়ায় চড়ি।"

মাণিকলাল তখন সহর্ষ চিত্তে নির্ম্মলকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া, সাবধানে তাহাকে ধরিয়া অশ্বচালনা করিতে লাগিল।

বোধ হয়, কোর্ট্‌শিপ্‌টা পাঠকের বড় ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকালসঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—"হে প্রাণ!" "হে প্রাণাধিক!" সে সব কিছুই নাই—ধিক্!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফলভোগী রাণা

যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী এক নিভৃত স্থানে নির্ম্মলকে নামাইয়া দিয়া, তাহাকে সেইখানে বসিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া, মাণিকলাল, যেখানে রাজসিংহের সঙ্গে মবারকের যুদ্ধ হইতেছিল, একেবারে সেইখানে, মবারকের পশ্চাতে উপস্থিত হইল।

মাণিকলাল দেখিয়া যায় নাই যে, তৎপ্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু রন্ধ্র-পথে রাজসিংহ প্রবেশ করিয়াছেন; হঠাৎ তাহার শঙ্কা হইয়াছিল যে, মোগলেরা রন্ধ্রের এই মুখ বন্ধ করিয়া রাজসিংহকে বিনষ্ট করিবে। সেই জন্যই সে রূপনগরে সৈন্য সংগ্রহার্থে গিয়াছিল, এবং সেই জন্য সে প্রথমেই এই দিকে রূপনগরের সেনা লইয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বুঝিল যে, রাজপুতগণের নাভিশ্বাস উপস্থিত বলিলেই হয়—মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। তখন মাণিকলাল মবারকের সেনার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ সকল দস্যু! উহাদিগকে মারিয়া ফেল।"

সৈনিকেরা কেহ কেহ বলিল, "উহারা যে মুসলমান!"

মাণিকলাল বলিল, "মুসলমান কি লুঠেরা হয় না? হিন্দুই কি যত দুষ্ক্রিয়াকারী? মার।"

মাণিকলালের আজ্ঞায় একেবারে হাজার বন্দুকের শব্দ হইল।

মবারক ফিরিয়া দেখিলেন, কোথা হইতে সহস্র অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে। মোগলেরা ভীত হইয়া আর যুদ্ধ করিল না। যে যে দিকে পারিল, সে সেই দিকে পলায়ন করিল। মবারক রাখিতে পারিল না। তখন রাজপুতেরা "মাতাজীকি জয়!" বলিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

মবারকের সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, রূপনগরের সেনা তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। মবারক সেনা ফিরাইতে গিয়া, সহসা অশ্বসমেত অদৃশ্য হইলেন।

এই অবসরে মাণিকলাল বিস্মিত রাজসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন, রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ কাণ্ড মাণিকলাল? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কিছু জান?"

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল, "জানি। যখন আমি দেখিলাম যে, মহারাজ রন্ধ্রপথে নামিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। প্রভুর রক্ষার্থ আমাকে আবার একটি নূতন জুয়াচুরি করিতে হইয়াছে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে রাণাকে শুনাইল। আপ্যায়িত হইয়া রাণা মাণিকলালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "মাণিকলাল! তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত। তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, যদি কখন উদয়পুর ফিরিয়া যাই, তবে তাহার পুরস্কার করিব। কিন্তু তুমি আমাকে বড় সাধে বঞ্চিত করিলে। আজ মুসলমানকে দেখাইতাম যে, রাজপুত কেমন করিয়া মরে!"

মাণিকলাল বলিল, "মহারাজ! মোগলকে সে শিক্ষা দিবার জন্য মহারাজের অনেক ভৃত্য আছে। সেটা রাজকার্য্যের মধ্যে গণনীয় নহে। এখন উদয়পুরের পথ খোলসা। রাজধানী ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে রাজকুমারীকে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করুন।"

রাজসিংহ বলিলেন, "আমার কতকগুলি সঙ্গী এখন ও দিকের পাহাড়ের উপরে আছে—তাহাদের নামাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি তাহাদিগকে লইয়া যাইব। আপনি অগ্রসর হউন। পথে আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

রাণা সম্মত হইয়া, চঞ্চলকুমারীর সহিত উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্নেহশালিনী পিসী

রাণাকে বিদায় দিয়া, মাণিকলাল রূপনগরের সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ব্বতারোহণ করিল। পলায়নপরায়ণ মোগলসেনা তৎকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যে যেখানে পাইল, পলায়ন করিল। তখন মাণিকলাল রূপনগরের সৈনিকদিগকে বলিলেন, "শত্রুদল পলায়ন করিয়াছে—আর কেন বৃথা পরিশ্রম করিতেছ? কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, রূপনগরে ফিরিয়া যাও।" সৈনিকেরাও দেখিল—তাও বটে, সম্মুখশত্রু আর কেহ নাই। মাণিকলাল যে একটা কারসাজি করিয়াছে, ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিল। হঠাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে,

তাহার আর উপায় নাই দেখিয়া, তাহারা লুঠপাটে প্রবৃত্ত হইল। এবং যথেষ্ট ধন সম্পত্তি অপহরণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে, হাসিতে হাসিতে, বাদশাহের জয়ধ্বনি তুলিয়া রণজয়গর্ব্বে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দণ্ডকাল মধ্যে পার্ব্বত্য পথ জনশূন্য হইল—কেবল হত ও আহত মনুষ্য ও অশ্ব সকল পড়িয়া রহিল। দেখিয়া, উচ্চ পর্ব্বতের উপরে প্রস্তরসঞ্চালনে যে সকল রাজপুত নিযুক্ত ছিল, তাহারা নামিল। এবং কোথাও কাহাকেও না দেখিয়া, রাণা অবশিষ্ট সৈন্য সহিত অবশ্য উদয়পুর যাত্রা করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া, তাহারাও তাঁহার সন্ধানে সেই পথে চলিল। পথিমধ্যে রাজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলে একত্রে উদয়পুরে চলিলেন।

সকলে যুটিল—কেবল মাণিকলাল নহে। মাণিকলাল, নির্ম্মলকে লইয়া বিব্রত। সকলকে গুছাইয়া পাঠাইয়া দিয়া, নির্ম্মলের কাছে আসিয়া যুটিল। তাহাকে কিছু ভোজন করাইয়া, গ্রাম হইতে বাহক ও দোলা লইয়া আসিল। দোলায় নির্ম্মলকে তুলিয়া, যে পথে রাণা গিয়াছেন, সে পথে না গিয়া ভিন্ন পথে চলিল—বমাল সমেত ধরা পড়ে, এমন ইচ্ছা রাখে না।

মাণিকলাল নির্ম্মলকে লইয়া পিসীর বাড়ী উপস্থিত হইল। পিসীমাকে ডাকিয়া বলিল, "পিসীমা, একটা বউ এনেছি।" বধূ দেখিয়া পিসীমা কিছু বিষণ্ন হইলেন—মনে করিলেন, লাভের যে আশা করিয়াছিলাম, বধূ বুঝি তাহার ব্যাঘাত করিবে। কি করে, ছুইটা আশরফি নগদ লইয়াছে—একদিন অন্ন না দিয়া বহুকে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। সুতরাং বলিল, "বেশ বউ।"

মাণিকলাল বলিল, "পিসী, বহুর সঙ্গে আমার আজিও বিবাহ হয় নাই।"

পিসীমা বুঝিলেন, তবে এটা উপপত্নী। যো পাইয়া বলিলেন, "তবে আমার বাড়ীতে—"

মাণিকলাল। তার ভাবনা কি? বিয়ে দাও না? আজই বিবাহ হউক।

নির্ম্মল লজ্জায় অধোবদন হইল।

পিসীমা আবার যো পাইলেন; বলিলেন, "সে ত সুখের কথা—তোমার বিবাহ দিব না ত কার বিবাহ দিব? তা বিবাহের ত কিছু খরচ চাই?"

মাণিকলাল বলিল, "তার ভাবনা কি?"

পাঠকের জানা থাকিতে পারে, যুদ্ধ হইলেই লুঠ হয়। মাণিকলাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিবার সময়ে নিহত মোগল সওয়ারদিগের বস্ত্রমধ্যে অনুসন্ধান করিয়া কিছু সংগ্রহ

করিয়া আসিয়াছিলেন—ঝনাৎ করিয়া পিসীর কাছে গোটাকত আশরফি ফেলিয়া দিলেন, পিসীমা আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া পেটারায় তুলিয়া রাখিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে বাহির হইলেন। বিবাহের উদ্যোগের মধ্যে ফুল চন্দন ও পুরোহিত সংগ্রহ, সুতরাং আশরফিগুলি পিসীমাকে পেটারা হইতে আর বাহির করিতে হইল না। মাণিকলালের লাভের মধ্যে তিনি যথাশাস্ত্র নির্ম্মলকুমারীর স্বামী হইলেন। বলা বাহুল্য যে, মাণিকলাল রাণার সৈনিকদিগের মধ্যে বিশেষ উচ্চ পদ লাভ করিলেন, এবং নিজগুণে সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চম খণ্ড

অগ্নির আয়োজন

প্রথম পরিচ্ছেদ

শাহজাদী অপেক্ষা দুঃখী ভাল

বলিয়াছি, মবারক রণভূমিতে পর্ব্বতের সানুদেশে সহসা অদৃশ্য হইলেন। অদৃশ্য হইবার কারণ, তিনি যে পথে অশ্বারোহণে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন, তাহার মধ্যে একটা কূপ ছিল। কেহ পর্ব্বতোপরি বাস করিবার অভিপ্রায়ে জলের জন্য এই কূপটি খনন করিয়াছিল। এক্ষণে চারি পাশের জঙ্গল কূপের মুখে পড়িয়া কূপটি আচ্ছাদন করিয়াছিল। মবারক তাহা না দেখিতে পাইয়া উপর দিয়া ঘোড়া চালাইলেন। ঘোড়া সমেত তাহার ভিতর পড়িয়া গিয়া অদৃশ্য হইলেন। তাহার ভিতর জল ছিল না। কিন্তু পতনের আঘাতেই ঘোড়াটি মরিয়া গেল। মবারক পতনকালে সতর্ক হইয়াছিলেন, তিনি বড় বেশী আঘাত পাইলেন না। কিন্তু কূপ হইতে উঠিবার কোন উপায় দেখিলেন না। যদি কেহ শব্দ শুনিয়া তাঁহার উদ্ধার করে, এজন্য ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধের কোলাহলে তিনি কোন উত্তর শুনিতে পাইলেন না। কেবল একবার যেন, দূর হইতে কে বলিল, "স্থির হইয়া থাক—তুলিব।" সেটাও সন্দেহ মাত্র।

যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, রণক্ষেত্র নিঃশব্দ হইলে, কেহ যেন কূপের উপর হইতে বলিল, "বাঁচিয়া আছ?"

মবারক উত্তর করিল, "আছি। তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি যে হই। বড় জখম হইয়াছ কি?"

"সামান্য।"

"আমি একটা কাঠে, দুই চারিখানা কাপড় বাঁধিয়া লম্বা দড়ির মত করিয়াছি। পাকাইয়া মজবুত করিয়াছি। তাহা কুয়ার ভিতর ফেলিয়া দিতেছি। দুই হাতে কাঠের দুই দিক্ ধর—আমি টানিয়া তুলিতেছি।"

মবারক বিস্মিত হইয়া বলিল, "এ যে স্ত্রীলোকের স্বর! কে তুমি?"

স্ত্রীলোক বলিল, "এ গলা কি চেন না?"

মবা। চিনিতেছি। দরিয়া এখানে কোথা হইতে?

দরিয়া বলিল, "তোমারই জন্য। এখন তুলিতেছি—উঠ।"

এই বলিয়া দরিয়া কাপড়ের কাছিতে বাঁধা কাঠখানা কূপের ভিতর ফেলিয়া দিল। তরবারি দিয়া কূপের মুখের জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিয়া দিল। মবারক কাঠের দুই দিক্ ধরিল। দরিয়া তখন টানিয়া তুলিতে লাগিল। জোরে কুলায় না। কান্না আসিতে লাগিল। তখন দরিয়া একটা বৃক্ষের বিনত শাখার উপর বস্ত্ররজ্জু স্থাপন করিয়া, শুইয়া পড়িয়া টানিতে লাগিল। মবারক উঠিল। দরিয়াকে দেখিয়া মবারক বিস্মিত হইল। বলিল, "এ কি? এ বেশ কেন?"

দরিয়া বলিল, "আমি বাদশাহী সওয়ার।"

মবা। কেন?

দরি। তোমারই জন্য।

মবা। কেন?

দরি। নহিলে তোমাকে আজ বাঁচাইত কে?

মবা। সেই জন্য কি দিল্লী হইতে এখানে আসিয়াছ? সেই জন্য কি সওয়ার সাজিয়াছ? এ যে রক্ত দেখিতেছি! তুমি যে জখম হইয়াছ! কেন এ করিলে?

দরি। তোমার জন্য করিয়াছি। না করিলে, তুমি বাঁচিতে কি? শাহজাদী কেমন ভালবাসে?

মবারক ম্লানমুখে, ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "শাহজাদীরা ভালবাসে না।"

দরিয়া বলিল, "আমরা দুঃখী,—আমরা ভাল বাসি। এখন বসো। আমি তোমার জন্য দোলা স্থির করিয়া রাখিয়াছি। লইয়া আসিতেছি। তোমার চোট লাগিয়াছে—ঘোড়ায় চড়া সৎপরামর্শ হইবে না।"

যে সকল দোলা মোগল সেনার সঙ্গে ছিল, যুদ্ধে ভীত হইয়া তাহার বাহকেরা কতকগুলি লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। দরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মবারককে কূপমগ্ন হইতে দেখিয়া, প্রথমেই দোলার সন্ধানে গিয়াছিল। পলাতক বাহকদিগকে সন্ধান করিয়া, দুইখানা দোলা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। তার পর এখন, সেই দোলা ডাকিয়া আনিল। একখানায় আহত মবারককে তুলিল। একখানায় স্বয়ং উঠিল। তখন মবারককে লইয়া দরিয়া দিল্লীর

পথে চলিল। দোলায় উঠিবার সময় মবারক দরিয়ার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।"

উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া, দরিয়া মবারকের শুশ্রূষা করিল। দরিয়ার চিকিৎসাতেই মবারক আরোগ্য লাভ করিল।

দিল্লীতে পৌঁছিলে, মবারক দরিয়ার হাত ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া গেল। দিন কত ইহাতে উভয়ে বড় সুখী হইল। তার পর ইহার যে ফল উপস্থিত হইল, তাহা ভয়ানক। দরিয়ার পক্ষে ভয়ানক, মবারকের পক্ষে ভয়ানক, জেব্-উন্নিসার পক্ষে ভয়ানক, ঔরঙ্গজেবের পক্ষে ভয়ানক। সে অপূর্ব্ব রহস্য আমি পশ্চাৎ বলিব। এক্ষণে চঞ্চলকুমারীর কথা কিছু বলা আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজসিংহের পরাভব

রাজসিংহ উদয়পুরে আসিলেন বলিয়াছি। চঞ্চলকুমারীর উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ, এজন্য চঞ্চলকুমারীকেও উদয়পুরে লইয়া আসিয়া রাজাবরোধে সংস্থাপিতা করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে উদয়পুরে রাখিবেন, কি রূপনগরে তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিবেন, ইহার মীমাংসা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। তিনি যত দিন ইহার সুমীমাংসা করিতে না পারিলেন, তত দিন চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

এ দিকে চঞ্চলকুমারী রাজার ভাবগতিক দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, "রাজা যে আমাকে বিবাহ করিয়া গ্রহণ করিবেন, এমন ত ভাবগতিক কিছুই দেখিতেছি না। যদি না করেন, তবে কেন আমি উঁহার অন্তঃপুরে বাস করিব? যাবই বা কোথায়?"

রাজসিংহ কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া, কতিপয় দিন পরে, চঞ্চলকুমারীর মনের ভাব জানিবার জন্য তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যাইবার সময়ে, যে পত্রখানি চঞ্চলকুমারী অনন্ত মিশ্রের হাতে পাঠাইয়াছিলেন, যাহা রাজসিংহ মাণিকলালের নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া গেলেন।

রাণা আসন গ্রহণ করিলে, চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, সলজ্জ এবং বিনীত-ভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকমনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া রাজা একটু মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তখনই মোহ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাজকুমারী! এক্ষণে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা জানিবার জন্য আমি আসিয়াছি। তোমার পিত্রালয়ে যাইবার অভিলাষ, না এইখানে থাকিতেই প্রবৃত্তি ?"

শুনিয়া চঞ্চলকুমারীর হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না—নীরবে রহিলেন।

তখন রাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রখানি বাহির করিয়া চঞ্চলকুমারীকে দেখাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তোমার পত্র বটে ?"

চঞ্চল বলিল, "আজ্ঞা হাঁ।"

রাণা। কিন্তু সবটুকু এক হাতের লেখা নহে। দুই হাতের লেখা দেখিতেছি। তোমার নিজের হাতের কোন অংশ আছে কি ?

চঞ্চল। প্রথম ভাগটা আমার হাতের লেখা।

রাণা। তবে শেষ ভাগটা অন্যের লেখা ?

পাঠকের স্মরণ থাকিবে যে, এই শেষ অংশেই বিবাহের প্রস্তাবটা ছিল। চঞ্চলকুমারী উত্তর করিলেন, "আমার হাতের নহে।"

রাজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তোমার সম্মতিক্রমেই ইহা লিখিত হইয়াছিল ?"

প্রশ্নটা অতি নির্দ্দয়। কিন্তু চঞ্চলকুমারী আপনার উন্নত স্বভাবের উপযুক্ত উত্তর করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! ক্ষত্রিয় রাজগণ বিবাহার্থেই কন্যাহরণ করিতে পারেন। অন্য কোন কারণে কন্যাহরণ মহাপাপ। মহাপাপ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিব কি প্রকারে ?"

রাণা। আমি তোমাকে হরণ করি নাই। তোমার জাতিকুল রক্ষার্থ তোমাকে মুসলমানের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে তোমার পিতার নিকট প্রতি-প্রেরণ করাই রাজধর্ম্ম।

চঞ্চলকুমারী কয়টা কথা কহিয়া যুবতীসুলভ লজ্জাকে বশে আনিয়াছিল। এক্ষণে মুখ তুলিয়া, রাজসিংহের প্রতি চাহিয়া বলিল, "মহারাজ! আপনার রাজধর্ম্ম আপনি জানেন। আমার ধর্ম্মও আমি জানি। আমি জানি যে, যখন আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমি ধর্ম্মতঃ আপনার মহিষী। আপনি গ্রহণ করুন বা না

করুন, ধর্ম্মতঃ আমি আর কাহাকেও বরণ করিতে পারিব না। যখন ধর্ম্মতঃ আপনি আমার স্বামী, তখন আপনার আজ্ঞা মাত্র শিরোধার্য্য। আপনি যদি আমাকে রূপনগরে ফিরিয়া যাইতে বলেন, তবে অবশ্য আমি যাইব। সেখানে গেলে পিতা আমাকে পুনর্ব্বার বাদশাহের নিকট পাঠাইতে বাধ্য হইবেন। কেন না, আমাকে রক্ষা করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। যদি তাহাই অভিপ্রেত, তাহা হইলে রণক্ষেত্রে যখন আমি বলিয়াছিলাম যে, 'মহারাজ! আমি দিল্লী যাইব'—তখন কেন যাইতে দিলেন না?"

রাজসিংহ। সে আমার আপনার মানরক্ষার্থ।

চঞ্চল। তার পর এখন, যে আপনার শরণ লইয়াছে, তাহাকে আবার দিল্লী যাইতে দিবেন কি?

রাজ। তাও হইতে পারে না। তবে, তুমি এইখানেই থাক।

চঞ্চল। অতিথিস্বরূপ থাকিব? না দাসী হইয়া? রূপনগরের রাজকন্যা এখানে মহিষী ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

রাজ। তোমার মত লোকমনোমোহিনী সুন্দরী যে রাজার মহিষী, সকলেই তাহাকে ভাগ্যবান্ বলিবে। তুমি এমন অদ্বিতীয়া রূপবতী বলিয়াই তোমাকে মহিষী করিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। শুনিয়াছি যে, শাস্ত্রে আছে, রূপবতী ভার্য্যা শত্রুস্বরূপ—

"ঋণকারী পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী।
ভার্য্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ॥"

চঞ্চলকুমারী একটু হাসিয়া বলিল, "বালিকার বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন—উদয়পুরের রাজমহিষীগণ সকলেই কি কুরূপা?"

রাজসিংহ বলিলেন, "তোমার মত কেহই সুরূপা নহে।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "আমার বিনীত নিবেদন, কথাটা মহিষীদিগের কাছে বলিবেন না। মহারাণা রাজসিংহেরও ভয়ের স্থান থাকিতে পারে।"

রাজসিংহ উচ্চ হাস্য করিলেন। চঞ্চলকুমারী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল—এখন চাপিয়া বসিল, মনে মনে বলিল, "আর ইনি আমার কাছে মহারাণা নহেন, ইনি এখন আমার বর।"

আসন গ্রহণ করিয়া চঞ্চলকুমারী বলিল, "মহারাজ! বিনা আজ্ঞায় আমি যে মহারাজের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলাম, সে অপরাধ আপনাকে মার্জ্জনা করিতে হইতেছে —কেন না, আমি আপনার নিকট জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষায় বসিলাম—শিষ্যের আসনে

অধিকার আছে। মহারাজ! রূপবতী ভার্য্যা শত্রু কি প্রকারে, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই।”

রাজসিংহ। তাহা সহজে বুঝান যায়। ভার্য্যা রূপবতী হইলে, তাহার জন্য বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয়। এই দেখ, তুমি এখনও আমার ভার্য্যা হও নাই, তথাপি তোমার জন্য ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আমার বিবাদ বাধিয়াছে। আমাদের বংশের মহারাণী পদ্মিনীর কথা শুনিয়াছ ত?

চঞ্চল। ঋষিবাক্যে আমার বড় শ্রদ্ধা হইল না। সুন্দরী মহিষী না থাকিলে রাজারা কি বিবাদ হইতে মুক্তি পান? আর এ পামরীর জন্য মহারাজ কেন এ কথা তুলেন? আমি সুরূপা হই, কুরূপা হই, আমার জন্য যে বিবাদ বাধিবার, তাহা ত বাধিয়াছে।

রাজসিংহ। আরও কথা আছে। রূপবতী ভার্য্যাতে পুরুষ অত্যন্ত আসক্ত হয়। ইহা রাজার পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয়। কেন না, তাহাতে রাজকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে।

চঞ্চল। রাজারা বহুশত মহিষী কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিয়াও রাজকার্য্যে অমনোযোগী হয়েন না। আমার ন্যায় বালিকার প্রণয়ে মহারাণা রাজসিংহের রাজকার্য্যে বিরাগ জন্মিবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধার কথা।

রাজসিংহ। কথা তত অশ্রদ্ধেয় নহে। শাস্ত্রে বলে, “বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।”

চঞ্চল। মহারাজ কি বৃদ্ধ?

রাজ। যুবা নহি।

চঞ্চল। যাহার বাহুতে বল আছে, রাজপুতকন্যার কাছে সেই যুবা। দুর্ব্বল যুবাকে রাজপুতকন্যাগণ বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য করেন।

রাজ। আমি সুরূপ নহি।

চঞ্চল। কীর্ত্তিই রাজাদিগের রূপ।

রাজ। রূপবান্, বলবান্, যুবা রাজপুত্রের অভাব নাই।

চঞ্চল। আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। অন্যের পত্নী হইলে দ্বিচারিণী হইব। আমি অত্যন্ত নির্লজ্জের মত কথা বলিতেছি। কিন্তু মনে করিয়া দেখিবেন, দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, শকুন্তলা লজ্জা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমারও আজ প্রায় সেই দশা। আপনি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমি রাজসমন্দরে* ডুবিয়া মরিব।

* রাজসিংহের নির্ম্মিত সরোবর।

রাজসিংহ বাক্‌যুদ্ধে এইরূপ পরাভব প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, "তুমিই আমার উপযুক্ত মহিষী। তবে তুমি কেবল বিপদে পড়িয়া আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে; এক্ষণে আমার হাত হইতে উদ্ধারের ইচ্ছা রাখ কি না, আমার এই বয়সে তুমি আমাতে অনুরাগিণী হইতে পারিবে কি না, আমার মনে এই সকল সংশয় ছিল। সে সকল সংশয় আজিকার কথাবার্ত্তায় দূর হইয়াছে। তুমি আমার মহিষী হইবে। তবে একটা কথার অপেক্ষা করিতে চাই। তোমার পিতার মত হইবে কি? তাঁহার অমতে আমি বিবাহ করিতে চাহি না। তাহার কারণ, যদিও তোমার পিতার ক্ষুদ্র রাজ্য এবং তাঁহার সৈন্য অল্প, কিন্তু বিক্রম সোলাঙ্কি যে একজন বীরপুরুষ এবং উপযুক্ত সেনানায়ক, ইহা প্রসিদ্ধ। মোগলের সঙ্গে আমার যুদ্ধ বাধিবেই বাধিবে। বাধিলে, তাঁহার সাহায্য আমার পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হইবে। তাঁহার অনুমতি লইয়া বিবাহ না করিলে তিনি কখনও আমার সহায় হইবেন না। বরং তাঁর অমতে বিবাহ করিলে তিনি মোগলের সহায় এবং আমার শত্রু হইতে পারেন। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে, অতএব আমার ইচ্ছা, তাঁহাকে পত্র লিখিয়া, তাঁহার সম্মতি আনাইয়া তোমাকে বিবাহ করি। তিনি সম্মত হইবেন কি?"

চঞ্চল। না হইবার ত কোন কারণ দেখি না। আমার ইচ্ছা, পিতা মাতার আশীর্ব্বাদ লইয়াই আপনার চরণসেবাব্রত গ্রহণ করি। লোক পাঠান আমারও ইচ্ছা।

তখন রাজসিংহ একখানি সবিনয় পত্র লিখিয়া, বিক্রম সোলাঙ্কির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। চঞ্চলকুমারীও মাতার আশীর্ব্বাদ কামনা করিয়া একখানা পত্র লিখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অগ্নি জ্বালিবার প্রয়োজন

রূপনগরের অধিপতির উত্তর, উপযুক্ত সময়ে পৌঁছিল। উত্তর বড় ভয়ানক। তাহার মর্ম্ম এই;—রাজসিংহকে তিনি লিখিতেছেন, "আপনি রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। রাজপুতানার মুকুটস্বরূপ। এক্ষণে আপনি রাজপুতের নামে কলঙ্ক দিতে প্রস্তুত। আপনি বলপূর্ব্বক আমার অপমান করিয়া, আমার কন্যাকে হরণ করিয়াছেন। আমার কন্যা পৃথিবীশ্বরী হইত, আপনি তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন। আপনারও শত্রুতা করা আমার কর্ত্তব্য। আমার সম্মতিক্রমে আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

"আপনি বলিতে পারেন, সেকালে ক্ষত্রিয়বীরেরা কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করিতেন। ভীষ্ম, অৰ্জ্জুন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কন্যাহরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার সে বলবীর্য্য কই? আপনার বাহুতে যদি বল আছে, তবে হিন্দুস্থানে মোগল বাদশাহ কেন? শৃগাল হইয়া সিংহের অনুকরণ করা কৰ্ত্তব্য নহে। আমিও রাজপুত, মুসলমানকে কন্যা দান করিলে আমার গৌরব বৃদ্ধি পাইবে না জানি। কিন্তু না দিলে মোগল রূপনগরের পাহাড়ের একখানি পাথরও রাখিবে না। যদি আমি আপনি আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম, কি কেহ আমাকে রক্ষা করিবে জানিতাম, তবে আমিও ইহাতে সম্মত হইতাম না। যখন জানিব যে, আপনার সে ক্ষমতা আছে, তখন না হয় আপনাকে কন্যাদান করিব।

"সত্য বটে, পূৰ্ব্বকালে ক্ষত্রিয় রাজগণ কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করিতেন, কিন্তু এমন চাতুরী মিথ্যা প্রবঞ্চনা কেহই করিতেন না। আপনি আমার কাছে লোক পাঠাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া, আমার সেনা লইয়া গিয়া, আমারই কন্যা হরণ করিলেন;—নচেৎ আপনার সাধ্য হয় নাই। ইহাতে আমার কতটা অনিষ্ট সাধিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। মোগল বাদশাহ মনে করিবেন, যখন আমার সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছে, তখন আমারই কুচক্রে আমার কন্যা অপহৃত হইয়াছে। অতএব নিশ্চয়ই আগে রূপনগর ধ্বংস করিয়া, তবে আপনার দণ্ডবিধান করিবেন। আমিও যুদ্ধ করিতে জানি, কিন্তু মোগলের লক্ষ লক্ষ ফৌজের কাছে কার সাধ্য অগ্রসর হয়? এই জন্য প্রায় সকল রাজপুত তাঁহার পদানত হইয়া আছে—আমি কোন্ ছার?

"জানি না, এখন তাঁহার কাছে সত্য কথা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইব কি না। কিন্তু আপনি যদি আমার কন্যা বিবাহ করেন, তাঁহাকে সে কন্যা দিবার আর যদি পথ না থাকে, তবে আমার বা আমার কন্যার নিষ্কৃতির আর কোন উপায় থাকিবে না।

"আপনি আমার কন্যা বিবাহ করিবেন না। করিলে আপনাদিগকে আমার শাপগ্রস্ত হইতে হইবে। আমি শাপ দিতেছি যে, তাহা হইলে আমার কন্যা বিধবা, সহগমনে বঞ্চিতা, মৃতপ্রজা এবং চিরদুঃখিনী হইবে। এবং আপনার রাজধানী শৃগাল কুকুরের বাসভূমি হইবে।"

বিক্রম সোলাঙ্কি এই ভীষণ অভিসম্পাতের পর নীচে একছত্র লিখিয়া দিলেন, "যদি আপনাকে কখনও উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবার কারণ পাই, তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি আপনাকে কন্যা দান করিব।"

চঞ্চলকুমারীর মাতা পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার পিতার পত্র রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে পড়িয়া শুনাইলেন। চঞ্চলকুমারী চারি দিক্ অন্ধকার দেখিল।

চঞ্চলকুমারী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিলে, রাণা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কি করিব? পরিণয় বিধেয় কি না?"

চঞ্চলকুমারী—চক্ষে এক বিন্দু, বিন্দুমাত্র জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "বাপের এ অভিসম্পাত মাথায় করিয়া কোন্ কন্যা বিবাহ করিতে সাহস করিবে?"

রাণা। তবে যদি পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় কর, তবে পাঠাইতে পারি।

চঞ্চল। কাজেই তাই। কিন্তু পিতৃগৃহে যাওয়াও যা, দিল্লী যাওয়াও তাই। তাহার অপেক্ষা বিষপান কিসে মন্দ?

রাণা। আমার এক পরামর্শ শুন। তুমিই আমার যোগ্যা মহিষী, আমি সহসা তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ ব্যতীতও তোমাকে বিবাহ করিব না। সে আশীর্ব্বাদের ভরসা আমি একেবারে ত্যাগ করিতেছি না। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ নিশ্চিত। একলিঙ্গ * আমার সহায়। আমি সে যুদ্ধে হয় মরিব, নয় মোগলকে পরাজিত করিব।

চঞ্চল। আমার স্থির বিশ্বাস, মোগল আপনার নিকট পরাজিত হইবে।

রাণা। সে অতিশয় দুঃসাধ্য কাজ। যদি সফল হই, তবে নিশ্চিত তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ পাইব।

চঞ্চল। তত দিন?

রাণা। তত দিন তুমি আমার অন্তঃপুরে থাক। মহিষীদিগের ন্যায় তোমার পৃথক্ রেউলা † হইবে। মহিষীদিগের ন্যায় তোমারও দাস দাসী পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিব। আমি প্রচার করিব যে, অল্পদিনের মধ্যে তুমি আমার মহিষী হইবে। এবং সেই বিবেচনায় সকলেই তোমাকে মহিষীদিগের ন্যায় মহারাণী বলিয়া সম্বোধন করিবে। কেবল যত দিন না তোমার সঙ্গে আমার যথাশাস্ত্র বিবাহ হয়, তত দিন আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কি বল?

চঞ্চলকুমারী বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, "ইহার অপেক্ষা সুব্যবস্থা এক্ষণে আর কিছু হইতে পারে না।" কাজেই সম্মত হইলেন। রাজসিংহও যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন।

---

* রাণাদিগের কুলদেবতা—মহাদেব।

† অবরোধ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অগ্নি জ্বালিবার আরও প্রয়োজন

মাণিকলালের কাছে নির্ম্মল শুনিল যে, চঞ্চলকুমারী রাজমহিষী হইলেন। কিন্তু কবে বিবাহ হইল, বিবাহ হইয়াছে কি না, তাহা মাণিকলাল কিছুই বলিতে পারিল না। নির্ম্মল তখন স্বয়ং চঞ্চলকুমারীকে দেখিতে আসিলেন।

অনেক দিনের পর নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চলকুমারী অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। সে দিন নির্ম্মলকে যাইতে দিলেন না। রূপনগর পবিত্যাগ করার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পরস্পর পরস্পরের কাছে সবিস্তার বলিলেন। নির্ম্মলের সুখ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আহ্লাদিতা হইলেন। সুখ—কেন না, মাণিকলাল রাণার কাছে অনেক পুরস্কার পাইয়াছিলেন—অনেক টাকা হইয়াছে; তার পর, মাণিকলাল রাণার অনুগ্রহে সৈন্যমধ্যে অতি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এবং রাজসম্মানে গৌরবান্বিত হইয়াছেন; নির্ম্মলের উচ্চ অট্টালিকা, ধন দৌলত, দাস দাসী সব হইয়াছে, এবং মাণিকলাল তাঁহার কেনা গোলাম হইয়াছে। পক্ষান্তরে, নির্ম্মল, চঞ্চলকুমারীর দুঃখ শুনিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইল। এবং চঞ্চলকুমারীর পিতা মাতা, রাজসিংহ এবং চঞ্চলকুমারীরও উপর অতিশয় বিরক্ত হইল। চঞ্চলকুমারীকে সে মহারাণী বলিয়া ডাকিতে অস্বীকৃত হইল—এবং মহারাণার সাক্ষাৎ পাইলে, তাঁহাকে দুই কথা শুনাইয়া দিবে, প্রতিজ্ঞা করিল। চঞ্চলকুমারী বলিল, "সে সকল কথা এখন থাক্। আমার সঙ্গে আমার একটি চেনা লোক নাই। আত্মীয় স্বজন কেহ নাই। আমি এ অবস্থায় এখানে থাকিতে পারি না। যদি ভগবান্ তোমাকে মিলাইয়াছেন, তবে আমি তোমাকে ছাড়িব না। তোমাকে আমার কাছে থাকিতে হইবে।"

শুনিয়া, প্রথমে নির্ম্মলের বোধ হইল, যেন বুকের উপর পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই সে সবে স্বামী পাইয়াছে—নূতন প্রণয়, নূতন সুখ, এ সব ছাড়িয়া কি চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া থাকা যায়? নির্ম্মলকুমারী হঠাৎ সম্মত হইতে পারিল না—কোন মিছা ওজর করিল না—কিন্তু আসল কথা ভাঙ্গিয়াও বলিতে পারিল না। বলিল, "ও বেলা বলিব।"

চঞ্চলকুমারীর চক্ষে একটু জল আসিল; মনে মনে বলিল, "নির্ম্মলও আমায় ত্যাগ করিল। হে ভগবান্! তুমি যেন আমায় ত্যাগ করিও না।" তার পর চঞ্চলকুমারী একটু

হাসিল, বলিল, "নির্ম্মল, তুমি আমার জন্য একা পদব্রজে রূপনগর হইতে চলিয়া আসিয়া মরিতে বসিয়াছিলে! আর আজ! আজ তুমি স্বামী পাইয়াছ!"

নির্ম্মল অধোবদন হইল। আপনাকে শত ধিক্কার দিল; বলিল, "আমি ও বেলা আসিব, যাহাকে মালিক করিয়াছি, তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আর একটা মেয়ে ঘাড়ে পড়িয়াছে, তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

চঞ্চল। মেয়ে না হয়, এখানে আনিলে?

নির্ম্মল। সে খ্যান্ খ্যান্ প্যান্ প্যান্ এখানে কাজ নাই। একটা পাতান রকম পিসী আছে—সেইটাকে ডাকিয়া বাড়ীতে বসাইয়া আসিব।

এই সকল পরামর্শের পর নির্ম্মলকুমারী বিদায় লইল। গৃহে গিয়া মাণিকলালকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। মাণিকলালও নির্ম্মলকে বিদায় দিতে বড় কষ্ট বোধ করিল। কিন্তু সে নিতান্ত প্রভুভক্ত, আপত্তি করিল না। পিসীমা আসিয়া কন্যাটির ভার লইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সে প্রয়োজন কি?

নির্ম্মল শিবিকারোহণে দাস দাসী সঙ্গে লইয়া রাণার অন্তঃপুরাভিমুখে চলিতেছেন। পথিমধ্যে বড় চক বা চৌক। তাহার একটা বাড়ীতে বড় লোকের ভিড়। নির্ম্মলের দোলা বহুমূল্য বস্ত্রে আবৃত ছিল। কিন্তু জনমর্দ্দের শব্দে তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, আবরণ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন। একজন পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ?" শুনিলেন, একজন বিখ্যাত "জ্যোতিষী" এই বাড়ীতে থাকে। সহস্র সহস্র লোক তাহার কাছে প্রত্যহ গণনা করাইতে আসে। যাহারা গণাইতে আসিয়াছে, তাহারাই ভিড় করিয়াছে। নির্ম্মল আরও শুনিলেন, "এই জ্যোতিষী সকল প্রকার প্রশ্ন গণিতে পারে। এবং যাহাকে যাহা বলিয়া দিয়াছে, তাহা ঠিক ফলিয়াছে।" নির্ম্মল তখন দাসীদিগকে বলিলেন, "সঙ্গের পাইকদিগকে বল, লোক সকল সরাইয়া দেয়। আমি ভিতরে গিয়া গণনা করাইব। কিন্তু আমার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।"

পাইকদিগের বল্লমের গুঁতায় লোক সকল সরিল—নির্ম্মলের শিবিকা জ্যোতিষীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যে গণাইতে বসিয়াছিল—সে উঠিয়া গেলে নির্ম্মল গিয়া প্রশ্নকর্ত্তার

আসনে বসিল। জ্যোতিষীকে প্রণাম করিয়া কিঞ্চিৎ দর্শনী অগ্রিম দিল। জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কি গণাইবে?"

নির্ম্মল বলিল, "আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা গণিয়া বলিয়া দিন।"

জ্যোতিষী। প্রশ্ন। ভাল, বল।

নির্ম্মল বলিল, "আমার এক প্রিয়সখী আছেন।"

জ্যোতিষী একটু কি লিখিল। বলিল, "তার পর?"

নির্ম্মল বলিল, "তিনি অবিবাহিতা।"

জ্যোতিষী আবার লিখিল। বলিল, "তার পর?"

নির্ম্মল। তাঁর কবে বিবাহ হইবে?

জ্যোতিষী আবার লিখিল। পরে খড়ি পাতিতে লাগিল। লগ্নসারণী দেখিল। শঙ্কুপট্ট দেখিল। নির্ম্মলকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। অনেক অঙ্ক কসিল। অনেক পুথি খুলিয়া পড়িল। শেষে নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল।

নির্ম্মল বলিল, "বিবাহ হইবে না?"

জ্যোতিষী। প্রায় সেইরূপ উত্তর শাস্ত্রে লেখে।

নির্ম্মল। প্রায় কেন?

জ্যোতিষী। যদি সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী আসিয়া কখন তোমার সখীর পরিচর্য্যা করে, তখন বিবাহ হইবে। নহিলে হইবে না। তাহা অসম্ভব বলিযাই বলিতেছি, বিবাহ হইবে না।

"অসম্ভব বটে।" বলিয়া নির্ম্মল জ্যোতিষীকে আরও কিছু দিয়া চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আগুন জ্বালিবার প্রস্তাব

চঞ্চলকুমারীর হরণে ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিল, তাহাতে হয় মোগল সাম্রাজ্য, নয় রাজপুতানা ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কেবল মহারাণা রাজসিংহের দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য এতটা হইতে পারে নাই। সেই আশ্চর্য্য ঘটনাপরম্পরা বিবৃত করা, উপন্যাস গ্রন্থের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তবে কিছু কিছু না বলিলেও এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট বুঝা যাইবে না।

রূপনগরের রাজকুমারীর হরণসংবাদ দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিল। দিল্লীতে অত্যন্ত কোলাহল পড়িয়া গেল। বাদশাহ রাগে স্বসৈন্যের নেতৃগণের মধ্যে কাহাকে পদচ্যুত, কাহাকে আবদ্ধ, কাহাকে বা নিহত করিলেন। কিন্তু যাহারা প্রধান অপরাধী—চঞ্চলকুমারী এবং রাজসিংহ—তাহাদের তত শীঘ্র দণ্ডিত করা দুঃসাধ্য। কেন না, যদিও মেবার ক্ষুদ্র রাজ্য, তথাপি বড় "কঠিন ঠাঁই।" চারি দিকে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালার প্রাচীর, রাজপুতেরা সকলেই বীরপুরুষ, এবং রাজসিংহ হিন্দুবীরচূড়ামণি। এ অবস্থায় রাজপুত কি করিতে পারে, তাহা প্রতাপসিংহ, আক্‌ব্বর শাহকেও শিখাইয়াছিল। দুনিয়ার বাদশাহকে কিল খাইয়া কিছু দিনের জন্য কিল চুরি করিতে হইল।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব কাহারও উপর রাগ সহ্য করিবার লোক নহেন। হিন্দুর অনিষ্ট করিতে তাঁহার জন্ম, হিন্দুর অপরাধ বিশেষ অসহ্য। একে হিন্দু মারহাট্টা পুনঃ পুনঃ অপমান করিয়াছে, আবার রাজপুত অপমান করিল। মারহাট্টার বড় কিছু করিতে পারেন নাই, রাজপুতের হঠাৎ কিছু করিতে পারিতেছেন না। অথচ বিষ উদ্গীরণ করিতে হইবে। অতএব রাজসিংহের অপরাধে সমস্ত হিন্দুজাতির পীড়নই অভিপ্রেত করিলেন।

আমরা এখন ইন্‌কম্ টেক্‌শকে অসহ্য মনে করি, তাহার অধিক অসহ্য একটা "টেক্‌শ" মুসলমানি আমলে ছিল। তাহার অধিক অসহ্য—কেন না, এই "টেক্‌শ" মুসলমানকে দিতে হইত না ; কেবল হিন্দুকেই দিতে হইত। ইহার নান জেজেয়া। পরম রাজনীতিজ্ঞ আক্‌ব্বর বাদশাহ, ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া, ইহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি উহা বন্ধ ছিল। এক্ষণে হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেব তাহা পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়া হিন্দুর যন্ত্রণা বাড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বেই বাদশাহ, জেজেয়ার পুনরাবির্ভাবের আজ্ঞা প্রচারিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল। হিন্দুরা ভীত, অত্যাচারগ্রস্ত, মর্ম্মপীড়িত হইল। যুক্তকরে সহস্র সহস্র হিন্দু, বাদশাহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ক্ষমা ছিল না। শুক্রবারে যখন বাদশাহ মস্‌জীদে ঈশ্বরকে ডাকিতে যান, তখন লক্ষ হিন্দু সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট রোদন করিতে লাগিল। দুনিয়ার বাদশাহ দ্বিতীয় হিরণ্য-কশিপুর মত আজ্ঞা দিলেন, "হস্তীগুলা পদতলে ইহাদিগকে দলিত করুক।" সেই বিষম জনমর্দ্দ হস্তিপদতলে দলিত হইয়া নিবারিত হইল।

ঔরঙ্গজেবের অধীন ভারতবর্ষ জেজেয়া দিল। ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত হিন্দুর দেবপ্রতিমা চূর্ণীকৃত, বহুকালের গগনস্পর্শী দেবমন্দির সকল ভগ্ন ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল,

তাহার স্থানে মুসলমানের মস্‌জীদ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির গেল; মথুরায় কেশবেব মন্দির গেল; বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর যাহা কিছু স্থাপত্যকীর্ত্তি ছিল, চিরকালের জন্য তাহা অন্তর্হিত হইল।

ঔরঙ্গজেব এক্ষণে আজ্ঞা দিলেন যে, রাজপুতানার রাজপুতেরাও জেজেয়া দিবে। রাজপুতানার প্রজা তাঁহার প্রজা নহে, তথাপি হিন্দু বলিয়া তাহাদের উপর এ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রাজপুতেরা প্রথমে অস্বীকৃত হইল; কিন্তু উদয়পুর ভিন্ন আর সর্ব্বত্র রাজপুতানা কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় অচল। জয়পুরের জয়সিংহ—যাঁহার বাহুবল মোগল সাম্রাজ্যের একটি প্রধান অবলম্বন ছিল, তিনি এক্ষণে গতাসু,—বিশ্বাসঘাতক বন্ধুহন্তা ঔরঙ্গজেবের কৌশলে বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার মৃত্যু সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র দিল্লীতে আবদ্ধ। সুতরাং জয়পুর জেজেয়া দিল।

যোধপুরের যশোবন্ত সিংহও লোকান্তরগত। তাঁহার রাণী এখন রাজপ্রতিনিধি। স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি বাদশাহের কর্ম্মচারীদিগকে হাঁকাইয়া দিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। স্ত্রীলোক যুদ্ধের ধমকে ভয় পাইলেন। রাণী জেজেয়া দিলেন না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলেন।

রাজসিংহ জেজেয়া দিলেন না। কিছুতেই দিবেন না; সর্ব্বস্ব পণ করিলেন। জেজেয়া সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবকে একখানি পত্র লিখিলেন। রাজপুতানার ইতিহাসবেত্তা সেই পত্রসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "The Rana remonstrated by letter, in the name of the nation of which he was the head, in a style of such uncompromising dignity, such lofty yet temperate resolve, so much of soul-stirring rebuke mingled with a boundless and tolerating benevolence, such elevating excess of the Divinity with such pure philanthropy, that it may challenge competition with any epistolary production of any age, clime or condition." * পত্রখানি বাদশাহের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি দিল।

বাদশাহ রাজসিংহের উপর আজ্ঞা প্রচার করিলেন, জেজেয়া ত দিতে হইবেই, তাহা ছাড়া রাজ্যে গোহত্যা করিতে দিতে হইবে, এবং দেবালয় সকল ভাঙ্গিতে হইবে। রাজসিংহ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

ঔরঙ্গজেবও যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এরূপ ভয়ানক যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন যে, তিনি কখন এমন আর করেন নাই। চীনের সম্রাট্, কি পারস্যের রাজা

---

* Tod's Rajasthan—Vol. I. page 381.

তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে যে উদ্যোগ করিতেন না, এই ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে সেই উদ্যোগ করিলেন। অর্দ্ধেক আসিয়ার অধিপতি সের (Xerxes) যেমন ক্ষুদ্র গ্রীস রাজ জয় করিবার জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর সের, ক্ষুদ্র রাজা রাণা রাজসিংহকে পরাজয় করিবার জন্য সেইরূপ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই দুইটি ঘটনা পরস্পর তুলনীয়, ইহার তৃতীয় তুলনা আর নাই। আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্থ করিয়া মরি—রাজসিংহের ইতিহাসের কিছুই জানি না। আধুনিক শিক্ষার সুফল!

ষষ্ঠ খণ্ড

অগ্নির উৎপাদন

প্রথম পরিচ্ছেদ

অরণিকাষ্ঠ—উর্ব্বশী

রাজসিংহ যে তীব্রঘাতী পত্র ঔরঙ্গজেবকে লিখিয়াছিলেন, তৎপ্রেরণ হইতে এই অগ্ন্যুৎপাদন খণ্ড আরম্ভ করিতে হইবে। সেই পত্র ঔরঙ্গজেবের কাছে কে লইয়া যাইবে, তাহার মীমাংসা কঠিন হইল। কেন না, যদিও দূত অবধ্য, তথাপি পাপে কুণ্ঠাশূন্য ঔরঙ্গজেব অনেক দূত বধ করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ। অতএব প্রাণের শঙ্কা রাখে, অন্ততঃ এমন সুতুচুর নয় যে, আপনার প্রাণ বাঁচাইতে পারে, এমন লোককে পাঠাইতে রাজসিংহ ইচ্ছুক হইলেন না। তখন মাণিকলাল আসিয়া, প্রার্থনা করিল যে, আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হউক। রাজসিংহ উপযুক্ত পাত্র পাইয়া তাহাকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

এ সংবাদ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী, নির্ম্মলকুমারীকে ডাকিলেন। বলিলেন, "তুমিও কেন তোমার স্বামীর সঙ্গে যাও না ?"

নির্ম্মল বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোথা যাব ? দিল্লী ? কেন ?

চঞ্চল। একবার বাদশাহের রঙ্‌মহালটা বেড়াইয়া আসিবে।

নির্ম্মল। শুনিয়াছি, সে না কি নরক।

চঞ্চল। নরকে কি কখন তোমায় যাইতে হইবে না ? তুমি গরিব বেচারা মাণিকলালের উপর যে দৌরাত্ম্য কর, তাহাতে তোমার নরক হইতে নিস্তার নাই।

নির্ম্মল। কেন, সুন্দর দেখে বিয়ে করেছিল কেন ?

চঞ্চল। সে বুঝি তোমায় গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া থাকিতে সাধিয়াছিল ?

নির্ম্মল। আমি ত আর তাকে ডাকি নাই। এখন সে ভূতের বোঝা বহিয়া দিল্লী গিয়া কি করিব বলিয়া দাও।

চঞ্চল। উদিপুরীকে নিমন্ত্রণপত্র দিয়া আসিতে হইবে।

নির্ম্মল। কিসের ?

চঞ্চল। তামাকু সাজার।

নির্ম্মল। বটে, কথাটা মনে ছিল না। পৃথিবীশ্বরী তোমার পরিচর্য্যা না করিলে, তোমারও ভূতের বোঝা মিলিবে না।

চঞ্চল। দূর হ পাপিষ্ঠা। আমিই এখন ভূতের বোঝা। হয়, বাদশাহের বেগম আমার দাসী হইবে—নহিলে আমাকে বিষ খাইতে হইবে। গণকের ত এই গণনা।

নির্ম্মল। তা, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেই কি বেগম আসিবে ?

চঞ্চল। না। আমার উদ্দেশ্য বিবাদ বাধান। আমার বিশ্বাস, বিবাদ বাধিলেই মহারাণার জয় হইবে। আর বেগম বাঁদী হইবে। আর উদ্দেশ্য, তুমি বেগমদিগকে চিনিয়া আসিবে।

নির্ম্মল। তা কি প্রকারে এ কাজ পারিব, বলিয়া দাও।

চঞ্চল। আমি বলিয়া দিতেছি। তুমি জান যে, যোধপুরী বেগমের পাঞ্জাটা আমার কাছে আছে। সেই পাঞ্জা তুমি লইয়া যাও। তাহার গুণে তুমি রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিতে পারিবে। এবং তাহার গুণে তুমি যোধপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিবে। আমি উদিপুরীর নামে যে পত্র দিতেছি, তাহা তাঁহাকে দেখাইবে। তিনি ঐ পত্র কোন প্রকারে, উদিপুরীর কাছে পাঠাইয়া দিবেন। যেখানে নিজের বুদ্ধিতে কুলাইবে না, সেখানে স্বামীর বুদ্ধি হইতে কিছু ধার লইও।

নির্ম্মল। ইঃ! আমি যাই মেয়ে, তাই তার সংসার চলে।

হাসিতে হাসিতে নির্ম্মলও পত্র লইয়া চলিয়া গেল। এবং যথাকালে স্বামীর সঙ্গে, উপযুক্ত লোক জন সমভিব্যাহারে দিল্লীযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অরণিকাষ্ঠ—পুরূরবা

উদ্যোগ, মাণিকলালেরই বেশী। তাহার একটা নমুনা সে একদিন নির্ম্মলকুমারীকে দেখাইল। নির্ম্মল সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার একটা আঙ্গুলের স্থানে আবার নূতন আঙ্গুল হইয়াছে। সে মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি ?"

মাণিকলাল বলিল, "গড়াইয়াছি।"

নির্ম্মল। কিসে?

মাণিক। হাতীর দাঁতে। কল কব্জা বেমালুম লাগাইয়াছি, তাহার উপর ছাগলের পাতলা চামড়া মুড়িয়া আমার গায়ের মত রঙ্গ করাইয়াছি। ইচ্ছানুসারে খোলা যায়, পরা যায়।

নির্ম্মল। এর দরকার?

মাণিক। দিল্লীতে জানিতে পারিবে। দিল্লীতে ছদ্মবেশের দরকার হইতে পারে। আঙ্গুলকাটার ছদ্মবেশ চলে না। কিন্তু দুই রকম হইলে খুব চলে।

নির্ম্মল হাসিল। তার পর মাণিকলাল একটি পিঞ্জর মধ্যে একটা পোষা পায়রা লইল। এই পারাবতটি অতিশয় সুশিক্ষিত। দৌত্যকার্য্যে সুনিপুণ। যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় যুদ্ধে "Carrier-pigeon"গুলির গুণ অবগত আছেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই জাতীয় শিক্ষিত পারাবতের ব্যবহার চলিত ছিল। পরাবতের গুণ মাণিকলাল সবিশেষ নির্ম্মলকুমারীকে বুঝাইয়া দিলেন।

রীতি ছিল যে, দিল্লীর বাদশাহের নিকট দূত পাঠাইতে হইলে, কিছু উপঢৌকন সঙ্গে পাঠাইতে হয়। ইংলণ্ড, পর্ত্তুগাল প্রভৃতির রাজারাও তাহা পাঠাইতেন। রাজসিংহও কিছু দ্রব্য সামগ্রী মাণিকলালের সঙ্গে পাঠাইলেন। তবে, অপ্রণয়ের দৌত্য, বেশী সামগ্রী পাঠাইলেন না।

অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত, মণিরত্নখচিত কারুকার্য্যযুক্ত কতকগুলি সামগ্রী পাঠাইলেন। মাণিকলাল তাহা পৃথক্ বাহনে বোঝাই করিয়া লইলেন।

অবধারিত দিবসে সস্ত্রীক হইয়া, এবং রাণার আজ্ঞালিপি ও পত্র লইয়া, নির্ম্মলকুমারী সমভিব্যাহারে, দাস দাসী, লোকজন, হাতি ঘোড়া, উট বলদ, শকট, এক্কা, দোলা, রেশালা প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া বড় ঘটার সহিত মাণিকলাল যাত্রা করিলেন। যাইতে অনেক দিন লাগিল। দিল্লীর কয় ক্রোশ মাত্র বাকি থাকিতে, মাণিকলাল তাম্বু ফেলিয়া নির্ম্মলকুমারীকে ও অন্যান্য লোক জনকে তথায় রাখিয়া, একজন মাত্র বিশ্বাসী লোক সঙ্গে লইয়া দিল্লী চলিল। আর সেই পাথরের সামগ্রীগুলিও সঙ্গে লইল। গড়া আঙ্গুল খুলিয়া নির্ম্মলকুমারীর কাছে রাখিয়া গেল। বলিল, "কাল আসিব।"

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

মাণিকলাল একখানা পাথরের জিনিষ নির্ম্মলকে দেখাইয়া, তাহাতে একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন দেখাইল। বলিল, "সকলগুলিতেই এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি।"

নির্ম্মল। কেন?

মাণিক। দিল্লীতে তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি অবশ্য হইবে। তার পর যদি মোগলের প্রতিবন্ধকতায়, পরস্পরের সন্ধান না পাই, তাহা হইলে, তুমি পাথরের জিনিস কিনিতে বাজারে পাঠাইও। যে দোকানের জিনিসে তুমি এই চিহ্ন দেখিবে, সেই দোকানে আমার সন্ধান করিও।

এইরূপ পরামর্শ আঁটিয়া মাণিকলাল বিশ্বাসী লোকটি ও প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যগুলি লইয়া দিল্লী গেল। সেখানে গিয়া, একখানা ঘর ভাড়া লইয়া, পাথরের দোকান সাজাইয়া, ঐ সমভিব্যাহারী লোকটিকে দোকানদার সাজাইয়া, শিবিরে ফিরিয়া আসিল।

পরে সমস্ত ফৌজ ও রেশালা এবং নির্ম্মলকুমারীকে লইয়া, পুনর্ব্বার দিল্লী গেল। এবং সেখানে যথারীতি শিবির সংস্থাপন করিয়া বাদশাহের নিকট সংবাদ পাঠাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অগ্নিচয়ন

অপরাহ্ণে ঔরঙ্গজেব দরবারে আসীন হইলে, মাণিকলাল সেখানে গিয়া হাজির হইলেন। দিল্লীর বাদশাহের আমখাস অনেক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, এখানে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আমার অভিপ্রেত নহে। মাণিকলাল প্রথম সোপানাবলী আরোহণ করিয়া একবার কুর্ণিশ করিলেন। তার পর উঠিতে হইল। একপদ উঠিয়া আবার কুর্ণিশ—আবার একপদ উঠিয়া আবার কুর্ণিশ। এইরূপ তিনবার উঠিয়া তক্তে তাউস্ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া রাজসিংহপ্রেরিত সামান্য উপহার বাদশাহের সম্মুখে অর্পিত করিলেন। নজরের অনর্ঘতা দেখিয়া ঔরঙ্গজেব রুষ্ট হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। প্রেরিত দ্রব্যের মধ্যে দুইখানি তরবারি ছিল ; একখানি কোষে আবৃত, আর একখানি নিষ্কোষ। ঔরঙ্গজেব নিষ্কোষ অসি গ্রহণ করিয়া আর সব উপহার পরিত্যাগ করিলেন।

মাণিকলাল রাজসিংহের পত্র দিলেন। পত্রার্থ অবগত হইয়া ঔরঙ্গজেব ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হইলে সচরাচর বাহিরে কোপ প্রকাশ করিতেন না। তখন মাণিকলালকে বিশেষ সমাদরের সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন।

তাঁহাকে উত্তম বাসস্থান দিবার জন্য বখ্‌শীকে আদেশ করিলেন। এবং আগামী কল্য মহারাণার পত্রের উত্তর দিবেন বলিয়া মাণিকলালকে বিদায় করিলেন।

তখনই দরবার বরখাস্ত হইল। দরবার হইতে উঠিয়া আসিয়াই ঔরঙ্গজেব মাণিক-লালের বধের আজ্ঞা করিলেন। বধের আজ্ঞা হইল, কিন্তু যাহারা মাণিকলালকে বধ করিবে, তাহারা মাণিকলালকে খুঁজিয়া পাইল না। যাহাদিগের প্রতি মাণিকলালের সমাদরের আদেশ হইয়াছিল, তাহারাও খুঁজিয়া পাইল না। দিল্লীর সর্ব্বত্র খুঁজিল, কোথাও মাণিকলালকে পাওয়া গেল না। তাহার বধের আজ্ঞা প্রচার হইবার আগেই মাণিকলাল সরিয়া পড়িয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, যখন মাণিকলালের জন্য এত খোঁজ তল্লাস হইতেছিল, তখন সে আপনার পাথরের দোকানে ছদ্মবেশে সওদাগরি করিতেছিল। আহদীরা মাণিকলালকে না পাইয়া, তাঁহার শিবিরে যাহাকে যাহাকে পাইল, তাহাকে তাহাকে ধরিয়া কোতোয়ালের নিকট লইয়া গেল। তাহার মধ্যে নির্ম্মলকুমারীকেও ধরিয়া লইয়া গেল।

কোতোয়াল, অপর লোকদিগের কাছে কিছু সন্ধান পাইলেন না। ভয়প্রদর্শন ও মারপিটেও কিছুই হইল না। তাহারা কোন সন্ধান জানে না, কি প্রকারে বলিবে?

কোতোয়াল শেষ নির্ম্মলকুমারীকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন—পরদানিশীন বলিয়া তাঁহাকে এতক্ষণ তফাৎ রাখা হইয়াছিল। কোতোয়াল, এখন নির্ম্মলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর করিল, "রাণার এল্‌চিকে আমি চিনি না।"

কোতোয়াল। তাহার নাম মাণিকলাল সিংহ।

নির্ম্মল। মাণিকলাল সিংহকে আমি চিনি না।

কো। তুমি রাণার এল্‌চির সঙ্গে উদয়পুর হইতে আস নাই?

নি। উদয়পুর আমি কখন দেখিও নাই।

কো। তবে তুমি কে?

নি। আমি জুনাব যোধপুরী বেগমের হিন্দু বাঁদী।

কো। জুনাব যোধপুরী বেগমের বাঁদীরা মহালের বাহিরে আসে না।

নি। আমিও কখন আসি নাই। এইবার হিন্দু এল্‌চি আসিয়াছে শুনিয়া বেগম সাহেব আমাকে তাহার তাম্বুতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

কো। সে কি? কেন?

নি। কিষণজীর চরণামৃতের জন্য। তাহা সকল রাজপুত রাখিয়া থাকে।

কো। তোমাকে ত একা দেখিতেছি। তুমি মহালের বাহিরেই বা আসিলে কি প্রকারে?

নি। ইহার বলে।

এই বলিয়া নির্ম্মলকুমারী যোধপুরী বেগমের পাঞ্জা বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া দেখাইল। দেখিয়া কোতোয়াল তিন সেলাম করিল। নির্ম্মলকে বলিল, "তুমি যাও। তোমাকে কেহ আর কিছু বলিবে না।"

নির্ম্মল তখন বলিল, "কোতোয়াল সাহেব! আর একটু মেহেরবানি করিতে হইবে। আমি কখন মহালের বাহির হই নাই। আজ বড় ধর পাকড় দেখিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছে। আপনি যদি দয়া করিয়া একটা আহদী, কি পাইক সঙ্গে দেন, যে আমাকে মহাল পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসে, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।"

কোতোয়াল তখনই একজন অস্ত্রধারী রাজপুরুষকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া নির্ম্মলকে বাদশাহের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। বাদশাহের প্রধানা মহিষীর পাঞ্জা দেখিয়া খোজারা কেহ কিছু আপত্তি করিল না। নির্ম্মলকুমারী একটু চাতুরীর সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে যোধপুরী বেগমের সন্ধান পাইল। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই পাঞ্জা দেখাইল। দেখিবামাত্র সতর্ক হইয়া, রাজমহিষী তাহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বলিলেন, "তুমি এ পাঞ্জা কোথায় পাইলে?"

নির্ম্মলকুমারী বলিল, "আমি সমস্ত কথা সবিস্তার বলিতেছি।"

নির্ম্মলকুমারী প্রথমে আপনার পরিচয় দিল। তার পর দেবীর রূপনগরে যাওয়ার কথা, সে যাহা বলিয়াছিল, সে কথা, পাঞ্জা দেওয়ার কথা, তার পর চঞ্চল ও নির্ম্মলের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিল। মাণিকলালের পরিচয় দিল। মাণিকলালের সঙ্গে যে নির্ম্মল আসিয়াছিল, চঞ্চলকুমারীর পত্র লইয়া আসিয়াছিল, তাহা বলিল। পরে দিল্লীতে আসিয়া যে প্রকার বিপদে পড়িয়াছিল, তাহা বলিল; যে প্রকারে উদ্ধার পাইয়া, যে কৌশলে মহাল মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বলিল। পরে চঞ্চলকুমারী উদিপুরীর জন্য যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা দিল। শেষ বলিল, "এই পত্র কি প্রকারে উদিপুরী বেগমের কাছে পৌঁছাইতে পারিব, সেই উপদেশ পাইবার জন্যই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

রাজমহিষী বলিলেন, "তাহার কৌশল আছে। জেব-উন্নিসা বেগমের হুকুমের সাপেক্ষ। তাহা এখন চাহিতে গেলে গোলযোগ হইবে, রাত্রে যখন এই পাপিষ্ঠারা শরাব

খাইয়া বিহ্বল হইবে, তখন সে উপায় হইবে। এখন তুমি আমার হিন্দু বাঁদীদিগের মধ্যে থাক। হিন্দুর অন্নজল খাইতে পাইবে।"

নির্ম্মলকুমারী সম্মত হইলেন। বেগম সেইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমিধসংগ্রহ—উদিপুরী

রাত্রি একটু বেশী হইলে যোধপুরী বেগম নির্ম্মলকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া, একজন তুর্কী (তাতারী) প্রহরিণী সঙ্গে দিয়া জেব-উন্নিসার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। নির্ম্মল জেব-উন্নিসার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া আতর গোলাবের, পুষ্পরাশির, এবং তামাকুর সদ্‌গন্ধে বিমুগ্ধ হইল। নানাবিধ রত্নরাজিখচিত হর্ম্ম্যতল, শয্যাভরণ, এবং গৃহাভরণ দেখিয়া বিস্মিত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা জেব-উন্নিসার বিচিত্র, রত্নপুষ্পমিশ্রিত অলঙ্কারপ্রভায়, চন্দ্রসূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যপ্রভায় চমকিত হইল। এই সকলে সজ্জিতা পাপিষ্ঠা জেব-উন্নিসাকে দেব-লোকবাসিনী অপ্সরা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু অপ্সরার তখন চক্ষু ঢুলু ঢুলু; মুখ রক্তবর্ণ; চিত্ত বিভ্রান্ত; দ্রাক্ষাসুধার তখন পূর্ণাধিকার। নির্ম্মলকুমারী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে, তিনি জড়িত রসনায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই ?"

নির্ম্মলকুমারী বলিল, "আমি উদয়পুরের রাজমহিষীর দূতী।"

জেব। মোগল বাদশাহের তক্তে তাউস্ লইয়া যাইতে আসিয়াছিস্ ?

নির্ম্মল। না। চিঠি লইয়া আসিয়াছি।

জেব। চিঠি কি হইবে ? পুড়াইয়া রোশনাই করিবি ?

নির্ম্মল। না। উদিপুরী বেগম সাহেবাকে দিব।

জেব। সে বাঁচিয়া আছে, না মরিয়া গিয়াছে ?

নির্ম্মল। বোধ হয় বাঁচিয়া আছেন।

জেব। না। সে মরিয়া গিয়াছে। এ দাসীটাকে কেহ তাহার কাছে লইয়া যা।

জেব-উন্নিসার উন্মত্ত-প্রলাপবাক্যের উদ্দেশ্য যে, ইহাকে যমের বাড়ী পাঠাইয়া দাও কিন্তু তাতারী প্রহরিণী তাহা বুঝিল না। সাদা অর্থ বুঝিয়া নির্ম্মলকুমারীকে উদিপুরী বেগমের কাছে লইয়া গেল।

সেখানে নির্ম্মল দেখিল, উদিপুরীর চক্ষু উজ্জ্বল, হাস্য উচ্চ, মেজাজ বড় প্রফুল্ল। নির্ম্মল খুব একটা বড় সেলাম করিল। উদিপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি?"

নির্ম্মল উত্তর করিল, "আমি উদয়পুরের রাজমহিষীর দূতী। চিঠি লইয়া আসিয়াছি।"

উদিপুরী বলিল, "না। না। তুমি ফার্স মুলুকের বাদশাহ। মোগল বাদশাহের হাত হইতে আমাকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছ।"

নির্ম্মলকুমারী, হাসি সামলাইয়া চঞ্চলের পত্রখানি উদিপুরীর হাতে দিল। উদিপুরী তাহা পড়িবার ভাণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি লিখিতেছে? লিখিতেছে, 'অয় নাজ্‌নী! পিয়ারে মেরে! তোমার সুরৎ ও দৌলৎ শুনিয়া আমি একেবারেই বেহোস্ ও দেওয়ানা হইয়াছি। তুমি শীঘ্র আসিয়া আমার কলিজা ঠাণ্ডা করিবে।' আচ্ছা, তা করিব। হজুরের সঙ্গে আল্‌বৎ যাইব। আপনি একটু অপেক্ষা করুন—আমি একটু শরাব খাইয়া লই। আপনি একটু শরাব মোলাহেজা করিবেন? আচ্ছা শরাব! ফেরেঙ্গের এল্‌চি ইহা নজর দিয়াছে। এমন শরাব আপনার মুলুকেও পয়দা হয় না।"

উদিপুরী পিয়ালা মুখে তুলিলেন, সেই অবসরে নির্ম্মলকুমারী বহির্গত হইয়া যোধপুরী বেগমের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং যোধপুরীর জিজ্ঞাসা মত যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, তাহা বলিল। শুনিয়া যোধপুরী বেগম হাসিয়া বলিল, "কাল পত্রখানা ঠিক হইয়া পড়িবে। তুমি এই বেলা পলায়ন কর। নচেৎ কাল একটা গণ্ডগোল হইতে পারে। আমি তোমার সঙ্গে একজন বিশ্বাসী খোজা দিতেছি। সে তোমাকে মহালের বাহির করিয়া তোমার স্বামীর শিবিরে পৌঁছাইয়া দিবে। সেখানে যদি তোমার আত্মীয় স্বজন কাহাকেও পাও, তার সঙ্গে আজিই দিল্লীর বাহিরে চলিয়া যাইও। যদি শিবিরে কাহাকেও না পাও, তবে ইহার সঙ্গে দিল্লীর বাহিরে যাইও। তোমার স্বামী বোধ হয়, দিল্লী ছাড়াইয়া কোথাও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পথে তাঁহার সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে এই খোজাই তোমাকে উদয়পুর পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিবে। খরচ পত্র তোমার কাছে না থাকে, তবে তাহাও আমি দিতেছি। কিন্তু সাবধান! আমি ধরা না পড়ি।"

নির্ম্মল বলিল, "হজরৎ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি রাজপুতের মেয়ে।"

তখন যোধপুরী বনাসী নামে তাঁহার বিশ্বাসী খোজাকে ডাকাইয়া যাহা করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনই যাইতে পারিবে ত ?"

বনাসী বলিল, "তা পারির। কিন্তু বেগম সাহেবার দস্তখতি একখানা পর্‌ওয়ানা না পাইলে এত করিতে সাহস হইতেছে না।"

যোধপুরী তখন বলিলেন, "যেরূপ পর্‌ওয়ানা চাহি, লিখাইয়া আন, আমি বেগম সাহেবার দস্তখত করাইতেছি।"

খোজা পর্‌ওয়ানা লিখাইয়া আনিল। তাহা সেই তাতারী প্রহরিণীর হাতে দিয়া রাজমহিষী বলিলেন, "ইহাতে বেগম সাহেবার দস্তখত করাইয়া আন।"

প্রহরিণী জিজ্ঞাসা করিল, "যদি জিজ্ঞাসা করে, কিসের পর্‌ওয়ানা ?"

যোধপুরী বলিলেন, "বলিও, 'আমার কোতলের পর্‌ওয়ানা।' কিন্তু কালি কলম লইয়া যাইও। আর পাঞ্জা ছেপ্‌ত করিতে ভুলিও না।"

প্রহরিণী কালি কলম সহিত পর্‌ওয়ানা লইয়া গিয়া জেব-উন্নিসার কাছে ধরিল। জেব-উন্নিসা পূর্ব্বভাবাপন্ন, জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের পর্‌ওয়ানা ?"

প্রহরিণী বলিল, "আমার কোতলের পর্‌ওয়ানা।"

জেব। কি চুরি করেছিস্ ?

প্রহরিণী। হজরৎ উদিপুরী বেগমের পেশ্‌ওয়াজ।

জেব। আচ্ছা করেছিস—কোতলের পর পরিস্।

এই বলিয়া বেগম সাহেবা পর্‌ওয়ানা দস্তখত করিয়া দিলেন। প্রহরিণী মোহর ছেপ্‌ত করিয়া লইয়া, যোধপুরী বেগমকে আনিয়া দিল। বনাসী সেই পর্‌ওয়ানা এবং নির্ম্মলকে লইয়া যোধপুরীর মহাল হইতে যাত্রা করিল। নির্ম্মলকুমারী অতি প্রফুল্লমনে খোজার সঙ্গে চলিলেন।

কিন্তু সহসা সে প্রফুল্লতা দূর হইল—রঙ্‌মহালের ফটকের নিকট আসিয়া খোজা ভীত, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কি বিপদ্! পালাও! পালাও!" এই বলিয়া খোজা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমিধসংগ্রহ—স্বয়ং যম

নির্ম্মল বুঝিল না যে, কেন পলাইতে হইবে। এদিক্ ওদিক্ নিরীক্ষণ করিল—পলাইবার কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিল, ফটকের নিকট, পরিণতবয়স্ক, শুভ্রবেশ একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। মনে করিল, এটা কি ভূত প্রেত যে, তাই ভয় পাইয়া খোজা পলাইল? নির্ম্মল নিজে ভূতের ভয়ে তেমন কাতর নহে। এ জন্য সে না পলাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল,—ইতিমধ্যে সেই শুভ্রবেশ পুরুষ আসিয়া, নির্ম্মলের নিকট দাঁড়াইল। নির্ম্মলকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

নির্ম্মল বলিল, "আমি যে হই না কেন?"

শুভ্রবেশী পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইতেছিলে?"

নির্ম্মল। বাহিরে।

পুরুষ। কেন?

নি। আমার দরকার আছে।

পু। দরকার ভিন্ন কেহ কিছু করে না, তাহা আমার জানা আছে। কি দরকার?

নি। আমি বলিব না।

পু। তোমার সঙ্গে কে আসিতেছিল?

নি। আমি বলিব না।

পু। তুমি হিন্দুর মেয়ে দেখিতেছি। কি জাতি?

নি। রাজপুত।

পু। তুমি কি যোধপুরী বেগমের কাছে থাক?

নির্ম্মল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, যোধপুরী বেগমের নাম কাহারও সাক্ষাতে করিবে না—কি জানি, যদি তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে। অতএব বলিল, "আমি এখানে থাকি না। আজ আসিয়াছি।"

সে পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা হইতে আসিয়াছ?"

নির্ম্মল মনে ভাবিল, মিথ্যা কথা কেন বলিব? এ ব্যক্তি আমার কি করিবে? কার ভয়ে রাজপুতের মেয়ে মিথ্যা বলিবে? অতএব উত্তর করিল, "আমি উদয়পুর হইতে আসিয়াছি।"

তখন সে পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, “কেন আসিয়াছ ?”

নির্ম্মল ভাবিল, ইহাকে বা এত পরিচয় কেন দিব ? বলিল, “আপনাকে অত পরিচয় দিয়া কি হইবে ? এত জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া আপনি যদি আমাকে ফটক পার করিয়া দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব।”

পুরুষ উত্তর করিল, “তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া উত্তরে যদি সন্তুষ্ট হই, তবে তোমাকে ফটক পার করিয়া দিতে পারি।”

নির্ম্মল। আপনি কে, তাহা না জানিলে আমি সকল কথা আপনাকে বলিব না।

পুরুষ উত্তর বলিল, “আমি আলমগীর বাদশাহ।”

তখন সেই তস্‌বীর, যাহা চঞ্চলকুমারী পদাঘাতে ভাঙ্গিয়াছিল, নির্ম্মলকুমারীর মনে উদয় হইল। নির্ম্মল একটু জিব কাটিয়া, মনে মনে বলিল, “হাঁ, সেই ত বটে!”

তখন নির্ম্মলকুমারী ভূমি স্পর্শ করিয়া বাদশাহকে রীতিমত সেলাম করিল। যুক্তকরে বলিল, “হুকুম ফরমাউন্।”

বাদশাহ বলিলেন, “এখানে কাহার কাছে আসিয়াছিলে ?”

নির্ম্মল। হজরৎ বাদশাহ বেগম উদিপুরী সাহেবার কাছে।

বাদশাহ। কি বলিলে ? উদয়পুর হইতে উদিপুরীর কাছে ? কেন ?

নি। পত্র ছিল।

বাদ। কাহার পত্র ?

নি। মহারাণার রাজমহিষীর।

বাদ। কৈ সে পত্র ?

নি। জহরৎ বেগম সাহেবাকে তাহা দিয়াছি।

বাদশাহ বড় বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, “আমার সঙ্গে এসো।”

নির্ম্মলকে সঙ্গে লইয়া বাদশাহ উদিপুরীর মন্দিরে গমন করিলেন। দ্বারে নির্ম্মলকে দাঁড় করাইয়া, তাতারী প্রহরিণীদিগকে বলিলেন, “ইহাকে ছাড়িও না।” নিজে উদিপুরীর শয্যাগৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উদিপুরী ঘোর নিদ্রাভিভূত। তাহার বিছানায় পত্রখানা পড়িয়া আছে। ঔরঙ্গজেব তাহা লইয়া পাঠ করিলেন। পত্রখানি, তখনকার রীতিমত, ফার্সীতে লেখা।

পত্র পাঠ করিয়া, নিদাঘসন্ধ্যাকাদম্বিনী তুল্য ভীষণ কান্তি লইয়া ঔরঙ্গজেব বাহিরে আসিলেন। নির্ম্মলকে বলিলেন, “তুই কি প্রকারে এই মহাল মধ্যে প্রবেশ করিলি ?”

নির্ম্মল যুক্তকরে বলিল, "বাঁদীর অপরাধ মার্জ্জনা হউক্—আমি এ কথার উত্তর দিব না।"

ঔরঙ্গজেব বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "কি এত হেমাকৎ? আমি দুনিয়ার বাদশাহ—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুই উত্তর দিবি না?"

নির্ম্মল করজোড়ে বলিল, "দুনিয়া হুজুরের। কিন্তু রসনা আমার। আমি যাহা না বলিব, দুনিয়ার বাদশাহ তাহা কিছুতেই বলাইতে পারিবেন না।"

ঔরঙ্গ। তা না পারি, যে রসনার বড়াই করিতেছ, তা এখনই তাতারী প্রহরিণীর হাতে কাটিয়া ফেলিয়া কুকুরকে খাওয়াইতে পারি।

নির্ম্মল। দিল্লীশ্বরের মর্জি! কিন্তু তাহা হইলে, যে সংবাদ আপনি খুঁজিতেছেন, তা প্রকাশের পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হইবে।

ঔরঙ্গ। সেই জন্য তোমার জিব রাখিলাম। তোমার প্রতি এই হুকুম দিতেছি যে, আগুন জ্বালিয়া তোমাকে কাপড়ে মুড়িয়া, একটু একটু করিয়া তাতারীরা পোড়াইতে থাকুক। আমার কথায় যাহা বলিবে না, আগুনের জ্বালায় তাহা বলিবে।

নির্ম্মলকুমারী হাসিল। বলিল, "হিন্দুর মেয়ে আগুনে পুড়িয়া মরিতে ভয় করে না। হিন্দুস্থানের বাদশাহ কি কখন শুনেন নাই যে, হিন্দুর মেয়ে, হাসিতে হাসিতে স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় চড়িয়া পুড়িয়া মরে? আপনি যে মরণের ভয় দেখাইতেছেন, আমার মা মাতামহী প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে সেই আগুনেই মরিয়াছেন। আমিও কামনা করি, যেন ঈশ্বরের কৃপায় আমিও স্বামীর পাশে স্থান পাইয়া আগুনেই জীবন্ত পুড়িয়া মরি।"

বাদশাহ মনে মনে বলিলেন, "বাহবা! বাহবা!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে কথার মীমাংসা পরে করিব। আপাততঃ তুমি এই মহালের একটা কামরার ভিতর চাবি বন্ধ থাক। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইলে কিছু খাইতে পাইবে না। তবে যখন নিতান্ত প্রাণ যায় বিবেচনা করিবে, তখন কবাটে ঘা মারিও, প্রহরীরা দ্বার খুলিয়া দিয়া আমার কাছে লইয়া যাইবে। তখন আমার নিকট সকল উত্তর দিলে, পান আহার করিতে পাইবে।"

নির্ম্মল। শাহান্-শাহ! আপনি কখনও কি শুনেন নাই যে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ব্রত নিয়ম করে? ব্রত নিয়ম জন্য এক দিন, দুই দিন, তিন দিন নিরম্বু উপবাস করে? শুনেন নাই, শর্ণা ধর্ণার জন্য অনিয়মিতকাল উপবাস করে? শুনেন নাই, তারা কখন কখন উপবাস করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে? জাঁহাপনা, এ দাসীও তা পারে। ইচ্ছা হয়, আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

ঔরঙ্গজেব দেখিলেন, এ মেয়েকে ভয় দেখাইয়া কিছু হইবে না। মারিয়া ফেলিলেও কিছু হইবে না। পীড়ন করিলে কি হয় বলা যায় না। কিন্তু তার পূর্ব্বে একবার প্রলোভনের শক্তিটা পরীক্ষা করা ভাল। অতএব বলিলেন, "ভাল, নাই তোমাকে পীড়ন করিলাম। তোমাকে ধন দৌলৎ দিয়া বিদায় করিব। তুমি এ সকল কথা আমার নিকট যথার্থ প্রকাশ কর।"

নি। রাজপুতকন্যা, যেমন মৃত্যুকে ঘৃণা করে, ধন দৌলৎকেও তেমনই। সামান্যা স্ত্রীলোক আমি—নিজগুণে আমাকে বিদায় দিন।

ঔরঙ্গ। দিল্লীর বাদশাহের অদেয় কিছু নাই। তাঁহার কাছে প্রার্থনীয় তোমার কি কিছুই নাই?

নি। আছে। নির্ব্বিঘ্নে বিদায়।

ঔরঙ্গ। কেবল সেইটি এখন পাইতেছ না। তা ছাড়া আর জগতে তোমার প্রার্থনা করিবার, কি ভয় করিবার কিছু নাই?

নি। প্রার্থনার আছে বৈ কি? কিন্তু দিল্লীর বাদশাহের রত্নাগারে সে রত্ন নাই।

ঔরঙ্গ। এমন কি সামগ্রী?

নি। আমরা হিন্দু, আমরা জগতে কেবল ধর্ম্মকেই ভয় করি, ধর্ম্মই কামনা করি। দিল্লীর বাদশাহ ম্লেচ্ছ, আর দিল্লীর বাদশাহ ঐশ্বর্য্যশালী। দিল্লীর বাদশাহের সাধ্য কি যে, আমার কাম্য বস্তু দিতে পারেন, কি লইতে পারেন?

দিল্লীশ্বর নির্ম্মলকুমারীর সাহস ও চতুরতা দেখিয়া, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এই কটূক্তিতে পুনর্ব্বার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বটে! বটে! ঐ কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" তখন তিনি একজন তাতারীকে আদেশ করিলেন, "যা! বাবর্চ্চি মহল হইতে কিছু গোমাংস আনিয়া, দুই তিন জনে ধরিয়া ইহার মুখে গুঁজিয়া দে।"

নির্ম্মল তাহাতেও টলিল না। বলিল, "জানি, আপনাদিগের সে বিদ্যা আছে। সে বিদ্যার জোরেই এই সোনার হিন্দুস্থান কাড়িয়া লইয়াছেন। জানি, গোরুর পাল সম্মুখে রাখিয়া লড়াই করিয়াই মুসলমান হিন্দুকে পরাস্ত করিয়াছে—নহিলে রাজপুতের বাহুবলের কাছে মুসলমানের বহুবল, সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। কিন্তু আবার একটা কথা আপনাকে মনে করিয়া দিতে হইল। শুনেন নাই কি যে, রাজপুতের মেয়ে বিষ সঙ্গে না লইয়া এক পা চলে না? আমার নিকটে এমন তীব্র বিষ আছে যে, আপনার ভৃত্যগণ গোমাংস লইয়া এই ঘরে পা দেওয়ার পরেও যদি তাহা আমি মুখে দিই, তবে জীবন্তে আর আমার মুখে কেহ

গোমাংস দিতে পারিবে না। জাঁহাপনা! আপনার বড় ভাই দারা শেকোকে বধ করিয়া তাহার দুইটা কবিলা কাড়িয়া আনিতে গিয়াছিলেন—পারিয়াছিলেন কি?—অধম খ্রিষ্টিয়ানীটা আসিয়াছিল জানি, রাজপুতনী দিল্লীর বাদশাহের মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যায় নাই কি? আমিও এখনই তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।"

বাদশাহ বাক্যশূন্য। যিনি পৃথিবীপতি বলিয়া খ্যাত, পৃথিবীময় যাঁহার গৌরব ঘোষিত, যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের ত্রাস, তিনি আজ এই অনাথা, নিঃসহায় অবলার নিকট অপমানিত—পরাস্ত। ঔরঙ্গজেব পরাজয় স্বীকার করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এ অমূল্য রত্ন, ইহাকে নষ্ট করা হইবে না। আমি ইহাকে বশীভূত করিব।" প্রকাশ্যে অতি মধুরস্বরে বলিলেন, "তোমার নাম কি, পিয়ারি?"

নির্ম্মলকুমারী হাসিয়া বলিল, "ও কি জাঁহাপনা! আরও রাজপুত মহিষীতে সাধ আছে না কি? তা সে সাধও পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। আমি বিবাহিতা, আমার হিন্দু স্বামী জীবিত আছেন।"

ঔ। সে কথা এখন থাক্। এখন তুমি কিছু দিন আমার এই রঙ্মহাল মধ্যে বাস কর। এ হুকুম বোধ করি তুমি অমান্য করিবে না?

নি। কেন আমাকে আটক করিতেছেন?

ঔ। তুমি এখন দেশে গেলে, আমার বিস্তর নিন্দা করিবে। যাহাতে তুমি আমার প্রশংসা করিতে পার, এক্ষণে তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিব। পরে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।

নি। যদি আপনি না ছাড়েন, তবে আমার যাইবার সাধ্য নাই। কিন্তু আপনি কয়েকটি কথা প্রতিশ্রুত হইলেই আমি দিন কত থাকিতে পারি।

ঔ। কি কি কথা?

নি। হিন্দুর অন্নজল ভিন্ন আমি স্পর্শ করিব না।

ঔ। তাহা স্বীকার করিলাম।

নি। কোন মুসলমান আমাকে স্পর্শ করিবে না।

ঔ। তাহাও স্বীকার করিলাম।

নি। আমি কোন রাজপুত বেগমের নিকটে থাকিব।

ঔ। তাহাও হইবে। আমি তোমাকে যোধপুরী বেগমের নিকট রাখিয়া দিব।

নির্ম্মলকুমারীর জন্য বাদশাহ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুনশ্চ সমিধসংগ্রহের জন্য

পরদিন ঔরঙ্গজেব, জেব-উন্নিসা ও নির্ম্মলকুমারীকে সঙ্গে লইয়া রঙ্ মহাল মধ্যে তদারক করিলেন, কে ইহাকে অন্তঃপুর মধ্যে আসিতে দিয়াছে। অন্তঃপুরবাসী সমস্ত খোজা, তাতারী, বাঁদীদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহারা নির্ম্মলকে আসিতে দিয়াছিল, তাহারা তাহাকে চিনিল, কিন্তু একটা গর্হিত কাজ হইয়াছে, বুঝিয়া কেহই অপরাধ স্বীকার করিল না। ঔরঙ্গজেব বা জেব-উন্নিসা কোন সন্ধানই পাইলেন না।

তখন ঔরঙ্গজেব ও জেব-উন্নিসা অপর পৌরবর্গকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে, "ইহাকে আসিতে দেওয়ায় তত ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু ইহাকে কেহ আমাদের হুকুম ব্যতীত বাহির হইতে দিও না। তবে ইহাকে কেহ কোন প্রকার পীড়ন বা অপমান করিও না। বেগমদিগের মত ইহাকে মান্য করিবে। এ যোধপুরী বেগমের হিন্দু বাঁদীদিগের পাক ও জল খাইবে, মুসলমান ইহাকে ছুঁইবে না।"

তখন নির্ম্মলকুমারীকে সকলে সেলাম করিল। জেব-উন্নিসা তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া লইয়া আপন মন্দিরে বসাইলেন এবং নানাবিধ আলাপ করিলেন। নির্ম্মলের কাছে ভিতরের কথা কিছু পাইলেন না।

সেই দিন অপরাহ্নে একজন তাতারী প্রহরিণী আসিয়া যোধপুরী বেগমকে সংবাদ দিল যে, একজন সওদাগর পাথরের জিনিস লইয়া দুর্গমধ্যে বেচিতে আসিয়াছে। কতকগুলা সে মহাল মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছে। জিনিসগুলা ভাল নহে—কোন বেগমই তাহা পসন্দ করিলেন না। আপনি কিছু লইবেন কি ?

মাণিকলাল বাছিয়া বাছিয়া মন্দ জিনিস আনিয়াছিল—যে সে বেগম যেন পসন্দ করিয়া কিনিয়া না রাখে। যখন প্রহরিণী এই কথা বলিল, তখন নির্ম্মলকুমারী যোধপুরীর নিকটে ছিল। সে যোধপুরীকে একটু চক্ষুর ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "আমি নিব।"

পূর্ব্বরাত্রিতে নির্ম্মলকুমারীর সঙ্গে যেরূপে বাদশাহের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছিল, নির্ম্মল সকলই তাহা যোধপুরী বেগমের কাছে বলিয়াছিল। যোধপুরী শুনিয়া নির্ম্মলের অনেক প্রশংসা এবং নির্ম্মলকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বহু যত্ন করিতে-ছিলেন। এক্ষণে নির্ম্মলের অভিপ্রায় বুঝিয়া পাথরের দ্রব্য আনাইতে হুকুম দিলেন।

প্রহরিণী বাহিরে গেলে নির্ম্মল সংক্ষেপে যোধপুরীকে মাণিকলালের সঙ্কেতকৌশল বুঝাইয়া দিল। যোধপুরী তখন বলিলেন, "তবে তুমি ততক্ষণ তোমার স্বামীকে একখানা পত্র লেখ। আমি পাথরের জিনিস পসন্দ করি। এই সুযোগে তাঁহাকে তোমার সংবাদ দিতে হইবে।" উপযুক্ত সময়ে সেই প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল।

নির্ম্মল দেখিল যে, সকল দ্রব্যেই মাণিকলালের চিহ্ন আছে। দেখিয়া নির্ম্মল পত্র লিখিতে বসিল। যতক্ষণ না নির্ম্মলের পত্র লেখা হইল, ততক্ষণ যোধপুরী পসন্দ করিতে লাগিলেন। দ্রব্যজাতের মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত মূল্যবান্ রত্নরাজির কারুকার্য্যবিশিষ্ট একটা কৌটা ছিল। তাহাতে জড়াইয়া চাবি তালা বন্ধ করিবার জন্য একটা স্বর্ণনির্ম্মিত শৃঙ্খল ছিল। নির্ম্মলের পত্র লেখা হইলে যোধপুরী অন্যের অলক্ষ্যে সেই পত্র ঐ কৌটার মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

যোধপুরী সকল দ্রব্য পসন্দ করিয়া রাখিলেন, কেবল সেই কৌটাটি না পসন্দ করিয়া ফেরৎ দিলেন। ফেরৎ দিবার সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক চাবিটা ফেরৎ দিতে ভুলিয়া গেলেন।

ছদ্মবেশী সওদাগর মাণিকলাল, কেবল কৌটা ফেরৎ আসিল, তাহার চাবি আসিল না, দেখিয়া প্রত্যাশাপন্ন হইল। সে টাকা কড়ি সব বুঝিয়া লইয়া, কৌটা লইয়া দোকানে গেল। সেখানে নির্জ্জনে কৌটার ভিতরে নির্ম্মলকুমারীর পত্র পাইল।

পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে জানিবার, পাঠকের প্রয়োজন নাই। স্থূল কথা যাহা, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। আনুষঙ্গিক কথা পরে বুঝিতে পারিবেন। পত্র পাইয়া, নির্ম্মল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া মাণিকলাল স্বদেশ যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দিনেই দোকান পাট উঠাইলে পাছে কেহ সন্দেহ করে, এজন্য দিনকতক বিলম্ব করা স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমিধসংগ্রহ—জেব-উন্নিসা

এখন একবার নির্ম্মলকুমারীকে ছাড়িয়া মোগলবীর মবারকের সংবাদ লইতে হইবে। বলিয়াছি, যাহারা রূপনগর হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, ঔরঙ্গজেব তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে বা পদচ্যুত, কাহাকে বা দণ্ডিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মবারক সে শ্রেণীভুক্ত

হয়েন নাই। ঔরঙ্গজেব সকলের নিকট তাঁহার বীরত্বের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বহাল রাখিয়াছিলেন।

জেব-উন্নিসাও সে সুখ্যাতি শুনিলেন। মনে করিলেন যে, মবারক নিজে উপযাচক হইয়া তাঁহার নিকট হাজির হইয়া সকল পরিচয় দিবে। কিন্তু মবারক আসিল না।

মবারক দরিয়াকে নিজালয়ে লইয়া আসিয়াছিল। তাহার খোজা বাঁদী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তাহাকে এল্‌বাস পোষাক দিয়া সাজাইয়াছিল। যথাসাধ্য অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিল। মবারক পবিত্রা পরিণীতা পত্নী লইয়া ঘরকরনা সাজাইতেছিল।

মবারক স্বেচ্ছাক্রমে আসিল না দেখিয়া জেব-উন্নিসা বিশ্বাসী খোজা আসীরদ্দীনের দ্বারা তাহাকে ডাকাইলেন। তথাপি মবারক আসিল না। জেব-উন্নিসার বড় রাগ হইল। বড় হেমাকৎ—বাদশাহজাদী মেহেরবানি ফরমাইয়া ইয়াদ্ করিতেছেন—তবু নফর হাজির হয় না—বড় গোস্তাকী।

দিন কতক জেব-উন্নিসা রাগের উপর রহিলেন—মনে মনে বলিলেন, "আমার ত সকলই সমান।" কিন্তু জেব-উন্নিসা তখনও জানিতেন না যে, বাদশাহজাদীরও ভুল হয় যে, খোদা বাদশাহজাদীকে ও চাষার মেয়েকে এক ছাঁচেই ঢালিয়াছেন ;—ধন দৌলত, তক্তে তাউস্, সকলই কর্ম্মভোগ মাত্র, আর কোন প্রভেদ নাই।

সব সমান হয় না, জেব-উন্নিসারও সব সমান নয়। কিছু দিন রাগের উপর থাকিয়া, জেব-উন্নিসা মবারকের জন্য একটু কাতর হইলেন। মান খোওয়াইয়া—শাহজাদীর মান, নায়িকার মান, দুই খোওয়াইয়া, আবার সেই মবারককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মবারক বলিল, "আমার বহৎ বহৎ তস্‌লিমাৎ, শাহজাদীর অপেক্ষা আমার নিকট বেশ্‌কিম্মৎ আর দুনিয়ায় কিছুই নাই। কেবল এক আছে। খোদা আছেন, "দীন্" আছে। গুনাহ্‌গারী আর আমা হইতে হইবে না। আমি আর মহালের ভিতর যাইব না—আমি দরিয়াকে ঘরে আনিয়াছি।"

উত্তর শুনিয়া জেব-উন্নিসা রাগে ফুলিয়া আটখানা হইল এবং মবারকের ও দরিয়ার নিপাতসাধন জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। ইহা বাদশাহী দস্তুর।

মহাল মধ্যে নির্ম্মলকুমারীর অবস্থানে, জেব-উন্নিসার এ অভিপ্রায় সাধনের কিছু সুবিধা ঘটিল। নির্ম্মলকুমারী, ঔরঙ্গজেবের নিকট ক্রমশঃ আদরের বস্তু হইয়া উঠিলেন। ইহার মধ্যে কন্দর্প ঠাকুরের কোন কারসাজি ছিল না ; কাজটা সয়তানের। ঔরঙ্গজেব প্রত্যহ অবসর মত, সুখের ও আয়েশের সময়ে, "রূপনগরী নাজ্‌নীকে" ডাকিয়া কথোপকথন

করিতেন। কথোপকথনের প্রধান উদ্দেশ্য, রাজসিংহের রাজকীয় অবস্থাঘটিত সংবাদ লওয়া। তবে চতুরচূড়ামণি ঔরঙ্গজেব এমন ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন যে, হঠাৎ কেহ বুঝিতে না পারে যে, তিনি যুদ্ধকালে ব্যবহার্য্য সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু নির্ম্মলও চতুরতায় ফেলা যায় না, সে সকল কথারই অভিপ্রায় বুঝিত, এবং সকল প্রয়োজনীয় কথার মিথ্যা উত্তর দিত।

অতএব ঔরঙ্গজেব তাহার কথাবার্ত্তায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি মনে মনে এইরূপ বিচার করিলেন,—"মেবার আমি সৈন্যের সাগরে ডুবাইয়া দিব, তাহাতে সন্দেহই করি না—রাজসিংহের রাজ্য থাকিবে না। কিন্তু তাহাতেই আমার মান বজায় হইবে না। তাহার রূপনগরী রাণীকে না কাড়িয়া আনিতে পারিলে আমার মান বজায় হইবে না। কিন্তু রাজ্য পাইলেই যে আমি রাজমহিষীকে পাইব, এমন ভরসা করা যায় না। কেন না, রাজপুতের মেয়ে, কথায় কথায় চিতায় উঠিয়া পুড়িয়া মরে, কথায় কথায় বিষ খায়। আমার হাতে পড়িবার আগে সে সয়তানী প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু এই বাঁদীটাকে যদি হস্তগত করিতে পারি—বশীভূত করিতে পারি—তবে ইহা দ্বারা তাহাকে ভুলাইয়া আনিতে পারিব না? এ বাঁদীটা কি বশীভূত হইবে না? আমি দিল্লীর বাদশাহ, আমি একটা বাঁদীকে বশীভূত করিতে পারিব না? না পারি, তবে আমার বাদশাহী নামোনাসেফ্।"

তার পর বাদশাহের ইঙ্গিতে জেব-উন্নিসা নির্ম্মলকুমারীকে রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিলেন। তাঁর বেশভূষা, এল্‌বাস পোষাক, বেগমদিগের সঙ্গে সমান হইল। নির্ম্মল যাহা বলিতেন, তাহা হইত; যাহা চাহিতেন, তাহা পাইতেন। কেবল বাহির হইতে পাইতেন না।

এ সব কথা লইয়া যোধপুরীর সঙ্গে নির্ম্মলের আন্দোলন হইত। একদা হাসিয়া নির্ম্মল, যোধপুরীকে বলিল,—

সোনে কি পিঞ্জিরা, সোনে কি চিড়িয়া,
সোনে কি জিঞ্জির পয়ের মে,
সোনে কি চানা, সোনে কি দানা,
মট্টি কেঁও সেরেফ্ খয়ের মে।

যোধপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুই নিস্ কেন?"

নির্ম্মল বলিল, "উদয়পুরে গিয়া দেখাইব যে, মোগল বাদশাহকে ঠকাইয়া আনিয়াছি।"

জেব-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবের দাহিন হাত। ঔরঙ্গজেবের আদেশ পাইয়া, জেব-উন্নিসা নির্ম্মলকে লইয়া পড়িলেন। আসল কাজটা শাহজাদীর হাতে রহিল—বাদশাহ নিজে মধুর আলাপের ভারটুকু আপন হাতে রাখিলেন। নির্ম্মলের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করিতেন, কিন্তু

তাহাও একটু বাদশাহী রকমের মাজা ঘষা থাকিত—নির্ম্মল রাগ করিতে পারিত না, কেবল উত্তর করিত, তাও মেয়েলী রকম মাজা ঘষা, তবে রূপনগরের পাহাড়ের কর্কশতাশূন্য নহে। এখনকার ইংরেজী রুচির সঙ্গে ঠিক মিলিবে না বলিয়া সেই বাদশাহী রুচির উদাহরণ দিতে পারিলাম না।

জেব-উন্নিসার কাছে নির্ম্মলের যাহা বলিবার আপত্তি নাই, তাহা সে অকপটে বলিয়াছিল। অন্যান্য কথার মধ্যে রূপনগরের যুদ্ধটা কি প্রকারে হইয়াছিল, সে কথাও পাড়িয়াছিল। নির্ম্মল যুদ্ধের প্রথম ভাগে কিছুই দেখে নাই, কিন্তু চঞ্চলকুমারীর কাছে সে সকল কথা শুনিয়াছিল। যেমন শুনিয়াছিল, জেব-উন্নিসাকে তেমনই শুনাইল। মবারক যে মোগল সৈন্যকে ডাকিয়া, চঞ্চলকুমারীর কাছে পরাভব স্বীকার করিয়া, রণজয় ত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, তাহা বলিল; চঞ্চলকুমারী যে রাজপুতগণের রক্ষার্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক দিল্লীতে আসিতে চাহিয়াছিল, তাহাও বলিল; বিষ খাইবাব ভরসার কথাও বলিল; মবারক যে চঞ্চলকুমারীকে লইয়া আসিল না, তাহাও বলিল।

শুনিয়া জেব-উন্নিসা মনে মনে বলিলেন, "মবারক সাহেব! এই অস্ত্রে তোমার কাঁধ হইতে মাথা নামাইব।" উপযুক্ত অবসর পাইলে, জেব-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবকে যুদ্ধের সেই ইতিহাস শুনাইলেন।

ঔরঙ্গজেব শুনিয়া বলিলেন, "যদি সে নফর এমন বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে আজি সে জহান্নামে যাইবে।" ঔরঙ্গজেব কাণ্ডটা না বুঝিলেন, তাহা নহে। জেব-উন্নিসার কু-চরিত্রের কথা তিনি সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতেন। কতকগুলি লোক আছে, এদেশের লোকে তাহাদের বর্ণনার সময় বলে, "ইহারা কুকুর মারে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে না।" মোগল বাদশাহেরা সেই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁহারা কন্যা বা ভগিনীর দুশ্চরিত্র জানিতে পারিলে কন্যা কি ভগিনীকে কিছু বলিতেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি কন্যা বা ভগিনীর অনুগৃহীত, তাহার ঠিকানা পাইলেই কোন ছলে কৌশলে তাহার নিপাত সাধন করিতেন। ঔরঙ্গজেব অনেক দিন হইতে মবারককে জেব-উন্নিসার প্রীতিভাজন বলিয়া সন্দেহ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। এখন কন্যার কথায় ঠিক বুঝিলেন, বুঝি কলহ ঘটিয়াছে, তাই বাদশাহজাদী, যে পিপীলিকা তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, তাহাকে টিপিয়া মারিতে চাহিতেছেন। ঔরঙ্গজেব তাহাতে খুব সম্মত। কিন্তু একবার নির্ম্মলের নিজমুখে এ সকল কথা বাদশাহের শুনা কর্ত্তব্য বোধে, তিনি নির্ম্মলকে ডাকাইলেন। ভিতরের কথা নির্ম্মল কিছু জানে না বা বুঝিল না, সকল কথাই ঠিক বলিল।

যথাবিহিত সময়ে বখ্‌শীকে তলব করিয়া, বাদশাহ মবারকের সম্বন্ধে আজ্ঞাপ্রচার করিলেন। বখ্‌শীর আজ্ঞা পাইয়া আট জন আহদী গিয়া মবারককে ধরিয়া আনিয়া বখ্‌শীর নিকট হাজির করিল। মবারক হাসিতে হাসিতে বখ্‌শীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বখ্‌শীর সম্মুখে দুইটি লৌহপিঞ্জর। তন্মধ্যে একটি একটি বিষধর সর্প গর্জ্জন করিতেছে।

এখনকার দিনে যে রাজদণ্ডে প্রাণ হারায়, তাহাকে ফাঁসি যাইতে হয়, অন্য প্রকার রাজকীয় বধোপায় প্রচলিত নাই। মোগলদিগের রাজ্যে এরূপ অনেক প্রকার বধোপায় প্রচলিত ছিল। কাহারও মস্তকচ্ছেদ হইত; কেহ শূলে যাইত; কেহ হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত হইত; কেহ বা বিষধর সর্পের দংশনে প্রাণত্যাগ করিল। যাহাকে গোপনে বধ করিতে হইবে, তাহার প্রতি বিষপ্রয়োগ হইত।

মবারক সহাস্যবদনে বখ্‌শীর কাছে উপস্থিত হইয়া এবং দুই পাশে দুইটি বিষধর সর্পের পিঞ্জর দেখিয়া পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল, "কি ? আমায় যাইতে হইবে ?"

বখ্‌শী বিষণ্ণভাবে বলিল, "বাদশাহের হুকুম !"

মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এ হুকুম হইল, কিছু প্রকাশ পাইয়াছে কি ?"

বখ্‌শী। না—আপনি কিছু জানেন না ?

মবারক। এক রকম—আন্দাজী আন্দাজী। বিলম্বে কাজ কি ?

বখ্‌শী। কিছু না।

তখন মবারক জুতা খুলিয়া একটা পিঞ্জরের উপর পা দিলেন। সর্প গর্জ্জাইয়া আসিয়া পিঁজরার ছিদ্রমধ্য হইতে দংশন করিল।

দংশনজ্বালায় মবারক একটু মুখ বিকৃত করিলেন। বখ্‌শীকে বলিলেন, "সাহেব ! যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, মবারক কেন মরিল, তখন মেহেরবানি করিয়া বলিবেন, শাহজাদী আলম্‌ জেব-উন্নিসা বেগম সাহেবার ইচ্ছা।"

বখ্‌শী সভয়ে, অতি কাতরভাবে বলিলেন, "চুপ ! চুপ ! এটাও।"

যদি একটা সাপের বিষ না থাকে, এজন্য দুইটা সর্পের দ্বারা হন্য ব্যক্তিকে দংশন করান রীতি ছিল। মবারক তাহা জানিতেন। তিনি দ্বিতীয় পিঞ্জরের উপর পা রাখিলেন, দ্বিতীয় মহাসর্পও তাঁহাকে দংশন করিয়া তীক্ষ্ণ বিষ ঢালিয়া দিল।

মবারক তখন বিষের জ্বালায় জর্জ্জরীভূত ও নীলকান্তি হইয়া, ভূমে জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্তকরে ডাকিতে লাগিল, "আল্লা আক্‌বর ! যদি কখনও তোমার দয়া পাইবার যোগ্য কার্য্য করিয়া থাকি, তবে এই সময়ে দয়া কর।"

এইরূপে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে, তীব্র সর্পবিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া, মোগলবীর মবারক আলি প্রাণত্যাগ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সব সমান

রঙ্‌মহালে সকল সংবাদই আসে—সকল সংবাদই জেব-উন্নিসা নিয়া থাকেন—তিনি নাএবে বাদশাহ। মবারকের বধসংবাদও আসিয়া পৌছিল।

জেব-উন্নিসা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, তিনি এই সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইবেন। সহসা দেখিলেন যে, ঠিক বিপরীত ঘটিল। সংবাদ আসিবামাত্র সহসা তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল—এ শুক্‌না মাটিতে কখন জল উঠে নাই। দেখিলেন, কেবল তাই নহে, গণ্ড বাহিয়া ধারায় ধারায় সে জল গড়াইতে লাগিল। শেষ দেখিলেন, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে। জেব-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তিদন্তনির্ম্মিত রত্নখচিত পালঙ্কে শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কৈ শাহজাদী? হস্তিদন্তনির্ম্মিত রত্নদণ্ডভূষিত পালঙ্কে শুইলেও ত চক্ষুর জল থামে না! তুমি যদি বাহিরে গিয়া দিল্লীর সহবতলীর ভগ্ন কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে, কত লোক ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া কত হাসিতেছে। তোমার মত কান্না কেহই কাঁদিতেছে না।

জেব-উন্নিসার প্রথমে কিছু বোধ হইল যে, তাঁহার আপনার সুখের হানি তিনি আপনিই করিয়াছেন। ক্রমশঃ বোধ হইল যে, সব সমান নহে—বাদশাহজাদীরাও ভালবাসে; জানিয়া হউক, না জানাইয়া হউক, নারীদেহ ধারণ করিলেই ঐ পাপকে হৃদয়ে আশ্রয় দিতে হয়। জেব-উন্নিসা আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিল, "আমি, তাকে এত ভালবাসিতাম, ত সে কথা এত দিন জানিতে পারি নাই কেন?" কেহ তাহাকে বলিয়া দিল না যে, ঐশ্বর্য্যমদে তুমি অন্ধ হইয়াছিলে, রূপের গর্ব্বে তুমি অন্ধ হইয়াছিলে, ইন্দ্রিয়ের দাসী হইয়া তুমি ভালবাসাকে চিনিতে পার নাই। তোমার উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে—কেহ যেন তোমাকে দয়া না করে।

কেহ বলিয়া না দিক্—তার নিজের মনে এ সকল কথা কিছু কিছু আপনা আপনি উদয় হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে এমনও মনে হইল, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি আছে। যদি থাকে,

তবে বড় অধর্ম্মের কাজ হইয়াছে। শেষ ভয় হইল, ধর্ম্মাধর্ম্মের পুরস্কার দণ্ড যদি থাকে? তাহার পাপের যদি দণ্ডদাতা কেহ থাকেন? তিনি বাদশাহজাদী বলিয়া জেব-উন্নিসাকে মার্জ্জনা করিবেন কি? সম্ভব নয়। জেব-উন্নিসার মনে ভয়ও হইল।

দুঃখে, শোকে, ভয়ে জেব-উন্নিসা দ্বার খুলিয়া তাহার বিশ্বাসী খোজা আসিরদ্দীনকে ডাকাইল। সে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সাপের বিষে মানুষ মরিলে তার কি চিকিৎসা আছে?"

আসিরদ্দীন বলিল, "মরিলে আর চিকিৎসা কি?"

জেব। কখনও শুন নাই?

আসি। হাতেম মাল এমনই একটা চিকিৎসা করিয়াছিল, কাণে শুনিয়াছি, চক্ষে দেখি নাই।

জেব-উন্নিসা একটু হাঁপ ছাড়িল। বলিল, "হাতেম মালকে চেন?"

আসি। চিনি।

জেব। সে কোথায় থাকে?

আসি। দিল্লীতেই থাকে।

জেব। বাড়ী চেন?

আসি। চিনি।

জেব। এখন সেখানে যাইতে পারিবে?

আসি। হুকুম দিলেই পারি।

জেব। আজ মবারক আলি (একটু গলা কাঁপিল) সর্পাঘাতে মরিয়াছে জান?

আসি। জানি।

জেব। কোথায় তাহাকে গোর দিয়াছে, জান?

আসি। দেখি নাই, কিন্তু যে গোরস্থানে গোর দিবে, তাহা আমি জানি। নূতন গোর, ঠিকানা করিয়া লইতে পারিব।

জেব। আমি তোমাকে দুই শত আশরফি দিতেছি। এক শ হাতেম মালকে দিবে, এক শ আপনি লইবে। মবারক আলির গোর খুঁড়িয়া, মোরদার বাহির করিয়া, চিকিৎসা করিয়া তাহাকে বাঁচাইবে। যদি বাঁচে, তাহাকে আমার কাছে লইয়া আসিবে। এখনই যাও।

আশরফি লইয়া খোজা আসিরদ্দীন তখনই বিদায় হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

সমিধসংগ্রহ—দবিয়া

আর একবার রঙ্‌মহালে পাথরের দ্রব্য বেচিয়া, মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীর খবর লইল। এবারও সেই পাথরের কৌটা চাবি বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। চাবি খুলিয়া, নির্ম্মল পাইল—সেই দৌত্য পারাবত। নির্ম্মল সেটিকে রাখিল। পত্রের দ্বারা, পূর্ব্বমত সংবাদ পাঠাইল। লিখিল, "সব মঙ্গল। তুমি এখন যাও, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি বাদশাহের সঙ্গে যাইব।"

মাণিকলাল তখন দোকান পাট উঠাইয়া উদয়পুর যাত্রা করিল। রাত্রি প্রভাত হইবার তখন অল্প বিলম্ব আছে। দিল্লীর অনেক "দর্‌ওয়াজা"। পাছে কেহ কিছু সন্দেহ করে, এজন্য মাণিকলাল আজমীর দর্‌ওয়াজায় না গিয়া, অন্য দর্‌ওয়াজায় চলিল। পথিপার্শ্বে একটা সামান্য গোরস্থান আছে। একটা গোরের নিকট দুইটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। মাণিকলালকে এবং তাহার সমভিব্যাহারীদিগকে দেখিয়া, সেই দুইটা মানুষ দৌড়াইয়া পলাইল। মাণিকলাল তখন ঘোড়া হইতে নামিয়া নিকটে গিয়া দেখিল। দেখিল যে, গোরের মাটি উঠাইয়া, উহারা মৃতদেহ বাহির করিয়াছে। মাণিকলাল, সেই মৃতদেহ খুব যত্নের সহিত, উদয়োন্মুখ ঊষার আলোকে পর্য্যবেক্ষণ করিল। তার পর কি বুঝিয়া ঐ দেহ আপনার অশ্বের উপর তুলিয়া বাঁধিয়া কাপড় ঢাকা দিয়া আপনি পদব্রজে চলিল।

মাণিকলাল দিল্লীর দর্‌ওয়াজার বাহিরে গেল। কিছু পরে সূর্য্যোদয় হইল, তখন মাণিকলাল ঐ মৃতদেহ ঘোড়া হইতে নামাইয়া, জঙ্গলের ছায়ায় লইয়া গিয়া রাখিল। এবং আপনার পেটারা হইতে একটি ঔষধের বড়ি বাহির করিয়া, তাহা কোন অনুপান দিয়া মাড়িল। তার পর ছুরি দিয়া মৃতদেহটা স্থানে স্থানে একটু একটু চিরিয়া, ছিদ্রমধ্যে সেই ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিল। এবং জিবে ও চক্ষুতে কিছু কিছু মাখাইয়া দিল। দুই দণ্ড পরে আবার ঐরূপ করিল। এইরূপ তিন বার ঔষধ প্রয়োগ করিলে মৃত ব্যক্তি নিশ্বাস ফেলিল। চারি বারে সে চক্ষু চাহিল ও তাহার চৈতন্য হইল। পাঁচ বারে সে উঠিয়া বসিয়া কথা কহিল।

মাণিকলাল একটু দুগ্ধ সংগ্রহ করাইয়াছিল। তাহা মবারককে পান করাইল। মবারক ক্রমশঃ দুগ্ধ পান করিয়া সবল হইলে, সকল কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমাকে বাঁচাইল? আপনি?"

মাণিকলাল বলিল, "হাঁ।"

মবারক বলিল, "কেন বাঁচাইলেন? আপনাকে আমি চিনিয়াছি। আপনার সঙ্গে রূপনগরের পাহাড়ে যুদ্ধ করিয়াছি। আপনি আমায় পরাভব করিয়াছিলেন।"

মাণিক। আমিও আপনাকে চিনিয়াছি। আপনিই মহারাণাকে পরাজয় করেন। আপনার এ অবস্থা কেন ঘটিল?

মবারক। এখন বলিবার কথা নহে। সমায়ন্তরে বলিব। আপনি কোথায় যাইতেছেন—উদয়পুরে?

মাণিক। হাঁ।

মবা। আমাকে সঙ্গে লইবেন? দিল্লীতে আমার ফিরিবার যো নাই, তা বুঝিতেছেন বোধ হয়। আমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত।

মাণিক। সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। কিন্তু আপনি এখন বড় দুর্ব্বল।

মবা। সন্ধ্যা লাগায়েৎ শক্তি পাইতে পারি। ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিবেন কি?

মাণিক। করিব।

মবারককে আরও কিছু দুগ্ধাদি খাওয়াইল। গ্রাম হইতে মাণিকলাল একটা টাট্টু কিনিয়া আনিল। তাহার উপর মবারককে চড়াইয়া উদয়পুর যাত্রা করিল।

পরে যাইতে যাইতে ঘোড়া পাশাপাশি করিয়া, নির্জ্জনে মবারক জেব-উন্নিসার সকল কথা মাণিকলালকে বলিল। মাণিকলাল বুঝিল যে, জেব-উন্নিসার কোপানলে মবারক ভস্মীভূত হইয়াছে।

এ দিকে আসীরদ্দীন ফিরিয়া আসিয়া জেব-উন্নিসাকে জানাইল যে, কিছুতেই বাঁচান গেল না। জেব-উন্নিসা আতরমাখা রুমালখানি চক্ষুতে দিয়া ছিল, এখন পাথরে লুটাইয়া পড়িয়া, চাষার মেয়ের মত মাথা কুটিতে লাগিল।

যে দুঃখ কাহারও কাছে প্রকাশ করিবার নয়, তাহা সহ্য করা বড়ই কষ্ট। বাদশাহ-জাদীর সেই দুঃখ হইল। জেব-উন্নিসা ভাবিল, "যদি চাষার মেয়ে হইতাম!"

এই সময়ে কক্ষদ্বারে বড় গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কেহ কক্ষপ্রবেশ করিবার জন্য জিদ্ করিতেছে—প্রতিহারী তাহাকে আসিতে দিতেছে না। জেব-উন্নিসা যেন দরিয়ার গলা শুনিলেন। প্রতিহারী তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিল না। দরিয়া প্রতিহারীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে তরবারি ছিল। সে জেব-উন্নিসাকে কাটিবার জন্য তরবারি উঠাইল। কিন্তু সহসা তরবারি ফেলিয়া দিয়া

জেব-উন্নিসার সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল। বলিল, "বহৎ আচ্ছা,—চোখে জল!" এই বলিয়া উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল। জেব-উন্নিসা প্রতিহারীকে ডাকিয়া উহাকে ধৃত করিতে আজ্ঞা দিলেন। প্রতিহারী তাহাকে ধরিতে পারিল না। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। প্রতিহারী তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহার বস্ত্র ধরিল। দরিয়া বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া নগ্নাবস্থায় পলায়ন করিল। সে তখন ঘোর উন্মাদগ্রস্ত। মবারকের মৃত্যুসংবাদ সে শুনিয়াছিল।

সপ্তম খণ্ড

অগ্নি জ্বলিল

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় Xerxes—দ্বিতীয় Platæa

রাজসিংহের রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য ঔরঙ্গজেবের যাত্রা করিতে যে বিলম্ব হইল, তাহার কারণ, তাঁহার সেনোদ্যোগ অতি ভয়ঙ্কর। দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তিনি ব্রহ্মপুত্র পার হইতে বাহ্লীক পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে কেরল ও পাণ্ড্য পর্য্যন্ত, যেখানে যত সেনা ছিল, সব এই মহাযুদ্ধে আহূত করিলেন। দক্ষিণাপথের মহাসৈন্য, গোলকুণ্ডা বিজয়পুর মহারাষ্ট্রের সমরের অবিশ্রান্ত বজ্রাঘাতে, দ্বিতীয় বৃত্রাসুরের ন্যায় যাহার পৃষ্ঠ অশনিদুর্ভেদ্য হইয়াছিল—তাহা লইয়া বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলম, দক্ষিণ হইতে উদয়পুর ভাসাইতে আসিলেন। অন্য পুত্র আজমশাহ,—বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি, পূর্ব্বভারতবর্ষের মহতী চমূ লইয়া মেবারের পর্ব্বতমালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পশ্চিমে মুলতান হইতে পঞ্জাব কাবুল কাশ্মীরের অজেয় যোদ্ধৃবর্গ লইয়া, অপর পুত্র আকব্বর শাহ আসিয়া, সেনাসাগরের অনন্ত স্রোতে আপনার সেনাসাগর মিশাইলেন। উত্তরে স্বয়ং শাহান্ শাহ বাদশাহ দিল্লী হইতে অপরাজেয় বাদশাহী সেনা লইয়া উদয়পুরের নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিবার জন্য মেবারে দর্শন দিলেন। সাগরমধ্যস্থ উন্নত পর্ব্বতশিখরসদৃশ সেই অনন্ত মোগল সেনাসাগর মধ্যে উদয়পুর শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তসর্পশ্রেণীপরিবেষ্টিত গরুড়, যতটুকু শত্রুভীত হওয়ার সম্ভাবনা, রাজসিংহ এই সাগরসদৃশ মোগলসেনা দেখিয়া ততটুকুই ভীত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এরূপ সেনোদ্যোগ কুরুক্ষেত্রের পর হইয়াছিল কি না, বলা যায় না। যে সেনা চীন, পারস্য বা রুষ জয়ের জন্যও আবশ্যক হয় না—ক্ষুদ্র উদয়পুর জয়ের জন্য ঔরঙ্গজেব বাদশাহ, তাহা রাজপুতানায় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। একবার মাত্র পৃথিবীতে এরূপ ঘটনা হইয়াছিল। যখন

পারস্য পৃথিবীর মধ্যে বড় রাজ্য ছিল, তখন তদধিপতি শের (Xerxes) পঞ্চাশ লক্ষ লোক লইয়া গ্রীস নামা ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড জয় করিতে গিয়াছিলেন। থার্ম্মপিলিতে Leonidas, সালামিসে Themistocles এবং প্লাতীয়ায় Pausanias তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, তাঁহাকে দূর করিয়া দিল—শৃগাল কুক্কুরের মত শের পলাইয়া আসিলেন। সেইরূপ ঘটনা পৃথিবী-তলে এই দ্বিতীয় বার মাত্র ঘটিয়াছিল। বহু লক্ষ সেনা লইয়া ভারতপতি—শেরের অপেক্ষাও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজা—রাজপুতানার একটু ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড জয় করিতে গিয়াছিলেন—রাজসিংহ তাঁহাকে কি করিলেন, তাহা বলিতেছি।

যুদ্ধবিদ্যা, ইউরোপীয় বিদ্যা। আসিয়া খণ্ডে, ভারতবর্ষে ইহার বিকাশ কোন কালে নাই। যে পুরাণেতিহাসবর্ণিত আর্য্যবীরগণের এত খ্যাতি শুনি, তাহাদের কৌশল কেবল তীরন্দাজী ও লাঠীয়ালিতে। ইতিহাসলেখক ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিদ্যা কি, তাহা বুঝিতেন না বলিয়াই হৌক, আর যুদ্ধবিদ্যা বস্তুতঃ প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ছিল না বলিয়াই হৌক, রামচন্দ্র অর্জ্জুনাদির সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, শকাদিত্য, শিলাদিত্য—কাহারও সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। যাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, মহম্মদ কাসিম, গজনবী মহম্মদ, শাহাবুদ্দীন, আলাউদ্দীন, বাবর, তৈমুর, নাদের, শের—কাহারও সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। বোধ হয়, মুসলমান লেখকেরাও ইহা বুঝিতেন না। আক্‌ব্বরের সময় হইতে এই সেনাপতিত্বের কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়। আক্‌ব্বর, শিবজী, আহাম্মদ আবদালী, হৈদর আলি, হরিসিংহ প্রভৃতিতে সেনাপতিত্বের লক্ষণ, রণপাণ্ডিত্যের লক্ষণ দেখা যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত রণপণ্ডিতের কথা আছে, রাজসিংহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। ইউরোপেও এরূপ রণপণ্ডিত অতি অল্পই জন্মিয়াছিল। অল্প সেনার সাহায্যে এরূপ মহৎ কার্য্য ওলন্দাজ বীর মুকাখ্য উলিয়মের পর পৃথিবীতে আর কেহ করে নাই।

সে অপূর্ব্ব সেনাপতিত্বের পরিচয় দিবার এ স্থল নহে। সংক্ষেপে বলিব।

চতুর্ভাগে বিভক্ত ঔরঙ্গজেবের মহতী সেনা সমাগতা হইলে, রণপণ্ডিতের যাহা কর্ত্তব্য, রাজসিংহ প্রথমেই তাহা করিলেন। পর্ব্বতমালার বাহিরে, রাজ্যের যে অংশ সমতল, তাহা ছাড়িয়া দিয়া, পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া সেনা সংস্থাপিত করিলেন। তিনি নিজ সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়সিংহের কর্ত্তৃত্বাধীনে পর্ব্বত-শিখরে সংস্থাপিত করিলেন। দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় পুত্র ভীমসিংহের অধীনে পশ্চিমে সংস্থাপিত করিলেন; সে দিকের পথ্ খোলা থাকে, অন্যান্য রাজপুতগণ সেই পথে প্রবেশ

করিয়া সাহায্য করেন, ইহাও অভিপ্রেত। নিজে তৃতীয় ভাগ লইয়া পূর্ব্বদিকে নয়ন নামে গিরিসঙ্কটমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

আজম শাহ সৈন্য লইয়া যেখানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে ত পর্ব্বতমালায় তাঁহার গতিরোধ হইল। আরোহণ করিবার সাধ্য নাই ; উপর হইতে গোলা ও শিলা বৃষ্টি হয়। ক্রিয়াবাড়ীর দ্বার বন্ধ হইলে, কুকুর যেমন রুদ্ধ দ্বার ঠেলাঠেলি করে, কিছু করিতে পারে না, তিনি সেইরূপ পার্ব্বত্য দ্বার ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন—ঢুকিতে পাইলেন না।

ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আজমীরে আকব্বরের মিলন হইল। পিতাপুত্র সৈন্য মিলাইয়া পর্ব্বতমালার মধ্যে যেখানে তিনটি পথ খোলা, সে দিকে আসিলেন। এই তিনটি পথ, গিরিসঙ্কট। একটির নাম দোবারি ; আর একটি দয়েলবারা ; আর একটি পূর্ব্বকথিত নয়ন। দোবারিতে পৌঁছিলে পর, ঔরঙ্গজেব, আকব্বরকে ঐ পথে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া আগে আগে যাইতে অনুমতি করিয়া উদয়সাগর নামে বিখ্যাত সরোবরতীরে শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভের চেষ্টা করিলেন।

শাহজাদা আকব্বর, পার্ব্বত্য পথে উদয়পুরে প্রবেশ করিতে চলিলেন। জনপ্রাণী তাঁহার গতিরোধ করিল না। রাজপ্রাসাদমালা, উপবনশ্রেণী, সরোবর, তন্মধ্যস্থ উপদ্বীপ সকল দেখিলেন, কিন্তু মনুষ্য মাত্র দেখিতে পাইলেন না। সমস্ত নীরব। আকব্বর তখন শিবির সংস্থাপন করিলেন ; মনে করিলেন যে, তাঁহার ফৌজের ভয়ে দেশের লোক পলাইয়াছে। মোগলশিবিরে আমোদ প্রমোদ হইতে লাগিল। কেহ ভোজনে, কেহ খেলায়, কেহ নেমাজে রত। এমন সময়ে সুপ্ত পথিকের উপর যেমন বাঘ লাফাইয়া পড়ে, কুমার জয়সিংহ তেমনই শাহজাদা আকব্বরের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। বাঘ, প্রায় সমস্ত মোগলকে দংষ্ট্রামধ্যে পূরিল—প্রায় কেহ বাঁচিল না। পঞ্চাশ সহস্র মোগলের মধ্যে অল্পই ফিরিল। শাহজাদা গুজরাট অভিমুখে পলাইল।

মাজুম শাহ, যাঁহার নামান্তর শাহ আলম, তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে সৈন্যরাশি লইয়া, আহম্মদাবাদ ঘুরিয়া, পর্ব্বতমালার পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই পথ, গণরাও নামক পার্ব্বত্য পথ। তিনি সেই পথ উত্তীর্ণ হইয়া কাঁকরলির সমীপবর্ত্তী সরোবর ও রাজপ্রাসাদমালার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আর পথ নাই। পথ করিয়া অগ্রসর হইতেও পারেন না। তাহা হইলে রাজপুতেরা তাঁহার পশ্চাতের পথ বন্ধ করিবে—রসদ আনিবার আর উপায় থাকিবে না—না খাইয়া মরিবেন। যাঁহারা যথার্থ সেনাপতি, তাঁহারা জানেন যে, হাতে মারিলে যুদ্ধ হয় না—পেটে মারিতে হয়। যাঁহারা যথার্থ সেনাপতি,

তাঁহারা জানেন যে, পেট চলিবার উপায় বজায় রাখিয়া—হাত চালান চাই। শিখেরা আজিও রোদন করিয়া বলে, শিখ সেনাপতিরা শিখসেনার রসদ বন্ধ করিল বলিয়া শিখ পরাজিত হইল। সর বার্ট্‌ল্‌ ফ্রিয়র একদা বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী যুদ্ধ করিতে জানে না বলিয়া ঘৃণা করিও না—বাঙ্গালী একদিনে সমস্ত খাদ্য লুকাইতে পারে। শাহ আলম যুদ্ধ বুঝিতেন, সুতরাং আর অগ্রসর হইলেন না।

রাজসিংহের সেনাসংস্থাপনের গুণে (এইটিই সেনাপতির প্রধান কার্য্য) বাঙ্গালার সেনা ও দাক্ষিণাত্যের সেনা, বৃষ্টিকালে কপিদলের মত—কেবল জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। মুলতানের সেনা, ছিন্নভিন্ন হইয়া ঝড়ের মুখে তূলার মত কোথায় উড়িয়া গেল। বাকি খোদ বাদশাহ—তুনিয়াবাজ বাদশাহ আলমগীর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নয়নবহ্নিও বুঝি জ্বলিয়াছিল

শাহজাদা আক্‌ব্বর শাহকে আগে পাঠাইয়া, খোদ বাদশাহ উদয়সাগরতীরে শিবির ফেলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পরিব্রাজক, মোগলদিগের দিল্লী দেখিয়া বলিয়াছিলেন, দিল্লী একটি বৃহৎ শিবির মাত্র। পক্ষান্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, মোগল বাদশাহদিগের শিবির একটি দিল্লী নগরী। নগরের যেমন চক, তেমনই বড় বড় চক সাজাইয়া তাম্বু পাতা হইত। এমন অসংখ্য চত্বরশ্রেণীতে একটি বস্ত্রনির্ম্মিতা মহানগরীর সৃষ্টি হইত। সকলের মধ্যে বাদশাহের তাম্বুর চক। দিল্লীতে যেমন মহার্ঘ হর্ম্ম্যশ্রেণীমধ্যে বাদশাহ বাস করিতেন, তেমনই মহার্ঘ হর্ম্ম্যশ্রেণীমধ্যে এখানেও বাস করিতেন; তেমনই দরবার, আমখাস, গোসলখানা, * রঙ্‌মহাল। এই সকল বাদশাহী তাম্বু কেবল বস্ত্রনির্ম্মিত নহে। ইহার লৌহ পিত্তলের সজ্জা ছিল—এবং ইহাতে দ্বিতল ত্রিতল কক্ষও থাকিত। সম্মুখে দিল্লীর দুর্গের ফটকের ন্যায় বড় ফটক। বাদশাহী তাম্বু সকলের বস্ত্রনির্ম্মিত প্রাচীর বা পট পাদক্রোশ দীর্ঘ, সমস্তই চারু কারুকার্য্যখচিত পট্টবস্ত্রনির্ম্মিত। যেমন দুর্গপ্রাচীরের বুরুজ গম্বুজ প্রভৃতি থাকিত, ইহাতে তাহা ছিল। পিত্তলের স্তম্ভের দ্বারা এই প্রাচীর রক্ষিত হইত।

* যাহাকে মোগল বাদশাহেরা গোসলখানা বলিতেন, তাহাতে আধুনিক বৈঠকখানার মত কার্য্য হইত। সেইটি আয়েশের স্থান।

কক্ষসকলের বাহিরে উজ্জ্বল রক্তিম পটের শোভা। ভিতরে সমস্ত দেয়াল "ছবি" মোড়া। ছবি, আমরা এখন যাহাকে বলি তাই, অর্থাৎ কাচের পরকলার ভিতর চিত্র। দরবার তাম্বুতে শিরোপরে স্বুবর্ণখচিত চন্দ্রাতপ—নিম্নে বিচিত্র গালিচা, মধ্যে রত্নমণ্ডিত রাজ-সিংহাসন। চারি দিকে অস্ত্রধারিণী তাতারসুন্দরীগণের প্রহরা।

রাজপ্রাসাদাবলীর পরে আমীর ওমরাহদিগের পটমণ্ডপরাজির শোভা। এমন শোভা অনেক ক্রোশ ব্যাপিয়া। কোন পটনির্ম্মিত অট্টালিকা রক্তবর্ণ, কোনটি পীতবর্ণ, কোনটি শ্বেত, কোনটি হরিৎকপিশ, কোনটি নীল ; সকলের স্বুবর্ণকলস চন্দ্রস্থর্য্যের কিরণে ঝলসিতে থাকে। তীরে, এই সকলের চারি দিকে, দিল্লীর চকের ন্যায় বিচিত্র পণ্যবীথিকা—বাজারের পর বাজার। সহসা বাদশাহের শুভাগমনে উদয়সাগরতীরে এই রমণীয় মহানগরীর সৃষ্টি হইল। দেখিয়া লোক বিস্ময়াপন্ন হইল।

বাদশাহ যখন শিবিরে আসিতেন, তখন অন্তঃপুরবাসিনী সকলেই সঙ্গে আসিত। বেগমেরা সকলেই আসিত। এবারও আসিয়াছিল। যোধপুরী, উদিপুরী, জেব-উন্নিসা সকলেই আসিয়াছিল। যোধপুরীর সঙ্গে নির্ম্মলকুমারীও আসিয়াছিল। দিল্লীর রঙ্‌মহালে যেমন তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ মন্দির ছিল, শিবিরে রঙ্‌মহালেও তেমনই তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ মন্দির ছিল।

এই স্বুখের শিবিরে, ঔরঙ্গজেব রাত্রিকালে যোধপুরীর মহালে আসিয়া স্বুখে কথোপকথন করিতেছেন। নির্ম্মলকুমারীও সেখানে উপস্থিত।

"ইম্‌লি বেগম !" বলিয়া বাদশাহ নির্ম্মলকে ডাকিলেন। নির্ম্মলকে তিনি ইতিপূর্ব্বে "নিম্‌লি বেগম" বলিতেন, কিন্তু বাক্যের যন্ত্রণা ভুগিয়া এক্ষণে "ইম্‌লি বেগম" বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাদশাহ নির্ম্মলকে বলিলেন, "ইম্‌লি বেগম ! তুমি আমার, না রাজপুতের ?" নির্ম্মল যুক্তকরে বলিল, "ত্বনিয়ার বাদশাহ ত্বনিয়ার বিচার করিতেছেন, এ কথারও তিনি বিচার করুন।"

ঔরঙ্গ। আমার বিচারে এই হইতেছে যে, তুমি রাজপুতের কন্যা, রাজপুত তোমার স্বামী, তুমি রাজপুতমহিষীর সখী—তুমি রাজপুতেরই।

নির্ম্মল। জাঁহাপনা ! বিচার কি ঠিক হইল ? আমি রাজপুতের কন্যা বটে, কিন্তু হজরৎ যোধপুরীও তাই। আপনার পিতামহী ও প্রপিতামহীও তাই—তাঁহারা মোগল বাদশাহের হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন না কি ?

ঔরঙ্গ। ইহারা মোগল বাদশাহের বেগম, তুমি রাজপুতের স্ত্রী।

নির্ম্মল। (হাসিয়া) আমি শাহান্‌শাহ আলম্‌গীর বাদশাহের ইম্‌লি বেগম।

ঔরঙ্গ। তুমি রূপনগরীর সখী।

নির্ম্মল। যোধপুরীরও তাই।

ঔরঙ্গ। তবে তুমি আমার ?

নির্ম্মল। আপনি যেমন বিবেচনা করেন।

ঔ। আমি তোমাকে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাই। তাহাতে আমার উপকার আছে, রাজসিংহের অনিষ্ট আছে। এমন কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহা করিবে ?

নি। কি কার্য্য, তাহা না জানিলে আমি বলিতে পারি না। আমি কোন দেবতা ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিতে পারিব না।

ঔ। আমি তোমাকে সে সব কিছু করিতে বলিব না। আমি উদয়পুর নগর দখল করিব—রাজসিংহের রাজপুরী দখল করিব, সে সকল বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজপুরী দখল হইলে পর রূপনগরীকে হস্তগত করিতে পারিব কি না সন্দেহ। তুমি সেই বিষয়ে সহায়তা করিবে।

নি। আমি আপনার নিকট গঙ্গাজী যমুনাজীর শপথ করিতেছি যে, আপনি যদি উদয়পুরের রাজপুরী দখল করেন, তবে আমি চঞ্চলকুমারীকে আনিয়া আপনার হস্তে সমর্পণ করিব।

ঔ। সে কথা বিশ্বাস করি ; কেন না, তুমি নিশ্চয় জান যে, যে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে, তাহাকে টুকরা টুকরা কাটিয়া কুকুরকে খাওয়াইতে পারি।

নি। পারেন কি না, সে বিষয়ের বিচার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনাকে প্রবঞ্চনা করিব না। তবে আপনি পুরী অধিকার করার পর তাহাকে আমি জীবিত পাইব কি না সন্দেহ। রাজপুতমহিষীদিগের রীতি এই যে, শত্রুর হাতে পড়িবার আগে চিতায় পড়িয়া পুড়িয়া মরে। তাহাকে জীবিত পাইব না বলিয়াই এ কথা স্বীকার করিতেছি। নহিলে আমা হইতে চঞ্চলকুমারীর কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

ঔ। ইহাতে অনিষ্ট কি ? সে ত বাদশাহের বেগম হইবে।

নির্ম্মল উত্তর করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে খোজা আসিয়া নিবেদন করিল, পেস্কার দরবারে হাজির, জরুরি আর্‌জি পেষ করিবে। হজরৎ শাহজাদা আক্‌ব্বর শাহের সংবাদ আসিয়াছে।

ঔরঙ্গজেব অতিশয় ব্যস্ত হইয়া দরবারে গেলেন। পেস্কার আর্‌জি পেষ করিল। ঔরঙ্গজেব শুনিলেন, আক্‌ব্বরের পঞ্চাশ হাজার মোগল সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রায় নিঃশেষ নিহত হইয়াছে। হতাবশিষ্ট কোথায় পলায়ন করিয়াছে, কেহ জানে না।

ঔরঙ্গজেব তখনই শিবির ভঙ্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

আক্‌ব্বরের সংবাদ রঙ্‌মহালেও পৌছিল। শুনিয়া নির্ম্মলকুমারী পেশোয়াজ পরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোধপুরী বেগমের নিকট রূপনগরী নাচের মহলা দিল।

বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মলকুমারী ভাল মানুষ হইয়া বসিলে বাদশাহ তাহাকে তলব করিলেন। নির্ম্মল হাজির হইলে বাদশাহ বলিলেন, "আমরা তাম্বু ভাঙ্গিতেছি—লড়াইয়ে যাইব—তুমি কি এখন উদয়পুর যাইতে চাও?"

নি। না, এক্ষণে আমি ফৌজের সঙ্গে যাইব। যাইতে যাইতে যেখানে সুবিধা বুঝিব, সেইখান হইতে চলিয়া যাইব।

ঔরঙ্গজেব একটু দুঃখিতভাবে বলিলেন, "কেন যাইবে?"

নির্ম্মল বলিল, "শাহান্‌শাহের হুকুম।"

ঔরঙ্গজেব প্রফুল্লভাবে বলিলেন, "আমি যদি যাইতে না দিই, তুমি কি চিরদিন আমার রঙ্‌মহালে থাকিতে সম্মত হইবে?"

নির্ম্মলকুমারী যুক্তকরে বলিল, "আমার স্বামী আছেন।"

ঔরঙ্গজেব একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "যদি তুমি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর—যদি সে স্বামী ত্যাগ কর—তবে উদিপুরী অপেক্ষা তোমাকে গৌরবে রাখিব।"

নির্ম্মল একটু হাসিয়া, অথচ সসম্ভ্রমে বলিল, "তাহা হইবে না, জাঁহাপনা!"

ঔ। কেন হইবে না? কত রাজপুতরাজকন্যা ত মোগলের ঘরে আসিয়াছে।

নি। তাহারা কেহ স্বামী ত্যাগ করিয়া আসে নাই।

ঔ। যদি তোমার স্বামী না থাকিত, তাহা হইলে আসিতে?

নি। এ কথা কেন?

ঔ। কেন, তাহা বলিতে আমার লজ্জা করে, আমি তেমন কথা কখনও কাহাকেও বলি নাই। আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু কখনও কাহাকেও ভালবাসি নাই। এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিয়াছি। তাই, তুমি যদি বল যে, তোমার স্বামী না থাকিলে তুমি আমার বেগম হইতে, তাহা হইলে এ স্নেহশূন্য হৃদয়—পোড়া পাহাড়ের মত হৃদয়—একটু স্নিগ্ধ হয়।

নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবের কথায় বিশ্বাস করিল—কেন না, ঔরঙ্গজেবের কণ্ঠের স্বর বিশ্বাসের যোগ্য বলিয়া বোধ হইল। নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবের জন্য কিছু দুঃখিত হইয়া বলিল, "জাঁহাপনা, এ বাঁদী এমন কি কাজ করিয়াছে যে, সে আপনার ভালবাসার যোগ্য হয় ?"

ঔ। তাহা বলিতে পারি না। তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার বয়স আমার আর নাই। আর তুমি সুন্দরী হইলেও উদিপুরী অপেক্ষা নও। বোধ করি, আমি তোমার কাছে ভিন্ন আর কোথাও সত্য কথা কখন পাই নাই, সেই জন্য। বোধ করি, তোমার বুদ্ধি, চতুরতা, আর সাহস দেখিয়া তোমাকেই আমার উপযুক্ত মহিষী বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। যাই হৌক, আলমগীর বাদশাহ তোমার ভিন্ন আর কাহারও কখন বশীভূত হয় নাই। আর কাহারও চক্ষুর কটাক্ষে মোহিত হয় নাই।

নি। শাহান্‌শাহ! আমাকে একদা রূপনগরের রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "তুমি কাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর ?" আমি বলিয়াছিলাম, আলমগীর বাদশাহকে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?" আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, আমি বালক-কালে বাঘ পুষিয়াছিলাম, বাঘকে বশ করাতেই আমার আনন্দ ছিল। বাদশাহকে বশ করিতে পারিলে আমার সেই আনন্দ হইবে। আমার ভাগ্যবশতঃই অবিবাহিত অবস্থায় আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি যে দীন দরিদ্রকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি, তাহাতেই আমি সুখী। এক্ষণে আমায় বিদায় দিন।

ঔরঙ্গজেব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "দুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না—কাহারও সাধ মিটে না। এ পৃথিবীতে আমি কেবল তোমায় ভাল বাসিয়াছি—কিন্তু তোমাকে পাইলাম না। তোমায় ভাল বাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইব না—ছাড়িয়া দিব। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই করিব। যাহাতে তোমার দুঃখ হয়, তাহা করিব না। তুমি যাও। আমাকে স্মরণ রাখিও। যদি কখনও আমা হইতে তোমার কোন উপকার হয়, আমাকে জানাইও। আমি তাহা করিব।"

নির্ম্মল কুর্ণিশ করিল। বলিল, "আমার একটি মাত্র ভিক্ষা রহিল। যখন উভয় পক্ষের মঙ্গলার্থ সন্ধি করিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করিব, তখন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন।"

ঔরঙ্গজেব বলিল, "সে কথার বিচার সেই সময়ে হইবে।"

তখন নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবকে তাঁহার কপোত দেখাইলেন। বলিলেন, "এই শিক্ষিত পায়রা আপনি রাখিবেন। যখন এ দাসীকে আপনি স্মরণ করিবেন, এই পায়রাটি আপনি

ছাড়িয়া দিবেন। ইহা দ্বারা আমার নিবেদন আপনাকে জানাইব। আমি এক্ষণে সৈন্যের সঙ্গে রহিলাম। যখন আমার বিদায় লইবার সময় হইবে, বেগম সাহেবা যেন আমাকে বিদায় দেন, এই অনুমতি তাঁর প্রতি থাক।”

তখন ঔরঙ্গজেব সৈন্য চালনার ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু তাঁহার মনে বড় বিষাদ উপস্থিত হইল। নির্ম্মলের মত কথোপকথনে সাহস, বাক্‌চাতুর্য্য এবং স্পষ্টবক্তৃত্ব মোগল বাদশাহ আর কোথাও দেখেন নাই। যদি কোন রাজা,—শিবজী বা রাজসিংহ, যদি কোন সেনাপতি—দিলীর কি তয়বার, যদি কোন শাহজাদা—আজিম কি আক্‌ব্বর, এরূপ সাহসে এরূপ স্পষ্ট কথা বলিত, ঔরঙ্গজেব তাহা সহ্য করিতেন না। কিন্তু রূপবতী যুবতী, সহায়হীনা নির্ম্মলের কাছে তাহা মিষ্ট লাগিত। বুড়ার উপর যতটুকু কন্দর্পের অত্যাচার হইতে পারে, বোধ হয় তাহা হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেব প্রেমান্ধের মত বিচ্ছেদে শোকে শোকাকুল না হইয়া একটু বিষণ্ণ হইলেন মাত্র। ঔরঙ্গজেব মার্ক্‌ আন্তনি বা অগ্নিবর্ণ ছিলেন না, কিন্তু মনুষ্য কখন পাষাণও হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাদশাহ বহ্নিচক্রে

প্রভাতে বাদশাহী সেনা কুচ করিতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বাগ্রে পথপরিষ্কারক সৈন্য পথ পরিষ্কারের জন্য সশস্ত্রে ধাবিত। তাহাদের অস্ত্র কোদালি, কুড়ালি, দা ও কাটারি। তাহারা সম্মুখের গাছ সকল কাটিয়া, সরাইয়া, খানা পয়গার বুজাইয়া, মাটি চাঁচিয়া, বাদশাহী সেনার জন্য প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। সেই প্রশস্ত পথে কামানের শ্রেণী, শকটের উপর আরূঢ় হইয়া ঘড়্ ঘড়্ হড়্ হড়্ করিয়া চলিল—সঙ্গে গোলন্দাজ সেনা। অসংখ্য গোলন্দাজি গাড়ির ঘড়্ ঘড়্ শব্দে কর্ণ বধির,—তাহার চক্রসহস্র হইতে বিঘূর্ণিত উর্দ্ধোত্থিত ধূলিজালে নয়ন অন্ধ; কালান্তক যমের ন্যায় ব্যাদিতাস্য কামান সকলের আকার দেখিয়া হৃদয় কম্পিত। এই গোলন্দাজ সেনার পশ্চাৎ রাজকোষাগার। বাদশাহী কোষাগার সঙ্গে সঙ্গে চলিত; দিল্লীতে কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া ঔরঙ্গজেব ধনরাশি রাখিয়া যাইতে পারিতেন না; ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র সর্ব্বজনে অবিশ্বাস। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এইবার দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া ঔরঙ্গজেব আর কখন দিল্লী

ফিরিলেন না। শতাব্দীর একপাদ শিবিরে শিবিরে ফিরিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনন্ত ধনরত্নরাজিপরিপূর্ণ গজাদিবাহিত রাজকোষের পর, বাদশাহী দফ্‌তরখানা চলিল। থাকে থাকে থাকে, গাড়ি, হাতী, উটের উপর সাজান খাতা পত্র বহিজাত; সারির পর সারি, শ্রেণীর পর শ্রেণী; অসংখ্য, অনন্ত, চলিতে লাগিল। তার পর গঙ্গাজলবাহী উটের শ্রেণী। গঙ্গাজলের মত সুপেয় কোন নদীর জল নহে; তাই বাদশাহদিগের সঙ্গে অর্দ্ধেক গঙ্গার জল চলিত। জলের পর আহার্য্য—আটা, ঘৃত, চাউল, মশালা, শর্করা, নানাবিধ পক্ষী, চতুষ্পদ—প্রস্তুত অপ্রস্তুত, পক্ক অপক্ক, ভক্ষ্য চলিত। তার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র বাবর্চি। তৎপশ্চাৎ তোষাখানা—এল্‌বাস্ পোষাকের, জেওরাতের হুড়াহুড়ি ছড়াছড়ি; তার পর অগণনীয় অশ্বারোহী মোগল সেনা।

এই গেল সৈন্যের প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগে বাদশাহ খোদ। আগে আগে অসংখ্য উষ্ট্রশ্রেণীর উপর জ্বলন্তবহ্নিবাহী, বৃহৎ কটাহ সকলে, ধূনা, গুগ্‌গুল, চন্দন, মৃগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য। সুগন্ধে ক্রোশ ব্যাপিয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আমোদিত। তৎপশ্চাৎ বাদশাহী খাস আহদী সেনা, দোষশূন্য রমণীয় অশ্বরাজির উপর আরূঢ়, দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। মধ্যে বাদশাহ নিজে মণিরত্নকিঙ্কিণীজালাদি শোভায় উজ্জ্বল উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য অশ্বের উপর আরূঢ়—শিরোপরে বিখ্যাত শ্বেতছত্র। তার পর সৈন্যের সার, দিল্লীর সার, বাদশাহীর সার, ঔরঙ্গজেবের অবরোধবাসিনী সুন্দরী সম্প্রদায়। কেহ বা ঐরাবততুল্য গজপৃষ্ঠে, সুবর্ণনির্ম্মিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট মখ্‌মলে মোড়া, মুক্তাঝালরভূষিত, অতি সূক্ষ্ম লূতাতন্তুতুল্য রেসমী বস্ত্রে আবৃত, হাওদার ভিতরে, অতি ক্ষীণমেঘাবৃত উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রতুল্য জ্বলিতেছে—রত্নমালাজড়িত কালভুজঙ্গীতুল্য বেণী পৃষ্ঠে দুলিতেছে—কৃষ্ণতার, বৃহচ্চক্ষুর মধ্যে কালাগ্নিতুল্য কটাক্ষ খেলিতেছে; উপরে কালো ভ্রূযুগ, নীচে সুরমার রেখা, তাহার মধ্যে সেই বিদ্যুদ্দামবিস্ফুরণে, সমস্ত সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে; মধুর তাম্বুলারক্ত অধরে মাধুর্য্যময়ী সুন্দরীকুল মধুর মধুর হাসিতেছে। এমন এক জন নয়, দুই জন নয়,—হাতীর গায়ে হাতী, হাতীর পিছু হাতী, তার পিছু হাতী। সকলের উপরেই তেমনই হাওদা, সকল হাওদার ভিতর তেমনই সুন্দরী, সকল সুন্দরীর নয়নেই মেঘযুগলমধ্যস্থ বিদ্যুদ্দামের ক্রীড়া! কালো পৃথিবী আলো হইয়া গেল। কেহ বা কদাচিৎ দোলায় চলিল—দোলার বাহিরে কিংখাপ, ভিতরে জরদোজী কামদার মখমল, উপরে মুক্তার ঝালর, রূপার দাণ্ডা, সোনার হাঙ্গর—তাহার ভিতর রত্নমণ্ডিতা সুন্দরী। যোধপুরী ও নির্ম্মলকুমারী, উদিপুরী ও

জেব-উন্নিসা, ইহারা গজপৃষ্ঠে। উদিপুরী হাস্যময়ী। যোধপুরী অপ্রসন্না। নির্ম্মলকুমারী রহস্যময়ী। জেব-উন্নিসা, গ্রীষ্মকালে উন্মূলিতা লতার মত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, পরিশুষ্ক, শীর্ণ, মৃতকল্প। জেব-উন্নিসা ভাবিতেছিল, "এ হাতিয়ার লহরী মাঝে আমার ডুবিয়া মরিবার কি উপায় নাই?"

এই মনোমোহিনী বাহিনীর পশ্চাৎ কুটুম্বিনী ও দাসীবৃন্দ। সকলেই অশ্বারূঢ়া, লম্বিতবেণী, রক্তাধরা, বিদ্যুৎকটাক্ষ; অলঙ্কারশিঞ্জিতে ঘোড়া সকল নাচিয়া উঠিতেছে। এই অশ্বারোহিণী বাহিনীও অতিশয় লোকমনোমোহিনী। ইহাদের পশ্চাতে আবার গোলন্দাজ সেনা—কিন্তু ইহাদের কামান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। বাদশাহ বুঝি স্থির করিয়াছিলেন, কামিনীর কমনীয় কটাক্ষের পর আর বড় কামানের প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় ভাগে পদাতি সৈন্য। তৎপশ্চাৎ দাস দাসী, মুটে মজুর, নর্ত্তকী প্রভৃতি বাজে লোক, খালি ঘোড়া, তাম্বুর রাশি এবং মোট ঘাট।

যেমন ঘোর নাদে গ্রাম প্রদেশ ভাসাইয়া—তিমি মকর আবর্ত্তাদিতে ভয়ঙ্করী, বর্ষাবিপ্লাবিতা স্রোতস্বতী, ক্ষুদ্র সৈকত ডুবাইতে যায়, তেমনই মহাকোলাহলে, মহাবেগে এই পরিমাণরহিতা অসংখ্যেয়া, বিস্ময়করী মোগলবাহিনী রাজসিংহের রাজ্য ডুবাইতে চলিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। যে পথে আক্‌ব্বর সৈন্য লইয়া গিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেবও সেই পথে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, আক্‌ব্বর শাহের সৈন্যের সঙ্গে নিজ সৈন্য মিলিত করিবেন। মধ্যে যদি কুমার জয়সিংহের সৈন্য পান, তবে তাঁহাকে মাঝে ফেলিয়া টিপিয়া মারিবেন, পরে দুই জনে উদয়পুর প্রবেশ করিয়া রাজ্য ধ্বংস করিবেন। কিন্তু পার্ব্বত্য পথে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, রাজসিংহ ঊর্দ্ধে পর্ব্বতের উপত্যকায় তাঁহার পথের পার্শ্বে সৈন্য লইয়া বসিয়া আছেন। রাজসিংহ নয়ননামা গিরিসঙ্কটে পার্ব্বত্য পথ রোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি দ্রুতগামী দূতমুখে আক্‌ব্বরের সংবাদ শুনিয়া, রণপাণ্ডিত্যের অদ্ভুত প্রতিভার বিকাশ করিয়া আমিষলোলুপ শ্যেন পক্ষীর মত দ্রুতবেগে সেনা সহিত পূর্ব্বপরিচিত পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া এই গিরিসানুদেশে সসৈন্যে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

মোগল দেখিল, রাজসিংহের এই অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্যে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কেন না, মোগলেরা যে পথে যাইতেছিল, সে পথে আর চলিলে রাজসিংহকে পার্শ্বে রাখিয়া যাইতে হয়। শত্রুসৈন্যকে পার্শ্বে রাখিয়া যাওয়ার অপেক্ষা বিপদ্ অল্পই আছে। পার্শ্ব হইতে যে আক্রমণ করে, তাহাকে রণে বিমুখ করা যায় না, সেই জয়ী হইয়া বিপক্ষকে ছিন্ন ভিন্ন

করিয়া ফেলে। সালামাঙ্কা ও ঔস্তরলিজে ইহাই ঘটিয়াছিল। ঔরঙ্গজেবও এ স্বতঃসিদ্ধ রণতত্ত্ব জানিতেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, পার্শ্বস্থিত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় বটে, কিন্তু তাহা করিতে গেলে নিজ সৈন্যকে ফিরাইয়া শত্রুর সম্মুখবর্ত্তী করিতে হয়। এই পার্ব্বত্য পথে তাদৃশ মহতী সেনা ফিরাইবার ঘুরাইবার স্থান নাই, এবং সময়ও পাওয়া যাইবে না। কেন না, সেনার মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে রাজসিংহ পর্ব্বত হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার সেনা দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, এক এক খণ্ড পৃথক্ করিয়া বিনষ্ট করিতে পারেন। এরূপ যুদ্ধে সাহস করা অকর্ত্তব্য। তার পর এমন হইতে পারে, রাজসিংহ যুদ্ধ না করিতেও পারেন। নির্ব্বিঘ্নে ঔরঙ্গজেবকে যাইতে দিতেও পারেন। তাহা হইলে আরও বিপদ্। তাহা হইলে ঔরঙ্গজেব চলিয়া গেলে রাজসিংহ পর্ব্বতাবতরণ করিয়া ঔরঙ্গজেবের পশ্চাদ্গামী হইবেন। হইলে, তিনি যে মোগলের পশ্চাদ্বর্ত্তী মাল আসবাব লুঠপাট ও সেনাধ্বংস করিবেন, সেও ক্ষুদ্র কথা। আসল কথা, রসদের পথ বন্ধ হইবে। সম্মুখে কুমার জয়সিংহের সেনা। রাজসিংহের সেনা ও জয়সিংহের সেনা উভয়ের মধ্যে পড়িয়া, ফাঁদের ভিতর প্রবিষ্ট মূষিকের মত, দিল্লীর বাদশাহ সসৈন্যে নিহত হইবেন।

ফলে দিল্লীশ্বরের অবস্থা জালনিবদ্ধ রোহিতের মত,—কোন মতেই নিস্তার নাই। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে রাজসিংহ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন। তিনি উদয়পুরের রাজ্য অতল জলে ডুবাইতে আসিয়াছিলেন—সে কথা দূরে থাকুক, এখন উদয়পুরের রাজা তাঁহার পশ্চাৎ করতালি দিতে দিতে ছুটিবে—পৃথিবী হাসিবে। মোগল বাদশাহের অপরিমিত গৌরবের পক্ষে ইহার অপেক্ষা অবনতি আর কি হইতে পারে? ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন—সিংহ হইয়া মূষিকের ভয়ে পলাইব? কিছুতেই পলায়নেব কথাকে মনে স্থান দিলেন না।

তখন আর কি হইতে পারে? এক মাত্র ভরসা—উদয়পুরে যাইবার যদি অন্য পথ থাকে। ঔরঙ্গজেবের আদেশে চারি দিকে অশ্বারোহী পদাতি অন্য পথেব সন্ধানে ছুটিল। ঔরঙ্গজেব নির্ম্মলকুমারীকেও জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল। নির্ম্মলকুমারী বলিল, "আমি পরদানিশীন স্ত্রীলোক—পথের কথা আমি কি জানি?" কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সংবাদ আসিল যে, উদয়পুর যাইবার আর একটা পথ আছে। একজন মোগল সওদাগরের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে, সে পথ দেখাইয়া দিবে। একজন মনসবদার সে পথ দেখিয়া আসিয়াছে। সে একটি পার্ব্বত্য রন্ধ্রপথ; অতিশয় সঙ্কীর্ণ। কিন্তু পথটা সোজা পথ, শীঘ্র বাহির হওয়া

যাইবে। সে দিকে কোন রাজপুত দেখা যাইতেছে না। যে মোগল সংবাদ দিয়াছে, সে বলিতেছে যে, সে দিকে কোন রাজপুত সেনা নাই।

ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন। বলিলেন, "নাই, কিন্তু লুকাইয়া থাকিতে পারে।"

যে মন্‌সবদার পথ দেখিয়া আসিয়াছিল—বখ্‌ত খাঁ—সে বলিল যে, "যে মোগল আমাকে প্রথমেই এই পথের সন্ধান দেয়, তাহাকে আমি পর্ব্বতের উপরে পাঠাইয়া দিয়াছি। সে যদি রাজপুত সেনা দেখিতে পায়, তবে আমাকে সঙ্কেত করিবে।"

ঔরঙ্গজেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি আমার সিপাহী?"

বখ্‌ত খাঁ। না, সে একজন সওদাগর। উদয়পুরে শাল বেচিতে গিযাছিল। এখন শিবিরে বেচিতে আসিয়াছিল।

ঔরঙ্গ। ভাল, সেই পথেই তবে ফৌজ লইয়া যাও।

তখন বাদশাহী হুকুমে, ফৌজ ফিরিল। ফিরিল—কেন না, কিছু পথ ফিরিয়া আসিয়া তবে রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিতে হয়। ইহাতেও বিশেষ বিপদ্—তবে জালনিবদ্ধ বৃহৎ রোহিত আর কোন্ দিকে যায়? যেরূপ পারম্পর্য্যের সহিত মোগলসেনা আসিয়াছিল—তাহা আর রক্ষিত হইতে পারিল না। যে ভাগ আগে ছিল, তাহা পিছে পড়িল; যাহা পিছনে ছিল, তাহা আগে চলিল। সেনার তৃতীয় ভাগ আগে আগে চলিল। বাদশাহ হুকুম দিলেন যে, তাম্বু ও মোট ঘাট ও বাজে লোক সকল, এক্ষণে উদয়সাগরের পথে যাক্—পরে সেনার পশ্চাতে তাহারা আসিবে। তাহাই হইল। ঔরঙ্গজেব নিজে, পদাতি ও ছোট কামান ও গোলন্দাজ সেনা লইয়া রন্ধ্রপথে চলিলেন। আগে আগে বখ্‌ত খাঁ।

দেখিয়া, রাজসিংহ, সিংহের মত লাফ দিয়া, পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া মোগল সেনার মধ্যে পড়িলেন। অমনই মোগল সেনা দ্বিখণ্ড হইয়া গেল—ছুরিকাঘাতে যেন ফুলের মালা কাটিয়া গেল। এক ভাগ ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রন্ধ্রমধ্যে প্রবিষ্ট; আর এক ভাগ, এখন পূর্ব্বপথে, কিন্তু রাজসিংহের সম্মুখে।

মোগলের বিপদের উপর বিপদ্ এই যে, যেখানে হাতী ঘোড়া দোলার উপর বাদশাহের পৌরাঙ্গনাগণ, ঠিক সেইখানে, পৌরাঙ্গনাদিগের সম্মুখে, রাজসিংহ সসৈন্যে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিয়া, যেমন চিল পড়িলে চড়ইয়ের দল কিল কিল করিয়া উঠে, এই সসৈন্য গরুড়কে দেখিয়া, রাজাবরোধের কালভুজঙ্গীর দল তেমনই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এখানে যুদ্ধের নাম মাত্র হইল না। যে সকল আহদীয়ান্ তাঁহাদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল—তাহারা কেহই অস্ত্রসঞ্চালন করিতে পারিল না—পাছে বেগমেরা আহত হয়েন। রাজপুতেরা বিনা

যুদ্ধে আহদীদিগকে বন্দী করিল। সমস্ত মহিষীগণ এবং তাঁহাদিগের অসংখ্য অশ্বারোহিণী অনুচরীবর্গ, বিনা যুদ্ধে রাজসিংহের বন্দিনী হইলেন।

মাণিকলাল রাজসিংহের নিকটে নিকটে থাকেন—তিনি রাজসিংহের অতিশয় প্রিয়। মাণিকলাল আসিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "মহারাজাধিরাজ! এখন এই মার্জ্জারী সম্প্রদায় লইয়া কি করা যায়? আজ্ঞা হয় ত উদর পূরিয়া দধিদুগ্ধ ভোজনের জন্য ইহাদের উদয়পুরে পাঠাইয়া দিই।"

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "এত দই দুধ উদয়পুরে নাই। শুনিয়াছি, দিল্লীর মার্জ্জারীদের পেট মোটা। কেবল উদিপুরীকে মহিষী চঞ্চলকুমারীর কাছে পাঠাইয়া দাও। তিনি ইহার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। আর সব ঔরঙ্গজেবের ধন ঔরঙ্গজেবকে ফিরাইয়া দাও।"

মাণিকলাল যোড়হাতে বলিল, "লুঠের সামগ্রী সৈনিকেরা কিছু কিছু পাইয়া থাকে।"

রাজসিংহ, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার কাহাকেও প্রয়োজন থাকে, গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু মুসলমানী, হিন্দুর অস্পর্শীয়া।"

মাণিক। উহারা নাচিতে গায়িতে জানে।

রাজ। নাচ গানে মন দিলে, রাজপুত কি আর তোমাদিগের মত বীরপনা দেখাইতে পারিবে? সব ছাড়িয়া দাও। উদিপুরীকে কেবল উদয়পুরে পাঠাইয়া দাও।

মাণিক। এ সমুদ্র মধ্যে সে রত্ন কোথায় খুঁজিয়া পাইব? আমার ত চেনা নাই। যদি আজ্ঞা হয়, তবে হনূমানের মত, এ গন্ধমাদন লইয়া গিয়া মহিষীর কাছে উপস্থিত করি। তিনি বাছিয়া লইবেন। যাহাকে রাখিতে হয়, রাখিবেন, বাকিগুলা ছাড়িয়া দিবেন। তাহারা উদয়পুরের বাজারে সুর্‌মা মিশি বেচিয়া দিনপাত করিবে।

এমন সময়ে মহাগজপৃষ্ঠ হইতে নির্ম্মলকুমারী রাজসিংহ ও মাণিকলাল উভয়কে দেখিতে পাইল। করযুগল উত্তোলন করিয়া সে উভয়কে প্রণাম করিল। দেখিয়া রাজসিংহ মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও আবার কোন্ বেগম? হিন্দু বোধ হইতেছে—সেলাম না করিয়া, আমাদের প্রণাম করিল।"

মাণিকলাল দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! ও একটা বাঁদী—ওটা বেগম হইল কি প্রকারে? উহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল, হুকুম দিয়া, নির্ম্মলকুমারীকে হাতীর উপর হইতে নামাইয়া আপনার নিকট আনাইল। নির্ম্মল কথা না কহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি? তুমি বেগম হইলে কবে?"

নির্ম্মল, মুখ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "মেয়্নে হজরৎ ইম্লি বেগম। তস্লিম দে।"

মাণিকলাল। তা না হয় দিতেছি—বেগম ত তুমি নও জানি; তোমার বাপ দাদাও কখনও বেগম হয় নাই—কিন্তু এ বেশ কেন?

নির্ম্মল। পহেলা মেরা হুকুম তামিল কর্—বাজে বাত্ আব্‌হি রাখ্।

মাণিকলাল। সীতারাম! বেগম সাহেবার ধমক দেখ!

নির্ম্মল। হামারি হুকুম যেহি হৈ কি হজরৎ উদিপুরী বেগম সাহেবা সামনেকা পঞ্চ-কলস্‌দার হাওদাওয়ালে হাথিপর তশরিফ রাখ্‌তী হেঁই। উন্‌কো হামারা হুজুর মে হাজির কর্।

বলিতে বিলম্ব সহিল না—মাণিকলাল তখনই উদিপুরীকে হাতী হইতে নামাইতে বলিল। উদিপুরী অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নামিল। মাণিকলাল একখানা দোলা খালি করিয়া, সে দোলা উদিপুরীর হাতীর কাছে পাঠাইয়া দিয়া, দোলায় চড়াইয়া উদিপুরীকে লইয়া আসিল। তার পর মাণিকলাল, নির্ম্মলকুমারীকে কাণে কাণে বলিল, "জী হাম্‌লী বেগম সাহেবা! আর একটা কথা—"

নির্ম্মল। চুপ্ রহ, বেতমিজ! মেরে নাম হজ্‌রৎ ইম্‌লি বেগম।

মাণিক। আচ্ছা, যে বেগমই হও না কেন, জেব-উন্নিসা বেগমকে চেন?

নির্ম্মল। জান্‌তে নেহিন্? বহ হামারি বেটী লাগ্‌তী হৈ। দেখ, আগাড়ী সোনেকা তিন কলস যো হাওদে পর জলুষ দেতা হয়, বস্‌পর জেব-উন্নিসা বৈঠী হৈ।

মাণিকলাল তাঁহাকেও হাতী হইতে নামাইয়া দোলায় তুলিয়া লইয়া আসিলেন।

সেই সময়ে আবার কোন মহিষী হাওদার জরির পরদা টানিয়া মুখ বাহির করিয়া, নির্ম্মলকুমারীকে ডাকিল। মাণিকলাল নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার তোমাকে কে ডাকিতেছে না?"

নির্ম্মল দেখিয়া বলিল, "হাঁ। যোধপুরী বেগম। কিন্তু উঁহাকে এখানে আনা হইবে না। আমাকে হাতীর উপর চড়াইয়া উঁহার কাছে লইয়া চল। শুনিয়া আসি।"

মাণিকলাল তাহাই করিল। নির্ম্মলকুমারী যোধপুরীর হাতীর উপর উঠিয়া তাঁহার ইন্দ্রাসনতুল্য হাওদার ভিতর প্রবেশ করিল। যোধপুরী বলিলেন, "আমাকে তোমাদের সঙ্গে লইয়া চল।"

নির্ম্মল। কেন মা?

যোধপুরী। কেন, তা ত কত বার বলিয়াছি। আমি এ ম্লেচ্ছপুরীতে, এ মহাপাপের ভিতর আর থাকিতে পারি না।

নির্ম্মল। তাহা হইবে না। তোমার যাওয়া হইবে না। আজ যদি মোগল সাম্রাজ্য টিকে, তবে তোমার ছেলে দিল্লীর বাদশাহ হইবে। আমরা সেই চেষ্টা করিব। তার রাজত্বে আমরা সুখে থাকিব।

যোধপুরী। অমন কথা মুখে আনিও না, বাছা। বাদশাহ শুনিলে, আমার ছেলে এক দিনও বাঁচিবে না। বিষপ্রয়োগে তাহার প্রাণ যাইবে।

নির্ম্মল। এখনকার কথা বলিতেছি না। যাহা শাহজাদার হক্, কালে তিনি পাইবেন। আপনি আমাকে আর কোন আজ্ঞা করিবেন না। আপনি যদি আমার সঙ্গে এখন যান, আপনার পুত্রের অনিষ্ট হইতে পারে।

যোধপুরী ভাবিয়া বলিল, "সে কথা সত্য। তোমার কথাই শুনিলাম। আমি যাইব না। তুমি যাও।"

নির্ম্মলকুমারী তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসা উপযুক্ত সৈন্যে বেষ্টিতা হইয়া নির্ম্মলকুমারীর সহিত উদয়পুরে চঞ্চলকুমারীর নিকট প্রেরিতা হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অগ্নিচক্র বড় ভীষণ হইল

তখন রাজসিংহ আর সকল পৌরাঙ্গনাগণকে—গজারূঢ়া শিবিকারূঢ়া এবং অশ্বারূঢ়া—সকলকেই, ঔরঙ্গজেবকে যে রন্ধ্রপথে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, সেই পথে প্রবেশ করিতে দিলেন। তাহারা প্রবেশ করিলে পর, উভয় সেনা নিস্তব্ধ হইল। ঔরঙ্গজেবের অবশিষ্ট সেনা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না—কেন না, রাজসিংহ পথ বন্ধ করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সাগরতুল্য অশ্বারোহী সেনা যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিল। তাহারা ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া রাজপুতের সম্মুখীন হইল। তখন রাজসিংহ একটু হঠিয়া গিয়া তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিলেন—তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন না। তাহারা "দীন্ দীন্" শব্দ করিতে করিতে বাদশাহের আজ্ঞানুসারে, বাদশাহ যে সংকীর্ণ রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে প্রবেশ করিল। রাজসিংহ আবার আগু হইলেন।

তার পর বাদশাহী তোষাখানা আসিয়া উপস্থিত হইল। রক্ষক নাই বলিলেই হয়, রাজপুতেরা তাহা লুঠিয়া লইল। তার পর খাদ্য দ্রব্য। যাহা হিন্দুর ব্যবহার্য্য, তাহা রাজসিংহের রসদের সামিল হইল। যাহা হিন্দুর অব্যবহার্য্য, তাহা ডোম দোসাদে লইয়া গিয়া কতক খাইল, কতক পর্ব্বতে ছড়াইল—শৃগাল কুক্কুর এবং বন্য পশুতে খাইল। রাজপুতেরা দফ্‌তরখানা হাতীর উপর হইতে নামাইল—কতক বা পুড়াইয়া দিল, কতক বা ছাড়িয়া দিল। তার পর মালখানা ; তাহাতে যে ধনরত্নরাশি আছে, পৃথিবীতে এমন আর কোথাও নাই,—জানিয়া রাজপুত সেনাপতিগণ লোভে উন্মত্ত হইল। তাহার পশ্চাতে বড় গোলন্দাজ সেনা। রাজসিংহ আপন সেনা সংযত করিলেন। বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইও না। ও সব তোমাদেরই। আজ ছাড়িয়া দাও। আজ এখন যুদ্ধের সময় নহে।" রাজসিংহ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। ঔরঙ্গজেবের সমস্ত সেনা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।

তার পর মাণিকলালকে বিরলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমি সেই মোগলের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এতটা সুবিধা হইবে, আমি মনে করি নাই। আমি যাহা অভিপ্রেত করিয়াছিলাম, তাহাতে যুদ্ধ করিয়া মোগলকে বিনষ্ট করিতে হইত। এক্ষণে বিনা যুদ্ধেই মোগলকে বিনষ্ট করিতে পারিব। মবারককে আমার নিকট লইয়া আসিবে। আমি তাহাকে সমাদর করিব।"

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মবারক মাণিকলালের হাতে জীবন পাইয়া তাহার সঙ্গে উদয়পুর আসিয়াছিলেন। রাজসিংহ তাঁহার বীরত্ব অবগত ছিলেন, অতএব তাহাকে সেনা মধ্যে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। তাহাতে মবারক কিছু দুঃখিত ছিল। আজ সেই দুঃখে গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়াছিল। সে গুরুতর কার্য্য যে সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, মবারকই ছদ্মবেশী মোগল সওদাগর।

মাণিকলাল আজ্ঞা পাইয়া মবারককে লইয়া আসিলেন। রাজসিংহ মবারকের অনেক প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, "তুমি এই সাহস ও চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া, মোগল সওদাগর সাজিয়া, মোগল সেনা রন্ধ্রপথে না লইয়া গেলে অনেক প্রাণিহত্যা হইত। তোমাকে কেহ চিনিতে পারিলে তোমারও মহাবিপদ্ উপস্থিত হইত।"

মবারক বলিল, "মহারাজ! যে ব্যক্তি সকলের সমক্ষে মরিয়াছে, যাহাকে সকলের সমক্ষে গোর দিয়াছে, তাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেও চেনে না—মনে করে, ভ্রম হইতেছে। আমি এই সাহসেই গিয়াছিলাম।"

রাজসিংহ বলিলেন, "এক্ষণে যদি আমার কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে সে আমার দোষ। তুমি যে পুরস্কার চাহিবে, আমি তাহাই তোমাকে দিব।"

মবারক কহিল, "মহারাজ! বে আদবী মাফ হৌক! আমি মোগল হইয়া মোগলের রাজ্য ধ্বংসের উপায় করিয়া দিয়াছি। আমি মুসলমান হইয়া হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কার্য্য করিয়াছি। আমি সত্যবাদী হইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়াছি। আমি বাদশাহের নেমক খাইয়া নেমকহারামী করিয়াছি। আমি মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক কষ্ট পাইতেছি। আমার আর কোন পুরস্কারে সাধ নাই। আমি কেবল এক পুরস্কার আপনার নিকট ভিক্ষা করি। আমাকে তোপের মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দিবার আদেশ করুন। আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।"

রাজসিংহ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "যদি এ কাজে তোমার এতই কষ্ট, তবে এমন কাজ কেন করিলে? আমাকে জানাইলে না কেন? আমি অন্য লোক নিযুক্ত করিতাম। আমি কাহাকেও এত দূর মনঃপীড়া দিতে চাহি না।"

মবারক, মাণিকলালকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই মহাত্মা আমার জীবন দান করিয়াছিলেন। ইঁহার নিতান্ত অনুরোধ যে, আমি এই কার্য্য সিদ্ধ করি। আমি নহিলেও এ কাজ সিদ্ধ হইত না; কেন না, মোগল ভিন্ন হিন্দুকে মোগলেরা বিশ্বাস করিত না। আমি ইহা অস্বীকার করিলে অকৃতজ্ঞতা পাপে পড়িতাম। তাই এ কাজ করিয়াছি। এক্ষণে এ প্রাণ আর রক্ষা করিব না স্থির করিয়াছি। আমাকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিতে আদেশ করুন। অথবা আমাকে বাঁধিয়া বাদশাহের নিকটে পাঠাইয়া দিন, অথবা অনুমতি দিন যে, আমি যে প্রকারে পারি, মোগল সেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করি।"

রাজসিংহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "কাল তোমাকে আমি মোগল সেনায় প্রবেশের অনুমতি দিব। আর একদিন মাত্র থাক। আমার কেবল এক্ষণে একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে। ঔরঙ্গজেব তোমাকে বধ করিয়াছিলেন কেন?"

মবারক। তাহা মহারাজের সাক্ষাৎ বক্তব্য নহে।

রাজসিংহ। মাণিকলালের সাক্ষাৎ?

মবারক। বলিয়াছি।

রাজসিংহ। আর একদিন অপেক্ষা কর।

এই বলিয়া রাজসিংহ মবারককে বিদায় দিলেন।

তার পর, মাণিকলাল মবারককে নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহেব! যদি আপনার মরিবার ইচ্ছা, তবে শাহজাদীকে ধরিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কেন?"

মবারক বলিল, "ভুল! সিংহজী ভুল! আমি আর শাহজাদী লইয়া কি করিব? মনে করিয়াছিলাম বটে যে, যে সয়তানী আমার ভালবাসার বিনিময়ে আমাকে কাল সাপের বিষদন্তে সমর্পণ করিয়া মারিয়াছিল, তাহাকে তাহার কর্ম্মের প্রতিফল দিব। কিন্তু মানুষ যাহা আজ চাহে, কাল তাহার ইচ্ছা থাকে না। আমি এখন মরিব নিশ্চয় করিয়াছি—এখন আর শাহজাদী প্রতিফল পাইল না পাইল, তাহাতে আমার কি? আমি আর কিছুই দেখিতে আসিব না।"

মাণিকলাল। জেব-উন্নিসাকে রাখিতে যদি আপনি অনুমতি না করেন, তবে আমি বাদশাহের নিকট কিছু ঘুষ লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিই।

মবারক। আর একবার তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা আছে। একবার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা আছে যে, জগতে ধর্ম্মাধর্ম্মে তাহার কিছু বিশ্বাস আছে কি না? একবার শুনিবার ইচ্ছা আছে যে, সে আমায় দেখিয়া কি বলে? একবার জানিবার ইচ্ছা আছে যে, আমাকে দেখিয়া সে কি করে?

মাণিকলাল। তবে, আপনি এখনও তাহার প্রতি অনুরক্ত?

মবারক। কিছুমাত্র না। একবার দেখিব মাত্র। আপনার কাছে এই পর্য্যন্ত ভিক্ষা।

অষ্টম খণ্ড

আগুনে কে কে পুড়িল

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাদশাহের দাহনারম্ভ

এদিকে বাদশাহ বড় গোলযোগে পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত সেনা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিবার অল্প পরেই দিবাবসান হইল। কিন্তু রন্ধ্রের অপর মুখে কেহই পৌঁছিল না। অপর মুখের কোন সংবাদ নাই। সন্ধ্যার পরেই সেই সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে অতিশয় গাঢ় অন্ধকার হইল। সমস্ত সেনার পথ আলোকযুক্ত হয়, এমন রোশনাইয়ের সরঞ্জাম সঙ্গে কিছুই নাই। বাদশাহের ও বেগমদিগের নিকট রোশনাই হইল—কিন্তু আর সমস্ত সেনাই গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন। তাহাতে আবার বন্ধুর পার্ব্বত্য তলভূমি, বিকীর্ণ উপলখণ্ডে ভীষণ হইয়া আছে। ঘোড়া সকল টক্কর খাইতে লাগিল—কত ঘোড়া আরোহী সমেত পড়িয়া গেল; অপর অশ্বের পাদদলনে পিষ্ট হইয়া অশ্ব ও আরোহী উভয়ে আহত বা নিহত হইল। কত হাতীর পায়ে বড় বড় শিলাখণ্ড ফুটিতে লাগিল—হস্তিগণ দুর্দ্দমনীয় হইয়া ইতস্ততঃ ফিরিতে লাগিল। অশ্বারোহিণী স্ত্রীগণ, ভূপতিতা হইয়া, অশ্বপদে, হস্তিপদে দলিত হইয়া, আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। দোলার বাহকদিগের চরণ সকল ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধিরে পরিপ্লুত হইতে লাগিল। পদাতিক সেনা আর চলিতে পারে না—পদস্খলনে, এবং উপলাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইল। তখন ঔরঙ্গজেব রাত্রিতে সেনার গতি বন্ধ করিয়া শিবির সংস্থাপন করিতে অনুমতি করিলেন।

কিন্তু তাম্বু ফেলিবার স্থান নাই। অতি কষ্টে বাদশাহ ও বেগমদিগের তাম্বুর স্থান হইল। আর কাহারও হইল না। যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে রহিল। অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠে—গজারোহী গজপৃষ্ঠে—পদাতিক চরণে ভর করিয়া রহিল। কেহ বা কষ্টে পর্ব্বতসানুদেশে একটু স্থান করিয়া, তাহাতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু সানুদেশ

দুরারোহণীয়,—এমন খাড়া যে, উঠা যায় না। অধিকাংশ লোকই এরূপ বিশ্রামের স্থান পাইল না।

তার পর বিপদের উপর—খাদ্যের অত্যন্ত অভাব। সঙ্গে যাহা ছিল, তাহা ত রাজপুতেরা লুঠিয়া লইয়াছে। যে রন্ধ্রপথে সেনা উপস্থিত—সেখানে অন্য খাদ্যের কথা দূরে থাক, ঘোড়ার ঘাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কেহ কিছু খাইতে পাইল না। বাদশাহ, কি বেগমেরাও নয়। ক্ষুধায়, নিদ্রার অভাবে সকলে মৃতপ্রায় হইল। মোগল সেনা বড় গোলযোগে পড়িল।

এ দিকে বাদশাহ উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসার হরণ-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রোধে অগ্নিতুল্য জ্বলিয়া উঠিলেন। একা সমস্ত সৈনিকদিগকে নিহত করা যায় না, নহিলে ঔরঙ্গজেব তাহা করিতেন। বিবরে নিরুদ্ধ সিংহ, সিংহীকে পিঞ্জরাবদ্ধ দেখিলে যেরূপ গর্জ্জন করে, ঔরঙ্গজেব সেইরূপ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রে সেনার কোলাহল কিছু নিবৃত্ত হইলে, অনেকে শুনিল, অতি দূরে অনেক পাহাড়ের উপর যেন বহুসংখ্যক বৃক্ষ উন্মূলিত হইতেছে। কিছু বুঝিতে না পারিয়া অথবা ভৌতিক শব্দ মনে করিয়া, সকলে চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাহনে বাদশাহের বড় জ্বালা

রাত্রি প্রভাতে ঔরঙ্গজেব সৈন্যচালনার আদেশ করিলেন। সেই বৃহতী সেনা,—তোপ লইয়া চতুরঙ্গিণী—অতি দ্রুতপদে রন্ধ্রমুখের উদ্দেশে চলিল। ক্ষুৎপিপাসায় সকলেই অত্যন্ত ক্লিষ্ট—বাহির হইলে তবে পানাহারের ভরসা—সকলে শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া ছুটিল। ঔরঙ্গজেব নিজে উদিপুরী ও জেব-উন্নিসাকে মুক্ত করিয়া উদয়পুর নিঃশেষ ভস্ম করিবার জন্য আপনার ক্রোধাগ্নিতে আপনি দগ্ধ হইতেছিলেন—তিনি আর কিছুমাত্র ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। বড় ছুটাছুটি করিয়া মোগল সেনা রন্ধ্রমুখে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া দেখিল, মোগলের সর্ব্বনাশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া আছে। রন্ধ্রমুখ বন্ধ! রাত্রিতে রাজপুতেরা সংখ্যাতীত মহামহীরুহ সকল ছেদন করিয়া পর্ব্বতশিখর হইতে রন্ধ্রমুখে ফেলিয়া দিয়াছে—পর্ব্বতাকার সপল্লব ছিন্ন বৃক্ষরাশি রন্ধ্রমুখ একবারে বন্ধ করিয়াছে; হস্তী অশ্ব পদাতিক দূরে থাক, শৃগাল কুক্কুরেরও যাতায়াতের পথ নাই।

মোগল সেনা মধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ উঠিল—স্ত্রীগণের রোদনধ্বনি শুনিয়া, ঔরঙ্গজেবের পাষাণনির্ম্মিত হৃদয়ও কম্পিত হইল।

সৈন্যের পথপরিষ্কারক সম্প্রদায় অগ্রে থাকে, কিন্তু এই সৈন্যকে বিপরীত গতিতে রন্ধ্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল বলিয়া তাহারা পশ্চাতে ছিল। ঔরঙ্গজেব প্রথমতঃ তাহাদিগকে সম্মুখে আনিবার জন্য আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কিন্তু তাহাদের আসা কালবিলম্বের কথা। তাহাদের অপেক্ষা করিতে গেলে, হয় ত সে দিনও উপবাসে কাটিবে। অতএব ঔরঙ্গজেব হুকুম দিলেন যে, পদাতিক সৈন্য, এবং অন্য যে পারে, বহু লোক একত্র হইয়া, গাছের প্রাচীরের উপর চড়িয়া, গাছ সকল ঠেলিয়া পাশে ফেলিয়া দেয়, এবং এই পরিশ্রমের সাহায্য জন্য হস্তী সকলকে নিযুক্ত করিলেন। অতএব সহস্র সহস্র পদাতিক এবং শত শত হস্তী বৃক্ষপ্রাকার ভগ্ন করিতে ছুটিল। কিন্তু যখন এ সকল, বৃক্ষপ্রাকারমূলে সমবেত হইল, তখন অমনই গিরিশিখর হইতে, যেমন ফাল্গুনের বাত্যায় শিলাবৃষ্টি হয়, তেমনই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের অবিশ্রান্ত ধারা পড়িতে লাগিল। পদাতিক সকলের মধ্যে কাহারও হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও মস্তক, কাহারও কক্ষ, কাহারও বক্ষ চূর্ণীকৃত হইল—কাহারও বা সমস্ত শরীর কর্দ্দমপিণ্ডবৎ হইয়া গেল। হস্তী সকলের মধ্যে কাহারও কুম্ভ, কাহারও দন্ত, কাহারও মেরুদণ্ড, কাহারও পঞ্জর ভগ্ন হইয়া গেল; হস্তী সকল বিকট চীৎকার করিতে করিতে, পদাতিক সৈন্য পদতলে বিদলিত করিতে করিতে পলায়ন করিল, তদ্দ্বারা ঔরঙ্গ-জেবের সমস্ত সেনা বিত্রস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া উঠিল। সকলে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সভয়ে দেখিল, পর্ব্বতের শিরোদেশে সহস্র সহস্র রাজপুত পদাতিক পিপীলিকার মত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে আহত বা নিহত না হইল, রাজপুতগণের বন্দুকের গুলিতে তাহারা মরিল। ঔরঙ্গজেবের সৈনিকেরা বৃক্ষপ্রাকারমূলে ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারিল না।

শুনিয়া ঔরঙ্গজেব সৈন্যাধ্যক্ষগণকে তিরস্কৃত করিয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষপ্রাচীরভঙ্গের উদ্যম করিতে আদেশ করিলেন। তখন "দীন্ দীন্" শব্দ করিয়া মোগল সেনা আবার ছুটিল—আবার রাজপুতসেনাকৃত গুলির বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টিতে বাত্যা সমীপে ইক্ষুক্ষেত্রের ইক্ষুর মত ভূমিশায়ী হইল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ উদ্যম করিয়া মোগল সেনা দুর্গপ্রাকার ভগ্ন করিতে পারিল না।

তখন ঔরঙ্গজেব হতাশ হইয়া, সেই বৃহতী সেনা রন্ধ্রপথে ফিরিতে আদেশ করিলেন। রন্ধ্রের যে মুখে সেনা প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মুখে বাহির হইতে হইবে। সমস্ত সেনা ক্ষুৎপিপাসায় ও পরিশ্রমে অবসন্ন, ঔরঙ্গজেবও তাঁহার জন্মে এই প্রথম

ক্ষুৎপিপাসায় অধীর ; বেগমেরাও তাই। কিন্তু আর উপায়ান্তর নাই—পর্ব্বতের সানুদেশ আরোহণ করা যায় না ; কেন না, পাহাড় সোজা উঠিয়াছে। কাজেই ফিরিতে হইল।

ফিরিয়া আসিয়া অপরাহ্নে, যে মুখে ঔরঙ্গজেব সসৈন্য রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, পুনশ্চ রন্ধ্রের সেই মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সেখানেও প্রত্যক্ষমূর্ত্তি মৃত্যু, তাঁহাকে সসৈন্যে গ্রাস করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। রন্ধ্রের সে মুখও, সেইরূপ অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতপ্রমাণ বৃক্ষপ্রাকারে বদ্ধ! নির্গমের উপায় নাই। পর্ব্বতোপরি রাজপুতসেনা পূর্ব্ববৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু নির্গত না হইলে ত নিশ্চিত সসৈন্য মৃত্যু। অতএব সমস্ত মোগল সেনাপতিকে ডাকিয়া ঔরঙ্গজেব স্তুতি মিনতি উৎসাহবাক্যে এবং ভয়প্রদর্শনের দ্বারা পথ মুক্ত করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পতন করিতে স্বীকৃত করাইলেন। সেনাপতিগণ সেনা লইয়া পুনশ্চ বৃক্ষপ্রাকার আক্রমণ করিলেন। এবার একটু সুবিধাও ছিল—পথপরিষ্কারক সেনাও উপস্থিত ছিল। মোগলেরা মরণ তৃণজ্ঞান করিয়া বৃক্ষরাজি ছিন্ন ও আকৃষ্ট করিতে লাগিল। কিন্তু সে ক্ষণমাত্র। পর্ব্বতশিখর হইতে যে লৌহ ও পাষাণবৃষ্টি হইতেছিল—ভাদ্রের বর্ষায় যেমন ধান্যক্ষেত্র ডুবিয়া যায়, মোগল সেনা তাহাতে তেমনই ডুবিয়া গেল।

তাব পর বিপদের উপর বিপদ্, সম্মুখস্থ পর্ব্বতসানুদেশে রাজসিংহের শিবির। তিনি দূর হইতে মোগল সেনার প্রত্যাবর্ত্তন জানিতে পারিয়া, তোপ সাজাইয়া সম্মুখে প্রেরণ করিলেন।

রাজসিংহের কামান ডাকিল। বৃক্ষপ্রাকার লঙ্ঘিত করিয়া রাজসিংহের গোলা ছুটিল—হস্তী, অশ্ব, পত্তি, সেনাপতি সব চূর্ণ হইয়া গেল। মোগল সেনা রন্ধ্রমধ্যে হটিয়া গিয়া, ক্রূর সর্প যেমন অগ্নিভয়ে কুণ্ডলী করিয়া বিবরে লুকায়, মোগল সেনা রন্ধ্রবিবরে সেইরূপ লুকাইল। শাহান্‌শাহ বাদশাহ, হীরকমণ্ডিত শ্বেত উষ্ণীষ মস্তক হইতে খুলিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, জানু পাতিয়া, পর্ব্বতের কাঁকর তুলিয়া আপনার মাথায় দিলেন। দিল্লীর বাদশাহ রাজপুত ভুঁইঞার নিকট সসৈন্যে পিঞ্জরাবদ্ধ মূষিক। একটা মূষিকের আহার পাইলেও আপাততঃ তাঁর প্রাণরক্ষা হইতে পারে।

তখন ভারতপতি ক্ষুদ্রা রাজপুতকুলবালাকে উদ্ধারকারিণী মনে করিয়া তাহার পারাবত উড়াইয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উদিপুরীর দাহনারম্ভ

নির্ম্মলকুমারী, উদিপুরী বেগম ও জেব-উন্নিসা বেগমকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া, মহারাণী চঞ্চলকুমারীর নিকট গিয়া প্রণাম করিলেন। এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ তাহার নিকট নিবেদন করিলেন। সকল কথা সবিশেষ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আগে উদিপুরীকে ডাকাইলেন। উদিপুরী আসিলে তাহাকে পৃথক্ আসনে বসিতে দিলেন; এবং তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য আপনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উদিপুরী অত্যন্ত বিষণ্ণ ও বিনীতভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে চঞ্চলকুমারীর সৌজন্য দেখিয়া মনে করিলেন, ক্ষুদ্রপ্রাণ হিন্দু ভয়েই এত সৌজন্য করিতেছে। তখন ম্লেচ্ছকন্যা বলিল, "তোমরা মোগলের নিকট মৃত্যু বাসনা করিতেছ কেন?"

চঞ্চলকুমারী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমরা তাঁহার নিকট মৃত্যু কামনা করি নাই। তিনি যদি সে সামগ্রী আমাদিগকে দিতে পারেন, সেই আশায় আসিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমরা হিন্দু; যবনের দান গ্রহণ করি না।"

উদিপুরী ঘৃণার সহিত বলিল, "উদয়পুরের ভুঁইঞারা, পুরুষানুক্রমে মুসলমানের কাছে এ দান স্বীকার করিয়াছেন। সুলতান্ আলাউদ্দীনের কথা ছাড়িয়া দিই; মোগল বাদশাহ আক্‌ব্বর শাহ, এবং তাঁহার পৌত্রের নিকটও রাণা রাজসিংহের পূর্ব্বপুরুষেরা এ দান স্বীকার করিয়াছেন।"

চঞ্চল। বেগম সাহেব! আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, সে আমরা দান বলিয়া স্বীকার করি নাই; ঋণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আক্‌ব্বর বাদশাহের ঋণ, প্রতাপসিংহ নিজে পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন। আপনার শ্বশুরের ঋণ এক্ষণে আমরা পরিশোধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাহার প্রথম কিস্তী লইবার জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি। আমার তামাকু নিবিয়া গিয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তামাকুটা সাজিয়া দিন।

চঞ্চলকুমারী প্রথমে বেগমের প্রতি যেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, বেগম যদি তাহার উপযোগী ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে বোধ করি, তাঁহাকে এ অপমানে পড়িতে হইত না। কিন্তু তিনি পরুষ বাক্যে তেজস্বিনী চঞ্চলকুমারীর গর্ব্ব উদ্রিক্ত করিয়াছেন—কাজেই এখন ফল ভোগ করিতে হইল। তামাকু সাজার কথায়, সেই তামাকু সাজার

নিমন্ত্রণপত্রখানা মনে পড়িল। উদিপুরীর সর্ব্বশরীরে স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল। তথাপি অভ্যস্ত গর্ব্বকে হৃদয়ে পুনঃ স্থাপন করিয়া কহিলেন, "বাদশাহের বেগমে তামাকু সাজে না।"

চঞ্চলকুমারী। যখন তুমি বাদশাহের বেগম ছিলে, তখন তামাকু সাজিতে না। এখন তুমি আমার বাঁদী। তামাকু সাজিবে। আমার হুকুম।

উদিপুরী কাঁদিয়া ফেলিল—দুঃখে নহে; রাগে। বলিল, "তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে, আলম্‌গীর বাদশাহের বেগমকে তামাকু সাজিতে বল?"

চঞ্চল। আমার ভরসা আছে, কাল আলম্‌গীর বাদশাহ স্বয়ং এখানে আসিয়া মহারাণার তামাকু সাজিবেন। তাঁহার যদি সে বিদ্যা না থাকে, তবে তুমি তাঁহাকে কাল শিখাইয়া দিবে। আজ আপনি শিখিয়া রাখ।

চঞ্চলকুমারী তখন পরিচারিকাকে আজ্ঞা দিলেন, "ইহা দ্বারা তামাকু সাজাইয়া লও।"

উদিপুরী উঠে না।

তখন পরিচারিকা বলিল, "ছিলিম উঠাও।"

উদিপুরী তথাপি উঠিল না। তখন পরিচারিকা তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে আসিল। অপমানভয়ে, কম্পিতহৃদয়ে শাহান্‌শাহের প্রেয়সী মহিষী ছিলিম তুলিতে গেলেন। তখন ছিলিম পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন না। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, এক পা বাড়াইতে না বাড়াইতে থরথর করিয়া কাঁপিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া গেলেন। পরিচারিকা ধরিয়া ফেলিল—আঘাত লাগিল না। উদিপুরী হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

তখন চঞ্চলকুমারীর আজ্ঞামত, যে মহার্ঘ পালঙ্কে তাঁহার জন্য মহার্ঘ শয্যা রচিত হইয়াছিল, তথায় তিনি পরিচারিকাগণের দ্বারা বাহিত ও নীত হইলেন। সেখানে পৌরাঙ্গনাগণ তাঁহার যথাবিহিত শুশ্রূষা করিল। অল্প সময়েই তাঁহার চৈতন্য লাভ হইল। চঞ্চলকুমারী আজ্ঞা দিলেন যে, আর কেহ কোন প্রকারে বেগমের অসম্মান না করে। আহারাদি, শয়ন ও পরিচর্য্যা সম্বন্ধে চঞ্চলকুমারীর নিজের যেরূপ বন্দোবস্ত, বেগম সম্বন্ধে ততোধিক যাহাতে হয়, তাহা করিতে চঞ্চলকুমারী নির্ম্মলকুমারীকে আদেশ করিলেন।

নির্ম্মল বলিল, "তাহা সবই হইবে। কিন্তু তাহাতে ইঁহার পরিতৃপ্তি হইবে না।"

চঞ্চল। কেন, আর কি চাই?

নির্ম্মল। তাহা রাজপুরীতে অপ্রাপ্য।

চঞ্চল। সরাব? যখন তাহা চাহিবে, তখন একটু গোময় দিও।

উদিপুরী পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু রাত্রিকালে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, উদিপুরী নির্ম্মলকুমারীকে ডাকাইয়া মিনতি করিয়া বলিলেন, "ইম্‌লি বেগম—থোড়া সরাব হুকুম কি জিয়ে।"

নির্ম্মল "দিতেছি" বলিয়া রাজবৈদ্যকে গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন। রাজবৈদ্য এক বিন্দু ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন, এবং উপদেশ দিলেন যে, সরবৎ প্রস্তুত করিয়া এই ঔষধবিন্দু তাহাতে মিশাইয়া, সরাব বলিয়া পান করিতে দিবে। নির্ম্মল তাহাই করাইলেন। উদিপুরী তাহা পান করিয়া, অতিশয় প্রীত হইলেন। বলিলেন, "অতি উৎকৃষ্ট মদ্য।" এবং অল্পকাল মধ্যেই নেশায় অভিভূত হইয়া, গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জেব-উন্নিসার দাহনারম্ভ

জেব-উন্নিসা একা বসিয়া আছেন। দুই একজন পরিচারিকা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেছে। নির্ম্মলকুমারীও দুই একবার তাঁহার খবর লইতেছেন। ক্রমশঃ জেব-উন্নিসা উদিপুরীর বিভ্রাটবার্ত্তা শুনিলেন। শুনিয়া তিনি নিজের জন্য চিন্তিত হইলেন।

পরিশেষে তাঁহাকেও নির্ম্মলকুমারী চঞ্চলকুমারীর নিকট লইয়া গেলেন। তিনি না বিনীত, না গর্ব্বিত ভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, আমি যে আলম্‌গীর বাদশাহের কন্যা, তাহা কিছুতেই ভুলিব না।

চঞ্চলকুমারী অতিশয় সমাদরের সহিত তাঁহাকে উপযুক্ত পৃথক্ আসনে বসাইলেন এবং নানাবিধ আলাপ করিলেন। জেব-উন্নিসাও সৌজন্যের সহিত কথার উত্তর করিলেন। পরস্পরে বিদ্বেষ ভাব জন্মে, এমন কথা কেহই কিছুই বলিলেন না। পরিশেষে চঞ্চলকুমারী তাঁহার উপযুক্ত পরিচর্য্যার আদেশ দিলেন। এবং জেব-উন্নিসাকে আতর ও পান দিলেন।

কিন্তু জেব-উন্নিসা, না উঠিয়া বলিলেন, "মহারাণি! আমাকে কেন এখানে আনা হইয়াছে, আমি কিছু শুনিতে পাই কি?"

চঞ্চল। সে কথা আপনাকে বলা হয় নাই। না বলিলেও চলে! কোন দৈবজ্ঞের আদেশমত আপনাকে আনা হইয়াছে। আপনি অদ্য একা শয়ন করিবেন। দ্বার খুলিয়া

রাখিবেন। প্রহরিণীগণ অলক্ষ্যে প্রহরা দিবে, আপনার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন, আপনি আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখিবেন। যদি স্বপ্ন দেখেন, তবে আমাকে কাল তাহা বলিবেন, ইহা আপনার নিকট প্রার্থনা।

শুনিয়া চিন্তিতভাবে জেব-উন্নিসা চঞ্চলকুমারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। নির্ম্মলকুমারীর যত্নে তাঁহার আহার, শয্যা ও শয্যার পারিপাট্য যেমন দিল্লীর রঙ্‌মহালে ঘটিত, তেমনই ঘটিল। তিনি শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা যাইলেন না। চঞ্চলকুমারীর আজ্ঞামত দ্বার খুলিয়া রাখিয়া একাই শয়ন করিলেন; কেন না, অবাধ্য হইলে যদি চঞ্চলকুমারী, উদিপুরীর দশার মত তাঁহারও কোন দুর্দ্দশা ঘটান, সে ভয়ও ছিল। কিন্তু একা সমস্ত রাত্রি দ্বার খুলিয়া রাখাতেও অত্যন্ত শঙ্কা উপস্থিত হইল। মনে ভাবিলেন যে, ইহাই সম্ভব যে, গোপনে আমার উপর কোন অত্যাচার হইবে, এই জন্য এমন বন্দোবস্ত হইয়াছে। অতএব স্থির করিলেন, নিদ্রা যাইবেন না, সতর্ক থাকিবেন।

কিন্তু দিবসে অনেক কষ্ট গিয়াছিল, এজন্য নিদ্রা যাইব না, জেব-উন্নিসা এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেও, তন্দ্রা আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে অধিকার করিতে লাগিল। যে নিদ্রা যাইব না প্রতিজ্ঞা করে, তন্দ্রা আসিলেও মধ্যে মধ্যে নিদ্রা ভঙ্গ হয়; তন্দ্রাভিভূত হইলেও একটু বোধ থাকে যে, আমার ঘুমান হইবে না। জেব-উন্নিসা মধ্যে মধ্যে এইরূপ তন্দ্রাভিভূত হইতেছিলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে চমকে চমকে ঘুম ভাঙ্গিতেছিল। ঘুম ভাঙ্গিলেই আপনার অবস্থা মনে পড়িতেছিল। কোথায় দিল্লীর বাদশাহজাদী, কোথায় উদয়পুরের বন্দিনী! কোথায় মোগল বাদশাহীর রঙ্গভূমির প্রধানা অভিনেত্রী, মোগল বাদশাহীর আকাশের পূর্ণচন্দ্র, তক্তে তাউসের সর্ব্বোজ্জ্বল রত্ন, কাবুল হইতে বিজয়পুর গোলকুণ্ডা যাঁহার বাহুবলে শাসিত, তাঁহার দক্ষিণ বাহু,—আর কোথায় আজ গিরিগুহানিহিত উদয়পুরের কোটরে মূষিকবৎ পিঞ্জরাবদ্ধা, রূপনগরের ভুঁইঞার মেয়ের বন্দিনী, হিন্দুর ঘরে অস্পর্শীয়া শূকরী, হিন্দু পরিচারিকামণ্ডলীর চরণকলঙ্ককারী কীট! মরণ কি ইহার অপেক্ষা ভাল নহে! ভাল বৈ কি? যে মরণ তিনি প্রাণাধিক প্রিয় মবারককে দিয়াছেন, সে ভাল না ত কি? যা মবারককে দিয়াছেন, তাহা অমূল্য—নিজে কি তিনি সেই মরণের যোগ্য? হায় মবারক! মবারক! মবারক! তোমার অমোঘ বীরত্ব কি সামান্য ভুজঙ্গমগরলকে জয় করিতে পারিল না? সে অনিন্দনীয় মনোহর মূর্ত্তিও কি সাপের বিষে নীল হইয়া গেল! এখন উদয়পুরে কি এমন সাপ পাওয়া যায় না যে, এই কালভুজঙ্গীকে দংশন করে? মানুষী কালভুজঙ্গী কি ফণিনী কালভুজঙ্গীর দংশনে মরিবে না! হায় মবারক! মবারক! মবারক!

তুমি একবার সশরীর দেখা দিয়া, কালভুজঙ্গী দিয়া আমায় একবার দংশন করাও ; আমি মরি কি না দেখ।

ঠিক এই কথা ভাবিয়া যেন মবারককে সশরীর দর্শন করিবার মানসেই জেব-উন্নিসা নয়ন উন্মীলিত করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে সশরীর মবারক! জেব-উন্নিসা চীৎকার করিয়া, চক্ষু পুনর্নিমীলিত করিয়া অজ্ঞান হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অগ্নিতে ইন্ধনক্ষেপ—জ্বালা বাড়িল

পরদিন যখন জেব-উন্নিসা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন, তখন আর তাঁহাকে চেনা যায় না। একে ত পূর্ব্বেই মূর্ত্তি শীর্ণা বিবর্ণা, কাদম্বিনীচ্ছায়াপ্রচ্ছন্নাবৎ হইয়াছিল—আজ আরও যেন কি হইয়াছে, বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত দিনরাত্র আগুনের তাপের নিকট বসিয়া থাকিলে মানুষ যেমন হয়, চিতারোহণ করিয়া, না পুড়িয়া কেবল ধূম ও তাপে অর্দ্ধদগ্ধা হইয়া চিতা হইতে নামিলে যেমন হয়, জেব-উন্নিসাকে আজ তেমনই দেখাইতেছিল। জেব-উন্নিসা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পুড়িতেছিল।

বেশভূষা না করিলে নয় ; জেব-উন্নিসা অত্যন্ত অনিচ্ছায় বেশভূষা করিয়া, নিয়ম ও অনুরোধ রক্ষার্থ জলযোগ করিল। তার পর প্রথমে উদিপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। দেখিল, উদিপুরী একা বসিয়া আছে—সম্মুখে কুমারী মেরির প্রতিমূর্ত্তি এবং একটি যিশুর ক্রস্। অনেক দিন উদিপুরী যিশুকে এবং তাঁহার মাতাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুর্দ্দিনে তাঁহাদের মনে পড়িয়াছিল। খিষ্টিয়ানির চিহ্নস্বরূপ এই দুইটি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত ; বৃষ্টির দিনে দুঃখীর পুরাণ ছাতির মত, আজ তাহা বাহির হইয়াছিল। জেব-উন্নিসা দেখিলেন, উদিপুরীর চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা ঝরিতেছে ; বিন্দুর পশ্চাৎ বিন্দু, বিন্দুর পশ্চাৎ বিন্দু, নিঃশব্দে দুগ্ধালক্তকনিন্দী গণ্ড বাহিয়া ঝরিতেছে। জেব-উন্নিসা উদিপুরীকে এত সুন্দর কখনও দেখেন নাই। সে স্বভাবতঃ পরম সুন্দরী—কিন্তু গর্ব্বে, ভোগবিলাসে, ঈর্ষ্যাদির জ্বালায়, সর্ব্বদাই সে অতুল সৌন্দর্য্য একটু বিকৃত হইয়া থাকিত। আজ অশ্রুস্রোতে সে বিকৃতি ধুইয়া গিয়াছিল—অপূর্ব্ব রূপরাশির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

উদিপুরী জেব-উন্নিসাকে দেখিয়া আপনার দুঃখের কথা বলিতেছিলেন। বলিলেন, "আমি বাঁদী ছিলাম—বাঁদীর দরে বিক্রীত হইয়াছিলাম—কেন বাঁদীই রহিলাম না! কেন আমার কপালে ঐশ্বর্য্য ঘটিয়াছিল!—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া উদিপুরী, জেব-উন্নিসার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার অবস্থা এমন কেন? কাল তোমার কি হইয়াছিল? কাফের তোমার উপরও কি অত্যাচার করিয়াছে?"

জেব-উন্নিসা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কাফেরের সাধ্য কি? আল্লা করিয়াছেন।"

উদিপুরী। সকলই তিনি করেন, কিন্তু কি ঘটিয়াছে, শুনিতে পাই না?

জেব। এখন সে কথা মুখে আনিতে পারিব না। মৃত্যুকালে বলিয়া যাইব।

উদি। যাই হৌক, ঈশ্বর যেন রাজপুতের এ স্পর্দ্ধার দণ্ড করেন।

জেব। রাজপুতের ইহাতে কোন দোষ নাই।

এই কথা বলিয়া জেব-উন্নিসা নীরব হইয়া রহিল। উদিপুরীও কিছু বলিল না। পরিশেষে চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য জেব-উন্নিসা উদিপুরীর নিকট বিদায় চাহিল।

উদিপুরী বলিল, "কেন, তোমাকে কি ডাকিয়াছে?"

জেব। না।

উদি। তবে উপযাচক হইয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি বাদশাহের কন্যা।

জেব। আমার নিজের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

উদি। সাক্ষাৎ কর ত জিজ্ঞাসা করিও যে, কত আশরফি পাইলে এই গাঁওয়ারেরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে?

"করিব।" বলিয়া জেব-উন্নিসা বিদায় লইলেন। পরে চঞ্চলকুমারীর অনুমতি লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে পূর্ব্বদিনের মত সম্মান করিলেন, এবং রীতিমত স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, উত্তম নিদ্রা হইয়াছিল ত?"

জেব। না। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে গিয়া ভয়ে ঘুমাই নাই।

চঞ্চল। তবে কিছু স্বপ্নে দেখেন নাই?

জেব। স্বপ্ন দেখি নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ কিছু দেখিয়াছি।

চঞ্চল। ভাল, না মন্দ?

জেব। ভাল, না মন্দ, তাহা বলিতে পারি না—ভাল ত নহেই। কিন্তু সে বিষয়ে আপনার কাছে আমার ভিক্ষা আছে।

চঞ্চল। বলুন।

জেব। আর তাহা দেখিতে পাই কি?

চঞ্চল। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা না করিলে বলিতে পারি না। আমি পাঁচ সাত দিন পরে, দৈবজ্ঞের কাছে লোক পাঠাইব।

জেব। আজ পাঠান যায় না?

চঞ্চল। এত কি ত্বরা বাদশাহজাদী?

জেব। এত ত্বরা, যদি আপনি এই মুহূর্ত্তে তাহা দেখাইতে পারেন, তবে আমি আপনার বাঁদী হইয়া থাকিতেই চাহিব।

চঞ্চল। বিস্ময়কর কথা শাহজাদী! এমন কি সামগ্রী?

জেব-উন্নিসা উত্তর করিল না। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। দেখিয়া চঞ্চলকুমারী দয়া করিল না। বলিল, "আপনি পাঁচ সাত দিন অপেক্ষা করুন, বিবেচনা করিব।"

তখন জেব-উন্নিসা, হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ ভুলিয়া গেল। যেখানে তাহার যাইতে নাই, সেখানে গেল। যে শয্যার উপর চঞ্চলকুমারী বসিয়া, তাহার উপর গিয়া দাঁড়াইল। তার পর ছিন্ন লতার মত সহসা চঞ্চলকুমারীর চরণে পড়িয়া গিয়া, চঞ্চলকুমারীর পায়ের উপর মুখ রাখিয়া, পদ্মের উপর পদ্মখানি উল্টাইয়া দিয়া, অশ্রুশিশিরে তাহা নিষিক্ত করিল। বলিল, "আমার প্রাণ রক্ষা কর! নহিলে আজ মরিব।"

চঞ্চলকুমারী তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন—তিনিও হিন্দু মুসলমান মনে রাখিলেন না। তিনি বলিলেন, "শাহজাদী! আপনি যেমন কাল রাত্রিতে দ্বার খুলিয়া শুইয়াছিলেন, আজিও তাই করিবেন। নিশ্চিত আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।"

এই বলিয়া তিনি জেব-উন্নিসাকে বিদায় দিলেন।

এ দিকে উদিপুরী জেব-উন্নিসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু জেব-উন্নিসা তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিল না। নিরাশ হইয়া উদিপুরী স্বয়ং চঞ্চলকুমারীর কাছে যাইবার অনুমতি চাহিলেন।

সাক্ষাৎ হইলে উদিপুরী চঞ্চলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কত আশরফি পাইলে চঞ্চলকুমারী তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন। চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "যদি বাদশাহ ভারতবর্ষের সকল মস্‌জীদ্—মায় দিল্লীর জুম্মা মস্‌জীদ্ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন, আর ময়ূরতক্ত এখানে বহিয়া দিয়া যাইতে পারেন, আর বৎসর বৎসর আমাদিগকে রাজকর দিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে তোমাদের ছাড়িয়া দিতে পারি।"

উদিপুরী ক্রোধে অধীর হইল। বলিল, "গাঁওয়ার ভুঁইঞার ঘরে এত স্পর্দ্ধা আশ্চর্য্য বটে।"

এই বলিয়া উদিপুরী উঠিয়া চলিয়া যায়। চঞ্চলকুমারী হাসিয়া বলিল, "বিনা হুকুমে যাও কোথায়? তুমি গাঁওয়ার ভুঁইয়ারনীর বাঁদী, তাহা মনে নাই?" পরে একজন পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, "আমার এই নূতন বাঁদী আর আর মহিষীদিগের নিকট লইয়া গিয়া দেখাইয়া আসিও। পরিচয় দিও, ইনি দারাসেকোর খরিদা বাঁদী।"

উদিপুরী কাঁদিতে কাঁদিতে পরিচারিকার সঙ্গে চলিল। পরিচারিকা রাজসিংহের আর আর মহিষীদিগের নিকট, ঔরঙ্গজেবের প্রেয়সী মহিষীকে দেখাইয়া আনিল।

নির্ম্মল আসিয়া চঞ্চলকে বলিল, "মহারাণী! আসল কথাটা ভুলিতেছ? কি জন্য উদিপুরীকে ধরিয়া আনিয়াছি? জ্যোতিষীর গণনা মনে নাই?"

চঞ্চলকুমারী হাসিয়া বলিল, "সে কথা ভুলি নাই। তবে সে দিন বেগম বড় কাতর হইয়া পড়িল বলিয়া আর পীড়ন করিতে পারিলাম না। কিন্তু বেগম আপনা হইতেই আমার দয়াটুকু শুকাইয়া তুলিতেছে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শাহজাদী ভস্ম হইল

অর্দ্ধ রাত্রি অতীত; সকলে নিঃশব্দে নিদ্রিত। জেব বাদশাহ-দুহিতা সুখশয্যায় অশ্রুমোচনে বিবশা, কদাচিৎ দাবাগ্নিপরিবেষ্টিত ব্যাঘ্রীর মত কোপতীব্রা। কিন্তু তখনই যেন বা শরবিদ্ধা হরিণীর মত কাতরা। রাত্রিটা ভাল নহে; মধ্যে মধ্যে গভীর হুঙ্কারের সহিত প্রবল বায়ু বহিতেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বাতায়নপথলক্ষ্য গিরিশিখরমালায় প্রগাঢ় অন্ধকার—কেবল যথায় রাজপুতের শিবির, তথায় বসন্তকাননে কুসুমরাজি তুল্য, সমুদ্রে ফেননিচয় তুল্য, এবং কামিনীকমনীয় দেহে রত্নরাশি তুল্য, এক স্থানে বহুসংখ্যক দীপ জ্বলিতেছে—আর

সর্ব্বত্র নিঃশব্দ, প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কদাচিৎ সিপাহীর হস্তমুক্ত বন্দুকের প্রতিধ্বনিতে ভীষণ। কখনও বা মেঘের "অদ্রিগ্রহণগুরুগর্জ্জিত,"—কখন বা একমাত্র কামানের, শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত তুমুল কোলাহল। রাজপুরীর অশ্বশালায় ভীত অশ্বের হ্রেষা ; রাজপুরীর উদ্যানে ভীত হরিণীর কাতরোক্তি। সেই ভয়ঙ্করী নিশীথিনীর সকল শব্দ শুনিতে শুনিতে বিষণ্নমনে জেব-উন্নিসা ভাবিতেছিল, "ঐ যে কামান ডাকিল, বোধ হয় মোগলের কামান—নহিলে কামান অমন ডাকিতে জানে না। আমার পিতার তোপ ডাকিল—এমন শত শত তোপ আমার বাপের আছে—একটাও কি আমার হৃদয়ের জন্য নহে? কি করিলে এই তোপের মুখে বুক পাতিয়া দিয়া, তোপের আগুনে সকল জ্বালা জুড়াই? কাল সৈন্যমধ্যে গজপৃষ্ঠে চড়িয়া লক্ষ সৈন্যের শ্রেণী দেখিয়াছিলাম, লক্ষ অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শুনিয়াছিলাম—তার একখানিতে আমার সব জ্বালা ফুরাইতে পারে; কৈ, সে চেষ্টা ত করি নাই? হাতীর উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, হাতীর পায়ের তলে পিষিয়া মরিতে পারিতাম,—কৈ? সে চেষ্টাও ত করি নাই। কেন করি নাই? মরিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু মরিবার উদ্যোগ নাই কেন? এখনও ত অঙ্গে অনেক হীরা আছে, গুঁড়াইয়া খাইয়া মরি না কেন? আমার মনের আর সে শক্তি নাই যে, উদ্যোগ করিয়া মরি।"

এমন সময়ে বেগবান্ বায়ু, মুক্তদ্বার কক্ষ মধ্যে, অতি বেগে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বাতি নিবাইয়া দিল। অন্ধকারে জেব-উন্নিসার মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। জেব উন্নিসা ভাবিতে লাগিল, "ভয় কেন? এই ত মরণ কামনা করিতেছিলাম! যে মরিতে চাহে, তার আবার কিসের ভয়? ভয়? কাল মরা মানুষ দেখিয়াছি, আজও বাঁচিয়া আছি। বুঝি যেখানে মরা মানুষ থাকে, সেইখানে যাইব, ইহা নিশ্চিত; তবে ভয় কিসের? তবে বেহেস্ত আমার কপালে নাই—বুঝি জাহান্নায় যাইতে হইবে, তাই এত ভয়! তা, এতদিন এ সকল কথা কিছুই বিশ্বাস করি নাই। জাহান্নাও মানি নাই, বেহেস্তও মানি নাই; খোদাও জানিতাম না, দীন্‌ও জানিতাম না। কেবল ভোগবিলাসই জানিতাম। আল্লা রহিম! তুমি কেন ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলে? ঐশ্বর্য্যেই আমার জীবন বিষময় হইল। তোমায় আমি তাই চিনিলাম না। ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই, তাহা আমি জানিতাম না, কিন্তু তুমি ত জান! জানিয়া শুনিয়া নির্দ্দয় হইয়া কেন এ দুঃখ দিলে? আমার মত ঐশ্বর্য্য কাহার কপালে ঘটিয়াছে? আমার মত দুঃখী কে?"

শয্যায় পিপীলিকা, কি অন্য একটা কীট ছিল—রত্নশয্যাতেও কীটের সমাগমের নিষেধ নাই—কীট জেব-উন্নিসাকে দংশন করিল। যে কোমলাঙ্গে পুষ্পধন্বাও শরাঘাতের সময়ে

মৃদুহস্তে বাণক্ষেপ করেন, তাহাতে কীট অবলীলাক্রমে দংশন করিয়া রক্ত বাহির করিল। জেব-উন্নিসা জ্বালায় একটু কাতর হইল। তখন জেব-উন্নিসা মনে মনে একটু হাসিল। ভাবিল, "পিপীলিকার দংশনে আমি কাতর! এই অনন্ত দুঃখের সময়েও কাতর! আপনি পিপীলিকাদংশন সহ্য করিতে পারিতেছি না, আর অবলীলাক্রমে আমি, যে আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তাহাকে ভুজঙ্গমদংশনে প্রেরণ করিলাম। এমন কেহ নাই কি যে, আমাকে তেমনই বিষধর সাপ আনিয়া দেয়! হয় সাপ, নয় মবারক!"

প্রায় সকলেরই ইহা ঘটে যে, অধিক মানসিক যন্ত্রণার সময়, অধিক ক্ষণ ধরিয়া একা, মর্ম্মভেদী চিন্তায় নিমগ্ন হইলে মনের কোন কোন কথা মুখে ব্যক্ত হয়। জেব-উন্নিসার শেষ কথা কয়টি সেইরূপ মুখে ব্যক্ত হইল। তিনি সেই অন্ধকার নিশীথে, গাঢ়ান্ধকার কক্ষমধ্য হইতে, সেই বায়ুর হুঙ্কার ভেদ করিয়া যেন কাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হয় সাপ! নয় মবারক!" কেহ সেই অন্ধকারে উত্তর করিল, "মবারককে পাইলে তুমি কি মরিবে না?"

"এ কি এ!" বলিয়া জেব-উন্নিসা উপাধান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। যেমন গীতধ্বনি শুনিয়া হরিণী উন্নমিতাননে উঠিয়া বসে, তেমনই করিয়া জেব-উন্নিসা উঠিয়া বসিল। বলিল, "এ কি এ? এ কি শুনিলাম! কার এ আওয়াজ?"

উত্তর হইল, "কার?"

জেব-উন্নিসা বলিল, "কার! যে বেহেস্তে গিয়াছে, তারও কি কণ্ঠস্বর আছে! সে কি ছায়া মাত্র নহে? তুমি কি প্রকারে বেহেস্ত হইতে আসিতেছ, যাইতেছ, মবারক? তুমি কাল দেখা দিয়াছিলে, আজ তোমার কথা শুনিলাম—তুমি মৃত, না জীবিত? আসিরদ্দীন কি আমার কাছে মিছা কথা বলিয়াছিল? তুমি জীবিত হও, মৃত হও, তুমি আমার কাছে —আমার এই পালঙ্কে মুহূর্ত্ত জন্য বসিতে পার না? তুমি যদি ছায়া মাত্রই হও, তবু আমার ভয় নাই। একবার বসো।"

উত্তর "কেন?"

জেব-উন্নিসা সকাতরে বলিল, "আমি কিছু বলিব। আমি যাহা কখন বলি নাই, তাহা বলিব।"

মবারক—(বলিতে হইবে না যে, মবারক সশরীর উপস্থিত) তখন অন্ধকারে, জেব-উন্নিসার পার্শ্বে পালঙ্কের উপর বসিল। জেব-উন্নিসার বাহুতে তাহার বাহু স্পর্শ হইল,—জেব-উন্নিসার শরীর হর্ষকণ্টকিত, আহ্লাদে পরিপ্লুত হইল;—অন্ধকারে মুক্তার সারি গণ্ড দিয়া বহিল। জেব-উন্নিসা আদরে মবারকের হাত আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইল।

বলিল, "ছায়া নও প্রাণনাথ! আমায় তুমি যা বলিয়া ভুলাও, আমি ভুলিব না। আমি তোমার; আবার তোমায় ছাড়িব না।" তখন জেব-উন্নিসা সহসা পালঙ্ক হইতে নামিয়া, মবারকের পায়ের উপর পড়িল; বলিল "আমায় ক্ষমা কর! আমি ঐশ্বর্য্যের গৌরবে পাগল হইয়াছিলাম। আমি আজ শপথ করিয়া ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিলাম— তুমি যদি আমায় ক্ষমা কর, আমি আর দিল্লী ফিরিয়া যাইব না। বল তুমি জীবিত!"

মবারক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি জীবিত। একজন রাজপুত আমাকে কবর হইতে তুলিয়া চিকিৎসা করিয়া প্রাণদান দিয়াছিল, তাহারই সঙ্গে আমি এখানে আসিয়াছি।"

জেব-উন্নিসা পা ছাড়িল না। তাহার চক্ষুর জলে মবারকের পা ভিজিয়া গেল। মবারক তাহার হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল। কিন্তু জেব-উন্নিসা উঠিল না; বলিল, "আমায় দয়া কর, আমায় ক্ষমা কর।"

মবারক বলিল, "তোমায় ক্ষমা করিয়াছি। না করিলে, তোমার কাছে আসিতাম না।"

জেব-উন্নিসা বলিল, "যদি আসিয়াছ, যদি ক্ষমা করিয়াছ, তবে আমায় গ্রহণ কর। গ্রহণ করিয়া, ইচ্ছা হয় আমাকে সাপের মুখে সমর্পণ কর, না ইচ্ছা হয়, যাহা বল, তাহাই করিব। আমায় আর ত্যাগ করিও না। আমি তোমার নিকট শপথ করিতেছি যে, আর দিল্লী যাইতে চাহিব না; আলমগীর বাদশাহের রঙ্মহালে আর প্রবেশ করিব না। আমি শাহজাদা বিবাহ করিতে চাহি না। তোমার সঙ্গে যাইব।"

মবারক সব ভুলিয়া গেল—সর্পদংশনজ্বালা ভুলিয়া গেল—আপনার মরিবার ইচ্ছা ভুলিয়া গেল—দরিয়াকে ভুলিয়া গেল। জেব-উন্নিসার প্রীতিশূন্য অসহ্য বাক্য ভুলিয়া গেল। কেবল জেব-উন্নিসার অতুল রূপরাশি তাহার নয়নে লাগিয়া রহিল; জেব-উন্নিসার প্রেম-পরিপূর্ণ কাতরোক্তি তাহার কর্ণমধ্যে ভ্রমিতে লাগিল; শাহজাদীর দর্প চূর্ণিত দেখিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। তখন মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এখন এই গরিবকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত?"

জেব-উন্নিসা যুক্তকরে, সজলনয়নে বলিল, "এত ভাগ্য কি আমার হইবে?"

বাদশাহজাদী আর বাদশাহজাদী নহে, মানুষী মাত্র। মবারক বলিল, "তবে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে, আমার সঙ্গে আইস।"

আলো জ্বালিবার সামগ্রী তাঁহার সঙ্গে ছিল। মবারক আলো জ্বালিয়া ফানুসের ভিতর রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কথামত জেব-উন্নিসা বেশ ভূষা

করিলেন। তাহা সমাপন হইলে, মবারক তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া কক্ষের বাহিরে গেলেন। তথা প্রহরিণীগণ নিযুক্ত ছিল। তাহারা মবারকের ইঙ্গিতে দুই জনে মবারক ও জেব-উন্নিসার সঙ্গে চলিল। মবারক যাইতে যাইতে জেব-উন্নিসাকে বুঝাইলেন যে, রাজাবরোধ মধ্যে পুরুষের আসিবার উপায় নাই। বিশেষ মুসলমানের ত কথাই নাই। এই জন্য তিনি রাত্রিতে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাও মহারাণীর বিশেষ অনুগ্রহেই পারিয়াছেন, এবং তাই এই প্রহরিণীদিগের সাহায্য পাইয়াছেন। সিংহদ্বার পর্য্যন্ত তাঁহাদের হাঁটিয়া যাইতে হইবে। বাহিরে মবারকের ঘোড়া এবং জেব-উন্নিসার জন্য দোলা প্রস্তুত আছে।

প্রহরিণীদিগের সাহায্যে সিংহদ্বারের বাহির হইয়া, তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব যানে আরোহণ করিলেন। উদয়পুরেও দুই চারি জন মুসলমান সওদাগরী ইত্যাদি উপলক্ষে বাস করিত। তাহারা রাণার অনুমতি লইয়া নগরপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মবারক জেব-উন্নিসাকে সেই মস্‌জীদে লইয়া গেলেন। সেখানে একজন মোল্লা ও উকীল ও গোওয়া উপস্থিত ছিল। তাহাদের সাহায্যে মবারক ও জেব-উন্নিসার সরা মত পরিণয় সম্পাদিত হইল।

তখন মবারক বলিলেন, "এখন তোমাকে যেখান হইতে লইয়া আসিয়াছি, সেইখানে রাখিয়া আসিতে হইবে। কেন না, এখনও তুমি মহারাণার বন্দী। কিন্তু ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মুক্তি পাইবে।"

এই বলিয়া মবারক জেব-উন্নিসাকে পুনর্ব্বার তাঁহার শয্যাগৃহে রাখিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দগ্ধ বাদশাহের জলভিক্ষা

পর দিন পূর্ব্বাহ্নকালে চঞ্চলকুমারীর নিকট জেব-উন্নিসা বসিয়া প্রফুল্লবদনে কথোপকথনে প্রবৃত্ত। দুই দিনের রাত্রিজাগরণে শরীর ম্লান—দুশ্চিন্তার দীর্ঘকাল ভোগে বিশীর্ণ। যে জেব-উন্নিসা রত্নরাশি, পুষ্পরাশিতে মণ্ডিত হইয়া সীস্ মহলের দর্পণে দর্পণে আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া হাসিত, এ সে জেব-উন্নিসা নহে। যে জানিত যে, বাদশাহজাদীর জন্ম কেবল ভোগবিলাসের জন্য, এ সে বাদশাহজাদী নহে। জেব-উন্নিসা বুঝিয়াছে যে,

বাদশাহজাদীও নারী, বাদশাহজাদীর হৃদয়ও নারীর হৃদয় ; স্নেহশূন্য নারীহৃদয়, জলশূন্য নদী মাত্র—কেবল বালুকাময় অথবা জলশূন্য তড়াগের মত—কেবল পঙ্কময়।

জেব-উন্নিসা এক্ষণে অকপটে, গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, বিনীতভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট গত রাত্রির ঘটনা সকল বিবৃত করিতেছিলেন। চঞ্চলকুমারী সকলই জানিতেন। সকল বলিয়া, জেব-উন্নিসা যুক্তকরে চঞ্চলকুমারীকে বলিলেন, "মহারাণী! আমায় আর বন্দী রাখিয়া আপনার কি ফল? আমি যে আল্‌মগীর বাদশাহের কন্যা, তাহা আমি ভুলিয়াছি। আপনি তাঁহার কাছে পাঠাইলেও আমার আর যাইতে ইচ্ছা নাই। গেলেও বোধ করি, আমার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আপনার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার স্বদেশ তুর্কস্থানে চলিয়া যাই।"

শুনিয়া চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "এ সকল কথার উত্তর দিবার সাধ্য আমার নাই। কর্ত্তা মহারাণা স্বয়ং। তিনি আপনাকে আমার কাছে রাখিতে পাঠাইয়াছেন, আমি আপনাকে রাখিতেছি। তবে এই যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, ইহার জন্য মহারাণার সেনাপতি মাণিকলাল সিংহ দায়ী। আমি মাণিকলালের নিকট বিশেষ বাধিত, তাই তাঁহার কথায় এতটা করিয়াছি। কিন্তু ছাড়িয়া দিবার কোন উপদেশ পাই নাই। অতএব সে বিষয়ে কোন অঙ্গীকার করিতে পারিতেছি না।"

জেব-উন্নিসা বিষণ্ণভাবে বলিল, "মহারাণাকে আমার এ ভিক্ষা আপনি কি জানাইতে পারেন না? তাঁহার শিবির এমন অধিক দূরে ত নহে। কাল রাত্রে পর্ব্বতের উপর তাঁহার শিবিরের আলো দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "পাহাড় যত নিকট দেখায়, তত নিকট নয়। আমরা পাহাড়ে দেশে বাস করি, তাই জানি। আপনিও কাশ্মীর গিয়াছিলেন, এ কথা আপনার স্মরণ হইতে পারে। তা যাই হোক, লোক পাঠান কষ্টসাধ্য নহে। তবে, রাণা যে এ কথায় সম্মত হইবেন, এমন ভরসা করি না। যদি এমন সম্ভব হইত যে, উদয়পুরের ক্ষুদ্র সেনা মোগল রাজ্য এই এক যুদ্ধে একেবারে ধ্বংস করিতে পারিত, যদি বাদশাহের সঙ্গে আমাদের আর সন্ধিস্থাপনের সম্ভাবনা না থাকিত, তবে অবশ্য তিনি আপনাকে স্বামীর সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিতে পারিতেন। কিন্তু যখন সন্ধি অবশ্য একদিন না একদিন করিতে হইবে, তখন আপনাদিগকেও বাদশাহের নিকট অবশ্য ফেরৎ দিতে হইবে।"

জেব। তাহা হইলে, আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে পাঠাইবেন। এ বিবাহের কথা জানিতে পারিলে, বাদশাহ আমাকে বিষভোজন করাইবেন। আর আমার স্বামীর ত

কথাই নাই। তিনি আর কখনও দিল্লী যাইতে পারেন না। গেলে মৃত্যু নিশ্চিত। এ বিবাহে কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, মহারাণী ?

চঞ্চল। যাহাতে কোন উৎপাত না ঘটে, এমন উপায় করা যাইতে পারে, বোধ হয়।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে নির্ম্মলকুমারী সেখানে কিছু ব্যস্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মল, চঞ্চলকে প্রণাম করার পর, জেব-উন্নিসাকে অভিবাদন করিলেন। জেব-উন্নিসাও তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। তার পর চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিলেন, "নির্ম্মল, এত ব্যস্তভাবে কেন ?"

নির্ম্মল। বিশেষ সংবাদ আছে।

তখন জেব-উন্নিসা উঠিয়া গেলেন। চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধের সংবাদ না কি ?"

নির্ম্মল। আজ্ঞা হাঁ।

চঞ্চল। তা ত লোকপরম্পরায় শুনিয়াছি। ইন্দুর গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। মহারাণা গর্ত্তের মুখ বুজাইয়া দিয়াছেন। শুনিয়াছি, ইন্দুর না কি গর্ত্তের ভিতর মরিয়া পচিয়া থাকিবার মত হইয়াছে।

নি। তার পর, আর একটা কথা আছে। ইন্দুর বড় ক্ষুধার্ত্ত। আমার সেই পায়রাটি আজ ফিরিয়া আসিয়াছে। বাদশাহ ছাড়িয়া দিয়াছেন—তাহার পায়ে একখানি রোক্কা বাঁধিয়া দিয়াছেন।

চ। রোক্কা দেখিয়াছ ?

নি। দেখিয়াছি।

চ। কাহার বরাবর ?

নি। ইম্লি বেগম।

চ। কি লিখিয়াছে ?

নির্ম্মল পত্রখানি বাহির করিয়া কিয়দংশ এইরূপ পড়িয়া শুনাইলেন,—

"আমি তোমায় যেরূপ স্নেহ করিতাম, কোন মনুষ্যকে কখনও এমন স্নেহ করি নাই। তুমিও আমার অনুগত হইয়াছিলে। আজ পৃথিবীশ্বর দুর্দ্দশাপন্ন—লোকের মুখে শুনিয়া থাকিবে। অনাহারে মরিতেছি। দিল্লীর বাদশাহ আজ এক টুকরা রুটির ভিখারী। কোন উপকার করিতে পা'র না কি ? সাধ্য থাকে, করিও। এখনকার উপকার কখনও ভুলিব না।"

শুনিয়া চঞ্চলকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপকার করিবে ?"

নির্ম্মল বলিলেন, "তাহা বলিতে পারি না। আর কিছু না পারি, বাদশাহের জন্য আর যোধপুরী বেগমের জন্য কিছু খাদ্য পাঠাইয়া দিব।"

চ। কি রকমে? সেখানে ত মনুষ্য সমাগমের পথ নাই।

নি। তাহা এখন বলিতে পারি না। আমায় একবার শিবিরে যাইতে অনুমতি দিন। কি করিতে পারি, দেখিয়া আসি।

চঞ্চলকুমারী অনুমতি দিলেন। নির্ম্মলকুমারী গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, রক্ষিবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া, শিবিরে স্বামিসন্দর্শনে গেলেন। যাইবামাত্র মাণিকলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধের অভিপ্রায়ে না কি?"

নি। কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? তুমি কি আমার যুদ্ধের যোগ্য?

মাণিক। তা ত নই। কিন্তু আলমগীর বাদশাহ?

নি। আমি তাঁর ইম্‌লি বেগম—তাঁর সঙ্গে কি যুদ্ধের সম্বন্ধ? আমি তাঁর উদ্ধারের জন্য আসিয়াছি। আমি যাহা আজ্ঞা করি, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

তার পর মাণিকলালে ও নির্ম্মলকুমারীতে কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। অনেক কথা হইল, ইহাই জানি।

মাণিকলাল, নির্ম্মলকুমারীকে উদয়পুরে প্রতিপ্রেরণ করিযা, রাজসিংহের সাক্ষাৎকার-লাভের অভিপ্রায়ে রাণার তাম্বুতে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অগ্নিনির্ব্বাণের পরামর্শ

মহারাণার সাক্ষাৎ পাইয়া, প্রণাম করিয়া মাণিকলাল যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "যদি এ দাসকে অন্য কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান মহারাজের অভিপ্রায় হয়, তবে বড় অনুগৃহীত হইব।"

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, এখানে কি হইয়াছে?"

মাণিকলাল উত্তর করিল, "এখানে ত কোন কাজ নাই। কাজের মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত মোগলদিগের শুষ্ক মুখ দেখা ও আর্ত্তনাদ শুনা। তাহা কখনও কখনও পর্ব্বতের উপর গাছে চড়িয়া দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু সে কাজ, যে সে পারিবে। আমি ভাবিতেছি কি যে,

এতগুলা মানুষ, হাতী, ঘোড়া, উট, এই রন্ধ্রে পচিয়া মরিয়া থাকিবে,—দুর্গন্ধে উদয়পুরেও কেহ বাঁচিবে না—বড় মরক উপস্থিত হইবে।"

রাণা বলিলেন, "অতএব তোমার বিবেচনা এই, মোগল সেনাকে অনাহারে মারিয়া ফেলা অকর্ত্তব্য।"

মাণিক। বোধ হয়। যুদ্ধে লক্ষ জনকে মারিলেও দেখিয়া দুঃখ হয় না। বসিয়া বসিয়া অনাহারে একজন লোকও মরিলে দুঃখ হয়।

রাণা। তবে উহাদিগের সম্বন্ধে কি করা যায়?

মাণিক। মহারাজ! আমার এত বুদ্ধি নাই যে, আমি এমন বিষয়ে পরামর্শ দিই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সন্ধিস্থাপনের এই উত্তম সময়। জঠরাগ্নির দাহের সময়ে মোগল যেমন নরম হইবে, ভরা পেটে তেমন হইবে না। আমার বোধ হয়, রাজমন্ত্রিগণ ও সেনাপতিগণকে ডাকিয়া পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করা ভাল।

রাজসিংহ এ প্রস্তাবে সম্মত ও স্বীকৃত হইলেন। উপবাসে এত মানুষ মারাও তাঁহার ইচ্ছা নহে। হিন্দু, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন যোগান পরমধর্ম্ম বলিয়া জানে। অতএব হিন্দু, শত্রুকেও সহজে উপবাসে মারিতে চাহে না।

সন্ধ্যার পর শিবিরে রাজসভা সমবেত হইল। তথা প্রধান সেনাপতিগণ, প্রধান রাজমন্ত্রিগণ উপস্থিত হইলেন। রাজমন্ত্রিগণের মধ্যে প্রধান দয়াল সাহা। তিনিও উপস্থিত ছিলেন। মাণিকলালও ছিল।

রাজসিংহ বিচার্য্য বিষয়টা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া, সভাসদ্‌গণের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেকেই বলিলেন, "মোগল ঐখানে ক্ষুধা তৃষ্ণায় মরিয়া পচিয়া থাকুক—ঔরঙ্গজেবের বেটাকে ধরিয়া আনিয়া উহাদের গোর দেওয়াইব। না হয়, দোসাদের দল আনিয়া মাটি চাপা দেওয়াইব। মোগল হইতে বার বার রাজপুতের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে, কাহারও ইচ্ছা হইবে না যে, মোগলকে হাতে পাইয়া ছাড়া যায়।"

ইহার উত্তরে মহারাণা বলিলেন, "না হয় স্বীকার করিলাম যে, এই মোগলদিগকে এইখানে শুকাইয়া মারিয়া মাটি চাপা দেওয়া গেল। কিন্তু ঔরঙ্গজেব আর ঔরঙ্গজেবের উপস্থিত সৈন্যগণ মরিলেই মোগল নিঃশেষ হইল না। ঔরঙ্গজেব মরিলে শাহ আলম বাদশাহ হইবে। শাহ আলমের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যবিজয়ী মহাসৈন্য পর্ব্বতের অপর পারে সশস্ত্রে উপস্থিত আছে। আর দুইটা মোগলসেনা আর দুই দিকে বসিয়া আছে। আমরা কি এই সকলগুলিকে নিঃশেষ ধ্বংস করিতে পারিব? যদি না পারি, তবে অবশ্য একদিন

সন্ধিস্থাপন করিতে হইবে। যদি সন্ধি করিতে হয়, তবে এমন সুসময় আর কবে হইবে? এখন ঔরঙ্গজেবের প্রাণ কণ্ঠাগত—এখন তাহার কাছে যাহা চাহিব, তাহাই পাইব। সময়ান্তরে কি তেমন পাইব?"

দয়াল সাহা বলিলেন, "নাই পাইলাম। তবু এই মহাপাপিষ্ঠ পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ ঔরঙ্গজেবকে বধ করিলে পৃথিবীকে পুনরুদ্ধার করা হইবে। এমন পুণ্য আর কোন কার্য্যে নাই। মহারাজ মতান্তর করিবেন না।"

রাজসিংহ বলিলেন, "সকল মোগল বাদশাহই দেখিলাম—পৃথিবীর কণ্টক। ঔরঙ্গজেব শাহজাঁহার অপেক্ষাও কি নরাধম? খস্রু হইতে আমাদের যত অমঙ্গল ঘটিয়াছে, ঔরঙ্গজেব হইতে কি তত হইয়াছে? শাহ আলম যে পিতৃপিতামহ হইতেও দুরাচার না হইবে, তাহার স্থিরতা কি? আর তোমরা যদি এমন ভরসাই কর—সে ভরসা আমিও না করি, তা নয়—যে এই চারিটি মোগল সেনাই আমরা পরাজিত করিতে পারিব, তবে ভাবিয়া দেখ, কত অসংখ্য মনুষ্যহত্যার পর সে আশা ফলে পরিণত হইবে। কত অসংখ্য রাজপুত বিনষ্ট হইবে। অবশিষ্ট থাকিবে কয় জন? আমরা অল্পসংখ্যক; মুসলমান বহুসংখ্যক। আমরা সংখ্যায় কমিয়া গেলে, আবার যদি মোগল আসে, তবে কার বাহুবলে তাদের আবার তাড়াইব?"

দয়াল সাহা বলিল, "মহারাজ! সমস্ত রাজপুতানা একত্রিত হইলে মোগলকে সিন্ধু পার করিয়া রাখিয়া আসিতে কতক্ষণ লাগে?"

রাজসিংহ বলিলেন, "সে কথা সত্য। কিন্তু তাহা কখন হইয়াছে কি? এখনও ত সে চেষ্টা করিতেছি—ঘটিতেছে কি? তবে সে ভরসা কি প্রকারে করিব?"

দয়াল সাহা বলিলেন, "সন্ধি হইলেও ঔরঙ্গজেব সন্ধিরক্ষা করিবে, এমন ভরসা করি না। অমন মিথ্যাবাদী, ভণ্ড কখন জন্মগ্রহণ করে নাই। মুক্তি পাইলেই, সে সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, যা করিতেছিল, তাহাই করিবে।"

রাজসিংহ বলিলেন, "তা ভাবিলে কখনই সন্ধি করা হয় না। তাই কি মত?"

এইরূপ অনেক বিচার হইল। পরিশেষে সকলেই রাণার কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিলেন। সন্ধিস্থাপনের কথাই স্থির হইল।

তখন কেহ আপত্তি করিল, "ঔরঙ্গজেব ত কই, সন্ধির চেষ্টায় দূত পাঠান নাই। তাঁর গরজ, না আমাদের গরজ?"

তাহাতে রাজসিংহ উত্তর করিলেন, "দূত আসিবে কি প্রকারে? সে রন্ধ্রপথের ভিতর হইতে একটি পিপ্ড়া উপরে আসিবার পথ রাখি নাই।"

দয়াল সাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আমাদেরই বা দূত যাইবে কি প্রকারে? সে বার ঔরঙ্গজেব আমাদিগের দূতকে বধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছিল, এবার যে সে আজ্ঞা দিবে না, তার ঠিকানা কি?"

রাজসিংহ বলিলেন, "এবার যে বধ করিবে না, তাহা স্থির। কেন না, এখন কপট সন্ধিতেও তাহার মঙ্গল। তবে দূত সেখানে যাইবে কি প্রকারে, তাহার গোলযোগ আছে বটে।"

তখন মাণিকলাল নিবেদন করিল, "সে ভার আমার উপর অর্পিত হউক। আমি মহারাণার পত্র ঔরঙ্গজেবের নিকট পৌছাইয়া দিব, এবং উত্তর আনিয়া দিব।"

সকলেই সে কথায় বিশ্বাস করিল; কেন না, সকলেই জানিত, কৌশলে ও সাহসে মাণিকলাল অদ্বিতীয়। অতএব পত্র লিখিবার হুকুম হইল। দয়াল সাহা পত্র প্রস্তুত করাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে—বাদশাহ, সমস্ত সৈন্য মেবার হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইবেন। মেবারে গোহত্যা ও দেবালয়ভঙ্গ নিবারণ করিবেন, এবং জেজেয়ার কোন দাবি করিবেন না। তাহা হইলে রাজসিংহ পথ মুক্ত করিয়া দিবেন, নিরুদ্বেগে বাদশাহকে যাইতে দিবেন।

পত্র সভাসদ্ সকলকে শুনান হইল। শুনিয়া মাণিকলাল বলিল, "বাদশাহের স্ত্রী কন্যা আমাদিগের নিকট বন্দী আছে। তাহারা থাকিবে?"

বলিবামাত্র সভামধ্যে একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। সকলে একবাক্যে বলিল, "ছাড়া হইবে না।" কেহ বলিল, "থাক্। উহারা মহারাণার আঙ্গিনা ঝাঁটাইবে।" কেহ বলিল, "উহাদের ঢাকায় পাঠাইয়া দাও। হিন্দু হইয়া, বৈষ্ণবী সাজিয়া, হরিনাম করিবে।" কেহ বলিল, "উহাদের মূল্যস্বরূপ এক এক ক্রোর টাকা বাদশাহ দিবেন।" ইত্যাদি নানা প্রকার প্রস্তাব হইল। মহারাণা বলিলেন, "দুইটা মুসলমান বাঁদীর জন্য সন্ধি ত্যাগ করা হইবে না। সে দুইটাকে ফিরাইয়া দিব, লিখিয়া দাও।"

সেইরূপ লেখা হইল। পত্রখানি মাণিকলালের জেম্মা হইল। তখন সভাভঙ্গ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

অগ্নিতে জলসেক

সভাভঙ্গ হইল, তবু মাণিকলাল গেল না। সকলেই চলিয়া গেল, মাণিকলাল গোপনে মহারাণাকে জানাইল, "মবারকের বখ্‌শিসের কথাটা এই সময়ে মহারাজকে স্মরণ করিয়া দিতে হয়।"

রাজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি চায়?"

মাণিক। বাদশাহের যে কন্যা আমাদিগের কাছে বন্দী আছে, তাহাকেই চায়।

রাজসিংহ। তাহাকে যদি বাদশাহের নিকট ফেরৎ না পাঠাই, তবে বোধ করি, সন্ধি হইবে না। আর স্ত্রীলোকের উপর কি প্রকারে আমি পীড়ন করিব?

মাণিক। পীড়ন করিতে হইবে না। শাহজাদীর সঙ্গে মবারকের গত রাত্রে সাদী হইয়াছে।

রাজসিংহ। সেই কথা শাহজাদী বাদশাহকে বলিলেই বোধ হয়, সব গোল মিটিবে।

মাণিক। এক রকম—কেন না, দুই জনের মাথা কাটা যাইবে।

রাজসিংহ। কেন?

মাণিক। শাহজাদীদের শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ নাই। এই শাহজাদী একজন ক্ষুদ্র সৈনিককে বিবাহ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের কুলের কলঙ্ক করিয়াছে। বিশেষ বাদশাহকে না জানাইয়া এ বিবাহ করিয়াছে, এজন্য তাহাকে দিল্লীর রঙ্‌মহালের প্রথানুসারে বিষ খাইতে হইবে। আর মবারক সাপের বিষে যখন মরেন নাই, তখন তাঁহাকে হাতীর পায়ে, কি শূলে যাইতে হইবে। যদি সে অপরাধও মার্জ্জনা হয়, তবে তিনি মহারাজের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য বাদশাহের কাছে শূলে যাইবার যোগ্য। জানিতে পারিলে বাদশাহ তাঁহাকে শূলে দিবে। তাহা ছাড়া তিনি বিনানুমতিতে শাহজাদী বিবাহ করিয়াছেন, সে জন্যও শূলে যাইতে বাধ্য।

রাজসিংহ। আমি ইহার কিছু প্রতিকার করিতে পারি কি?

মাণিক। ঔরঙ্গজেব, কন্যা জামাতাকে মার্জ্জনা না করিলে আপনি সন্ধি করিবেন না, এই নিয়ম করিতে পারেন।

রাজসিংহ বলিলেন, "তাহা আমি করিতে স্বীকৃত হইতেছি। উহাদের জন্য আমি একখানি পৃথক্ পত্র বাদশাহকে লিখিতেছি। তাহাও তুমি ঐ সঙ্গে লইয়া যাও। ঔরঙ্গজেব

কন্যাকে মার্জ্জনা করিতে পারেন। কিন্তু মবারককে মার্জ্জনা করিতে তিনি আপাততঃ স্বীকৃত হইলেও, তাহাকে যে, তিনি নিষ্কৃতি দিবেন, এমন আমার ভরসা হয় না। যাই হউক, মবারক যদি ইহাতে সন্তুষ্ট হয়, তবে আমি ইহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

এই বলিয়া রাজসিংহ একখানি পৃথক্ পত্র স্বহস্তে লিখিয়া মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল পত্র দুইখানি লইয়া সেই রাত্রিতে উদয়পুর চলিল।

উদয়পুরে গিয়া মাণিকলাল প্রথম নির্ম্মলকুমারীকে এই সকল সংবাদ দিলেন। নির্ম্মল সন্তুষ্ট হইল। সেও একখানি পত্র বাদশাহকে এই মর্ম্মে লিখিল—

"শাহান্‌শাহ!

বাঁদীর অসংখ্য কুর্ণিশ। হজুর যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, বাঁদী তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। এক্ষণে হজুরের সম্মতি পাইলেই হয়। আমার শেষ ভিক্ষাটা স্মরণ রাখিবেন। সন্ধি করিবেন।"

সে পত্রও নির্ম্মল মাণিকলালকে দিল। তার পর নির্ম্মল, জেব-উন্নিসাকে সকল কথা জানাইল, তিনিও তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। এ দিকে মাণিকলাল মবারককে সকল কথা জানাইলেন। মবারক কিছু বলিল না। মাণিকলাল তাহাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিল, "সাহেব! বাদশাহের নিকট ফিরিয়া গেলে, তিনি যে আপনাকে যথার্থ মার্জ্জনা করিবেন, এমন ভরসা আমি করি না।"

মবারক বলিল, "নাই করুন।"

পরদিন প্রাতে মাণিকলাল, নির্ম্মলকুমারীর পায়রা চাহিয়া লইয়া গিয়া, পত্রগুলি কাটিয়া ছোট করিয়া তাহার পায়ে বাঁধিয়া দিল। পায়রা ছাড়িয়া দিবামাত্র সে আকাশে উঠিল। পায়ের ভরে বড় পীড়িত। তথাপি কোন মতে উড়িয়া যেখানে ঔরঙ্গজেব, উর্দ্ধমুখে আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সেইখানে বাদশাহের কাছে পত্র পৌঁছাইয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ

অগ্নিনির্ব্বাণকালে উদিপুরী ভস্ম

কপোত শীঘ্রই ঔরঙ্গজেবের উত্তর লইয়া আসিল। রাজসিংহ যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব সকলেতেই সম্মত হইলেন। কেবল একটা গোলযোগ করিলেন, লিখিলেন, "চঞ্চলকুমারীকে দিতে হইবে।" রাজসিংহ বলিলেন, "তদপেক্ষা আপনাকে ঐখানে সসৈন্যে

কবর দেওয়া আমার মনোমত।" কাজেই ঔরঙ্গজেবকে সে বাহনা ছাড়িতে হইল। তিনি সন্ধিতে সম্মত হইয়া মুন্শীর দ্বারা সেই মর্ম্মে সন্ধিপত্র লেখাইয়া আপনার পাঞ্জা অঙ্কিত করিয়া, স্বহস্তে তাহাতে "মঞ্জুর" লিখিয়া দিলেন। জেব-উন্নিসা ও মবারক সম্বন্ধে একখানি পৃথক্ পত্রে তাঁহাদিগকে মার্জ্জনা করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু একটি সর্ত এই করিলেন যে, এ বিবাহের কথা কাহারও সাক্ষাতে কখন প্রকাশ করিবে না। সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিলেন যে, কন্যা যাহাতে স্বামিসন্দর্শনে বঞ্চিত না হয়েন, সে উপায়ও বাদশাহ করিবেন।

রাজসিংহ সন্ধিপত্র পাইয়া, মোগল সেনা মুক্তি দিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। রাজপুতেরা হাতী লাগাইয়া গাছ সকল টানিয়া বাহির করিল। মোগলেরা হঠাৎ আহার্য্য কোথায় পাইবে, এই জন্য রাজসিংহ দয়া করিয়া, বহুতর হাতীর পিঠে বোঝাই দিয়া, অনেক আহার্য্য বস্তু উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। এবং শেষে উদিপুরী, জেব-উন্নিসা ও মবারককে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য উদয়পুরে আদেশ পাঠাইলেন। তখন নির্ম্মল, চঞ্চলকে ইঙ্গিত করিয়া, কাণে কাণে বলিল, "বেগম তোমার দাসীপনা করিল কৈ?" এই বলিয়া নির্ম্মল, উদিপুরীকে বলিল, "আমি যে নিমন্ত্রণ করিতে দিল্লী গিয়াছিলাম, সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন না?"

উদিপুরী বলিল, "তোমার জিব আমি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিব। তোমাদের সাধ্য কি যে, আমাকে দিয়া তামাকু সাজাও? তোমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের সাধ্য কি যে, বাদশাহের বেগম আটক রাখ? কেমন, এখন ছাড়িতে হইল ত? কিন্তু যে অপমান করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিব। উদয়পুরের চিহ্ন মাত্র রাখিব না।"

তখন চঞ্চলকুমারী স্থিরভাবে বলিলেন, "শুনিয়াছি, মহারাণা বাদশাহকে দয়া করিয়া তোমাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন। আপনি তাঁহার জন্য একটা মিষ্ট কথাও বলিতে জানেন না। অতএব আপনাকে ছাড়া হইবে না। আপনি বাঁদী মহলে গিয়া আমার জন্য তামাকু প্রস্তুত করিয়া আনুন।"

জেব-উন্নিসা বলিল, "সে কি মহারাণী! আপনি এত নির্দ্দয়?"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "আপনি যাইতে পারেন—কেহ বিঘ্ন করিবে না। ইহাকে আমি এক্ষণে যাইতে দিতেছি না।"

জেব-উন্নিসা অনেক অনুনয় করিল, শেষ উদিপুরীও কিছু বিনীত ভাব অবলম্বন করিল। কিন্তু চঞ্চলকুমারী বড় শক্ত। দয়া করিয়া কেবল এইটুকু বলিলেন, "আমার জন্য একবার তামাকু প্রস্তুত করুক, তবে যাইতে পারিবে।"

তখন উদিপুরী বলিল, "তামাকু প্রস্তুত করিতে আমি জানি না।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "বাঁদীরা দেখাইয়া দিবে।"

অগত্যা উদিপুরী স্বীকৃত হইল। বাঁদীরা দেখাইয়া দিল। উদিপুরী চঞ্চলকুমারীর জন্য তামাকু সাজিল।

তখন চঞ্চলকুমারী সেলাম করিয়া তাহাদের বিদায় করিলেন। বলিলেন, "এখানে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমস্তই আপনি বাদশাহকে জানাইবেন, এবং তাঁহারে স্মরণ করিয়া দিবেন যে, আমিই তস্বীরে নাথি মারিয়া নাক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম। আরও বলিবেন, পুনশ্চ যদি তিনি কোন হিন্দুবালার অপমানের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি কেবল তস্বীরে পদাঘাত করিয়া সন্তুষ্ট হইব না।"

তখন উদিপুরী নিদাঘের মেঘের মত সজলকান্তি হইয়া বিদায় হইল।

মহিষী, কন্যা ও খাদ্য পাইয়া, ঔরঙ্গজেব বেত্রাহত কুক্কুরের মত বদনে লাঙ্গুল নিহিত করিয়া রাজসিংহের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অগ্নিকাণ্ডে তৃষিতা চাতকী

বেগমদিগকে বিদায় দিয়া চঞ্চলকুমারী আবার অন্ধকার দেখিল। মোগল ত পরাভূত হইল, বাদশাহের বেগম তাঁহার পরিচর্য্যা করিল, কিন্তু কৈ, রাণা ত কিছু বলেন না। চঞ্চলকুমারী কাঁদিতেছে দেখিয়া নির্ম্মল আসিয়া কাছে বসিল। মনের কথা বুঝিল। নির্ম্মল বলিল, "মহারাণাকে কেন কথাটা স্মরণ করিয়া দাও না?"

চঞ্চল বলিল, "তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? স্ত্রীলোক হইয়া বার বার এই কথা কি বলা যায়?"

নির্ম্মল। তবে রূপনগরে, তোমার পিতাকে কেন আসিতে লেখ না?

চঞ্চল। কেন? সেই পত্রের উত্তরের পর আবার পত্র লিখিব?

নির্ম্মল। বাপের উপর রাগ অভিমান কি?

চঞ্চল। রাগ অভিমান নয়। কিন্তু একবার লিখিয়া—সে আমারই লেখা—যে অভিসম্পাত প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা মনে হইলে এখনও বুক কাঁপে, আর কি লিখিতে সাহস হয়?

নির্ম্মল। সে ত বিবাহের জন্য লিখিয়াছিলে?

চঞ্চল। এবার কিসের জন্য লিখিব?

নির্ম্মল। যদি মহারাণা কোন কথা না পাড়িলেন—তবে বোধ করি, পিত্রালয়ে গিয়া বাস করাই ভাল,—ঔরঙ্গজেব এ দিকে আর ঘেঁষিবে না। সেই জন্য পত্র লিখিতে বলিতেছিলাম। পিত্রালয় ভিন্ন আর উপায় কি?

চঞ্চল কি উত্তর করিতে যাইতেছিল। উত্তর মুখ দিয়া বাহির হইল না—চঞ্চল কাঁদিয়া ফেলিল। নির্ম্মলও কথাটা বলিয়াই অপ্রতিভ হইয়াছিল।

চঞ্চল, চক্ষুর জল মুছিয়া, লজ্জায় একটু হাসিল। নির্ম্মলও হাসিল। তখন নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, "আমি দিল্লীর বাদশাহের কাছে কখন অপ্রতিভ হই নাই—তোমার কাছে অপ্রতিভ হইলাম—ইহা দিল্লীর বাদশাহের পক্ষে বড় লজ্জার কথা। ইম্‌লি বেগমেরও কিছু লজ্জার কথা। তা, তুমি একবার ইম্‌লি বেগমের মুন্‌শীআনা দেখ। দোওয়াত কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ কর—আমি বলিয়া যাইতেছি।"

চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে লিখিব—মাকে, না বাপকে?"

নির্ম্মল বলিল, "বাপকে।"

চঞ্চল পাঠ লিখিলে, নির্ম্মল বলিয়া যাইতে লাগিল, "এখন মোগল বাদশাহ মহারাণার হস্তে"—

"বাদশাহ" পর্য্যন্ত লিখিয়া চঞ্চলকুমারী বলিল, "মহারাণার হস্তে" লিখিব না—"রাজপুতের হস্তে লিখিব।" নির্ম্মলকুমারী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তা লেখ।" তার পর নির্ম্মলের কথন মতে চঞ্চল লিখিতে লাগিল—

"হস্তে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া রাজপুতানা হইতে তাড়িত হইয়াছেন। এক্ষণে আর তিনি আমাদিগের উপর বলপ্রকাশ করিবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনার সন্তানের প্রতি আপনার কি আজ্ঞা? আমি আপনারই অধীন—"

পরে নির্ম্মল বলিল, "মহারাণার অধীন নই।"

চঞ্চল বলিল, "দূর হ পাপিষ্ঠা।" সে কথা লিখিল না। নির্ম্মল বলিল, "তবে লেখ, 'আর কাহারও অধীন নই'।" অগত্যা চঞ্চল তাহাই লিখিল।

এইরূপ পত্র লিখিত হইলে, নির্ম্মল বলিল, "এখন রূপনগর পাঠাইয়া দাও।" পত্র রূপনগরে প্রেরিত হইল। উত্তরে রূপনগরের রাও লিখিলেন, "আমি দুই হাজার ফৌজ লইয়া উদয়পুর যাইতেছি। ঘাট খুলিয়া রাখিতে রাণাকে বলিবে।"

এই আশ্চর্য্য উত্তরের অর্থ কি, তাহা চঞ্চল ও নির্ম্মল কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পরিশেষে তাহারা বিচারে স্থির করিল যে, যখন ফৌজের কথা আছে, তখন রাণাকে অবগত করা আবশ্যক। নির্ম্মলকুমারী মাণিকলালের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

রাণাও সেইরূপ গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। চঞ্চলকুমারীকে ভুলেন নাই। তিনি বিক্রম সোলাঙ্কীকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের মর্ম্ম, চঞ্চলকুমারীর বিবাহের কথা। বিক্রম সিংহ কন্যাকে শাপ দিয়াছিলেন, রাণা তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। আর তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন রাজসিংহকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবেন, তখন তাঁহাকে আশীর্ব্বাদের সহিত কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তাহাও স্মরণ করাইলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আপনার কিরূপ অভিপ্রায় ?"

এই পত্রের উত্তরে বিক্রম সিংহ লিখিলেন, "আমি দুই হাজার অশ্বারোহী লইয়া আপনার নিকট যাইতেছি। ঘাট ছাড়িয়া দিবেন।"

রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারীর মত, সমস্যা বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, "দুই হাজার মাত্র অশ্বারোহী লইয়া বিক্রম আমার কি করিবে ? আমি সতর্ক আছি।" অতএব তিনি বিক্রমকে ঘাট ছাড়িয়া দিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অগ্নি পুনর্জ্বালিত

উদয়সাগরের তীরে ফিরিয়া আসিয়া, ঔরঙ্গজেব তথায় শিবির স্থাপন ও রাত্রি যাপন করিলেন। সৈনিক ও বাহনগণ খাইয়া বাঁচিল। তখন সিপাহী মহালে গান গল্প এবং নানাবিধ রসিকতা আরম্ভ হইল। একজন মোগল বলিল, "হিন্দুর রাজ্যে আসিয়াছি বলিয়া আমরা একাদশীর উপবাস করিয়াছিলাম।" শুনিয়া একজন মোগলানী বলিল, "বাঁচিয়া আছ, তবু ভাল। আমরা মনে করিয়াছিলাম, তোমরা নাই—তাই আমরাও একাদশী করিয়াছিলাম।" একজন গায়িকা কতকগুলি সৌকীন মোগলদিগের সম্মুখে গীত করিতেছিল ; গায়িতে গায়িতে তাহার তাল কাটিয়া গেল। একজন শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিল, "বিবিজান! এ কি হইল ? তাল কাটিল যে ?" গায়িকা বলিল, "আপনাদের যে বীরপনা দেখিলাম," তাহাতে আর হিন্দুস্থানে থাকিতে সাহস হয় না। উড়িষ্যায় যাইব মনে করিয়াছি—তাই তাল কাটিতে শিখিতেছি।" কেহ বা উদিপুরীর হরণবৃত্তান্ত লইয়া

দুঃখ করিতে লাগিল—কোন খয়েরখাঁ হিন্দুসৈনিক রাবণকৃত সীতাহরণের সহিত তাহার তুলনা করিল—কেহ তাহার উত্তরে বলিল, "বাদশাহ এত বানর সঙ্গে আনিয়াছিল, তবু এ সীতার উদ্ধার হইল না কেন?" কেহ বলিল, "আমরা শিপাহী—কাঠুরিয়া নহি, গাছ কাটা বিদ্যা আমাদের নাই, তাই হারিলাম।" কেহ উত্তরে বলিল, "তোমাদের ধানকাটা পর্য্যন্ত বিদ্যা, তা গাছ কাটিবে কি?" এইরূপ রঙ্গ রহস্য চলিতে লাগিল।

এ দিকে বাদশাহ শিবিরের রঙ্মহালে প্রবেশ করিলে জেব-উন্নিসা তাহার নিকট যুক্তকরে দাঁড়াইল। বাদশাহ জেব-উন্নিসাকে বলিলেন, "তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক কর নাই, বুঝিতে পারিতেছি। এজন্য তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম। কিন্তু সাবধান! বিবাহের কথা প্রকাশ না পায়।"

তার পর উদিপুরী বেগমের সঙ্গে বাদশাহ সাক্ষাৎ করিলেন। উদিপুরী তাহার অপমানের কথা আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিল। দশটা বাড়াইয়া বলিল, ইহা বলা বাহুল্য। ঔরঙ্গজেব শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ হইলেন।

পরদিন দরবারে বসিয়া, আম দরবার খুলিবার আগে, নিভৃতে মবারককে ডাকিয়া বাদশাহ বলিলেন, "এক্ষণে তোমার সকল অপরাধ আমি মার্জ্জনা করিলাম। কেন না, তুমি আমার জামাতা। আমার জামাতাকে নীচ পদে নিযুক্ত রাখিতে পারি না। অতএব তোমাকে দুই হাজারের মন্‌সব্‌দার করিলাম। পরওয়ানা আজি বাহির হইবে। কিন্তু এক্ষণে তোমার এখানে থাকা হইতে পারিতেছে না। কারণ, শাহজাদা আক্‌ব্বর, পর্ব্বত মধ্যে আমার ন্যায় জালে পড়িয়াছেন। তাঁর উদ্ধারের জন্য দিলীর খাঁ সেনা লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। সেখানে তোমার ন্যায় যোদ্ধার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। তুমি অদ্যই যাত্রা কর।"

মবারক এ সকল কথায় আহ্লাদিত হইলেন না; কেন না, জানিতেন, ঔরঙ্গজেবের আদর শুভকর নহে। কিন্তু মনে যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দুঃখিতও হইলেন না। অতি বিনীতভাবে বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া দিলীর খাঁর শিবিরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তার পর ঔরঙ্গজেব একজন বিশ্বাসী দূতের দ্বারা দিলীর খাঁর নিকট এক লিপি প্রেরণ করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, মবারক খাঁকে দুইহাজারি মন্‌সব্‌দার করিয়া তোমার নিকট পাঠাইয়াছি। সে যেন একদিনও জীবিত না থাকে। যুদ্ধে মরে ভালই,—নহিলে অন্য প্রকারে যেন মরে।

দিলীর মবারককে চিনিতেন না। বাদশাহের আজ্ঞা অবশ্যপালনীয় বলিয়া স্থির করিলেন।

তার পর ঔরঙ্গজেব আমদরবারে বসিয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "আমরা কাঠুরিয়ার ফাঁদে পড়িয়াই সন্ধিস্থাপন করিয়াছি। সে সন্ধি রক্ষণীয় নহে। ক্ষুদ্র একজন ভুঁইয়া রাজার সঙ্গে বাদশাহের আবার সন্ধি কি? আমি সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। বিশেষ, সে রূপনগরের কুঙারীকে ফেরৎ পাঠায় নাই। রূপনগরীকে তাহার পিতা আমাকে দিয়াছে। অতএব রাজসিংহের তাহাতে অধিকার নাই। তাহাকে ফিরাইয়া না দিলে, আমি রাজসিংহকে ক্ষমা করিতে পারি না। অতএব যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিবে। রাণার রাজ্যমধ্যে গোরু দেখিলে, মুসলমান তাহা মারিয়া ফেলিবে। দেবালয় দেখিলেই তাহা ভগ্ন করিবে। জেজেয়া সর্ব্বত্রই আদায় হইবে।"

এই সকল হুকুম জারি হইল। এদিকে দিলীর খাঁ দাইসুরীর পথ দিয়া, মাড়বার হইতে উদয়পুরে প্রবেশের চেষ্টায় আসিতেছেন, শুনিয়া রাজসিংহ, ঔরঙ্গজেবের কাছে লোক পাঠাইলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সন্ধির পর আবার যুদ্ধ কেন? ঔরঙ্গজেব বলিলেন, "ভুঁইয়ার সঙ্গে বাদশাহের সন্ধি? বাদশাহের রূপনগরী বেগম ফেরৎ না পাঠাইলে বাদশাহ তোমাকে ক্ষমা করিবেন না।" শুনিয়া, রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "আমি এখনও জীবিত আছি।" রূপনগরের রাজকুমারীর অপহরণটা ঔরঙ্গজেবের শেল সমান বিঁধিতেছিল। তিনি রাজসিংহের নিকট অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া, রূপনগরের "রাও সাহেবকে" এক পর্‌ওয়ানা দিলেন, তাহাতে লিখিলেন, "তোমার কন্যা এখনও আমার নিকট উপস্থিত হয় নাই। শীঘ্র তাহাকে উপস্থিত করিবে—নহিলে রূপনগরের গড়ের চিহ্ন রাখিব না।" ঔরঙ্গজেবের ভরসা যে, পিতা জিদ্ করিলে চঞ্চলকুমারী তাঁহার নিকটে আসিতে সম্মত হইতে পারে। পর্‌ওয়ানা পাইয়া বিক্রম সিংহ উত্তর লিখিল, "আমি শীঘ্র দুই হাজার অশ্বারোহী সেনা লইয়া আপনার হজুরে হাজির হইব।"

ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন, "সেনা কেন?" মনকে এইরূপ বুঝাইলেন যে, তাঁহার সাহায্যার্থ বিক্রমসিংহ সেনা লইয়া আসিতেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মবারকের দাহনারম্ভ

সৌন্দর্য্যের কি মহিমা! মবারক জেব-উন্নিসাকে দেখিয়া আবার সব ভুলিয়া গেল। গর্ব্বিতা, স্নেহাভাবদর্পে প্রফুল্লা জেব-উন্নিসাকে দেখিলে আর তেমন হইত কি না, বলা যায় না, কিন্তু সেই জেব-উন্নিসা এখন বিনীতা, দর্পশূন্যা, স্নেহশালিনী, অশ্রুময়ী। মবারকের পূর্ব্বানুরাগ সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিল। দরিয়া, দরিয়ায় ভাসিয়া গেল। মনুষ্য স্ত্রীজাতির প্রেমে অন্ধ হইলে, আর তাহার হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না। তাহার মত বিশ্বাস-ঘাতক, পাপিষ্ঠ আর নাই।

সহস্র দীপের রশ্মিপ্রতিবিম্বসমন্বিত, উদয়সাগরের অন্ধকার জলেব চতুঃপার্শ্বে পর্ব্বত-মালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, পটমণ্ডপের দুর্গমধ্যে ইন্দ্রভবন তুল্য কক্ষে বসিয়া মবারক জেব-উন্নিসার হাত, আপন হাতের ভিতর তুলিয়া লইল। মবারক বড় দুঃখেব সহিত বলিল, "তোমাকে আবার পাইয়াছি, কিন্তু দুঃখ এই যে, এই সুখ দশ দিন ভোগ করিতে পারিলাম না।"

জেব-উন্নিসা। কেন? কে বাধা দিবে? বাদশাহ?

মবারক। সে সন্দেহও আছে। কিন্তু বাদশাহের কথা এখন বলিতেছি না। আমি কাল যুদ্ধে যাইব। যুদ্ধে মরণ জীবন দুই আছে। কিন্তু আমার পক্ষে মরণ নিশ্চয়। আমি রাজপুতদিগের যুদ্ধের যে সুবন্দোবস্ত দেখিয়াছি, তাহাতে আমি নিশ্চিত জানি যে, পার্ব্বত্য যুদ্ধে আমরা তাহাদিগকে পরাভব করিতে পারিব না। আমি একবার হারিয়া আসিয়াছি, আর একবার হারিয়া আসিতে পারিব না। আমাকে যুদ্ধে মরিতে হইবে।

জেব-উন্নিসা সজল নয়নে বলিল, "ঈশ্বর অবশ্য করিবেন যে, তুমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিবে। তুমি আমার কাছে না আসিলে আমি মরিব।"

উভয়ে চক্ষুর জল ফেলিল। তখন মবারক ভাবিল, "মরিব, না মরিব না?" অনেক ভাবিল। সম্মুখে সেই নক্ষত্রখচিতগগনস্পর্শী পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত অন্ধকার উদয়সাগরের জল—তাহাতে দীপমালাপ্রভাসিত পট-নির্ম্মিতা মহানগরীর মনোমোহিনী ছায়া—দূরে পর্ব্বতের চূড়ার উপর চূড়া—তার উপর চূড়া—বড় অন্ধকার। দুইজনে বড় অন্ধকারই দেখিল।

সহসা জেব-উন্নিসা বলিল, "এই অন্ধকারে, শিবিরের পাঁচিরের তলায়, কে লুকাইল ? তোমার জন্য আমার মন সর্ব্বদা সশঙ্কিত।"

"দেখিয়া আসি," বলিয়া মবারক ছুটিয়া দুর্গপ্রাকারতলে গেলেন। দেখিলেন, একজন যথার্থই লুকাইয়া শুইয়া আছে বটে। মবারক তাহাকে ধৃত করিলেন। হাত ধরিয়া তুলিলেন। যে লুকাইয়াছিল, সে দাঁড়াইয়া উঠিল। অন্ধকারে মবারক কিছু ঠাওর পাইলেন না। তাহাকে টানিয়া দুর্গমধ্যে দীপালোকের নিকট আনিলেন। দেখিলেন যে, একটা স্ত্রীলোক। সে মুখে কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া রহিল—মুখ খুলিল না। মবারক তাহাকে একজন প্রতিহারীর জিম্মায় রাখিয়া, স্বয়ং জেব-উন্নিসার নিকট গিয়া সবিস্তার নিবেদন করিলেন। জেব-উন্নিসা কৌতূহলবশতঃ তাহাকে কক্ষমধ্যে আনিতে অনুমতি দিলেন। মবারক তাহাকে কক্ষমধ্যে লইয়া আসিলেন।

জেব-উন্নিসা বলিল, "তুমি কে ? কেন লুকাইয়াছিলে ? মুখের কাপড় খোল।"

সে স্ত্রীলোক তখন মুখের কাপড় খুলিল। দুই জনে সবিস্ময়ে দেখিল—দরিয়া বিবি!

বড় সুখের সময়ে, সহসা বিনা মেঘে সম্মুখে বজ্রপতন দেখিলে, যেমন বিহ্বল হইতে হয়, জেব-উন্নিসা ও মবারক সেইরূপ হইল। তিন জনের কেহ কোন কথা কহিল না।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মবারক বলিল, "ইয়া আল্লা! আমাকে মরিতেই হইবে।"

জেব-উন্নিসা তখন অতি কাতর কণ্ঠে বলিল, "তবে আমাকেও।"

দরিয়া বলিল, "তোমরা কে ?"

মবারক তাহাকে বলিল, "আমার সঙ্গে আইস।"

তখন মবারক অতি দীন ভাবে জেব-উন্নিসার নিকট বিদায় লইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অগ্নির নূতন স্ফুলিঙ্গ

রাজসিংহ রাজনীতিতে ও যুদ্ধনীতিতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। মোগল যতক্ষণ না সমস্ত সৈন্য লইয়া রাণার রাজ্য ছাড়িয়া অধিক দূর যায়, ততক্ষণ শিবির ভঙ্গ করেন নাই বা স্বীয় সেনার কোন অংশ স্থানবিচ্যুত করেন নাই। তিনি শিবিরেই রহিয়াছেন, এমন সময়ে

সংবাদ আসিল যে, বিক্রম সিংহ রূপনগর হইতে দুই সহস্র সেনা লইয়া আসিতেছেন। রাজসিংহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

একজন অশ্বারোহী অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিয়া দূতস্বরূপ, রাজসিংহের দর্শন পাইবার কামনা জানাইল। রাজসিংহের অনুমতি পাইয়া প্রতিহারী তাহাকে লইয়া আসিল। সে রাজসিংহকে প্রণাম করিয়া জানাইল যে, রূপনগরাধিপতি বিক্রম সোলাঙ্কি মহারাণার দর্শন-মানসে সসৈন্যে আসিয়াছেন।

রাজসিংহ বলিলেন, "যদি শিবিরের ভিতরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তবে একা আসিতে বলিবে। যদি সসৈন্যে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তবে শিবিরের বাহিরে থাকিতে বলিবে। আমি সসৈন্যে যাইতেছি।"

বিক্রম সোলাঙ্কি, একা শিবিরমধ্যে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। তিনি আসিলে রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরে আসন প্রদান করিলেন। বিক্রম সিংহ, রাণাকে কিছু নজর দিলেন। উদয়পুরের রাণা রাজপুতকুলের প্রধান,—এজন্য এ নজর প্রাপ্য। কিন্তু রাজসিংহ ঐ নজর না গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আপনার কাছে এ নজর, মোগল বাদশাহেরই প্রাপ্য।"

বিক্রমসিংহ বলিল, "মহারাণা রাজসিংহ জীবিত থাকিতে, ভরসা করি, আর কোন রাজপুত মোগল বাদশাহকে নজর দিবে না। মহারাজ! আমাকে মার্জ্জনা করিতে হইবে। আমি না জানিয়াই তেমন পত্রখানা লিখিয়াছিলাম। আপনি মোগলকে যেরূপ শাসিত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, সমস্ত রাজপুত মিলিত হইয়া আপনার অধীনে কার্য্য করিলে মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হইবে। আমার পত্রের শেষ ভাগ স্মরণ করিবেন। আমি আপনাকে কেবল নজর দিতে আসি নাই। আমি আরও দুইটি সামগ্রী আপনাকে দিতে আসিয়াছি। এক আমার এই দুই সহস্র অশ্বারোহী; দ্বিতীয় আমার নিজের এই তরবারি;—আজিও এ বাহুতে কিছু বল আছে; আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, শরীর পতন করিয়াও সে কার্য্য সম্পন্ন করিব।"

রাজসিংহ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন। আপনার আন্তরিক আনন্দ বিক্রমসিংহকে জানাইলেন। বলিলেন, "আজ আপনি সোলাঙ্কির মত কথা বলিয়াছেন। দুষ্ট মোগল, আমার হাতে নিপাত যাইতেছিল, সন্ধি করিয়া উদ্ধার পাইল। উদ্ধার পাইয়া বলে, সন্ধি করি নাই। আবার যুদ্ধ করিতেছে। দিলীর খাঁ সৈন্য লইয়া শাহজাদা আকব্বরের উদ্ধারের জন্য যাইতেছে। আপনি অতি সুসময়ে আসিয়াছেন। দিলীর খাঁকে পথিমধ্যে

নিকাশ করিতে হইবে—সে গিয়া আক্‌ব্বরের সঙ্গে যুক্ত হইলে কুমার জয়সিংহের বিপদ্ ঘটিবে। তজ্জন্য আমি গোপীনাথ রাঠোরকে পাঠাইতেছিলাম। কিন্তু তাঁহার সেনা অতি অল্প। আমার নিজ সেনা হইতে কিছু তাঁহার সঙ্গে দিব—মাণিকলাল সিংহ নামে আমার একজন সুদক্ষ সেনাপতি আছে—সে তাহা লইয়া যাইবে। কিন্তু ঔরঙ্গজেব নিকটে, আমি নিজে এ স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি না, অথবা অধিক সৈন্য মাণিকলালের সঙ্গে দিতে পারিতেছি না। আমার ইচ্ছা, আপনিও আপনার অশ্বারোহী সেনা লইয়া সেই যুদ্ধে যান। আপনারা তিন জনে মিলিত হইয়া দিলীর খাঁকে পথিমধ্যে সসৈন্যে সংহার করুন।"

বিক্রমসিংহ আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

এই বলিয়া বিক্রম সোলাঙ্কি যুদ্ধে যাইবার উদ্যোগার্থ বিদায় লইলেন। চঞ্চলকুমারীর কথা কিছু হইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মবারক ও দরিয়া ভস্মীভূত

গোপীনাথ রাঠোর, বিক্রম সোলাঙ্কি, এবং মাণিকলাল দিলীর খাঁর ধ্বংসাকাঙ্ক্ষায় চলিলেন। যে পথে দিলীর খাঁ আসিতেছেন, সেই পথে তিন স্থানে তিন জন লুক্কায়িত রহিলেন। কিন্তু পরস্পরের অনতিদূরেই রহিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আসিয়াছিলেন, কাজেই তিনি উচ্চ সানুদেশে থাকিতে পারিলেন না। তিনি পর্ব্বতবাসী হইলেও তাঁহাকে অশ্ব রাখিতে হইত; তাহার কারণ, তদ্ব্যতীত নিম্নভূমিনিবাসী শত্রু ও দস্যুর পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারিতেন না। আর এমন সকল ক্ষুদ্র রাজগণ, রাত্রিকালে সুযোগ পাইলে, নিজে নিজেও এক আধটা ডাকাতি—অর্থাৎ এক রাত্রিতে দশ পাঁচখানা গ্রাম লুণ্ঠন না করিতেন, এমন নহে। পর্ব্বতের উপর তাঁহার সৈনিকেরা অশ্ব ছাড়িয়া পদাতিকের কাজ করিত। এক্ষণে মোগলের পশ্চাদনুসরণ করিতে হইবে বলিয়া, বিক্রমসিংহ অশ্ব লইয়া আসিয়াছিলেন। পার্ব্বত্য যুদ্ধে তাহাতে অসুবিধা হইল। অতএব তিনি পর্ব্বতে না উঠিয়া অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমির অন্বেষণ করিলেন। মনোমত সেরূপ কিছু ভূমি পাইলেন। তাহার সম্মুখে কিছু বন জঙ্গল আছে। জঙ্গলের পশ্চাৎ তাঁহার অশ্বারোহিগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া রহিলেন। তৎপরে মাণিকলাল রাজসিংহের পদাতিকগণ লইয়া লুক্কায়িত হইল। সর্ব্বশেষে গোপীনাথ রাঠোর রহিলেন।

দিলীর খাঁ আক্‌ব্বরের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া, একটু সতর্ক ভাবে আসিতেছিলেন—অগ্রে অগ্রে অশ্বারোহী পাঠাইয়া সন্ধান লইতেছিলেন যে, রাজপুত কোথাও লুকাইয়া আছে কি না। অতএব বিক্রম সোলাঙ্কির অশ্বারোহিগণের সন্ধান, তাঁহাকে সহজে মিলিল। তিনি তখন কতকগুলি সৈন্য, অশ্বারোহীদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি অন্যান্য বিষয়ে বড় স্থূলবুদ্ধি, কিন্তু যুদ্ধকালে অতিশয় ধূর্ত্ত এবং রণপণ্ডিত—অনেক সময়ে ধূর্ত্ততাই রণপাণ্ডিত্য—তিনি মোগল সেনার সঙ্গে অতি সামান্য যুদ্ধ করিয়া সরিয়া পড়িলেন—দিলীর খাঁর মুণ্ডপাত করিবার জন্য।

দিলীর মাণিকলালকে অতিক্রম করিয়া চলিলেন। মাণিকলাল যে পার্শ্বে লুক্কায়িত আছে, তাহা তিনিও জানিতে পারিলেন না—মাণিকলালও কোন শব্দ সাড়া করিল না। সোলাঙ্কিকে তাড়াইয়া দিলীর বিবেচনা করিয়াছিলেন, সব রাজপুতই হঠিয়াছে—অতএব আর পূর্ব্ববৎ অবধানের সহিত চলিতেছিলেন না। মাণিকলাল বুঝিল, এ উপযুক্ত সময় নহে—সেও স্থির রহিল।

পরে, যথায় গোপীনাথ রাঠোর লুক্কায়িত, তাহারই নিকট দিলীর উপস্থিত। সেখানে পর্ব্বতমধ্যস্থ পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। সেইখানে সেনার মুখ উপস্থিত হইলে, গোপীনাথ রাঠোর লাফ দিয়া তাহার উপর পড়িয়া, বাঘ যেমন পথিকের সম্মুখে থাবা পাতিয়া বসে, সেইরূপ সসৈন্যে বসিলেন।

দিলীর, মবারককে আজ্ঞা করিলেন, "সম্মুখবর্ত্তী সেনা লইয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দাও।" মবারক অগ্রসর হইলেন। কিন্তু গোপীনাথ রাঠোরকে তাড়াইবার ভার সাধ্য কি? সঙ্কীর্ণ পথে অল্প মোগলই দাঁড়াইতে পারিল। যেমন গর্ত্ত হইতে পিপীলিকা বাহির হইবার সময়ে, বালকে একটি একটি করিয়া টিপিয়া মারে, তেমনই রাজপুতেরা মোগলদিগকে সঙ্কীর্ণ পথে টিপিয়া মারিতে লাগিল। এ দিকে দিলীর, সম্মুখে পথ না পাইয়া, সেনা লইয়া নিশ্চল হইয়া মধ্যপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মাণিকলাল বুঝিল, এই উপযুক্ত সময়। সে সসৈন্য পর্ব্বতাবতরণ করিয়া বজ্রের ন্যায় দিলীরের উপর পড়িল। দিলীর খাঁর সেনা প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু এই সময়ে বিক্রম সোলাঙ্কি সেই দুই হাজার অশ্বারোহী লইয়া হঠাৎ দিলীরের সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলেন। তখন তিন দিকে আক্রান্ত হইয়া মোগল সেনা আর এক দণ্ড তিষ্ঠিল না। যে পারিল, সে পলাইয়া বাঁচিল। অধিকাংশই পলাইবার পথ পাইল না—কৃষকের অস্ত্রের নিকট ধান্যের ন্যায় ছিন্ন হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত হইল।

কেবল গোপীনাথ রাঠোরের সম্মুখে, কয়জন মোগল যোদ্ধা কিছুতেই হঠিল না—মৃত্যুকে তৃণজ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। তাহারা মোগলসেনার সার—বাছা বাছা লোক। মবারক তাহাদের নেতা। কিন্তু তাহারাও আর টিকে না। পলকে পলকে এক এক জন বহুসংখ্যক রাজপুতের আক্রমণে নিপাত যাইতেছিল। শেষ দুই চারি জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

দূর হইতে ইহা দেখিতে পাইয়া মাণিকলাল সেখানে শীঘ্র উপস্থিত হইলেন। রাজপুতদিগকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "ইহাদিগকে মারিও না। ইহারা বীরপুরুষ। ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।"

রাজপুতেরা মুহূর্ত্ত জন্য নিরস্ত হইল। তখন মাণিকলাল বলিল, "তোমরা চলিয়া যাও। তোমাদের ছাড়িয়া দিলাম। আমার অনুরোধে তোমাদের কেহ কিছু বলিবে না।"

একজন মোগল বলিল, "আমরা যুদ্ধে কখন পিছন ফিরি নাই। আজও ফিরিব না।" সেই কয়জন মোগল আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন মাণিকলাল মবারককে ডাকিয়া বলিলেন, "খাঁ সাহেব! আর যুদ্ধ করিয়া কি করিবে?"

মবারক বলিল, "মরিব।"

মাণিক। কেন মরিবে?

মবা। আপনি কি জানেন না যে, মৃত্যু ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই?

মাণিক। তবে বিবাহ করিলেন কেন?

মবা। মরিবার জন্য।

এই সময়ে একটা বন্দুকের শব্দ পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইল। প্রতিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতে না করিতে মবারক মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। মাণিকলাল দেখিলেন, মবারক জীবনশূন্য। মাথায় গুলি বিঁধিয়াছে। মাণিকলাল চাহিয়া দেখিলেন, পর্ব্বতের সানুদেশে একজন স্ত্রীলোক বন্দুক হাতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বন্দুকের মুখনিঃসৃত ধূম দেখা গেল। বলা বাহুল্য, সে উন্মাদিনী দরিয়া!

মাণিকলাল স্ত্রীলোককে ধরিতে আজ্ঞা দিলেন। সে হাসিতে হাসিতে পলাইয়া গেল। সেই অবধি দরিয়া বিবিকে পৃথিবীতে আর কেহ কখন দেখে নাই।

যুদ্ধের পর জেব-উন্নিসা শুনিল, মবারক যুদ্ধে মরিয়াছে। তখন সে বেশভূষা দূরে নিক্ষেপ করিল, উদয়সাগরের প্রস্তরকঠিন ভূমির উপর পড়িয়া কাঁদিল—

বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পূর্ণাহুতি—ইষ্টলাভ

যুদ্ধান্তে জয়শ্রী বহন করিয়া বিক্রম সোলাঙ্কি রাজসিংহের শিবিরে ফিরিয়া আসিল, রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি বলিলেন, "একটা কথা বাকি আছে। আমার সেই কন্যাটা। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া আপনাকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। গ্রহণ করিবেন কি?"

রাজসিংহ বলিলেন, "তবে উদয়পুরে চলুন।"

বিক্রম সোলাঙ্কি সেই দুই সহস্র ফৌজ লইয়া উদয়পুরে গেলেন।

বলা বাহুল্য, সেই রাত্রেই রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তার পর যা ঘটিল, তাহাতে ইতিহাসবেত্তারই অধিকার, উপন্যাসলেখকের সে সব কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আবার স্বয়ং ঔরঙ্গজেব রাজসিংহের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আজিম আসিয়া ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। রাজসিংহ বিখ্যাত মাড়বারী দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া, ঔরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলেন। ঔরঙ্গজেব পুনশ্চ পরাজিত ও অপমানিত হইয়া, বেত্রাহত কুক্কুরের ন্যায় পলায়ন করিলেন। রাজপুতেরা তাঁহার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইল। ঔরঙ্গজেবের বিস্তর সেনা মরিল।

ঔরঙ্গজেব ও আজিম ভয়ে পলাইয়া রাণাদিগের পরিত্যক্ত রাজধানী চিতোরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানেও রক্ষা নাই। সুবলদাস নামা একজন রাজপুত সেনাপতি পশ্চাতে গিয়া চিতোর ও আজমীরের মধ্যে সেনা স্থাপন করিলেন। আবার আহারবন্ধের ভয়। অতএব খাঁ রহিলাকে বার হাজার ফৌজের সহিত সুবলদাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দিয়া ঔরঙ্গজেব স্বয়ং আজমীরে পলায়ন করিলেন। আর কখনও উদয়পুরমুখ হইলেন না। সে সাধ তাঁহার জন্মের মত ফুরাইল।

এ দিকে সুবলদাস, খাঁ রহিলাকে উত্তম মধ্যম দিয়া দূরীকৃত করিলেন। পরাভূত হইয়া, খাঁ রহিলাও আজমীরে প্রস্থান করিলেন। দিগন্তরে রাজসিংহের দ্বিতীয় পুত্র কুমার ভীমসিংহ গুজরাট অঞ্চলে মোগলের অধিকারে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নগর, গ্রাম, এমন কি, মোগল সুবাদারের রাজধানীও লুঠপাট করিলেন। অনেক স্থান অধিকার করিয়া সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত রাজসিংহের অধিকার স্থাপন করিতেছিলেন, কিন্তু পীড়িত প্রজারা আসিয়া রাজসিংহকে

জানাইল। করুণহৃদয় রাজসিংহ তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভীমসিংহকে ফিরাইয়া আনিলেন। দয়ার অনুরোধে হিন্দুসাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিলেন না।

কিন্তু রাজমন্ত্রী দয়াল সাহ সে প্রকৃতির লোক নহেন। তিনিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত। মালবে মুসলমানের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজেব হিন্দুধর্ম্মের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। প্রতিশোধের স্বরূপে ইনি কাজিদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে লাগিলেন। কোরাণ দেখিলেই কুয়ায় ফেলিয়া দিতে লাগিলেন।

দয়াল সাহ, কুমার জয়সিংহের সৈন্যের সঙ্গে আপনার সৈন্য মিলাইলে, তাঁহারা শাহজাদা আজিমকে পাকড়া করিয়া, চিতোরের নিকট যুদ্ধ করিলেন। আজিমও হতসৈন্য ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

চারি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইল। পদে পদে মোগলেরা পরাজিত হইলেন। শেষ ঔরঙ্গজেব সত্য সত্যই সন্ধি করিলেন। রাণা যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব সবই স্বীকার করিলেন। আরও কিছু বেশীও স্বীকার করিতে হইল। মোগল এমন শিক্ষা আর কখনও পায় নাই।

উপসংহার

গ্রন্থকারের নিবেদন

গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দুর অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক—সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্ম্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। রাজা যেরূপ হয়েন, রাজানুচর এবং রাজ-পৌরজন প্রভৃতিও সেইরূপ হয়। উদিপুরী ও চঞ্চলকুমারীর তুলনায়, জেব-উন্নিসা ও নির্ম্মলকুমারীর তুলনায়, মাণিকলাল ও মবারকের তুলনায় ইহা জানিতে পারা যায়। এই জন্য এ সকল কল্পনা।

ঔরঙ্গজেবের উত্তম ঐতিহাসিক তুলনার স্থল স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ। উভয়েই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধিপতি; উভয়েই ঐশ্বর্য্যে, সেনাবলে, গৌরবে আর সকল রাজগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উভয়েই শ্রমশীলতা, সতর্কতা প্রভৃতি রাজকীয় গুণে বিভূষিত ছিলেন। কিন্তু উভয়েই নিষ্ঠুর, কপটাচারী, ক্রুর, দাম্ভিক, আত্মমাত্রহিতৈষী, এবং প্রজা-পীড়ক। এজন্য উভয়ই আপন আপন সাম্রাজ্য ধ্বংসের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। উভয়ই ক্ষুদ্র শত্রু দ্বারা পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন;—ফিলিপ ইংরেজ (তখন ক্ষুদ্র জাতি) ও ওলন্দাজের দ্বারা, ঔরঙ্গজেব মারহাট্টা ও রাজপুতের দ্বারা। মারহাট্টা

শিবজী ও ইংলণ্ডের তাৎকালিক নেত্রী এলিজাবেথ পরস্পর তুলনীয়। কিন্তু তদপেক্ষা ওলন্দাজ উইলিয়ম ও রাজপুত রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে তুলনীয়। উভয়ের কীর্ত্তি ইতিহাসে অতুল। উইলিয়ম ইউরোপে দেশহিতৈষী ধর্ম্মাত্মা বীরপুরুষের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন—এ দেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।

পাঠভেদ

১২৮৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা হইতে 'বঙ্গদর্শনে' 'রাজসিংহ' ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতে থাকে, ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র পর্য্যন্ত ছয় সংখ্যায় উনবিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত বাহির হয় এবং পুস্তক অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে সম্পূর্ণ পুস্তক প্রথম বাহির হয় কলিকাতার জন্‌সন প্রেস হইতে, পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৮৩ এবং পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ছিল উনবিংশ। এই প্রথম সংস্করণে বইখানিকে উপন্যাস না বলিয়া "ক্ষুদ্র কথা" বলা হইয়াছে। ১২৯২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ৯০) প্রথম সংস্করণের প্রায় পুনর্মুদ্রণ। ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে (পৃ. ৪৩৪) বইখানি বর্ত্তমান আকারে পরিবর্দ্ধিত হয়। এই সংস্করণকেই মূল ধরিয়া বর্ত্তমান সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের সহিত ইহার আকাশ পাতাল প্রভেদ, সুতরাং পাঠভেদ দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা এই অধ্যায়ে প্রথম সংস্করণের পুস্তক আমূল ছাপিয়া দিলাম; অনুসন্ধিৎসু পাঠক একটু মিলাইয়া দেখিলেই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবর্ত্তনের ধারা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ প্রথম সংস্করণ ও চতুর্থ সংস্করণকে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বই বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন

রাজসিংহ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইতে হইতে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই বন্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে অল্প পরিবর্ত্তন করিয়া উহা পুনর্মুদ্রিত করা গেল। এক্ষণে গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

এ অবস্থাতে গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করাতে অনেকেই আমার উপর রাগ করিবেন। একবার মনে করিয়াছিলাম, এই বিজ্ঞাপনে তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। কিন্তু দেখিতেছি, যাহাতে তাঁহাদের রাগ না হয়, এমন একটা সহজ উপায় আছে। তাঁহারা গ্রন্থখানি না পড়িলেই হইল।

শ্রীবঃ

রাজসিংহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজস্থানের পার্ব্বত্যপ্রদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রাজ্য ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তার একটা রাজা থাকিবে। রূপনগরেরও রাজা ছিল। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ায় আপত্তি নাই—রূপনগরের রাজার নাম বিক্রম সিংহ। বিক্রমসিংহের সবিশেষ পরিচয় যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমরা বলিতে পারি। শ্রুত আছে যে, তিনি স্নানাহার করিতেন, এবং রজনীযোগে নিদ্রা দিতেন, ইহার অধিক পরিচয় আমরা এক্ষণে দিতে ইচ্ছুক নহি।

কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা। ক্ষুদ্র রাজ্য; ক্ষুদ্র রাজধানী; ক্ষুদ্র পুরী। তন্মধ্যে একটি ঘর বড় সুশোভিত। সাদা পাতরের মেঝ্যা; সাদা পাতরের প্রাচীর; তাহাতে বহুবিধ লতা পাতা, পশু পক্ষী এবং মনুষ্যমূর্ত্তি খোদিত। বড় পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর এক পাল স্ত্রীলোক, দশ জন কি পনর জন, নানা রঙের বস্ত্রের বাহার দিয়া বসিয়া, কেহ তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছে, কেহ আলবোলাতে তামাকু টানিতেছে—কাহারও নাকে বড় বড় মতিদার নথ দুলিতেছে, কাহারও কাণে হীরকজড়িত কর্ণভূষা দুলিতেছে। অধিকাংশই যুবতী; হাসি টিটকারির কিছু ঘটা পড়িয়া গিয়াছে—একটু রঙ্গ জমিয়া গিয়াছে।

যুবতীগণের হাসিবার কারণ, এক প্রাচীনা, কতকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়া তাঁহাদিগের হাতে পড়িয়াছিল। হস্তিদন্তনির্ম্মিত ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ব্ব চিত্রগুলি; মহামূল্য। প্রাচীনা বিক্রয়াভিলাষে এক একখানি চিত্র বস্ত্রাবরণমধ্য হইতে বাহির করিতেছিল; যুবতীগণ চিত্রিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

প্রাচীনা প্রথম চিত্রখানি বাহির করিলে, এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার তসবীর আয়ি?"

প্রাচীনা বলিল, "এ আকবর বাদশাহের তসবীর।"

যুবতী বলিল, "দূর্ মাগি, এ দাড়ি যে আমি চিনি। এ আমার ঠাকুরদাদার দাড়ি।"

আর একজন্ বলিল, "সে কি লো? ঠাকুরদাদার নাম দিয়া ঢাকিস্ কেন? ও যে তোর বরের দাড়ি।" পরে আর সকলের দিকে ফিরিয়া রসবতী বলিল, "ঐ দাড়িতে একদিন একটা বিছা লুকাইয়াছিল—সই আমার ঝাড়ু দিয়া সেই বিছাটা মারিল।"

তখন হাসির বড় একটা গোল পড়িয়া গেল। চিত্রবিক্রেত্রী তখন আর একখানা ছবি দেখাইল। বলিল, "এখানা জাহাঙ্গীর বাদশাহের ছবি।"

দেখিয়া রসিকা যুবতী বলিল, "ইহার দাম কত?"

প্রাচীনা বড় দাম হাকিল।

রসিকা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "এ ত গেল ছবির দাম। আসল মানুষটা নুরজাঁহা বেগম কতকে কিনিয়াছিল?"

তখন প্রাচীনাও একটু রসিকতা করিল; বলিল, "বিনামূল্যে।"

রসিকা বলিল, "যদি আসলটার এই দশা, তবে নকলটা ঘরের কড়ি কিছু দিয়া আমাদিগকে দিয়া যাও।"

আবার একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল। প্রাচীনা বিরক্ত হইয়া চিত্রগুলি ঢাকিল। বলিল, "হাসিতে মা তসবীর কেনা যায় না। রাজকুমারী আসুন, তবে আমি তসবীর দেখাইব। আজ তাঁরই জন্য এ সকল আনিয়াছি।"

তখন সাত জন সাত দিক্ হইতে বলিল, "ওগো আমি রাজকুমারী! ও আয়ি বুড়ী, আমি রাজকুমারী।" বৃদ্ধা ফাঁপরে পড়িয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল, আবার আর একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল।

অকস্মাৎ হাসির ধূম কম পড়িয়া গেল—গোলমাল প্রায় থামিল—কেবল তাকাতাকি, আঁচাআঁচি, এবং বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত ওষ্ঠপ্রান্তে একটু ভাঙ্গা হাসি। চিত্রস্বামিনী ইহার কারণ সন্ধান করিবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিছনে কে একখানি দেবীপ্রতিমা দাঁড় করাইয়া গিয়াছে!

বৃদ্ধা অনিমিক্ লোচনে সেই সর্ব্বশোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনির্ম্মিতা প্রতিমা পানে চাহিয়া রহিল—কি সুন্দর! বুড়ী বয়সদোষে একটু চোখে খাট, তত পরিষ্কার দেখিতে পায় না—তাহা না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ শ্বেতপ্রস্তরের বর্ণ নহে; শাদা পাতর এত গোলাবি আভা মারে না। পাতর দূরে থাকুক, কুসুমেও এ চারুবর্ণ পাওয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা দেখিল যে, প্রতিমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। ও মা—পুতুল কি হাসে! বুড়ী তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এ বুঝি পুতুল নয়—ঐ অতি দীর্ঘ, কৃষ্ণতার, চঞ্চল, সজল, বৃহচ্চক্ষুর্দ্বয় তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

বুড়ী অবাক্ হইল—এর ওর তার মুখপানে চাহিতে লাগিল—কিছু ভাবিয়া ঠিক পাইল না। বিকলচিত্ত রসিকা রমণীমণ্ডলীর মুখপানে চাহিয়া, বৃদ্ধা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "হা গা, তোমরা বল না গা?"

এক সুন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না—রসের উৎস উছলিয়া উঠিল—হাসির ফোয়ারার মুখ আপনি ছুটিয়া গেল—যুবতী হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বলা বুড়ী কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন সেই প্রতিমা কথা কহিল। অতি মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, কাঁদিস্ কেন গো?"

তখন বুড়ী বুঝিল যে, এটা গড়া পুতুল নহে—আদত মানুষ—রাজমহিষী বা রাজকুমারী হইবে। বুড়ী তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম রাজকুলকে নহে—এ প্রণাম সৌন্দর্য্যকে। বুড়ী যে সৌন্দর্য্য দেখিল, তাহা দেখিয়া প্রণত হইতে হয়।

আমি জানি, রূপের গৌরব ঘরে ঘরে আছে। ইহাও জানি, অনেকে সেই রূপসীগণপদতলে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। কিন্তু সে প্রণাম রূপের পায়ে নহে। সে প্রণাম সম্বন্ধের পায়ে।..."তুমি আমার গৃহিণী—অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করি। তোমার হাতে অন্ন জল—অতএব তোমাকে প্রণাম করি—আমাকে

একমুঠা খাইতে দিও"—সে প্রণামের এই মন্ত্র। কিন্তু বুড়ীর প্রণাম সে দরের নহে। বুড়ী বুঝি, অনন্ত সুন্দরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের ছায়া দেখিল। **তিনিই** রূপ; **তিনিই** গুণ। যেখানে সে অনন্ত রূপের ছায়া দেখা যায়, সেইখানেই মনুষ্যমস্তক আপনি প্রণত হয়। অতএব বুড়ী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ভুবনমোহিনী সুন্দরী, যারে দেখিয়া চিত্রবিক্রেত্রী প্রণাম করিল, রূপনগরের রাজার কন্যা চঞ্চলকুমারী। যাহারা এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিল, তাহারা তাঁহার সখীজন এবং দাসী। চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই রঙ্গ দেখিয়া নীরবে হাস্য করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রাচীনাকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?"

সখীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল। "উনি তসবীর বেচিতে আসিয়াছেন।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "তা তোমরা এত হাসিতেছিলে কেন?"

কেহ কেহ কিছু কিছু অপ্রতিভ হইল। যিনি সহচরীকে ঝাড়ুদারি রসিকতাটা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আমাদের দোষ কি? আয়ি বুড়ী যত সেকেলে বাদশাহের তসবীর আনিয়া দেখাইতেছিল—তাই আমরা হাসিতেছিলাম—আমাদের রাজা রাজড়ার ঘরে আকবর বাদশাহ, কি জাঁহাগীর বাদশাহের তসবীর কি নাই?"

বৃদ্ধা কহিল, "থাকবে না কেন মা? একখানা থাকিলে কি আর একখানা লইতে নাই? আপনারা লইবেন না, তবে আমরা কাঙ্গাল গরীব প্রতিপালন হইব কি প্রকারে?"

রাজকুমারী তখন প্রাচীনার তসবীর সকল দেখিতে চাহিলেন। প্রাচীনা একে একে তসবীরগুলি রাজকুমারীকে দেখাইতে লাগিল। আকবর বাদশাহ, জাঁহাগীর, শাহা জাঁহা, নূরজাঁহা, নুরমহালের চিত্র দেখাইল। রাজকুমারী হাসিয়া হাসিয়া সকলগুলি ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "ইহারা আমাদের কুটুম্ব, ঘরে ঢের তসবীর আছে। হিন্দুরাজার তসবীর আছে?"

"অভাব কি?" বলিয়া প্রাচীনা, রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুত্রী তাহাও ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "এও লইব না। এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর।"

প্রাচীনা তখন হাসিয়া বলিল, "মা, কে কার চাকর, তা আমি ত জানি না। আমার যা আছে, দেখাই—পসন্দ করিয়া লও।"

প্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল। রাজকুমারী পসন্দ করিয়া রাণা প্রতাপ, রাণা অমরসিংহ, রাণা কর্ণ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি কখানি চিত্র ক্রয় করিলেন। একখানি বৃদ্ধা ঢাকিয়া রাখিল—দেখাইল না।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানি ঢাকিয়া রাখিলে যে?" বৃদ্ধা কথা কহে না। রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা ভীতা হইয়া করযোড়ে কহিল, "আমার অপরাধ লইবেন না—অসাবধানে ঘটিয়াছে—অন্য তসবীরের সঙ্গে আসিয়াছে।"

রাজকুমারী বলিলেন, "অত ভয় পাইতেছ কেন? এমন কাহার তসবীর যে, দেখাইতে ভয় পাইতেছ?"

বুড়ী। দেখিয়া কাজ নাই। আপনার ঘরের দুষ্‌মনের ছবি।

রাজকুমারী। কার তসবীর?

বুড়ী। (সভয়ে) রাণা রাজসিংহের।

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "বীরপুরুষ স্ত্রীজাতির কখনও শত্রু নহে। আমি ও তসবীর লইব।"

তখন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাঁহার হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল; লোচন বিস্ফারিত হইল। একজন সখী, তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল—রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, "দেখ। দেখিবার যোগ্য বটে। বীরপুরুষের চেহারা।"

সখীগণের হাতে হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল। রাজসিংহ যুবা পুরুষ নহে—তথাপি তাঁহার চিত্র দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা সুযোগ পাইয়া এই চিত্রখানিতে দ্বিগুণ মুনফা করিল। তার পর লোভ পাইয়া বলিল, "ঠাকুরাণি, যদি বীরের তসবীর লইতে হয়, তবে আর একখানি দিতেছি। ইঁহার মত পৃথিবীতে বীর কে?"

এই বলিয়া বৃদ্ধা আর একখানি চিত্র বাহির করিয়া রাজপুত্রীর হাতে দিলেন।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার চেহারা?"

বৃদ্ধা। বাদশাহ আলমগীরের।

রাজকুমারী। কিনিব।

এই বলিয়া একজন পরিচারিকাকে রাজপুত্রী ক্রীত চিত্রগুলির মূল্য আনিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারিকা মূল্য আনিতে গেল, ইত্যবসরে রাজপুত্রী সখীগণকে বলিলেন, "এসো, একটু আমোদ করা যাক্।"

রঙ্গপ্রিয়া বয়স্যাগণ বলিল, "কি আমোদ বল! বল!"

রাজপুত্রী বলিলেন, "আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি। সবাই উহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি।"

ভয়ে সখীগণের মুখ শুকাইয়া গেল। একজন বলিল, "অমন কথা মুখে আনিও না, কুমারীজী! কাক পক্ষীতে শুনিলেও রূপনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না।"

হাসিয়া রাজপুত্রী চিত্রখানি মাটিতে রাখিলেন, "কে নাতি মারিবি মার।"

কেহ অগ্রসর হইল না। নির্ম্মল নাম্নী একজন বয়স্যা আসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিল। বলিল, "অমন কথা আর বলিও না।"

চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত বাম চরণখানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন—চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন—মড় মড় শব্দ হইল—ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুতকুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।

"কি সর্ব্বনাশ! কি করিলে!" বলিয়া সখীগণ শিহরিল।

রাজপুতকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "যেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনি মোগল বাদশাহের মুখে নাতি মারার সাধ মিটাইলাম।" তার পর নির্ম্মলের মুখ চাহিয়া বলিলেন, "সখী নির্ম্মল! ছেলেদের সাধ মিটে; সময়ে তাহাদের সত্যের ঘর সংসার হয়। আমার কি সাধ মিটিবে না? আমি কি কখন জীবন্ত ঔরঙ্গজেবের মুখে এইরূপ—"

নির্ম্মল, রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন। কথাটা সমাপ্ত হইল না—কিন্তু সকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীনার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল—এমন প্রাণসংহারক কথাবার্ত্তা যেখানে হয়, সেখান হইতে কতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইবে? এই সময়ে তাহার বিক্রীত তসবীরের মূল্য আসিয়া পৌছিল। প্রাপ্তিমাত্র প্রাচীনা উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সে ঘরের বাহিরে আসিলে, নির্ম্মল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিল। আসিয়া, তাহার হাতে একটি মোহর দিয়া বলিল, "আয়িবুড়ী, দেখিও, যাহা শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে মুখে আনিও না। রাজকুমারীর মুখের আটক নাই—এখনও উঁহার ছেলে বয়স।"

বুড়ী মোহরটি লইয়া বলিল, "তা এ কি আর বল্‌তে হয় মা। আমি তোমাদের দাসী—আমি কি আর এ সকল কথা মুখে আনি।"

নির্ম্মল সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুড়ী বাড়ী আসিল। তাহার বাড়ী বুঁদী। সে চিত্রগুলি দেশে বিদেশে বিক্রয় করে। বুড়ী রূপনগর হইতে বুঁদী গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, তাহার পুত্র আসিয়াছে। তাহার পুত্র দিল্লীতে দোকান করে।

কুক্ষণে বুড়ী রূপনগরে চিত্র বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। চঞ্চলকুমারীর সাহসের কাণ্ড যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা কাহারও কাছে বলিতে না পাইয়া, বুড়ীর মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। যদি নির্ম্মলকুমারী তাহাকে পুরস্কার দিয়া কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া না দিত, তবে বোধ হয়, বুড়ীর মন এত ব্যস্ত না হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু যখন সে কথা প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ নিষেধ হইয়াছে, তখন বুড়ীর মন, কাজে কাজেই কথাটি বলিবার জন্য বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। বুড়ী কি করে, একে সত্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে হাত পাতিয়া মোহর লইয়া নিমক খাইয়াছে, কথা প্রকাশ পাইলেও দুরন্ত বাদশাহের হস্তে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাও বুঝিতেছে। হঠাৎ কথা কাহারও

সাক্ষাতে বলিতে পারিল না। কিন্তু বুড়ীর আর দিবসে আহার হয় না—রাত্রে নিদ্রা হয় না। শেষ আপনা আপনি শপথ করিল যে, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। তাহার পরেই তাহার পুত্র আহার করিতে বসিল—বুড়ী আর থাকিতে পারিল না—শপথ ভঙ্গ করিয়া পুত্রের সাক্ষাতে সবিস্তারে চঞ্চলকুমারীর দুঃসাহসের কথা বিবৃত করিল। মনে করিল, আপনার পুত্রের সাক্ষাতে বলিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? পুত্রকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল—আমার দিব্য, এ কথা কাহারও কাছে বলিও না।

পুত্র স্বীকার করিল, কিন্তু দিল্লী ফিরিয়া গিয়াই, আপনার উপপত্নীর কাছে গল্প করিল। বলিয়া দিল—জান্! কাহারও সাক্ষাতে বলিও না। জান্, তখনই আপনার প্রিয় সখীর কাছে গিয়া বলিল। তাহার প্রিয়সখী দুই চারি দিন বাদশাহের অন্তঃপুরে গিয়া বাঁদীস্বরূপ নিযুক্ত হইল। সে অন্তঃপুরে পরিচারিকাগণের নিকট এই রহস্যের গল্প করিল। ক্রমে বাদশাহের বেগমেরা শুনিল। যোধপুরী বেগম বাদশাহের কাছে গল্প করিল।

ঔরঙ্গজেব সসাগর ভারতের অধীশ্বর। ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী রাজাধিরাজ এক চঞ্চলা বালিকার কথায় রাগ করিবেন, ইহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। কিন্তু ক্রূরমনা ঔরঙ্গজেব সে প্রকৃতির বাদশাহ ছিলেন না। যে যত ক্ষুদ্র হৌক, যে যেমন মহৎ হউক, কেহ তাঁহার প্রতিহিংসার অতীত নহে। অমনি স্থির করিলেন যে, সেই অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকাকে ইহার গুরুতর প্রতিফল দিবেন। বেগমকে বলিলেন, "রূপনগরের রাজকুমারী দিল্লীর রাজপুরে আসিয়া বাঁদীদিগের তামাকু সাজিবে।"

যোধপুরেশ্বরকুমারী শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "সে কি জাঁহাপনা! যাহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজ-রাজেশ্বরগণ রাজ্যচ্যুত হইতেছে—এক সামান্যা বালিকা কি তাহার ক্রোধের যোগ্য!"

রাজেন্দ্র হাসিলেন—কিছু বলিলেন না। কিন্তু সেই দিনেই চঞ্চলকুমারীর সর্ব্বনাশের উদ্যোগ হইল। রূপনগরের ক্ষুদ্র রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি হইল। যে অদ্বিতীয় কুটিলতাভয়ে জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও আজিম শাহ প্রভৃতি শাহজাদাগণ সর্ব্বদা শশব্যস্ত—যে অভেদ্য কুটিলতাজালে বদ্ধ হইয়া চতুরাগ্রগণ্য শিবজীও দিল্লীতে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন—এই আজ্ঞাপত্র সেই কুটিলতাপ্রসূত। তাহাতে লিখিত হইল যে, "বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রূপনগরের রাজার সৎস্বভাব ও রাজভক্তিতে বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন। অতএব বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন। রাজা কন্যাকে দিল্লীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে থাকুন; শীঘ্র রাজসৈন্য আসিয়া কন্যাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবে।"

এই সম্বাদ রূপনগরে আসিবামাত্র মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। রূপনগরে আর আনন্দের সীমা রহিল না। যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত রাজগণ মোগল বাদশাহকে কন্যাদান করা অতি গুরুতর সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সে স্থলে রূপনগরের ক্ষুদ্রজীবী রাজার অদৃষ্টে এই শুভ ফল বড়ই আনন্দের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হইল। বাদশাহের বাদশাহ—যাঁহার সমকক্ষ মনুষ্যলোকে কেহ নাই—তিনি জামাতা হইবেন—চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন—ইহার অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? রাজা, রাজরাণী, পৌরজন, রূপনগরের প্রজাবর্গ আনন্দে মাতিয়া উঠিল। রাণী একলিঙ্গের পূজা

পাঠাইয়া দিলেন ; রাজা এই সুযোগে কোন্ ভূম্যধিকারীর কোন্ কোন্ গ্রাম কাড়িয়া লইবেন তাহার ফর্দ্দ করিতে লাগিলেন।

কেবল চঞ্চলকুমারীর সখীজন নিরানন্দ। তাহারা জানিত যে, এ সম্বন্ধে মোগলদ্বেষিণী চঞ্চলকুমারীর সুখ নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নির্ম্মল, ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী একা বসিয়া কাঁদিতেছেন। সে দিন যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহাব একখানি রাজকুমারীর হাতে দেখিলেন। নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রখানি উল্টাইয়া রাখিলেন—কাহার চিত্র, নির্ম্মল তাহা দেখিতে পাইল না। নির্ম্মল কাছে গিয়া বসিয়া, বলিল, "এখন উপায় ?"

চঞ্চল। উপায় যাই হউক—আমি মোগলের দাসী কখনই হইব না।

নির্ম্মল। তোমার অমত, তা ত জানি, কিন্তু আলমগীর বাদশাহের হুকুম, রাজার কি সাধ্য যে, অন্যথা করেন ? উপায় নাই, সখি !—সুতরাং তোমাকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর স্বীকার করা ত সৌভাগ্যের বিষয়। যোধপুর বল, অম্বর বল, রাজা, বাদশাহ, ওমরাহ, নবাব, সুবা, যাহা বল, পৃথিবীতে এত বড় লোক কে আছে যে, তাহার কন্যা দিল্লীর তক্তে বসিতে বাসনা করে না ? পৃথিবীশ্বরী হইতে তোমার এত অসাধ কেন ?

চঞ্চল রাগ করিয়া বলিল, "তুই এখান হইতে উঠিয়া যা।"

নির্ম্মল দেখিল, ও পথে কিছু হইবে না। তবে আর কোন্ পথে রাজকুমারীর কিছু উপকার করিতে পারে, তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। বলিল, "আমি যেন উঠিয়া গেলাম—কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রতিপালন হইতেছি, আমাকে তাঁহার হিত খুঁজিতে হয়। তুমি যদি দিল্লী না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হইবে, তাহা কি একবার ভাবিয়াছ ?"

চ। ভাবিয়াছি। আমি যদি না যাই, তবে আমার পিতার কাঁধে মাতা থাকিবে না—রূপনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না। তা ভাবিয়াছি—আমি পিতৃহত্যা করিব না। বাদশাহের ফৌজ আসিলেই আমি তাহাদিগের সঙ্গে দিল্লীযাত্রা করিব। ইহা স্থির করিয়াছি।

নির্ম্মল প্রসন্ন হইল। বলিল, "আমিও সেই পরামর্শ ই দিতেছিলাম।"

রাজকুমারী আবার ভ্রূভঙ্গী করিলেন—বলিলেন, "তুই কি মনে করেছিস্ যে, আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব ? হংসী কি বকের সেবা করে ?"

নির্ম্মল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি করিবে ?"

চঞ্চলকুমারী হস্তের একটি অঙ্গুরীয় নির্ম্মলকে দেখাইল। বলিল, "দিল্লীর পথে বিষ খাইব।" নির্ম্মল জানিত, ঐ অঙ্গুরীয়তে বিষ আছে।

নির্ম্মল শিহরিয়া উঠিল ; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আর কি কোন উপায় নাই ?"

চঞ্চল বলিল, "আর উপায় কি সখি ? কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে, আমায় উদ্ধার করিয়া দিল্লীশ্বরের সহিত শত্রুতা করিবে ? রাজপুতানার কুলাঙ্গার সকলি মোগলের দাস—আর কি সংগ্রাম আছে, না প্রতাপ আছে ?"

নির্ম্মল। কি বল রাজকুমারি ! সংগ্রাম, কি প্রতাপ যদি থাকিত, তবে তাহারাই বা তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াই বা দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করিবে কেন ? পরের জন্য কেহ সহজে সর্ব্বস্ব পণ করে না। প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই, কিন্তু রাজসিংহ আছে—কিন্তু তোমার জন্য রাজসিংহ সর্ব্বস্ব পণ করিবে কেন ? বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরানা।

চঞ্চল। সে কি ? বাহুতে বল থাকিতে কোন্ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা করে নাই ? আমি তাই ভাবিতেছিলাম নির্ম্মল—আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম প্রতাপের বংশতিলকেরই শরণ লইব—তিনি কি আমায় রক্ষা করিবেন না ?

বলিতে বলিতে চঞ্চলদেবী ঢাকা ছবিখানি উল্টাইলেন—নির্ম্মল দেখিল, সে রাজসিংহের মূর্ত্তি। চিত্র দেখাইয়া রাজকুমারী বলিতে লাগিলেন, "দেখ সখি, এ রাজকান্তি দেখিয়া তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে, ইনি অগতির গতি, অনাথার রক্ষক ? আমি যদি ইঁহার শরণ লই, ইনি কি রক্ষা করিবেন না ?"

নির্ম্মলকুমারী অতি স্থিরবুদ্ধিশালিনী—চঞ্চলের সহোদরাধিকা। নির্ম্মল অনেক ভাবিল। শেষে চঞ্চলের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারি—যে বীর তোমাকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে ?" রাজকুমারী বুঝিলেন। স্থির কাতর অথচ অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "কি দিব সখি ! আমার কি দিবার আছে ? আমি যে অবলা !"

নির্ম্মল। তোমার তুমিই আছ ?

চঞ্চল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দূর হ !"

নির্ম্মল। তা রাজার ঘরে এমন হইয়া থাকে। তুমি যদি রুক্মিণী হইতে পার, যদুপতি আসিয়া অবশ্য উদ্ধার করিতে পারেন।

চঞ্চলকুমারী মুখাবনত করিল। বলিল, "তাঁহাকে পাইব, আমি কি এমন ভাগ্য করিয়াছি ? আমি বিকাইতে চাহিলে তিনি কি কিনিবেন ?"

নির্ম্মল। সে কথার বিচারক তিনি—আমরা নই। রাজসিংহের বাহুতে শুনিয়াছি বল আছে, তাঁর কাছে কি দূত পাঠান যায় না। গোপনে—কেহ না জানিতে পারে, এরূপ দূত কি তাঁহার কাছে যায় না ?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "তুমি আমার গুরুদেবকে ডাকিতে পাঠাও। আমায় আর কে তেমন ভালবাসে ? কিন্তু তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া আমার কাছে আনিও। সকল কথা বলিতে আমার লজ্জা করিবে।"

নির্ম্মল উঠিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনে কিছুমাত্র ভরসা হইল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনন্ত মিশ্র, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুলপুরোহিত। কন্যানির্ব্বিশেষে চঞ্চলকুমারীকে ভাল বাসিতেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত। চঞ্চলের নাম করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি অন্তঃপুরে আসিলেন—কুলপুরোহিতের অবারিত দ্বার। পথিমধ্যে নির্ম্মল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল।—এবং সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিভূতিচন্দনবিভূষিত, প্রশস্তললাট, দীর্ঘকায়, রুদ্রাক্ষশোভিত, হাস্যবদন, সেই ব্রাহ্মণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নির্ম্মল দেখিয়াছিল যে, চঞ্চল কাঁদিতেছে। কিন্তু আর কাহারও কাছে চঞ্চল কাঁদিবার মেয়ে নহে। গুরুদেব দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরমূর্ত্তি। বলিলেন, "মা লক্ষ্মী,—আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন?"

চ। আমাকে বাঁচাইবার জন্য। আর কেহ নাই যে, আমায় বাঁচায়।

অনন্ত মিশ্র হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, রুক্মিণীর বিয়ে, সেই পুরোহিত বুড়াকেই দ্বারকায় যেতে হবে। তা দেখ দেখি মা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কিছু আছে কি না—পথ খরচটা জুটিলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব।"

চঞ্চল, একটী জরির থলি বাহির করিয়া দিল। তাহাতে আশরফি ভরা। পুরোহিত দুইটা আশরফি লইয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "পথে অন্নই খাইতে হইবে—আশরফি খাইতে পারিব না। একটি কথা বলি, পারিবে কি?"

চঞ্চল বলিলেন, "আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলেও, আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাও পারি। কি আজ্ঞা করুন।"

মিশ্র। রাণা রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "আমি বালিকা—পুরস্ত্রী; তাঁহার কাছে অপরিচিতা—কি প্রকারে পত্র লিখি? কিন্তু আমি তাঁহার কাছে যে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহাতে লজ্জারই বা স্থান কই? লিখিব।"

মিশ্র। আমি লিখাইয়া দিব, না আপনি লিখিবে?

চ। আপনি বলিয়া দিন।

নির্ম্মল সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "তা হইবে না। এ বামুনে বুদ্ধির কাজ নয়—এ মেয়েলি বুদ্ধির কাজ। আমরা পত্র লিখিব। আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন।"

মিশ্রঠাকুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গৃহে গেলেন না। রাজা বিক্রমসিংহের নিকট দর্শন দিলেন। বলিলেন, "আমি দেশপর্য্যটনে গমন করিব, মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।" কি জন্য কোথায় যাইবেন, রাজা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তথাপি তিনি যে উদয়পুর পর্য্যন্ত যাইবেন, তাহা স্বীকার করিলেন, এবং রাণার নিকট পরিচিত হইবার জন্য একখানি লিপির জন্য প্রার্থিত হইলেন। রাজাও পত্র দিলেন।

অনন্ত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া চঞ্চলকুমারীর নিকট পুনরাগমন করিলেন। ততক্ষণ চঞ্চল ও নির্ম্মল, দুই জনে দুই বুদ্ধি একত্র করিয়া একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল। পত্র শেষ করিয়া রাজনন্দিনী, একটি কৌটা হইতে অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট মুকুতাবলয় বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "রাণা পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ আপনি এই রাখি বাঁধিয়া দিবেন। রাজপুতকুলের যিনি চূড়া, তিনি কখন রাজপুতকন্যার প্রেরিত রাখি অগ্রাহ্য করিবেন না।"

মিশ্রঠাকুর স্বীকৃত হইলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিধেয় বস্ত্র, ছত্র, যষ্টি, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া অনন্ত মিশ্র গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদয়পুর যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, "কেন যাইবে ?" মিশ্রঠাকুর বলিলেন, "রাণার কাছে কিছু বৃত্তি পাইব।" গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইলেন, বিরহযন্ত্রণা আর তাঁহাকে দাহ করিতে পারিল না, অর্থলাভের আশাস্বরূপ শীতলবারিপ্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি বার কত ফোঁস ফোঁস করিয়া নিবিয়া গেল। মিশ্রঠাকুর একাকী যাত্রা করিলেন।

পথ অতি দুর্গম—বিশেষ পার্ব্বত্য পথ বন্ধুর, এবং অনেক স্থানে আশ্রয়শূন্য। একাহারী ব্রাহ্মণ যে দিন যেখানে আশ্রয় পাইতেন, সে দিন সেখানে আতিথ্য স্বীকার করিতেন; দিনমানে পথ অতিবাহন করিতেন। পথে কিছু দস্যুভয় ছিল—ব্রাহ্মণের নিকট রত্নবলয় আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কদাপি একাকী পথ চলিতেন না। সঙ্গী জুটিলে চলিতেন। সঙ্গী ছাড়া হইলেই আশ্রয় খুঁজিতেন। একদিন রাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া, পরদিন প্রভাতে গমনকালে, তাঁহাকে সঙ্গী খুঁজিতে হইল না। চারি জন বণিক্ ঐ দেবালয়ের অতিথিশালায় শয়ন করিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া তাহারাও পার্ব্বত্য পথে আরোহণ করিল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া উহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইবে ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি উদয়পুর যাইব।" বণিকেরা বলিল, "আমরাও উদয়পুর যাইব। ভাল হইয়াছে, একত্রে যাই চলুন।" ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গী হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদয়পুর আর কত দূর।" বণিকেরা বলিল, "নিকট। আজি সন্ধ্যার মধ্যে উদয়পুর পৌছিতে পারিব। এ সকল স্থান রাণার রাজ্য।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা চলিতেছিল। পার্ব্বত্য পথ, অতিশয় দুরারোহণীয়, এবং দুরবরোহণীয়; সচরাচর বসতিশূন্য। কিন্তু এ দুর্গম পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল—এখন সমতল ভূমিতে অবরোহণ করিতে হইবে। পথিকেরা এক অনির্ব্বচনীয় শোভাময় অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। দুই পার্শ্বে অনতিউচ্চ পর্ব্বতদ্বয়, হরিৎ বৃক্ষাদিশোভিত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়াছে; উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্রা প্রবাহিণী নীলকাচপ্রতিম সফেন জলপ্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া বনাসের অভিমুখে চলিতেছে। তটিনীর ধার দিয়া মনুষ্যগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে। সেখানে নামিলে, আর কোন দিক্ হইতে কেহ পথিককে দেখিতে পায় না; কেবল পর্ব্বতদ্বয়ের উপর হইতে দেখা যায়।

সেই নিভৃত স্থানে অবরোহণ করিয়া, একজন বণিক্ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ঠাঁই টাকা কড়ি কি আছে?"

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন, বুঝি এখানে দস্যুর বিশেষ ভয়, তাই সতর্ক করিবার জন্য বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে। দুর্ব্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি থাকিবে?"

বণিক্ বলিল, "যাহা কিছু থাকে, আমাদের নিকট দাও। নহিলে এখানে রাখিতে পারিবে না।"

ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, "রত্নবলয় রক্ষার্থ বণিক্‌দিগকে দিই;" আবার ভাবিলেন, "ইহারা অপরিচিত, ইহাদিগকেই বা বিশ্বাস কি?" এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক, আমার কাছে কি থাকিবে?"

বিপদ্‌কালে যে ইতস্ততঃ করে, সেই মারা যায়। ব্রাহ্মণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ছদ্মবেশী বণিকেরা বুঝিল যে, অবশ্য ব্রাহ্মণের কাছে বিশেষ কিছু আছে। একজন তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকে আঁটু দিয়া বসিল—এবং তাহার মুখে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল। ব্রাহ্মণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া নারায়ণ স্মরণ করিতে লাগিল। আর একজন, তাহার গাঁটরি কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর হইতে চঞ্চলকুমারীপ্রেরিত বলয়, দুইখানি পত্র, এবং দুই আশরফি পাওয়া গেল। দস্যু তাহা হস্তগত করিয়া সঙ্গীকে বলিল, "আর ব্রহ্মহত্যা করিয়া কাজ নাই। উহার যাহা ছিল, তাহা পাইয়াছি। এখন উহাকে ছাড়িয়া দে।"

আর একজন দস্যু বলিল, "ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। ব্রাহ্মণ তাহা হইলে এখনই একটা গোলযোগ করিবে। আজ কাল রাণা রাজসিংহের বড় দৌরাত্ম্য—তাহার শাসনে বীর পুরুষে আর অন্ন করিয়া খাইতে পারে না। উহাকে এই গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া যাই।"

এই বলিয়া দস্যুগণ মিশ্রঠাকুরের হস্ত পদ এবং মুখ তাহার পরিধেয় বস্ত্রে দৃঢ়তর বাঁধিয়া পর্ব্বতের সানুদেশস্থিত একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বাঁধিল। পরে চঞ্চলকুমারীদত্ত রত্নবলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয়া ক্ষুদ্র নদীর তীরবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইয়া একজন অশ্বারোহী তাহাদিগকে দেখিল। তাহারা অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল না; পলায়নে ব্যস্ত।

দস্যুগণ পার্ব্বতীয়া প্রবাহিণীর তটবর্ত্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি দুর্গম ও মনুষ্যসমাগমশূন্য পথে চলিল। এইরূপ কিছু দূর গিয়া, এক নিভৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করিল।

গুহার ভিতর খাদ্য দ্রব্য, শয্যা, পাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত ছিল। দেখিয়া বোধ হয়, দস্যুগণ কখন কখন এই গুহামধ্যে লুকাইয়া বাস করে। এমন কি, কলসীপূর্ণ জল পর্য্যন্ত ছিল। দস্যুগণ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে লাগিল। এবং এক একজন পাকের উদ্যোগ করিতে লাগিল। একজন বলিল, "মাণিকলাল, রসুই পরে হইবে। প্রথমে মালের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহার মীমাংসা করা যাউক।"

মাণিকলাল বলিল, "মালের কথাই আগে হউক।"

তখন আশরফি দুইটি কাটিয়া চারি খণ্ড হইল। এক একজন এক এক খণ্ড লইল। রত্নবলয় বিক্রয় না হইলে ভাগ হইতে পারে না—তাহা সম্প্রতি অবিভক্ত রহিল। পত্র দুইখানি কি করা যাইবে, তাহার মীমাংসা হইতে লাগিল। দলপতি বলিলেন, কাগজে আর কি হইবে—উহা পোড়াইয়া ফেল। এই বলিয়া পত্র দুইখানি সে মাণিকলালকে অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিবার জন্য দিল।

মাণিকলাল কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে জানিত। সে পত্র দুইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল। বলিল, "এ পত্র নষ্ট করা হইবে না। ইহাতে রোজগার হইতে পারে।"

"কি ? কি ?" বলিয়া আর তিন জন গোলযোগ করিয়া উঠিল। মাণিকলাল তখন চঞ্চলকুমারীর পত্রের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া চোরেরা বড় আনন্দিত হইল।

মাণিকলাল বলিল, "দেখ, এই পত্র রাণাকে দিলে কিছু পুরস্কার পাইব।"

দলপতি বলিল, "নির্ব্বোধ! রাণা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা এ পত্র কোথায় পাইলে, তখন কি উত্তর দিবে ? তখন কি বলিবে যে, আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি ? রাণার কাছে পুরস্কারের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে। তাহা নহে। এ পত্র লইয়া গিয়া বাদশাহকে দিব—বাদশাহের কাছে এরূপ সন্ধান দিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যায় আমি জানি। আর ইহাতে—"

দলপতি কথা সমাপ্ত করিতে অবকাশ পাইলেন না। কথা মুখে থাকিতে থাকিতে তাঁহার মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অশ্বারোহী পর্ব্বতের উপর হইতে দেখিল, চারি জনে এক জনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আগে কি হইয়াছে, তাহা সে দেখে নাই, তখন সে পৌঁছে নাই। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিল, উহারা কোন্ পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাঁক ফিরিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল, তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিল। পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, "বিজয়! এখানে থাকিও—আমি আসিতেছি—কোন শব্দ করিও না।" অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার আরোহী পাদচারে অতি দ্রুতবেগে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। পর্ব্বত যে বড় উচ্চ নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অশ্বারোহী পদব্রজে মিশ্রঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, অল্প কথায় বলুন।" মিশ্র বলিলেন, "চারি জনের সঙ্গে আমি একত্রে আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি না—পথের আলাপ; তাহারা বলে, আমরা বণিক্। এইখানে আসিয়া তাহারা মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল, কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি লইয়া গিয়াছে ?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "একগাছি মুক্তার বালা, দুইটি আশরফি, দুইখানি পত্র।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "আপনি এইখানে থাকুন। উহারা কোন্ দিকে গেল, আমি দেখিয়া আসি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি প্রকারে? তাহারা চারি জন, আপনি একা।"

আগন্তুক বলিল, "দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক।"

অনন্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধব্যবসায়ী বটে। তাহার কোমরে তরবারি এবং পিস্তল, এবং হস্তে বর্শা। তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না।

রাজপুত, যে পথে দস্যুগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে, অতি সাবধানে তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, অথবা দস্যুদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত: দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন যে, দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, চারি জনে যাইতেছে। সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায়। দেখিলেন, কিছু পরে উহারা একটা পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেল না। তখন রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উহারা হয় ঐখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে; বৃক্ষাদির জন্য দেখা যাইতেছে না। নয়, ঐ পর্ব্বত-তলে গুহা আছে, দস্যুরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত, বৃক্ষাদি চিহ্ন দ্বারা সেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বন্য পথে প্রবেশপূর্ব্বক, সেই সকল চিহ্নলক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্ব্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্ব্বততলে একটি গুহা আছে। গুহামধ্যে মনুষ্যের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন।

এই পর্য্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতস্তত: করিতে লাগিলেন। উহারা চারি জন—তিনি একা, এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি না। যদি গুহাদ্বার রোধ করিয়া উহারা চারি জনে তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম করে, তবে তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ কথা রাজপুতের মনে বড় অধিকক্ষণ স্থান পাইল না—মৃত্যুভয় আবার ভয় কি? মৃত্যুভয়ে রাজপুত কোন কার্য্য হইতে বিরত হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহার হস্তে দুই একজন অবশ্য মরিবে। যদি উহারা সেই দস্যুদল না হয়? তবে নিরপরাধীর হত্যা হইবে।

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দস্যুরা তখন অপহৃত সম্পত্তির বিভাগের কথা কহিতেছিল। শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীত হইল যে, উহারা দস্যু বটে। রাজপুত, তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।

ধীরে ধীরে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন। পরে অসি নিষ্কোষিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বাম হস্তে পিস্তল লইলেন। দস্যুরা যখন চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিমুগ্ধ হইয়া অন্যমনস্ক ছিল—সেই সময়ে রাজপুত অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। প্রবেশ করিয়া

রাজপুত দৃঢ়মুষ্টিধৃত তরবারি দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল যে, এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই দ্বিতীয় একজন দস্যু, যে দলপতির কাছে বসিয়াছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মস্তকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন যে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজপুত, অন্য দুই জনের উপর দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন; সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাণিকলাল, বেগতিক দেখিয়া, গুহাদ্বারপথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে রাজপুত যে বর্শা, বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া, দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত হউন, নহিলে এই বর্শায় বিদ্ধ করিব।"

রাজপুত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে বর্শা মারিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি উহা বাম হস্তে ধরিতাম। কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে না—এই দেখ।" এই কথা বলিতে না বলিতে রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিস্তল দস্যুর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন, দারুণ প্রহারে তাহার হাতের বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়া, মাণিকলালের চুল ধরিলেন। এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তক ছেদনে উদ্যত হইলেন।

মাণিকলাল তখন কাতরস্বরে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! আমার জীবনদান করুন—রক্ষা করুন—আমি শরণাগত!"

রাজপুত, তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন। বলিলেন, "তুই মরিতে এত ভীত কেন?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে, সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই—কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে, আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।"

দস্যু কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষের জল মুছিয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজাধিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর কখন দস্যুতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব। আর যদি জীবন থাকে, একদিন না একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।"

রাজপুত বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন?"

দস্যু বলিল, "মহারাণা রাজসিংহকে কে না চিনে?"

তখন রাজসিংহ বলিলেন, "আমি তোমার জীবনদান করিলাম। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছ। আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্ম্মে পতিত হইব।"

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! এ পাপে আমি নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘু দণ্ডেরই বিধান করুন। আমি আপনার সম্মুখেই শাস্তি লইতেছি।"

এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া, অবলীলাক্রমে আপনার তর্জ্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিয়া, অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া, আর একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্যু বলিল, "মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।"

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, "ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি?"

দস্যু বলিল, "এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুতকুলের কলঙ্ক।"

রাজসিংহ বলিলেন, "মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কার্য্যে নিযুক্ত হইলে। এক্ষণে তুমি অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইলে—তোমার কন্যা লইয়া উদয়পুরে যাও; তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও।"

মাণিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল। এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিতি করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহৃত মুক্তাবলয়, পত্র দুইখানি, এবং আশরফি চারি খণ্ড আনিয়া দিল। বলিল, "ব্রাহ্মণের যাহা আমরা কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। পত্র দুইখানি আপনারই জন্য। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

রাণা পত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই নামাঙ্কিত শিরোনামা। বলিলেন, "মাণিকলাল—পত্র পড়িবার এ স্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস—তোমরা পথ জান, পথ দেখাও।"

মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাণা দেখিলেন যে, দস্যু একবার তাহার ক্ষত ও আহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না বা তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলিতেছে না—বা একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীঘ্রই বন হইতে বেগবতী ক্ষীণা তটিনীতীরে এক সুরম্য নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তথায়, উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীরব সঙ্গে সুমন্দমধুর বায়ু, এবং স্বরলহরীবিকীর্ণকারী কুঞ্জবিহঙ্গমগণ ধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে বন্য কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া, পার্ব্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে। তথায়, রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে, এবং মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে। সেইখানে রাজসিংহ এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া পত্র দুইখানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম রাজা বিক্রমসিংহের পত্র পড়িলেন। পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—মনে করিলেন, ব্রাহ্মণকে কিছু দিলেই পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তার পর চঞ্চলকুমারীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্র এইরূপ;—

"রাজন্—আপনি রাজপুত-কুলের চূড়া—হিন্দুর শিরোভূষণ। আমি অপরিচিতা হীনমতি বালিকা—নিতান্ত বিপন্না না হইলে কখনই আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করিতাম না। নিতান্ত বিপন্না বুঝিয়াই আমার এ দুঃসাহস মার্জ্জনা করিবেন।

যিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমার গুরুদেব। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন—আমি রাজপুতকন্যা। রূপনগর অতি ক্ষুদ্র রাজ্য—তথাপি বিক্রমসিংহ সোলাঙ্কি রাজপুত—রাজকন্যা বলিয়া আমি মধ্যদেশাধিপতির কাছে গণ্যা না হই,—রাজপুতকন্যা বলিয়া দয়ার পাত্রী। কেন না, আপনি রাজপুতপতি—রাজপুতকুলতিলক।

অনুগ্রহ করিয়া আমার বিপদ্ শ্রবণ করুন। আমার দুরদৃষ্টক্রমে, দিল্লীর বাদশাহ আমার পাণিগ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য, আমাকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্য আসিবে। আমি রাজপুতকন্যা ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবা—কি প্রকারে তাতারের দাসী হইব? রাজহংসী হইয়া কেমন করিয়া বকসহচরী হইব? হিমালয়নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পঙ্কিল তড়াগে মিশাইব? রাজপুতকুমারী হইয়া কি প্রকারে তুরকী বর্ব্বরের আজ্ঞাকারিণী হইব? আমি স্থির করিয়াছি, এ বিবাহের অগ্রে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ করিব।

মহারাজাধিরাজ! আমাকে অহঙ্কৃতা মনে করিবেন না। আমি জানি যে, আমি ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর কন্যা—যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাজাধিরাজগণও দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান করা কলঙ্ক মনে করেন না—কলঙ্ক মনে করা দূরে থাক, বরং গৌরব মনে করেন। আমি সে সব ঘরের কাছে কোন্ ছার? আমার এ অহঙ্কার কেন? এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু মহারাজ! সূর্য্যদেব অস্তে গেলে খদ্যোত কি জ্বলে না? শিশিরভরে নলিনী মুদিত হইলে, ক্ষুদ্র কুন্দ কুসুম কি বিকশিত হয় না? যোধপুর অম্বর কুলধ্বংস করিলে রূপনগরে কি কুলরক্ষা হইতে পারে না? মহারাজ, ভাটমুখে শুনিয়াছি যে, বনবাসী রাণা প্রতাপের সহিত মহারাজা মানসিংহ ভোজন করিতে আসিলে, মহারাণা ভোজন করেন নাই, বলিয়াছিলেন, যে তুর্ককে ভগিনী দিয়াছে, তাহার সহিত ভোজন করিব না। সেই মহাবীরের বংশধরকে কি আমায় বুঝাইতে হইবে যে, এই সম্বন্ধ রাজপুতকুলকামিনীর পক্ষে ইহলোকে পরলোকে ঘৃণাস্পদ? মহারাজ! আজিও আপনার বংশে তুর্ক বিবাহ করিতে পারিল না কেন? আপনারা বীর্য্যবান্ মহাবলাক্রান্ত বংশ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নহে। মহাবল পরাক্রান্ত রুমের বাদশাহ কিম্বা পারস্যের শাহ দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান গৌরব মনে করেন। তবে উদয়পুরেশ্বর কেবল তাঁহাকে কন্যাদান করেন না কেন? তিনি রাজপুত বলিয়া। আমিও সেই রাজপুত। মহারাজ! প্রাণত্যাগ করিব, তবু কুল রাখিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

প্রয়োজন হইলে প্রাণবিসর্জ্জন করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু তথাপি এই অষ্টাদশ বৎসর বয়সে, এ অভিনব জীবন রাখিতে বাসনা হয়। কিন্তু কে এ বিপদে এ জীবন রক্ষা করিবে? আমার পিতার ত কথাই নাই, তাঁহার এমন কি সাধ্য যে, আলমগীরের সঙ্গে বিবাদ করেন। আর যত রাজপুত রাজা, ছোট হউন বড় হউন, সকলেই বাদশাহের ভৃত্য, সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিতকলেবর। কেবল আপনি—

রাজপুতকুলের একা প্রদীপ—কেবল আপনিই স্বাধীন—কেবল উদয়পুরেশ্বরই বাদশাহের সমকক্ষ। হিন্দুকুলে আর কেহ নাই—যে এই বিপন্না বালিকাকে রক্ষা করে—আমি আপনার শরণ লইলাম—আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না ?

কত বড় গুরুতর কার্য্যে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, তাহা আমি না জানি, এমত নহে। আমি কেবল বালিকাবুদ্ধির বশীভূতা হইয়া লিখিতেছি, এমত নহে। দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ সহজ নহে জানি। এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই যে, তাহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিষ্ঠিতে পারে। কিন্তু মহারাজ! মনে করিয়া দেখুন, মহারাণা সংগ্রাম সিংহ বাবরশাহকে প্রায় রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ আকবরশাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আপনি সেই সিংহাসনে আসীন—আপনি সেই সংগ্রামের, সেই প্রতাপের বংশধর—আপনি কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা হীনবল? শুনিয়াছি নাকি মহারাষ্ট্রে এক পার্ব্বতীয় দস্যু আলমগীরকে পরাভূত করিয়াছে—সে আলমগীর কি রাজস্থানের রাজেন্দ্রের কাছে গণ্য ?

আপনি বলিতে পারেন, "আমার বাহুতে বল আছে—কিন্তু থাকিলেও আমি তোমার জন্য এত কষ্ট কেন করিব ? আমি কেন অপরিচিতা মুখরা কামিনীর জন্য প্রাণিহিত্যা করিব ?—ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইব ?" মহারাজ ! সর্ব্বস্ব পণ করিয়া শরণাগতকে রক্ষা করা কি রাজধর্ম্ম নহে ? সর্ব্বস্ব পণ করিয়া কুলকামিনীর রক্ষা কি রাজপুতের ধর্ম্ম নহে ?"

এই পর্য্যন্ত পত্রখানি রাজকন্যার হাতের লেখা। বাকি যেটুকু, সেটুকু তাঁহার হাতের নহে। নির্ম্মলকুমারী লিখিয়া দিয়াছিল ; রাজকন্যা তাহা জানিতেন কি না, আমরা বলিতে পারি না।

"মহারাজ ! আর একটি কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিলেও নহে। আমি এই বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগল হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজপুত হয়েন, আর যদি আমাকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করেন, তবে আমি তাঁহার দাসী হইব। হে বীরশ্রেষ্ঠ ! যুদ্ধে স্ত্রীলাভ বীরের ধর্ম্ম। সমগ্র ক্ষত্রকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পাণ্ডব দ্রৌপদীলাভ করিয়াছিলেন। যাদবী সেনাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অর্জ্জুন সুভদ্রাকে পাইয়াছিলেন। কাশীরাজ্যে সমবেত রাজমণ্ডলসমক্ষে আপন বীর্য্য প্রকাশ করিয়া ভীষ্মদেব রাজকন্যাগণকে লইয়া আসিয়াছিলেন। হে রাজন্ ! রুক্মিণীর বিবাহ কি মনে পড়ে না ? আপনি এই পৃথিবীতে আজিও অদ্বিতীয় বীর—আপনি কি বীরধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইবেন ?

আমি মুখরা, কতই বলিতেছি—পাছে বাক্যে আপনাকে না বাঁধিতে পারি—এজন্য গুরুদেবহস্তে রাখির বন্ধন পাঠাইলাম। তিনি রাখি বাঁধিয়া দিবেন—তার পর আপনার রাজধর্ম্ম আপনার হাতে। আমার প্রাণ আমার হাতে। যদি দিল্লী যাইতে হয়, দিল্লীর পথে বিষভোজন করিব।"

পত্র পাঠ করিয়া রাজসিংহ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন ; পরে মাথা তুলিয়া মাণিকলালকে বলিলেন, "মাণিকলাল, এ পত্রের কথা তুমি ছাড়া আর কে জানে ?"

মাণিক। যাহারা জানিত, মহারাজ গুহামধ্যে তাহাদিগকে বধ করিয়া আসিয়াছেন।

রাজা। উত্তম। তুমি গৃহে যাও। উদয়পুরে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। এ পত্রের কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

এই বলিয়া রাজসিংহ, নিকটে যে কয়টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহা মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

রাণা অনন্ত মিশ্রকে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, অনন্ত মিশ্রও তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহার চিত্ত স্থির ছিল না। অশ্বারোহীর যোদ্ধবেশ এবং তীব্র দৃষ্টিতে তিনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। একবার ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন—কিন্তু আর সব হারাইয়াছেন—চঞ্চলকুমারীর আশা ভরসা হারাইয়াছেন—আর কি বলিয়া তাহার কাছে মুখ দেখাইবেন? ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, পর্ব্বতের উপরে দুই তিন জন লোক দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন; মনে করিলেন, আবার নূতন দস্যুসম্প্রদায় আসিয়া উপস্থিত হইল না কি? সে বার—নিকটে যাহা হয় কিছু ছিল, তাহা পাইয়া দস্যুরা তাঁহার প্রাণবধে বিরত হইয়াছিল—এবার যদি ইহারা তাঁহাকে ধরে, তবে কি দিয়া প্রাণ রাখিব? এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে, পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তিরা হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছে এবং পরস্পর কি বলিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণের যে কিছু সাহস ছিল, তাহা গেল—ব্রাহ্মণ পলায়নের উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে পর্ব্বতবিহারীদিগের মধ্যে একজন পর্ব্বত অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল—দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তখন ধর ধর করিয়া তিন চারি জন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল—ব্রাহ্মণও ছুটিল—অজ্ঞান, মুক্তকচ্ছ, তথাপি নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ তীরবৎ বেগে পলাইল। যাহারা তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা তাহাকে শেষে আর না দেখিতে পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

তাহারা অপর কেহই নহে—মহারাণার ভৃত্যবর্গ। মহারাণার সহিত এস্থলে কি প্রকারে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল, তাহা এক্ষণে বুঝাইতে হইতেছে। রাজপুতগণের শিকারে বড় আনন্দ, অদ্য মহারাণা শত অশ্বারোহী এবং ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা শিকারে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উদয়পুরাভিমুখে যাইতেছিলেন। রাজসিংহ, সর্ব্বদা প্রহরিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন না। কখন কখন অনুচরবর্গকে দূরে রাখিয়া একাকী অশ্বারোহণ করিয়া ছদ্মবেশে প্রজাদিগের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। সেই জন্য তাঁহার রাজ্যে প্রজা অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিয়াছিল; স্বচক্ষে সকল দেখিতেন, স্বহস্তে সকল দুঃখ নিবারণ করিতেন।

অদ্য মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি অনুচরবর্গকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া দিয়া, বিজয়নামা দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় অনন্ত মিশ্রের সহিত

সাক্ষাৎ হইলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কথিত হইয়াছে। রাজা দস্যুকৃত অত্যাচার শুনিয়া স্বহস্তে ব্রহ্মস্ব উদ্ধারের জন্য ছুটিয়াছিলেন। যাহা দুঃসাধ্য এবং বিপদ্‌পূর্ণ, তাহাতেই তাঁহার আমোদ ছিল।

এদিকে অনেক বেলা হইল দেখিয়া কতিপয় রাজভৃত্য দ্রুতপদে তাঁহার অনুসন্ধানে চলিল। নীচে অবতরণকালে দেখিল, রাণার অশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—ইহাতে তাহারা বিস্মিত এবং চিন্তিত হইল। আশঙ্কা করিল যে, রাণার কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। নিম্নে শিলাখণ্ডোপরি অনন্ত ঠাকুর বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিল যে, এই ব্যক্তি অবশ্য কিছু জানিবে। সেই জন্য তাহারা হস্তপ্রসারণ করিয়া সে দিকে দেখাইয়া দিতেছিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য তাহারা নামিতেছিল, এমত সময়ে ঠাকুরজি নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন তাহারা ভাবিল, তবে এই ব্যক্তি অপরাধী। এই ভাবিয়া তাহারা পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণ এক গহ্বরমধ্যে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

এদিকে মহারাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রপাঠ সমাপ্ত ও মাণিকলালকে বিদায় করিয়া অনন্ত মিশ্রের তল্লাসে গেলেন। দেখিলেন, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই—তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার ভৃত্যবর্গ, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহিগণ আসিয়া অধিত্যকার তলদেশে ব্যাপিত করিয়াছে। রাণাকে দেখিতে পাইয়া সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিজয়, প্রভুকে দেখিতে পাইয়া, তিন লম্ফে অবতরণ করিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। রাণা তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বস্ত্র রুধিরাক্ত দেখিয়া সকলেই বুঝিল যে, একটা কিছু ক্ষুদ্র ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজপুতগণের ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার—কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

রাণা কহিলেন, "এইখানে এক ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল ; সে কোথায় গেল—কেহ দেখিয়াছ ?"

যাহারা উহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা বলিল, "মহারাজ, সে ব্যক্তি পলাইয়াছে।"

রাণা। শীঘ্র তাহার সন্ধান করিয়া লইয়া আইস।

ভৃত্যগণ তখন সবিশেষ কথা বুঝাইয়া নিবেদন করিল যে, আমরা অনেক সন্ধান করিয়াছি ; কিন্তু পাই নাই।

অশ্বারোহিগণ মধ্যে রাণার পুত্রদ্বয়, তাঁহার জ্ঞাতি ও অমাত্যবর্গ প্রভৃতি ছিল। রাজা পুত্রদ্বয় ও অমাত্যবর্গকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া আর সকলকে বলিলেন, "প্রিয়জনবর্গ! আজি অধিক বেলা হইয়াছে ; তোমাদিগের সকলের ক্ষুধাতৃষ্ণা পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ উদয়পুরে গিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করা আমাদিগের অদৃষ্টে নাই। এই পার্ব্বত্য পথে আবার আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। একটু ক্ষুদ্র লড়াই জুটিয়াছে—লড়াইয়ে যাহার সাধ থাকে, আমার সঙ্গে আইস—আমি এই পর্ব্বত পুনরারোহণ করিব। যাহার সাধ না থাকে, উদয়পুরে ফিরিয়া যাও।"

এই বলিয়া রাণা পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন ; অমনি "জয় মহারাণা কি জয়! জয় মাতা জী কি জয়!" বলিয়া সেই শত অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাতে পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইল। উপরে উঠিয়া হর! হর! হর! শব্দে, রূপনগরের পথে ধাবিত হইল। অশ্বক্ষুরের আঘাতে অধিত্যকায় ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

এদিকে অনন্ত মিশ্র রূপনগর হইতে যাত্রা করার পরেই রূপনগরে মহাধূম পড়িয়াছিল। মোগল বাদশাহের দুই সহস্র অশ্বারোহী সেনা রূপনগরের গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা চঞ্চলকুমারীকে লইতে আসিয়াছে।

নির্ম্মলের মুখ শুকাইল; দ্রুতবেগে সে চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, "কি হইবে সখি?"

চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিসের কি হইবে?"

নির্ম্মল। তোমাকে ত লইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই ত ঠাকুরজি উদয়পুর গিয়াছেন—এখনও তাঁর পৌছিবার বিলম্ব আছে। রাজসিংহের উত্তর আসিতে না আসিতেই তোমায় লইয়া যাইবে—কি হইবে সখি?

চঞ্চল। তার আর উপায় নাই—কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে। দিল্লীর পথে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ—সে বিষয়ে আমি চিত্ত স্থির করিয়াছি। সুতরাং আমার আর উদ্বেগ নাই। একবার কেবল আমি পিতাকে অনুরোধ করিব—যদি মোগলসেনাপতি সাত দিনের অবসর দেন।

চঞ্চলকুমারী সময়মত পিতৃপদে নিবেদন করিলেন যে, "আমি জন্মের মত রূপনগর হইতে চলিলাম। আমি আর কখন যে আপনাদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইব, আর কখন যে বাল্যসখীগণের সঙ্গে আমোদ করিতে পাইব, এমত সম্ভাবনা নাই। আমি আর সাত দিনের অবসর ভিক্ষা করি—সাত দিন মোগলসেনা এইখানে অবস্থিতি করুক। আর সাত দিন আমি আপনাদিগকে দেখিয়া শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হইব।"

রাজা একটু কাঁদিলেন। বলিলেন, "দেখি, সেনাপতিকে অনুরোধ করিব। কিন্তু তিনি অপেক্ষা করিবেন কি না, বলিতে পারি না।"

রাজা অঙ্গীকারমত মোগলসেনাপতির কাছে নিবেদন জানাইলেন। সেনাপতি ভাবিয়া দেখিলেন, বাদশাহ কোন সময় নিরূপিত করিয়া দেন নাই—বলিয়া দেন নাই যে, এত দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সাত দিন বিলম্ব করিতে তাঁহার সাহস হইল না; ভবিষ্যৎ বেগমের অনুরোধ একেবারে অগ্রাহ্য করিতেও পারিলেন না। আর পাঁচ দিন অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন। চঞ্চলকুমারীর বড় একটা ভরসা জন্মিল না।

এদিকে উদয়পুর হইতে কোন সম্বাদ আসিল না—মিশ্রঠাকুর ফিরিলেন না। তখন চঞ্চলকুমারী ঊর্দ্ধমুখে, যুক্তকরে বলিল, "হে অনাথনাথ দেবাদিদেব! অবলাকে বধ করিও না।"

তৃতীয় রজনীতে নির্ম্মল আসিয়া তাঁহার কাছে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি দুই জনে দুই জনকে বক্ষে রাখিয়া রোদন করিয়া কাটাইল। নির্ম্মল বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" কয়দিন ধরিয়া সে এই কথাই বলিতেছিল। চঞ্চল বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে? আমি মরিতে যাইতেছি।" নির্ম্মল বলিল, "আমিও মরিব। তুমি আমায় ফেলিয়া গেলেই কি আমি বাঁচিব?" চঞ্চল বলিল, "ছি! অমন কথা বলিও না—আমার দুঃখের উপর কেন দুঃখ বাড়াও?" নির্ম্মল বলিল, "তুমি আমাকে লইয়া যাও

বা না যাও, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাইব—কেহ রাখিতে পারিবে না।" দুই জনে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইল।

এদিকে সৈয়দ হাসান আলি খাঁ, মনসবদার—মোগল সৈন্যের সেনাপতি, রাত্রি প্রভাতে রাজকুমারীকে লইয়া যাইবার সকল উদ্যোগ করিয়া রাখিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে একবার মাণিকলালের কথা পাড়িতে হইল।

মাণিকলাল রাণার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, প্রথমে আবার সেই পর্ব্বতগুহায় ফিরিয়া গেল। আর সে দস্যুতা করিবে, এমত বাসনা ছিল না, কিন্তু পূর্ব্ববন্ধুগণ মরিল কি বাঁচিল, তাহা দেখিবে না কেন? যদি কেহ একেবারে না মরিয়া থাকে, তবে তাহার শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইতে হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে মাণিকলাল গুহাপ্রবেশ করিল।

দেখিল, দুই জন মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যে কেবল মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, সে সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মাণিকলাল তখন বিষণ্ণচিত্তে বন হইতে একরাশি কাট ভাঙ্গিয়া আনিল—তদ্দ্বারা দুইটি চিতা রচনা করিয়া দুইটি মৃতদেহ তদুপরি স্থাপন করিল। গুহা হইতে প্রস্তর ও লৌহ বাহির করিয়া অগ্ন্যুৎপাদনপূর্ব্বক চিতায় আগুন দিল। এইরূপ সঙ্গীদিগের অন্তিম কার্য্য করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। পরে মনে করিল যে, যে ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিয়াছিলাম, তাহার কি অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া আসি। যেখানে অনন্ত মিশ্রকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই। দেখিল, স্বচ্ছসলিলা পার্ব্বত্যা নদীর জল একটু ময়লা হইয়াছে—এবং অনেক স্থানে বৃক্ষশাখা, লতা গুল্ম তৃণাদি ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। এই সকল চিহ্ন মাণিকলাল মনে করিল যে, এখানে বোধ হয়, অনেক লোক আসিয়াছিল। তার পর দেখিল, পাহাড়ের প্রস্তরময় অঙ্গেও কতকগুলি অশ্বের পদচিহ্ন লক্ষ্য করা যায়—বিশেষ অশ্বের ক্ষুরে যেখানে লতা গুল্ম কাটিয়া গিয়াছে, সেখানে অর্দ্ধগোলাকৃত চিহ্ন সকল স্পষ্ট। মাণিকলাল মনোযোগপূর্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল যে, এখানে অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল।

চতুর মাণিকলাল তাহার পর দেখিতে লাগিল, অশ্বারোহিগণ কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছে—কোন্ দিকে গিয়াছে। দেখিল, কতকগুলি চিহ্নের সম্মুখ দক্ষিণে—কতকগুলির সম্মুখ উত্তরে। কতক দূর মাত্র দক্ষিণ গিয়া চিহ্ন সকল আবার উত্তরমুখ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিল, অশ্বারোহিগণ উত্তর হইতে এই পর্য্যন্ত আসিয়া আবার উত্তরাংশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

এই সকল সিদ্ধান্ত করিয়া মাণিকলাল গৃহে গেল। সে স্থান হইতে মাণিকলালের গৃহ দুই তিন ক্রোশ। তথায় রন্ধন করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইল। তখন মাণিকলাল ঘরে চাবি দিয়া কন্যা ক্রোড়ে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মাণিকলালের কেহ ছিল না—কেবল এক পিসীর ননদের জায়ের খুল্লতাতপুত্রী ছিল। সম্বন্ধ বড় নিকট—"সইয়ের বউয়ের বকুলফুলের—" ইত্যাদি। সৌজন্যবশতই হউক আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই হউক—মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিতেন।

মাণিকলাল কন্যা লইয়া সেই পিসীর বাড়ী গেল, ডাকিল, "পিসী গা ?"

পিসী বলিল, "কি বাছা মাণিকলাল ! কি মনে করিয়া ?"

মাণিকলাল বলিল, "আমার এই মেয়েটি রাখিতে পার পিসী ?"

পিসী। কতক্ষণের জন্য ?

মাণিক। এই দুমাস ছ মাসের জন্য ?

পিসী। সে কি বাছা ! আমি গরীব মানুষ—মেয়েকে খাওয়াব কোথা হইতে ?

মাণিক। কেন পিসী মা, তুমি কিসের গরীব ? তুমি কি নাতিনীকে দুমাস খাওয়াতে পার না ?

পিসী। সে কি কথা ? দুমাস একটা মেয়ে পুষিতে যে এক মোহর পড়ে।

মাণিক। আচ্ছা, আমি সে এক মোহর দিতেছি—তুমি মেয়েটিকে দুমাস রাখ। আমি উদয়পুরে যাইব—সেখানে আমি রাজসরকারে বড় চাকরি পাইয়াছি। এই বলিয়া মাণিকলাল, রাণার প্রদত্ত আশরাফির মধ্যে একটা পিসীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল ; এবং কন্যাকে তাহার কাছে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "যা ! তোর দিদির কোলে গিয়া বস্।"

পিসীঠাকুরাণী কিছু লোভে পড়িলেন। মনে মনে বিলক্ষণ জানিতেন যে, এক মোহরে ঐ শিশুর এক বৎসর গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে—মাণিকলাল কেবল দুই মাসের করার করিতেছে। অতএব কিছু লাভের সম্ভাবনা। তার পর মাণিক রাজদরবারে চাকরি স্বীকার করিয়াছে—চাহি কি বড়মানুষ হইতে পারে—তা হইলে কি পিসীকে কখন কিছু দিবে না ? মানুষটা হাতে থাকা ভাল।

পিসী তখন মোহরটি কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "তার আশ্চর্য্য কি বাছা—তোমার মেয়ে মানুষ করিব, সে কি বড় ভারি কাজ ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আয় রে জান্ আয় !" বলিয়া পিসী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইল।

কন্যাসম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে মাণিকলাল নিশ্চিন্তচিত্তে গ্রাম হইতে নির্গত হইল। কাহাকে কিছু না বলিয়া রূপনগরে যাইবার পার্ব্বত্য পথে আরোহণ করিল।

মাণিকলাল এইরূপ বিচার করিতেছিল—"ঐ অধিত্যকায় অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল কেন ? ঐখানে রাণাও একাকী ভ্রমিতেছিলেন—কিন্তু উদয়পুর হইতে এত দূর রাণা একাকী আসিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব উহারা রাণার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহী। তার পর দেখা গেল, উহারা উত্তর হইতে আসিয়াছে—উদয়পুর অভিমুখে যাইতেছিল—বোধ হয়, রাণা মৃগয়া বা বনবিহারে গিয়া থাকিবেন—উদয়পুর ফিরিয়া যাইতেছিলেন। তার পর দেখিলাম, উহারা উদয়পুর যায় নাই। উত্তরমুখেই ফিরিয়াছে—কেন ? উত্তরে ত রূপনগর বটে। বোধ হয়, চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া রাণা অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহার নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন। তাহা যদি না গিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রাজপুতপতি নাম মিথ্যা। আমি

তাঁহার ভৃত্য—আমি তাঁহার কাছে যাইব।—কিন্তু তাঁহারা অশ্বারোহণে গিয়াছেন—আমার পদব্রজে যাইতে অনেক বিলম্ব হইবে। তবে এক ভরসা, পার্ব্বত্য পথে অশ্ব তত দ্রুত যায় না এবং মাণিকলাল পদব্রজে বড় দ্রুতগামী।" মাণিকলাল দিবারাত্র পথ চলিতে লাগিল। যথাকালে সে রূপনগরে পৌঁছিল। পৌঁছিয়া দেখিল যে, রূপনগরে দুই সহস্র মোগল অশ্বারোহী আসিয়া শিবির করিয়াছে। কিন্তু রাজপুত সেনার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। আরও শুনিল, পরদিন প্রভাতে মোগলেরা রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে।

মাণিকলাল বুদ্ধিতে একটি ক্ষুদ্রতর সেনাপতি। রাজপুতগণের কোন সন্ধান না পাইয়া, কিছুই দুঃখিত হইল না। মনে মনে বলিল, মোগল পারিবে না—কিন্তু আমি প্রভুর সন্ধান করিয়া লইব।

এক ব্যক্তি নাগরিককে মাণিক বলিল, আমাকে দিল্লী যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে পার? আমি কিছু বখশিস দিব। নাগরিক সম্মত হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলাল তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিল, পরে দিল্লীর পথে, চারি দিক্ ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিল। মাণিকলাল স্থির করিয়াছিল যে, রাজপুত অশ্বারোহিগণ অবশ্য দিল্লীর পথে কোথাও লুকাইয়া আছে। প্রথমতঃ কিছু দূর পর্য্যন্ত মাণিকলাল রাজপুতসেনার কোন চিহ্ন পাইল না। পরে এক স্থানে দেখিল, পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। দুই পার্শ্বে দুইটি পাহাড় উঠিয়া, প্রায় অর্দ্ধক্রোশ সমান্তরাল হইয়া চলিয়াছে—মধ্যে কেবল সঙ্কীর্ণ পথ। দক্ষিণদিকে পর্ব্বত অতি উচ্চ—এবং দুরারোহণীয়—তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বাম দিকে পর্ব্বত, অতি ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। আরোহণের সুবিধা, এবং পর্ব্বতও অনুচ্চ। এক স্থানে ঐ বাম দিকে, একটি রন্ধ্র বাহির হইয়াছে, তাহা দিয়া একটু সূক্ষ্ম পথ আছে।

নাপোলেয়ন্ প্রভৃতি অনেক দস্যু সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। রাজা হইলে লোকে আর দস্যু বলে না। মাণিকলাল রাজা নহে—সুতরাং আমরা তাহাকে দস্যু বলিতে বাধ্য, কিন্তু রাজদস্যুদিগের ন্যায় এই ক্ষুদ্র দস্যুরও সেনাপতির চক্ষু ছিল। পর্ব্বতনিরুদ্ধ সঙ্কীর্ণ পথ দেখিয়া সে মনে করিল, রাণা যদি আসিয়া থাকেন, তবে এইখানেই আছেন। যখন মোগল সৈন্য এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইবে—এই পর্ব্বতশিখর হইতে রাজপুত অশ্ব বজ্রের ন্যায় তাহাদিগের মস্তকে পড়িতে পারিবে। দক্ষিণদিকের পর্ব্বত দুরারোহণীয়, অশ্বারোহিগণের আরোহণ ও অবতরণের অনুপযুক্ত, অতএব সেখানে রাজপুতসেনা থাকিবে না—কিন্তু বামের পর্ব্বত হইতে তাহাদিগের অবতরণের বড় সুখ। মাণিকলাল তদুপরি আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

উঠিয়া কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইল না। মনে করিল, খুঁজিয়া দেখি, কিন্তু আবার ভাবিল, রাজা ভিন্ন আর কোন রাজপুত আমাকে চিনে না; আমাকে মোগলের চর বলিয়া হঠাৎ কোন অদৃশ্য রাজপুত মারিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবিয়া সে আর অগ্রসর না হইয়া, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বলিল, "মহারাণার জয় হউক!"

এই শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র চারি পাঁচ জন শস্ত্রধারী রাজপুত অদৃশ্য স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইল, এবং তরবারি হস্তে মাণিকলালকে কাটিতে আসিতে উদ্যত হইল।

একজন বলিল, "মারিও না।" মাণিকলাল দেখিল, স্বয়ং রাণা।

রাণা বলিল, "মারিও না। এ আমাদিগের স্বজন।" যোদ্ধগণ তখনই আবার লুক্কায়িত হইল।

রাণা মাণিককে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আসিল। এক নিভৃত স্থলে তাহাকে বসিতে বলিয়া, স্বয়ং সেইখানে বসিলেন। রাণা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

মাণিকলাল বলিল, "প্রভু যেখানে, ভৃত্য সেইখানে যাইবে। বিশেষ যখন আপনি এরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যদি ভৃত্য কোন কার্য্যে লাগে, এই ভরসায় আসিয়াছে। মোগলেরা দুই সহস্র—মহারাজের সঙ্গে একশত। আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব? আপনি আমাকে জীবনদান করিয়াছেন—একদিনেই কি তাহা ভুলিব?"

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে এখানে আসিয়াছি, তুমি কি প্রকারে জানিলে?"

মাণিকলাল তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। শুনিয়া রাণা সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ—আমি তোমার মত সুচতুর লোক একজন খুঁজিতেছিলাম। আমি যাহা বলি পারিবে?"

মাণিকলাল বলিল, "মনুষ্যের যাহা সাধ্য, তাহা করিব।"

রাণা বলিলেন, "আমরা একশত যোদ্ধামাত্র; মোগলের সঙ্গে দুই হাজার—আমরা রণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জয়ী হইতে পারিব না। যুদ্ধ করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার করিতে পারিব না। রাজকন্যাকে আগে বাঁচাইয়া পরে যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলে তিনি আহত হইতে পারেন। তাঁহার রক্ষা প্রথমে চাই।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি সে সকল কি প্রকারে বুঝিব, আমাকে কি করিতে হইবে, তাহাই আজ্ঞা করুন।"

রাণা বলিলেন, "তোমাকে মোগল অশ্বারোহীর বেশ ধরিয়া কল্য মোগলসেনার সঙ্গে আসিতে হইবে। রাজকুমারীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে থাকিতে হইবে। এবং যাহা যাহা বলিতেছি, তাহা করিতে হইবে।" রাণা তাহাকে সবিস্তারিত উপদেশ দিলেন। মাণিকলাল শুনিয়া বলিলেন, "মহারাজের জয় হউক! আমি কার্য্য সিদ্ধ করিব। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া একটি ঘোড়া বক্সিস করুন।"

রাণা। আমরা একশত যোদ্ধা, একশত ঘোড়া। আর ঘোড়া নাই যে তোমায় দিই। অন্য কাহারও ঘোড়া দিতে পারিব না—আমার ঘোড়া লইতে পার।

মাণিক। তাহা প্রাণ থাকিতে লইব না। আমাকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দিন।

রাণা। কোথায় পাইব? যাহা আছে, তাহাতে আমাদের কুলায় না। কাহাকে নিরস্ত্র করিয়া তোমাকে হাতিয়ার দিব? আমার হাতিয়ার লইতে পার।

মাণিক। তাহা হইতে পারে না। আমাকে পোষাক দিতে আজ্ঞা হউক।

রাণা। এখানে যাহা পরিয়া আসিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর পোষাক নাই। আমি কিছুই দিব না।

মাণিক। মহারাজ! তবে অনুমতি দিউন, আমি যে প্রকারে হউক, এ সকল সংগ্রহ করিয়া লই।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "চুরি করিবে?"

মাণিকলাল জিহ্বা কাটিল। "আমি শপথ করিয়াছি যে, আর সে কার্য্য করিব না।"

রাণা। তবে কি করিবে?

মাণিক। ঠকাইয়া লইব।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "যুদ্ধকালে সকলেই চোর—সকলেই বঞ্চক। আমিও বাদশাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি—চোরের মত লুকাইয়া আছি। তুমি যে প্রকারে পার, এ সকল সংগ্রহ করিও।"

মাণিকলাল প্রফুল্লচিত্তে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মাণিকলাল তখনই রূপনগরে ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রূপনগরের বাজারে গিয়া মাণিকলাল দেখিল যে, বাজার অত্যন্ত শোভাময়। দোকানের শত শত প্রদীপের শোভায় বাজার আলোকময় হইয়াছে—নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য উজ্জ্বলবর্ণে রসনা আকুলিত করিতেছে—পুষ্প, পুষ্পমালা, থরে থরে নয়ন রঞ্জিত, এবং ঘ্রাণে মন মুগ্ধ করিতেছে। মাণিকের উদ্দেশ্য—অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, কিন্তু তাই বলিয়া আপন উদরকে বঞ্চনা করা মাণিকলালের অভিপ্রায় ছিল না। মাণিক গিয়া কিছু মিঠাই কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সের পাঁচ ছয় ভোজন করিয়া মাণিক দেড় সের জল খাইল। এবং দোকানদারকে উচিত মূল্য দান করিয়া তাম্বূলান্বেষণে গেল।

দেখিল, একটা পানের দোকানে বড় জাঁক। দেখিল, দোকানে বহুসংখ্যক দীপ বিচিত্র ফানুসমধ্য হইতে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে। দেওয়ালে নানা বর্ণের কাগজ মোড়া—নানা প্রকার বাহারের ছবি লট্‌কান—তবে চিত্রগুলি একটু বেশীমাত্রায় রঙ্গদার। মধ্য স্থানে কোমল গালিচায় বসিয়া—দোকানের অধিকারিণী তাম্বূলবিক্রেত্রী—বয়সে ত্রিশের উপর, কিন্তু কুরূপা নহে। বর্ণ গৌর, চক্ষু বড় বড়, চাহনি বড় কোমল, হাসি বড় রঙ্গদার—সে হাসি অনিন্দ্য দন্তশ্রেণীমধ্যে সর্ব্বদাই খেলিতেছে—হাসির সঙ্গে সর্ব্বালঙ্কার দুলিতেছে—অলঙ্কার কতক পিতল, কতক সোনা—কিন্তু সুগঠন এবং সুশোভন। মাণিকলাল, দেখিয়া শুনিয়া, পান চাহিল।

পানওয়ালী স্বয়ং পান বেচে না—সম্মুখে একজন দাসীতে পান সাজিতেছে ও বেচিতেছে—পানওয়ালী কেবল পয়সা কুড়াইতেছে—এবং মিষ্ট হাসিতেছে।

দাসী একজন পান সাজিয়া দিল; মাণিকলাল ডবল দাম দিল। আবার পান চাহিল। যতক্ষণ পান সাজা হইতেছিল, ততক্ষণ মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া দুই একটা মিষ্ট কথা কহিতে লাগিল; পানওয়ালীর রূপের প্রশংসা করিলে, পাছে সে কিছু মন্দ ভাবে, এ জন্য প্রথমে তাহার দোকান-সজ্জা ও অলঙ্কারগুলির প্রশংসা করিতে লাগিল। পানওয়ালীও একটু ভিজিল। পানওয়ালী মিঠে পানের সঙ্গে মিঠে কথা বেচিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল তখন দোকানে উঠিয়া বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর হুঁকা কাড়িয়া লইয়া, টানিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে মাণিকলাল পান খাইয়া দোকানের মশালা ফুরাইয়া দিল। দাসী মশালা আনিতে অন্য দোকানে গেল। সেই অবসরে মাণিকলাল

পানওয়ালীকে বলিল, "বিবি সাহেব! তুমি বড় চতুরা। আমি একটি চতুরা স্ত্রীলোক খুঁজিতেছিলাম। আমার একটি দুষমন্ আছে—তাহাকে একটু জব্দ করিব ইচ্ছা। কি করিতে হইবে, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। তুমি যদি আমার সহায়তা কর, তবে এক আশরফি পুরস্কার করিব।"

পান। কি করিতে হইবে?

মাণিক চুপি চুপি কি বলিল। পানওয়ালী বড় রঙ্গপ্রিয়া—তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। বলিল, "আশরফির প্রয়োজন নাই—রঙ্গই আমার পুরস্কার।"

মাণিকলাল তখন দোয়াত, কলম, কাগজ চাহিল, দাসী তাহা নিকটস্থ বেণিয়ার দোকান হইতে আনিয়া দিল। পানওয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই পত্র লিখিল,—

"হে প্রাণনাথ! তুমি যখন নগরভ্রমণে আসিয়াছিলে, আমি তোমাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তোমার একবার দেখা না পাইলে আমার প্রাণ যাইবে। শুনিতেছি, তোমরা কাল চলিয়া যাইবে—অতএব আজ একবার অবশ্য অবশ্য আমায় দেখা দিবে। নহিলে আমি গলায় ছুরি দিব। যে পত্র লইয়া যাইতেছে—তাহার সঙ্গে আসিও—সে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে।"

পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল শিরোনামা দিল, "মহম্মদ খাঁ।"

পানওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও ব্যক্তি?"

মা। একজন মোগল সওয়ার।

বাস্তবিক, মাণিকলাল মোগলদিগের মধ্যে একজনকেও চিনিত না। কাহারও নাম জানে না। সে মনে ভাবিল, দুই হাজার মোগলের মধ্যে অবশ্য একজন মহম্মদ আছেই আছে—আর সকল মোগলই "খাঁ"। অতএব সাহস করিয়া "মহম্মদ খাঁ" লিখিল; পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল বলিল, "তাহাকে এইখানে আনিব।"

পানওয়ালী বলিল, "এ ঘরে হইবে না। আর একটা ঘর ভাড়া লইতে হইবে।"

তখনই দুই জনে বাজারে গিয়া আর একটা ঘর লইল। পানওয়ালী মোগলের অভ্যর্থনাজন্য তাহা সজ্জিতকরণে প্রস্তুত হইল—মাণিকলাল পত্র লইয়া মুসলমানশিবিরে উপস্থিত হইল। শিবিরমধ্যে মহাগোলযোগ—কোন শৃঙ্খলা নাই—নিয়ম নাই। তাহার ভিতরে বাজার বসিয়া গিয়াছে—রঙ্গ তামাসা রোশনাইয়ের ধুম লাগিয়াছে। মাণিকলাল মোগল দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে, "মহম্মদ খাঁ কে মহাশয়? তাঁহার নামে পত্র আছে।" কেহ উত্তর দেয় না—কেহ গালি দেয়;—কেহ বলে চিনি না—কেহ বলে খুঁজিয়া লও। শেষ একজন মোগল বলিল, "মহম্মদ খাঁকে চিনি না, কিন্তু আমার নাম নূর মহম্মদ খাঁ। পত্র দেখি—দেখিলে বুঝিতে পারিব, পত্র আমার কি না।"

মাণিকলাল সানন্দচিত্তে তাহার হস্তে পত্র দিল—মনে জানে, মোগল যেই হউক, ফাঁদে পড়িবে। মোগলও ভাবিল—পত্র যারই হউক, আমি কেন এই সুবিধাতে বিবিটাকে দেখিয়া আসি না। প্রকাশ্যে বলিল, "হাঁ, পত্র আমারই বটে। চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" এই বলিয়া মোগল তাম্বুমধ্যে প্রবেশ করিয়া চুল আঁচড়াইয়া গন্ধদ্রব্য মাখিয়া পোষাক পরিয়া বাহির হইল। বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে ভৃত্য, সে স্থান কতদূর?"

মাণিকলাল যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর, অনেক দূর! ঘোড়ায় গেলে ভাল হইত।"

"বহুত আচ্ছা" বলিয়া খাঁ সাহেব ঘোড়া বাহির করিয়া চড়িতে যান, এমত সময়ে মাণিকলাল আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর! বড় ঘরের কথা—হাতিয়ার বন্দ হইয়া গেলেই ভাল হয়।"

নূতন নাগর ভাবিলেন, সে ভাল কথা—জঙ্গী জোয়ান আমি; হাতিয়ার ছাড়া কেন যাইব। তখন অঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া মাণিকলাল বলিল, "এই স্থানে উতারিতে হইবে। আমি আপনার ঘোড়া ধরিতেছি, আপনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করুন।"

খাঁ সাহাব নামিলেন—মাণিকলাল ঘোড়া ধরিয়া রহিল। খাঁ বাহাদুর সশস্ত্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, পরে মনে পড়িল যে, হাতিয়ার বন্দ হইয়া রমণীসম্ভাষণে যাওয়া বড় ভাল দেখায় না। ফিরিয়া আসিয়া মাণিকলালের কাছে অস্ত্রগুলিও রাখিয়া গেলেন। মাণিকলালের আরও সুবিধা হইল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া খাঁ সাহেব দেখিলেন যে, তক্তপোষের উপর উত্তম শয্যা; তাহার উপর সুন্দরী বসিয়া আছে—আতর গোলাবের সৌগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়াছে—চারি দিকে ফুল বিকীর্ণ হইয়াছে। এবং সম্মুখে আলবোলায় সুগন্ধি তামাকু প্রস্তুত আছে।—খাঁ সাহেব, জুতা খুলিয়া, তক্তপোষে বসিলেন, বিবিকে মিষ্টবচনে সম্ভাষণ করিলেন—পরে পোষাকটি খুলিয়া রাখিয়া, ফুলের পাখা হাতে লইয়া বাতাস খাইতে আরম্ভ করিলেন, এবং আলবোলার নল মুখে পুরিয়া সুখের আবেশে টান দিতে লাগিলেন। বিবিও তাঁহাকে দুই চারিটা গাঢ় প্রণয়ের কথা বলিয়া একেবারে মোহিত করিল।

অর্দ্ধ দণ্ড হইতে না হইতে মাণিকলাল আসিয়া দ্বারে ঘা মারিল। বিবি বলিল, "কেও?"

মাণিকলাল বিকৃত স্বরে বলিল, "আমি।"

তখন চতুরা রমণী অতি ভীতকণ্ঠে খাঁ সাহেবকে বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে—আমার স্বামী আসিয়াছেন—মনে করিয়াছিলাম—তিনি আজ আর আসিবেন না। তুমি এই তক্তপোষের নীচে একবার লুকাও। আমি উহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

মোগল বলিল, "সে কি? মরদ হইয়া ভয়ে লুকাইব? যে হয় আসুক না; এখনই কোতল করিব।"

পানওয়ালী জিব কাটিয়া বলিল, "সে কি? সর্ব্বনাশ! আমার স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়া আমার অন্নবস্ত্রের পথ বন্ধ করিবে? এই কি তোমাকে ভালবাসার ফল? শীঘ্র তক্তপোষের নীচে যাও। আমি এখনই উহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

এদিকে মাণিকলাল পুনঃপুনঃ দ্বারে করাঘাত করিতেছিল। অগত্যা খাঁ সাহেব তক্তপোষের নীচে গেলেন। মোটা শরীর বড় সহজে প্রবেশ করে না, ছাল চামড়া দুই এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল—কি করে—প্রেমের জন্য অনেক সহিতে হয়। সে স্থূল মাংসপিণ্ড তক্তপোষতলে বিন্যস্ত হইলে পর পানওয়ালী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে পানওয়ালী পূর্ব্বশিক্ষামত বলিল, "তুমি আবার এলে যে? আজ আর আসিবে না বলিয়াছিলে যে?"

মাণিকলাল পূর্ব্বমত বিকৃতস্বরে বলিল, "চাবিটা ফেলিয়া গিয়াছি।"

দুই জনে চাবি খোঁজার ছল করিয়া, খাঁ সাহেবের পরিত্যক্ত পোষাকটি হস্তে লইল। পোষাক লইয়া দুই জনে বাহিরে চলিয়া আসিয়া, শিকল টানিয়া বাহির হইতে চাবি দিল। খাঁ সাহেব তখন তক্তপোষের নীচে, মূষিকদিগের দংশনযন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন।

তাঁহাকে গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া, মাণিকলাল তাঁহার পোষাক পরিল। পরে তাঁহার হাতিয়ারে হাতিয়ারবন্দ হইয়া মুসলমানশিবিরে তাঁহার স্থান লইতে চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে মোগলসৈন্য সাজিল। রূপনগরের গড়ের সিংহদ্বার হইতে, উষ্ণীষকবচশোভিত, গুম্ফশ্মশ্রুসমন্বিত, অস্ত্রসজ্জাভীষণ অশ্বারোহীর দল সারি দিল। পাঁচ পাঁচ জন অশ্বারোহী এক এক সারি, সারির পিছু সারি, তার পর আবার সারি, সারি সারি সারি অশ্বারোহীর সারি চলেছে; ভ্রমরশ্রেণীসমাকুল যুল্লকমলতুল্য তাহাদের বদনমণ্ডল সকল শোভিতেছিল। তাহাদিগের অশ্বশ্রেণী গ্রীবাভঙ্গে সুন্দর, বল্গারোধে অধীর, মন্দগমনে ক্রীড়াশীল; অশ্বশ্রেণী শরীরভরে হেলিতেছে দুলিতেছে এবং নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে।

চঞ্চলকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া, রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইলেন। নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল। চঞ্চল বলিল, "ফুলের মালা পরাও সখি—আমি চিতারোহণে যাইতেছি।" প্রবলবেগে প্রবহমান চক্ষের জল, চক্ষুঃপ্রান্তে ফেরৎ পাঠাইয়া নির্ম্মল বলিল, "রত্নালঙ্কার পরাই সখি, তুমি উদয়পুরেশ্বরী হইতে যাইতেছ।" চঞ্চল বলিল, "পরাও! পরাও! নির্ম্মল! কুৎসিত হইয়া কেন মরিব? রাজার মেয়ে আমি; রাজার মেয়ের মত সুন্দর হইয়া মরিব। সৌন্দর্য্যের মত কোন্ রাজ্য? রাজত্ব কি বিনা সৌন্দর্য্যে শোভা পায়? পরা।" নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল, সে কুসুমিততরুবিনিন্দিত কান্তি দেখিয়া কাঁদিল। কিছু বলিল না। চঞ্চল তখন, নির্ম্মলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চল তার পর বলিল, "নির্ম্মল! আর তোমায় দেখিব না। কেন বিধাতা এমন বিড়ম্বনা করিলেন। দেখ, ক্ষুদ্র কাঁটার গাছ যেখানে জন্মে, সেইখানে থাকে; আমি কেন রূপনগরে থাকিতে পাইলাম না!"

নির্ম্মল বলিল, "আমায় আবার দেখিবে। তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। আমায় না দেখিলে তোমার মরা হইবে না; তোমায় না দেখিলে আমার মরা হইবে না।"

চঞ্চল। আমি দিল্লীর পথে মরিব।

নির্ম্মল। দিল্লীর পথে তবে আমায় দেখিবে।

চঞ্চল। সে কি নির্ম্মল? কি প্রকারে তুমি যাইবে?

নির্ম্মল কিছু বলিল না। চঞ্চলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চলকুমারী বেশভূষা সমাপন করিয়া মহাদেবের মন্দিরে গেলেন। নিত্যব্রত শিবপূজা ভক্তিভাবে করিলেন। পূজান্তে বলিলেন, "দেবদেব মহাদেব! মরিতে চলিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বালিকার

মরণে তোমার এত তুষ্টি কেন? প্রভো! আমি বাঁচিলে কি তোমার সৃষ্টি চলিত না? যদি এতই মনে ছিল, কেন আমাকে রাজার মেয়ে করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলে?"

মহাদেবের বন্দনা করিয়া চঞ্চলকুমারী মাতৃচরণ বন্দনা করিতে গেলেন। মাতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল! পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিল। পিতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল! তার পর একে একে সখীজনের কাছে, চঞ্চল বিদায়গ্রহণ করিল। সকলে কাঁদিয়া গণ্ডগোল করিল। চঞ্চল কাহাকে অলঙ্কার, কাহাকে খেলেনা, কাহাকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না; আমি আবার আসিব।" কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না; দেখিতেছ না, আমি পৃথিবীশ্বরী হইতে যাইতেছি?" কাহাকেও বলিলেন, "কাঁদিও না—কাঁদিলে যদি দুঃখ যাইত, তবে আমি কাঁদিয়া রূপনগরের পাহাড় ভাসাইতাম।"

সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া, চঞ্চলকুমারী শিবিকারোহণে চলিলেন। এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য শিবিকার অগ্রে স্থাপিত হইয়াছে; এক সহস্র পশ্চাতে। রজতমণ্ডিত, রত্নখচিত সে শিবিকা, বিচিত্র সুবর্ণখচিত বস্ত্রে আবৃত হইয়াছে; আশা সোঁটা লইয়া চোপদার বাগ্‌জালে গ্রাম্য দর্শকবর্গকে আনন্দিত করিতেছে। চঞ্চলকুমারী শিবিকায় আরোহণ করিলেন। দুর্গমধ্য হইতে শঙ্খ নিনাদিত হইল; কুসুম ও লাজাবলীতে শিবিকা পরিপূর্ণ হইল; সেনাপতি চলিবার আজ্ঞা দিলেন; তখন অকস্মাৎ মুক্তপথ তড়াগের জলের ন্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী প্রবাহিত হইল; বল্গা দংশিত করিয়া, নাচিতে নাচিতে অশ্বশ্রেণী চলিল—অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রের ঝঞ্চনা বাজিল।

অশ্বারোহিগণ প্রভাতবায়ুপ্রফুল্ল হইয়া কেহ কেহ গান করিতেছিল। শিবিকার পশ্চাতেই যে অশ্বারোহিগণ ছিল, তাহার মধ্যে অগ্রবর্ত্তী একজন গায়িতেছিল—যাহা গায়িতেছিল, তাহার অনুবাদ, যথা—

যারে ভাবি দূরে সে সতত নিকটে।
প্রাণ গেলে তবু সে যে রাখিবে শকটে॥

রাজকুমারীর কর্ণে সে গীত প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন, "হায়! যদি শিপাহীর গীত সত্য হইত!" রাজকুমারী তখন রাজসিংহকে ভাবিতেছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল তাঁহার পশ্চাতে এই গীত গাইতেছিল। মাণিকলাল, যত্ন করিয়া শিবিকার পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এদিকে নির্ম্মলকুমারীর বড় গোলমাল বাধিল। চঞ্চল ত রত্নখচিত শিবিকারোহণে চলিয়া গেল—আগে পিছে দুই সহস্র কুমারপ্রতিম অশ্বারোহী আল্লার মহিমার শব্দে রূপনগরের পাহাড় ধ্বনিত করিয়া চলিল। কিন্তু নির্ম্মলের কান্না ত থামে না—একা—একা—একা—শত পৌরজনের মধ্যে চঞ্চল অভাবে নির্ম্মল বড়ই একা! নির্ম্মল উচ্চ গৃহচূড়ার উপরি উঠিয়া দেখিতে লাগিল—দেখিতে লাগিল, পাদক্রোশপরিমিত অজগর

সর্পের ন্যায় সেই বৃহৎ অশ্বারোহী সৈনিকশ্রেণী পার্ব্বত্য পথে বিসর্পিত হইয়া উঠিতেছে, নামিতেছে—প্রভাতসূর্য্যকিরণে তাহাদিগের ঊর্দ্ধোত্থিত উজ্জ্বল বর্শাফলক সকল জ্বলিতেছে। কতক্ষণ নির্ম্মল চাহিয়া রহিল। চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তখন নির্ম্মল চক্ষু মুছিয়া, ছাদের উপর হইতে নামিল। নির্ম্মল একটা কিছু ভাবিয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়াছিল। নামিয়া প্রথমে একজন সামান্যা পরিচারিকার জীর্ণ মলিন বাস চুরি করিল—তাহার বিনিময়ে আপনার চারুদর্শন পরিধেয় রাখিয়া আসিল। নির্ম্মল সেই জীর্ণ মলিন বাস পরিল।—অলঙ্কার সকল খুলিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিল, কেহ দেখিতে পাইল না। সঞ্চিত অর্থমধ্যে কতিপয় মুদ্রা নির্ম্মল গোপনে সংগ্রহ করিল। কেবল তাহাই লইয়া সেই জীর্ণ মলিন বাসে নির্ম্মল একাকিনী রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। পরে দৃঢ়পদে অশ্বারোহী সেনা যে পথে গিয়াছে, সেই পথে একাকিনী তাহাদের অনুবর্ত্তিনী হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় ফিরিতে ফিরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে সেই অশ্বারোহী সেনা পার্ব্বত্য পথে চলিল। যে রন্ধ্রপথের পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া মাণিকলাল রাজসিংহের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল, বিবরে প্রবিশ্যমান মহোরগের ন্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। অশ্বসকলের অসংখ্য পদবিক্ষেপধ্বনি পর্ব্বতের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এমন কি, সেই স্থির শব্দহীন বিজন প্রদেশে আরোহীদিগের অশ্বের মৃদু শব্দ একত্র সমুত্থিত হইয়া রোমহর্ষণ প্রতিধ্বনির উৎপত্তির কারণ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে অশ্বগণের হ্রেষারব—আর সৈনিকের ডাক হাঁক! পর্ব্বততলে যে সকল লতা গুল্ম ছিল—শব্দাঘাতে তাহার পাতা সকল কাঁপিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বন্য পশু পক্ষী কীট যাহারা সে বিজন প্রদেশে নির্ভয়ে বাস করিত, তাহারা সকলে দ্রুত পলায়ন করিল। এইরূপে সমুদায় অশ্বারোহীর সারি সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। তখন হঠাৎ গুম করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। যেখানে শব্দ হইল, সে প্রদেশের অশ্বারোহীরা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, পর্ব্বতশিখরদেশ হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্ব্বতচ্যুত হইয়া সৈন্যমধ্যে পড়িয়াছে। চাপে একজন অশ্বারোহী মরিয়াছে, আর একজন আহত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে, ব্যাপার কি, তাহা কেহ বুঝিতে না বুঝিতে আবার সৈন্যমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িল—এক, দুই, তিন, চারি, ক্রমে দশ পঁচিশ—তখনই একেবারে শত শত ছোট বড় শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল—বহুসংখ্যক অশ্ব ও অশ্বারোহী কেহ হত, কেহ আহত হইয়া, পথের উপর পড়িয়া সঙ্কীর্ণ পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। অশ্বসকল আরোহী লইয়া পলায়নের জন্য বেগবান্ হইল—কিন্তু অগ্রে পশ্চাতে পথ সৈনিকের ঠেলাঠেলিতে অবরুদ্ধ—অশ্বের উপর অশ্ব, আরোহীর উপর আরোহী চাপিয়া পড়িতে লাগিল—সৈনিকেরা পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিয়া পথ করিতে লাগিল—শৃঙ্খলা একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল, সৈন্যমধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল।

"কাহার লোগ হুঁসিয়ার! বাঁ রাস্তা!" মাণিকলাল হাঁকিল। যেখানে রাজকুমারী শিবিকায়, এবং পশ্চাতে মাণিকলাল, তাহার সম্মুখেই এই গোলযোগ উপস্থিত। বাহকেরা আপনাদিগের প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত—অশ্ব সকল পাছু হটিয়া তাহাদের উপর চাপিয়া পড়িতেছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পার্ব্বত্য পথের বামদিক্ দিয়া একটি অতি সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথ বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহাতে একেবারে একটিমাত্র অশ্বারোহী প্রবেশ করিতে পারে। তাহারই কাছে যখন সেনামধ্যস্থিত শিবিকা পৌছিয়াছিল, তখনই এই হুলস্থুল উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই রাজসিংহের বন্দোবস্ত। সুশিক্ষিত মাণিকলাল প্রাণভয়ে ভীত বাহকদিগকে ঐ পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলালের কথা শুনিবামাত্র বাহকেরা আপনাদিগের ও রাজকুমারীর প্রাণরক্ষার্থ ঝটিতি শিবিকা লইয়া সেই পথে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব লইয়া মাণিকলালও তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। নিকটস্থ সৈনিকেরা দেখিল যে, প্রাণ বাঁচাইবার এই এক পথ, তখন আর একজন অশ্বারোহী মাণিকলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পথে প্রবেশ করিতে গেল। সেই সময়ে উপর হইতে একটা অতি বৃহৎ শিলাখণ্ড গড়াইতে গড়াইতে, শব্দে পার্ব্বত্য প্রদেশ কাঁপাইতে কাঁপাইতে, আসিয়া সেই রন্ধ্রমুখে পড়িয়া স্থিতিলাভ করিল। তাহার চাপে দ্বিতীয় অশ্বারোহী অশ্বসমেত চূর্ণ হইয়া গেল। রন্ধ্রমুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আর কেহ সে পথে প্রবেশ করিতে পারিল না। একা মাণিকলাল শিবিকাসঙ্গে যথেপ্সিত পথে চলিল।

সেনাপতি হাসান আলি খাঁ মনসবদার, তখন সৈন্যের সর্ব্বপশ্চাতে ছিলেন। প্রবেশপথমুখে স্বয়ং দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ণ দ্বারে সেনার প্রবেশের তত্ত্বাবধারণ করিতেছিলেন। পরে সমুদায় সেনা প্রবিষ্ট হইলে স্বয়ং ধীরে ধীরে সর্ব্বপশ্চাতে আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সহসা সৈনিকশ্রেণী মহাগোলযোগ করিয়া পাছু হটিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু ভাল বুঝাইয়া বলিতে পারে না। তখন সৈনিকগণকে ভর্ৎসনা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন—এবং স্বয়ং সর্ব্বাগ্রগামী হইয়া ব্যাপার কি, দেখিতে চলিলেন।

কিন্তু ততক্ষণ সেনা থাকে না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই পর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বস্থ পর্ব্বত অতি উচ্চ এবং দুরারোহণীয়—তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকার করিয়াছে। রাজপুতেরা তাহার প্রদেশান্তরে অনুসন্ধান করিয়া পথ বাহির করিয়া, পঞ্চাশ জন তাহার উপর উঠিয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছিল। এক এক জন অপরের চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে স্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া আপন আপন সম্মুখে একটি একটি ঢিপি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে পলকে পলকে পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ খণ্ড শিলা নিম্নস্থ আরোহীদিগের উপর বৃষ্টি করিতেছিল। এক একবারে পঞ্চাশটি অশ্ব বা আরোহী আহত বা নিহত হইতেছিল। কে মারিতেছিল, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলে, দুরারোহণীয় পর্ব্বতশিখরস্থ শত্রুগণের প্রতি কোনরূপেই আঘাত সম্ভব নহে—অতএব তাহারা পলায়ন ভিন্ন অন্য কোন চেষ্টাই করিতেছিল না। যে সহস্রসংখ্যক অশ্বারোহী শিবিকার অগ্রভাগে ছিল, তাহার মধ্যে হত ও আহতের অবশিষ্ট পলায়নপূর্ব্বক রন্ধ্রমুখে নির্গত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

পঞ্চাশ জন রাজপুত দক্ষিণপার্শ্বের উচ্চ পর্ব্বত হইতে শিলাবৃষ্টি করিতেছিল—আর পঞ্চাশ জন স্বয়ং রাজসিংহের সহিত বাম দিকের অনুচ্চ পর্ব্বতশিরে লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এতক্ষণ কিছুই করিতেছিল না।

কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইল। যেখানে শিলাবৃষ্টিনিবন্ধন ঘোরতর বিপত্তি, সেখানে মিরজা মবারকআলিনামা একজন যুবা মোগল—অর্থাৎ আহেলে বিলায়ত তুর্কস্থানী এবং দুইশতী মনসবদার, অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে সৈন্যগণকে সুশৃঙ্খলের সহিত পার্ব্বত্য পথ হইতে বহিষ্কৃত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, ক্ষুদ্রতর রন্ধ্রপথে রাজকুমারীর শিবিকা চলিয়া গেল, একজনমাত্র অশ্বারোহী তাহার সঙ্গে গেল, অমনি অর্গলের ন্যায় বৃহৎ শিলাখণ্ড সে পথ বন্ধ করিল—তখন তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, এ ব্যাপার আর কিছুই নহে—কোন দুরাত্মা রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার মানসে এই উদ্যম করিয়াছে। তখন তিনি ডাকিয়া নিকটস্থ সৈনিকদিগকে বলিলেন—"প্রাণ যায় সেও স্বীকার! শত শিপাহী দোলার পিছু পিছু যাও। ঘোড়া ছাড়িয়া পাও দলে, এই পাথর টপকাইয়া যাও—চল, আমি যাইতেছি।" মবারক অগ্রে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পথরোধক শিলাখণ্ডের উপর উঠিলেন। এবং তাহার উপর হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া শত শিপাহী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।

রাজসিংহ পর্ব্বতশিখর হইতে এ সকল দেখিতে লাগিলেন। যতক্ষণ মোগলেরা ক্ষুদ্রপথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল, ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরে তাহারা রন্ধ্রপথমধ্যে নিবদ্ধ হইলে, পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী রাজপুত লইয়া বজ্রের ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদের নিহত করিতে লাগিলেন। সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইয়া মোগলেরা বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এই ভয়ঙ্কর রণে প্রাণত্যাগ করিল। উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়া শিপাহীগণের উপর পড়িল—নীচে যাহারা ছিল, তাহারা চাপেই মরিল। পাঁচ সাত দশজন মাত্র এড়াইল। মবারক তাহাদের লইয়া ফিরিলেন। রাজপুতেরা তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল না।

মবারকের সঙ্গে মোগল শিপাহীর বেশধারী মাণিকলালও বাহির হইয়া আসিল। আসিয়াই একজন মৃত সোওয়ারের অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই শৃঙ্খলাশূন্য মোগলসেনার মধ্যে কোথায় লুকাইল, মবারক তাহা দেখিতে পাইলেন না।

মাণিকলাল, যে মুখে মোগলেরা সেই পার্ব্বত্য পথে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথে নির্গত হইল। যাহারা তাহাকে দেখিল, তাহারা ভাবিল, সে পলাইতেছে। মাণিকলাল গলি হইতে বাহির হইয়া তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগরের গড়ের দিকে চলিল।

মবারক প্রস্তরখণ্ড পুনরুল্লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, আজ্ঞা দিলেন, "এই পাহাড়ে চড়িতে কষ্ট নাই; সকলেই ঘোড়া লইয়া এই পাহাড়ের উপরে উঠ। দস্যু অল্পসংখ্যক। তাহাদের সমূলে নিপাত করিব।" তখন পাঁচ শত মোগল সেনা, "দীন! দীন!" শব্দ করিয়া অশ্বসহিত বাম দিকের সেই পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। মবারক অধিনায়ক। মোগলদিগের সঙ্গে দুইটা তোপ ছিল। একটা ঠেলিয়া তুলিয়া পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর একটা লইয়া মোগলেরা টানিয়া, যে বৃহৎ শিলাখণ্ডের দ্বারা পার্ব্বত্য রন্ধ্র বন্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর উঠাইয়া স্থাপিত করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

তখন "দীন দীন" শব্দে পঞ্চ শত অশ্বারোহী কালান্তক যমের ন্যায় পর্ব্বতে আরোহণ করিল। পর্ব্বত অত্যুচ্চ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—শিখরদেশে উঠিতে তাহাদের বড় কালবিলম্ব হইল না। কিন্তু পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া দেখিল যে, কেহ ত পর্ব্বতোপরে নাই। যে রন্ধ্রপথমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজে পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এখন মবারক বুঝিলেন যে, সমুদায় দস্যু—মবারকের বিবেচনায় তাহারা রাজপুত দস্যু ভিন্ন আর কিছুই নহে—সমুদায় দস্যু সেই রন্ধ্রপথে আছে। তাহার দ্বিতীয় মুখ রোধ করিয়া তাহাদিগের বিনাশসাধন করিবেন, মবারক এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন। হাসান আলি আর মুখে কামান পাতিয়া বসিয়া আছেন। এই ভাবিয়া, তিনি সেই রন্ধ্রের ধারে ধারে সৈন্য লইয়া চলিলেন। ক্রমে পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল; তখন মবারক পাহাড়ের ধারে আসিয়া দেখিলেন—চল্লিশ জনের অনধিক রাজপুত, শিবিকাসঙ্গে রুধিরাক্ত কলেবরে সেই পথে চলিতেছে। মবারক বুঝিলেন যে, অবশ্য ইহারা নির্গমপথ জানে; ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিলে, রন্ধ্রদ্বারে উপস্থিত হইব। তাহা হইলে যেরূপ পথে রাজপুতেরা পর্ব্বত হইতে নামিয়াছিল, সেইরূপ অন্য পথ দেখিতে পাইব। রাজপুতেরা যে আগে উপরে ছিল, পরে নামিয়াছে, তাহার সহস্র চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। মবারক সেইরূপ করিতে লাগিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, পাহাড় ঢালু হইয়া আসিতেছে, সম্মুখে নির্গমের পথ। মবারক অশ্ব-সকল তীরবেগে চালাইয়া পর্ব্বততলে নামিয়া রন্ধ্রমুখ বন্ধ করিলেন। রাজপুতেরা রন্ধ্রের বাঁক ফিরিয়া যাইতেছিল—সুতরাং তাহারা আগে রন্ধ্রমুখে পৌঁছিতে পারিল না। মোগলেরা পথরোধ করিয়া রন্ধ্রমুখে কামান বসাইল; এবং আগতপ্রায় রাজপুতগণকে উপহাস করিবার জন্য তাহার বজ্রনাদ একবার শুনাইল—দীন! দীন! শব্দের সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। শুনিয়া উত্তরস্বরূপ রন্ধ্রের অপর মুখে হাসান আলিও কামানের আওয়াজ করিলেন; আবার পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি বিকট ডাক ডাকিল। রাজপুতগণ শিহরিল—তাহাদের কামান ছিল না।

রাজসিংহ দেখিলেন, আর কোন মতেই রক্ষা নাই। তাঁহার সৈন্যের বিশগুণ সেনা, পথের দুই মুখ বন্ধ করিয়াছে—পথান্তর নাই—কেবল যমমন্দিরের পথ খোলা। রাজসিংহ স্থির করিলেন, সেই পথেই যাইবেন। তখন সৈনিকগণকে একত্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"ভাই বন্ধু, যে কেহ সঙ্গে থাক, আজি সরলান্তঃকরণে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোষে এ বিপদ্ ঘটিয়াছে—পর্ব্বত হইতে নামিয়াই এ দোষ করিয়াছি। এখন এ গলির দুই মুখ বন্ধ—দুই মুখেই কামান শুনিতেছ! দুই মুখে আমাদের বিশগুণ মোগল দাঁড়াইয়া আছে—সন্দেহ নাই। অতএব আমাদিগের বাঁচিবার ভরসা নাই। নাই—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? রাজপুত হইয়া কে মরিতে কাতর? সকলেই মরিব—একজনও বাঁচিব না—কিন্তু মারিয়া মরিব। যে মরিবার আগে দুই জন মোগল না মারিয়া মরিবে—সে রাজপুত নহে—বিজাতক। রাজপুতেরা শুন। এ পথে ঘোড়া ছুটে না—সবাই ঘোড়া ছাড়িয়া দাও। এসো, আমরা তরবাল হাতে লাফাইয়া গিয়া তোপের উপর পড়ি। তোপ ত আমাদেরই হইবে—তার পর দেখা যাইবে, কত মোগল মারিয়া মরিতে পারি।"

তখন রাজপুতগণ, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একত্র অসি নিষ্কোষিত করিয়া, "মহারাণা কি জয়!" বলিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখকান্তি দেখিয়া রাজসিংহ বুঝিলেন যে, প্রাণরক্ষা না হউক—একটি রাজপুতও হটিবে না। সন্তুষ্ট চিত্তে রাণা আজ্ঞা দিলেন, "দুই দুই করিয়া সারি দাও।" অশ্বপৃষ্ঠে সবে একে একে যাইতেছিল—পদব্রজে "দুইয়ে দুইয়ে রাজপুত চলিল—রাণা সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। আজ আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্ত।

এমত সময়ে সহসা পর্ব্বতরন্ধ্র কম্পিত করিয়া, পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া, রাজপুত সেনা শব্দ করিল, "মাতা জি কি জয়! কালীমায়ি কি জয়!"

অত্যন্ত হর্ষসূচক ঘোর রব শুনিয়া রাজসিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, ব্যাপার কি? দেখিলেন, দুই পার্শ্বে রাজপুতসেনা সারি দিয়াছে—মধ্যে বিশাললোচনা, সহাস্যবদনা, কোন্ দেবী আসিতেছে। হয় কোন দেবী মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—নয় কোন মানবীকে বিধাতা দেবীর মূর্ত্তিতে গঠিয়াছেন। রাজপুতেরা মনে করিল, চিতোরাধিষ্ঠাত্রী রাজপুতকুলরক্ষিণী ভগবতী এ সঙ্কটে রাজপুতকে রক্ষা করিতে স্বয়ং রণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই তাহারা জয়ধ্বনি করিতেছিল।

রাজসিংহ দেখিলেন—এ ত মানবী, কিন্তু সামান্যা মানবী নহে। ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, দোলা কোথায়?"

একজন পিছু হইতে বলিল, "দোলা এই দিকে আছে।"

রাণা বলিলেন, "দেখ, দোলা খালি কি না?"

সৈনিক বলিল, "দোলা খালি। কুমারী জী মহারাজের সাম্‌নে।"

চঞ্চলকুমারী তখন রাজসিংহকে প্রণাম করিলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারি—আপনি এখানে কেন?"

চঞ্চল বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। প্রণাম করিয়াছি—এখন একটি ভিক্ষা চাহি। আমি মুখরা—স্ত্রীলোকের শোভা যে লজ্জা, তাহা আমাতে নাই. ক্ষমা করিবেন। ভিক্ষা যাহা চাহি—তাহাতে নৈরাশ করিবেন না।"

চঞ্চলকুমারী হাস্য ত্যাগ করিয়া, যোড়হাত করিয়া কাতরস্বরে এই কথা বলিলেন। রাজসিংহ বলিলেন, "তোমারই জন্য এতদূর আসিয়াছি—তোমাকে অদেয় কিছুই নাই—কি চাও, রূপনগরের কন্যে?"

চঞ্চলকুমারী আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, "আমি চঞ্চলমতি বালিকা বলিয়া আপনাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু আমি আপনার মন আপনি বুঝিতে পারি নাই। আমি এখন মোগলসম্রাটের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া, বড় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি অনুমতি করুন—আমি দিল্লী যাইব।"

রাজসিংহ বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "তোমার দিল্লী যাইতে হয় যাও—আমার আপত্তি নাই—স্ত্রীলোক চিরকাল অস্থিরচিত্ত। কিন্তু আপাততঃ তুমি যাইতে পাইবে না। যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিই, মোগল মনে করিবে যে, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আগে যুদ্ধ শেষ হউক—তার পর তুমি যাইও। যওয়ান্ সব—আগে চল।"

তখন চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসিয়া, মর্ম্মভেদী মৃদু কটাক্ষ করিয়া, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীয় বাম হস্তের অঙ্গুলিদ্বয়ের দ্বারা ফিরাইয়া রাজসিংহকে দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, "মহারাজ! এই আঙ্গটিতে বিষ আছে। দিল্লীতে না যাইতে দিলে, আমি বিষ খাইব।"

রাজসিংহ তখন হাসিলেন—বলিলেন, "বুঝিয়াছি রাজকুমারি—রমণীকুলে তুমি ধন্যা! কিন্তু তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা হইবে না। আজ রাজপুতের বাঁচা হইবে না; আজ রাজপুতকে মরিতেই হইবে—নহিলে রাজপুতনামে বড় কলঙ্ক হইবে। আমরা যতক্ষণ না মরি—ততক্ষণ তুমি বন্দী। আমরা মরিলে তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইও।"

চঞ্চলকুমারী হাসিল—অতিশয় প্রণয়প্রফুল্ল, ভক্তিপ্রমোদিত, সাক্ষাৎ মহাদেবের অনিবার্য্য এক কটাক্ষবাণ রাজসিংহের উপর ত্যাগ করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, "বীরচূড়ামণি! আজি হইতে আমি তোমার মহিষী হইলাম! যদি তোমার মহিষী না হই—তবে চঞ্চল কখনই প্রাণ রাখিবে না।" প্রকাশ্যে বলিল, "মহারাজ! দিল্লীশ্বর যাহাকে মহিষী করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সে কাহারও বন্দী নহে। এই আমি মোগল সৈন্যসম্মুখে চলিলাম—কাহার সাধ্য রাখে দেখি?"

এই বলিয়া চঞ্চলকুমারী—জীবন্ত দেবীমূর্ত্তি, রাজসিংহকে পাশ করিয়া রন্ধ্রমুখে চলিল। তাঁহাকে স্পর্শ করে কাহার সাধ্য? এজন্য কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে, হেলিতে দুলিতে, সেই স্বর্ণমুক্তাময়ী প্রতিমা রন্ধ্রমুখে চলিয়া গেল।

একাকিনী চঞ্চলকুমারী সেই প্রজ্বলিত বহ্নিতুল্য রুষ্ট, সশস্ত্র পঞ্চ শত মোগল অশ্বারোহীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যেখানে সেই পথরোধকারী কামান—মনুষ্যনির্ম্মিত বজ্র, অগ্নি উদ্গীর্ণ করিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে—গোলন্দাজের হাতে অগ্নি জ্বলিতেছে—সেইখানে, সেই কামানের সম্মুখে, রত্নমণ্ডিতা লোকাতীত সুন্দরী দাঁড়াইল। দেখিয়া বিস্মিত মোগলসেনা মনে করিল—পর্ব্বতনিবাসিনী পরি আসিয়াছে।

মনুষ্যভাষায় কথা কহিয়া চঞ্চলকুমারী সে ভ্রম ভাঙ্গিল।—বলিল, "এ সেনার সেনাপতি কে?"

মবারক স্বয়ং রন্ধ্রমুখে রাজপুতগণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তিনি বলিলেন, "ইহারা এখন অধমের অধীন। আপনি কে?"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "আমি সামান্যা স্ত্রী। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা আছে—যদি অন্তরালে শুনেন, তবেই বলিতে পারি।"

মবারক বলিলেন, "তবে রন্ধ্রমধ্যে আগু হউন।" চঞ্চলকুমারী রন্ধ্রমধ্যে অগ্রসর হইলেন—মবারক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

যেখানে কথা অন্যে শুনিতে পায় না, এমত স্থানে আসিয়া চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "আমি রূপনগরের রাজকন্যা। বাদশাহ আমাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে আমাকে লইতে এই সেনা পাঠাইয়াছেন—একথা বিশ্বাস করেন কি?"

মবারক। আপনাকে দেখিয়াই সে বিশ্বাস হয়।

চঞ্চল। আমি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক—ধর্ম্মে পতিত হইব মনে করি। কিন্তু পিতা ক্ষীণবল—তিনি আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন।—তাঁহা হইতে কোন ভরসা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কাছে দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম—আমার কপালক্রমে তিনি পঞ্চাশ জন মাত্র শিপাহী লইয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের বলবীর্য্য ত দেখিলেন ?

মবারক চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি—পঞ্চাশ জন শিপাহী এক সহস্র মোগল মারিল ?"

চঞ্চল। বিচিত্র নহে—হলদীঘাটে ঐ রকম কি একটা হইয়াছিল শুনিয়াছি। কিন্তু সে যাই হউক—রাজসিংহ এক্ষণে আপনার নিকট পরাস্ত। তাঁহাকে পরাস্ত দেখিয়াই আমি আসিয়া ধরা দিতেছি। আমাকে দিল্লী লইয়া চলুন—যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই।

মবারক বলিল, "বুঝিয়াছি, নিজের সুখ বলি দিয়া, আপনি রাজপুতের প্রাণরক্ষা করিতে চাহেন। তাঁহাদেরও কি সেই ইচ্ছা ?"

চ। সেও কি সম্ভবে ? আমাকে আপনারা লইয়া চলিলেও তাহারা যুদ্ধ ছাড়িবে না। আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে একমত হইয়া আপনি তাহাদের প্রাণরক্ষা করুন।

ম। তাহা পারি। কিন্তু দস্যুর দণ্ড অবশ্য দিতে হইবে। আমি তাঁহাদের বন্দী করিব।

চ। সব পারিবেন—সেইটি পারিবেন না। তাঁহাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিবেন, কিন্তু বাঁধিতে পারিবেন না। তাঁহারা সকলেই মরিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন—মরিবেন।

মবা। তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি দিল্লী যাইবেন, ইহা স্থির ?

চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাতত যাওয়াই স্থির। দিল্লী পর্য্যন্ত পৌছিব কি না সন্দেহ।

মবা। সে কি ?

চ। আপনারা যুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি শুধু শুধু মরিতে জানি না ?

মবা। আমাদের শত্রু আছে, তাই মরি। ভুবনে কি আপনার শত্রু আছে ?

চ। আমি নিজে।—

ম। আমাদের শত্রুর অনেক প্রকার অস্ত্র আছে—আপনার ?

চ। বিষ।

ম। কোথায় আছে ?

বলিয়া মবারক চঞ্চলকুমারীর মুখপানে চাহিলেন। বুঝি অন্য কেহ হইলে তাহার মনে মনে হইত, "নয়ন ছাড়া আর কোথাও বিষ আছে কি ?" কিন্তু মবারক সে ইতর প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন না। তিনি রাজসিংহের ন্যায় যথার্থ বীরপুরুষ। তিনি বলিলেন, "মা, আত্মঘাতিনী কেন হইবেন ? আপনি যদি যাইতে না চাহেন, তবে আমাদের সাধ্য কি, আপনাকে লইয়া যাই ? স্বয়ং দিল্লীশ্বর উপস্থিত থাকিলেও আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিতেন না—আমরা কোন্ ছার ? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—কিন্তু এ রাজপুতেরা বাদশাহের সেনা আক্রমণ করিয়াছে—আমি মোগলসেনাপতি হইয়া কি প্রকারে উহাদের ক্ষমা করি ?"

চ। ক্ষমা করিয়া কাজ নাই—যুদ্ধ করুন।

এই সময় রাজপুতগণ লইয়া রাজসিংহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন—তখন চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "যুদ্ধ করুন—রাজপুতের মেয়েরাও মরিতে জানে।"

মোগলসেনাপতির সঙ্গে লজ্জাহীনা চঞ্চল কি কথা কহিতেছে, শুনিবার জন্য রাজসিংহ এই সময়ে চঞ্চলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চঞ্চল তখন তাঁহার কাছে হাত পাতিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! আপনার কোমরে যে তরবারি দুলিতেছে, রাজপ্রসাদস্বরূপ দাসীকে উহা দিতে আজ্ঞা হউক।"

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি সত্য সত্যই ভৈরবী।" এই বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অসি নির্ম্মুক্ত করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিলেন। চঞ্চল অসি ঘুরাইয়া মবারকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "তবে যুদ্ধ করুন। রাজপুতেরা যুদ্ধ করিতে জানে। আর রাজপুতানার স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধ করিতে জানে। খাঁ সাহেব! আগে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। স্ত্রীহত্যা হইলে, আপনার বাদশাহের গৌরব বাড়িতে পারে।"

শুনিয়া, মোগল ঈষৎ হাসিল। চঞ্চলকুমারীর কথার কোন উত্তর করিল না। কেবল রাজসিংহের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "উদয়পুরের বীরেরা কত দিন হইতে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত?"

রাজসিংহের দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "যত দিন হইতে মোগলবাদশাহ অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, ততদিন হইতে রাজপুতকন্যাদিগের বাহুতে বল হইয়াছে।" তখন রাজসিংহ সিংহের ন্যায় গ্রীবাভঙ্গের সহিত, স্বজনবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রাজপুতেরা বাগ্‌যুদ্ধে অপটু। বৃথা কালহরণে প্রয়োজন নাই—পিপীলিকার মত এই মোগলদিগকে মারিয়া ফেল।"

এতক্ষণ বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় উভয় সৈন্য স্তম্ভিত হইয়া ছিল—প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত কেহই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছিল না। এক্ষণে রাণার আজ্ঞা পাইয়া "মাতা জী কি জয়!" শব্দে রাজপুতেরা জলপ্রবাহবৎ মোগলসেনার উপরে পড়িল। এদিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া, মোগলেরা "আল্লা—হো—আকবর!" শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সহসা উভয় সেনাই নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল! সেই রণক্ষেত্রে উভয় সেনার মধ্যে অসি উত্তোলন করিয়া—স্থিরমূর্ত্তি চঞ্চলকুমারী দাঁড়াইয়া—সরিতেছে না।

চঞ্চলকুমারী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যতক্ষণ না একপক্ষ নিবৃত্ত হয়—ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না। অগ্রে আমাকে না মারিয়া কেহ অস্ত্র চালনা করিতে পরিবে না।"

রাজসিংহ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমার এ অকর্ত্তব্য। স্বহস্তে তুমি রাজপুতকুলে এই কলঙ্ক লেপিতেছ কেন? লোকে বলিবে, আজ স্ত্রীলোকের সাহায্যে রাজসিংহ প্রাণরক্ষা করিল।"

চ। মহারাজ! আপনাকে মরিতে কে নিষেধ করিতেছে? আমি কেবল আগে মরিতে চাহিতেছি। যে অনর্থের মূল—তাহার আগে মরিবার অধিকার আছে।

চঞ্চল নড়িল না—মোগলেরা বন্দুক উঠাইয়াছিল—নামাইল। মবারক চঞ্চলকুমারীর কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন উভয় সেনাসমক্ষে মবারক ডাকিয়া বলিলেন, "মোগল বাদশাহ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করেন না—অতএব বলি, আমরা এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া যাই। রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মীমাংসা ভরসা করি, ক্ষেত্রান্তরে হইবে। আমি রাণাকে অনুরোধ করিয়া যাইতেছি যে, সে বার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া না আইসেন।"

চঞ্চলকুমারী মবারকের জন্য চিন্তিত হইলেন। মবারক তখন তাঁহার নিকটে—অশ্বে আরোহণ করিতেছে মাত্র। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে বলিলেন, "সাহেব! আমাকে ফেলিয়া যাইতেছ কেন? আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আপনাদের দিল্লীশ্বর পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাকে যদি না লইয়া যান, তবে বাদশাহ কি বলিবেন?"

মবারক বলিল, "বাদশাহের বড় আর একজন আছেন। উত্তর তাঁহার কাছে দিব।"

চঞ্চল। সে ত পরলোকে, কিন্তু ইহলোকে?

মবারক। মবারক আলি, ইহলোকে কাহাকেও ভয় করে না। ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন—আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া মবারক অশ্বে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যকে ফিরিতে আদেশ করিতেছিলেন, এমত সময়ে পশ্চাতে একবারে সহস্র বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। একেবারে শত মোগল যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। মবারক দেখিলেন, ঘোর বিপদ—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মাণিকলাল পার্ব্বত্য পথ হইতে নির্গত হইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে রূপনগরের গড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রূপনগরের রাজার কিছু সিপাহী ছিল, তাহারা বেতনভোগী চাকর নহে; জমী করিত; ডাক হাঁক করিলে ঢাল, খাঁড়া, লাঠি, সোঁটা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত; এবং সকলেরই এক একটি ঘোড়া ছিল। মোগলসেনা আসিলে রূপনগরের রাজা তাহাদিগকে ডাক হাঁক করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে তাহাদিগের ডাকিবার কারণ, মোগলসৈন্যের সম্মান ও খবরদারিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা। গোপন অভিপ্রায়, যদি মোগলসেনা হঠাৎ কোন উপদ্রব উপস্থিত করে, তবে তাহার নিবারণ। ডাকিবামাত্র রাজপুতেরা ঢাল, খাঁড়া, ঘোড়া লইয়া গড়ে উপস্থিত হইল—রাজা তাহাদিগকে, অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র দিয়া সাজাইলেন। তাহারা নানাবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া মোগলসৈনিকগণের সহিত হাস্য পরিহাস ও রঙ্গরসে কয়দিবস কাটাইল। তাহার পর ঐ দিবস প্রভাতে মোগলসেনা শিবির ভঙ্গ করিয়া রাজকুমারীকে লইয়া যাওয়াতে, রূপনগরের সৈনিকেরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা পাইল। তখন তাহারা অস্ত্র সজ্জিত করিল এবং অস্ত্র সকল রাজার অস্ত্রাগারে ফিরাইয়া দিবার জন্য লইয়া আসিল, রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে

একত্রিত করিয়া স্নেহসূচক বাক্যে বিদায় দিতেছিলেন, এমত সময় আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অশ্ব সহিত সেখানে উপস্থিত হইল।

মাণিকলালের সেই মোগলসৈনিকের বেশ। একজন মোগলসৈনিক অতি ব্যস্ত হইয়া গড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সম্বাদ?"

মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ, বড় গণ্ডগোল বাধিয়াছে, পাঁচ হাজার দস্যু আসিয়া রাজকুমারীকে ঘেরিয়াছে। জোনাব হাসান আলি খাঁ বাহাদুর, আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন—তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু আর কিছু সৈন্য ব্যতীত রক্ষা পাইতে পারিবেন না। আপনার নিকট সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছেন।"

রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আমার সৈন্য সজ্জিতই আছে।" সৈনিকগণকে বলিলেন, "তোমাদের ঘোড়া তৈয়ার, হাতিয়ার হাতে! তোমরা সওয়ার হইয়া এখনই যুদ্ধে চল। আমি স্বয়ং তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি।"

মাণিকলাল বলিল, "যদি এ দাসের অপরাধ মাপ হয়, তবে আমি নিবেদন করি যে, ইহাদিগকে লইয়া আমি অগ্রসর হই। মহারাজ আর কিছু সেনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসুন। দস্যুরা সংখ্যায় প্রায় পাঁচ হাজার। আরও কিছু সেনাবল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

স্থূলবুদ্ধি রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহস্র সৈনিক লইয়া মাণিকলাল অগ্রসর হইল; রাজা আরও সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টায় গড়ে রহিলেন। মাণিক, সেই রূপনগরের সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিল।

পথে যাইতে যাইতে মাণিকলাল একটি ছোট রকম লাভ করিয়া চলিল। পথের ধারে একটি বৃক্ষের ছায়ায় একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে—বোধ হয় যেন পীড়িতা। অশ্বারোহী সৈন্য প্রধাবিত দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল—দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল; বোধ হয় পলাইবার ইচ্ছা, কিন্তু পারিল না। বল নাই। ইহা দেখিয়া মাণিকলাল ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার নিকটে গেল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি অতিশয় সুন্দরী। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা এখানে এপ্রকারে পড়িয়া আছ?"

যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কাহার ফৌজ?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি রাণা রাজসিংহের ভৃত্য।"

যুবতী বলিল, "আমি রূপনগরের রাজকুমারীর দাসী।"

মাণিক। তবে এখানে এ অবস্থায় কেন?

যুবতী। রাজকুমারীকে দিল্লী লইয়া যাইতেছে। আমি সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে রাজি হয়েন নাই। ফেলিয়া আসিয়াছেন। আমি তাই হাঁটিয়া তাঁহার কাছে যাইতেছিলাম।

মাণিকলাল বলিল, "তাই পথশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া আছ?"

নির্ম্মলকুমারী বলিল, "অনেক পথ হাঁটিয়াছি—আর পারিতেছি না।"

পথ এমন বেশী নয়—তবে নির্ম্মল কখন পথ হাঁটে নাই, তার পক্ষে অনেক বটে।

মাণিক। তবে এখন কি করিবে?

নির্ম্মল। কি করিব—এইখানে মরিব।

মাণিক। ছি! মরিবে কেন? রাজকুমারীর কাছে চল না কেন?

নি। যাইব কি প্রকারে? হাঁটিতে পারিতেছি না, দেখিতেছ না।

মাণিক। কেন, ঘোড়ায় চল না?

নির্ম্মল হাসিল। বলিল, "ঘোড়ায়?"

মাণিক। ঘোড়ায়। ক্ষতি কি?

নির্ম্মল। আমি কি শিপাহী?

মাণিক। হও না।

নির্ম্মল। আপত্তি নাই। তবে একটা প্রতিবন্ধক আছে—ঘোড়ায় চড়িতে জানি না।

মাণিক। তার জন্য কি আটকায়। আমার ঘোড়ায় চড় না?

নি। তোমার ঘোড়া কলের? না মাটির?

মাণিক। আমি ধরিয়া থাকিব।

নির্ম্মল, লজ্জারহিতা হইয়া রসিকতা করিতেছিল—এবার মুখ ফিরাইল। তার পর ভ্রূকুটি করিল; রাগ করিয়া বলিল, "আপনি আপনার কাজে যান, আমি আমার গাছতলায় পড়িয়া থাকি। রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাতে আমার কাজ নাই।" মাণিকলাল দেখিল, মেয়েটা বড় সুন্দরী। লোভ সামলাইতে পারিল না। বলিল, "হাঁ গা! তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

রহস্যপরায়ণা নির্ম্মল মাণিকলালের রকম দেখিয়া হাসিল। বলিল, "না।"

মাণিকলাল। তুমি কি জাতি?

নি। আমি রাজপুতের মেয়ে।

মাণিক। আমিও রাজপুতের ছেলে। আমারও স্ত্রী নাই। আমার একটি ছোট মেয়ে আছে, তার একটি মা খুঁজি। তুমি তার মা হইবে? আমায় বিবাহ করিবে? তা হইলে আমার সঙ্গে একত্র ঘোড়ায় চড়ায় কোন আপত্তি হয় না।

নি। শপথ কর।

মাণিক। কি শপথ করিব?

নি। তরবার ছুঁইয়া শপথ কর যে, আমাকে বিবাহ করিবে।

মাণিকলাল তরবারি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে, "যদি আজিকার যুদ্ধে বাঁচি, তবে তোমাকে বিবাহ করিব।"

নির্ম্মল বলিল, "তবে চল, ঘোড়ায় চড়ি।"

মাণিকলাল তখন সহর্ষ চিত্তে নির্ম্মলকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া, সাবধানে তাহাকে ধরিয়া অশ্বচালনা করিতে লাগিল।

বোধ হয়, কোর্টশিপটা পাঠকের বড় লাগিল না। আমি কি করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকালসঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—"হে প্রাণ!" "হে প্রাণাধিক!" সে সব কিছুই নাই —ধিক্!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী এক নিভৃত স্থানে নির্ম্মলকে নামাইয়া দিয়া, তাহাকে সেইখানে বসিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া, মাণিকলাল, যেখানে রাজসিংহের সঙ্গে মবারকের যুদ্ধ হইতেছিল, একেবারে সেইখানে, মবারকের পশ্চাতে, উপস্থিত হইল।

মাণিকলাল দেখিয়া যায় নাই যে, তৎপ্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু রন্ধ্রপথে রাজসিংহ প্রবেশ করিয়াছেন; হঠাৎ তাহার শঙ্কা হইয়াছিল যে, মোগলেরা রন্ধ্রের এই মুখ বন্ধ করিয়া রাজসিংহকে বিনষ্ট করিবে। সেই জন্যই সে রূপনগরের সৈন্যসংগ্রহার্থে গিয়াছিল। এবং সেই জন্য সে প্রথমেই এই দিকে রূপনগরের সেনা লইয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বুঝিল যে, রাজপুতগণের নাভিশ্বাস উপস্থিত বলিলেই হয়—মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। তখন মাণিকলাল মবারকের সেনার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ সকল দস্যু! উহাদিগকে মারিয়া ফেল।"

সৈনিকেরা কেহ কেহ বলিল, "উহারা যে মুসলমান!"

মাণিকলাল বলিল, "মুসলমান কি লুঠেরা হয় না? হিন্দুই কি যত দুষ্ক্রিয়াকারী? মার।"

মাণিকলালের আজ্ঞায় একেবারে হাজার বন্দুকের শব্দ হইল।

মবারক ফিরিয়া দেখিলেন, কোথা হইতে সহস্র অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে। মোগলেরা ভীত হইয়া আর যুদ্ধ করিল না। যে যেদিকে পারিল, সে সেই দিকে পলায়ন করিল। মবারক রাখিতে পারিল না। তখন রাজপুতেরা "মাতাজী কি জয়!" বলিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

মবারকের সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, রূপনগরের সেনা তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল।

এই অবসরে মাণিকলাল বিস্মিত রাজসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ কাণ্ড মাণিকলাল? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কিছু জান?"

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল, "জানি। যখন আমি দেখিলাম যে, মহারাজ রন্ধ্রপথে নামিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। প্রভুর রক্ষার্থ আমাকে আবার একটি নূতন জুয়াচুরি করিতে হইয়াছে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে রাণাকে শুনাইল। আপ্যায়িত হইয়া রাণা মাণিকলালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "মাণিকলাল! তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত! তুমি যে কার্য্য করিয়াছ,

যদি কখন উদয়পুর ফিরিয়া যাই, তবে তাহার পুরস্কার করিব। কিন্তু তুমি আমাকে বড় সাধে বঞ্চিত করিলে। আজ মুসলমানকে দেখাইতাম যে, রাজপুত কেমন করিয়া মরে।"

মাণিকলাল বলিল, "মহারাজ! মোগলকে সে শিক্ষা দিবার জন্য মহারাজের অনেক ভৃত্য আছে। সেটা রাজকার্য্যের মধ্যে গণনীয় নহে! এখন উদয়পুরের পথ খোলসা। রাজধানী ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে রাজকুমারীকে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করুন।"

রাজসিংহ বলিলেন, "আমার কতকগুলি সঙ্গী এখন ওদিকের পাহাড়ের উপরে আছে—তাহাদের নামাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি তাহাদিগকে লইয়া যাইব। আপনি অগ্রসর হউন। পথে আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

রাণা সম্মত হইয়া, চঞ্চলকুমারী সহিত উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

রাণাকে বিদায় দিয়া, মাণিকলাল রূপনগরের সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ব্বতারোহণ করিল। পলায়নপরায়ণ মোগলসেনা তৎকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যে যেখানে পাইল, পলায়ন করিল। তখন মাণিকলাল রূপনগরের সৈনিকদিগকে বলিলেন, "শত্রুসকল পলায়ন করিয়াছে—আর কেন বৃথা পরিশ্রম করিতেছ? কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, রূপনগরে ফিরিয়া যাও।" সৈনিকেরাও দেখিল—তাও বটে, সম্মুখশত্রু আর কেহ নাই। তখন তাহারা মহারাজা বিক্রমসিংহের জয়ধ্বনি তুলিয়া রণজয়গর্ব্বে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দণ্ডকাল মধ্যে পার্ব্বত্য পথ জনশূন্য হইল—কেবল হত ও আহত মনুষ্য ও অশ্ব সকল পড়িয়া রহিল। দেখিয়া উচ্চ পর্ব্বতের উপরে, প্রস্তরসঞ্চালনে যে সকল রাজপুত নিযুক্ত ছিল, তাহারা নামিল। এবং কোথাও কাহাকে না দেখিয়া রাণা অবশিষ্ট সৈন্য সহিত অবশ্য উদয়পুর যাত্রা করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া, তাহারাও তাঁহার সন্ধানে সেই পথে চলিল। পথিমধ্যে রাজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলে একত্রে উদয়পুরে চলিলেন।

সকলে জুটিল—কেবল মাণিকলাল নহে। মাণিকলাল নির্ম্মলকে লইয়া বিব্রত। সকলকে গুছাইয়া পাঠাইয়া দিয়া, নির্ম্মলের কাছে আসিয়া জুটিল। তাহাকে কিছু ভোজন করাইয়া, গ্রাম হইতে বাহক ও দোলা লইয়া আসিল। দোলায় নির্ম্মলকে তুলিয়া, যে পথে রাণা গিয়াছেন, সে পথে না গিয়া ভিন্ন পথে চলিল—বমাল সমেত ধরা পড়ে, এমত ইচ্ছা রাখে নাই।

মাণিকলাল নির্ম্মলকে লইয়া পিসীর বাড়ী উপস্থিত হইল। পিসী মাকে ডাকিয়া বলিল, "পিসী মা, একটা বউ এনেছি।" বধূ দেখিয়া পিসী মা কিছু বিষণ্ন হইলেন—মনে করিলেন—লাভের যে আশা করিয়াছিলাম—বধূ বুঝি তাহার ব্যাঘাত করিবে। কি করে, দুইটা আশরফি নগদ লইয়াছে—একদিন অন্ন না দিয়া বহুকে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। সুতরাং বলিল, "বেশ বউ।"

মাণিকলাল বলিল, "পিসী—বহুর সঙ্গে আমার আজিও বিবাহ হয় নাই।"

পিসী মা বুঝিলেন, তবে এটা উপপত্নী। যো পাইয়া বলিল, "তবে আমার বাড়ীতে—"

মাণিকলাল। তার ভাবনা কি? বিয়ে দাও না? আজই বিবাহ হউক।

নির্ম্মল লজ্জায় অধোবদন হইল।

পিসী মা আবার যো পাইলেন, বলিলেন, "সে ত সুখের কথা—তোমার বিবাহ দিব না ত কার বিবাহ দিব? তা বিবাহে ত কিছু খরচ চাই?"

মাণিকলাল বলিল, "তার ভাবনা কি?"

পাঠকের জানা থাকিতে পারে, যুদ্ধ হইলেই লুঠ হয়। মাণিকলাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিবার সময়ে নিহত মোগলশিপাহীদিগের বস্ত্রমধ্যে অনুসন্ধান করিয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছিলেন—ঝনাৎ করিয়া পিসীর কাছে গোটাকত আশরাফি ফেলিয়া দিলেন, পিসী মা আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া পেটারায় তুলিয়া রাখিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে বাহির হইলেন। বিবাহের উদ্যোগের মধ্যে ফুল চন্দন ও পুরোহিত সংগ্রহ, সুতরাং আশরাফিগুলি পিসী মাকে পেটারা হইতে আর বাহির করিতে হইল না। মাণিকলালের লাভের মধ্যে তিনি যথাশাস্ত্র নির্ম্মলকুমারীর স্বামী হইলেন।

ইহার পর বলা বাহুল্য যে, নির্ম্মলকুমারী পরিণীতা হইয়া স্বামিকর্ত্তৃক উদয়পুরে আনীতা এবং রাজপুরী-মধ্যে চঞ্চলকুমারীর নিকট প্রেরিতা হইলেন। ইহাও বলা বাহুল্য যে, চঞ্চলকুমারী উদয়পুরের রাণার রাজমহিষী হইলেন। এবঞ্চ মাণিকলাল রাজদরবারে সম্মানিত হইয়া উচ্চ পদ লাভ করিলেন। তাঁহার কন্যাটি নির্ম্মলকুমারীর জিম্মায় রহিল। পিসী মার সঙ্গে আর বড় সম্বন্ধ রহিল না।

ঔরঙ্গজেব শিশুপালের দশা প্রাপ্ত হইয়া দেবীরের ক্ষেত্রে রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। সেখানেও শিশুপালের দশান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সকল কথা বলা হইল না।

সম্পূর্ণ